শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

বর্ষ ---২৯

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...	৫
দেশে কত দূরে...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৩
ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে	শ্রীঅরবিন্দ	১৮
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৩৩
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৪৫
কঠিন ভানায় ওড়া	বীরবাহু	৭১

27552

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

আগামী মার্চ থেকে বিজ্ঞাপনের পরিবর্তিত হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০.০০	বার্ষিক	৩০০.০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০.০০		২০০.০০
ভিতরের মলাট	১৫০.০০		৫২০.০০
বাহিরের মলাট	২০০.০০		৬০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Edited by : NOLINI KANTA GUPTA
Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2
PRINTED IN INDIA

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

অবিচল শান্তিই শুধু
এনে দিতে পারে শাশ্বত জীবন।

—শ্রীমা

সাবিত্রী

একাদশ পর্ব্ব—প্রথম স্বর্গ

(১০)

[বারবার তিনবার—এই শেষবার ভগবান সাবিত্রীকে আহ্বান করলেন, তাঁর সমুদ্র স্থিতির মধ্যে ডুবে গিয়ে চরম সার্থকতা লাভ করতে—বারবার তিনবার সাবিত্রীও উত্তর দিলে ভগবানের সব বস্তুই সে গ্রহণ করবে অবনত শিরে—তবে পৃথিবীর জন্য মানুষের জন্য, নিজের জন্য নয়।

ভগবানের সঙ্গে সাবিত্রীর এই মিলনে পরিপূর্ণ সাযুজ্য সিদ্ধিলাভ হল।]

মুক্ত এখন সাবিত্রী দৃষ্টির গ্রন্থি থেকে, চিন্তার জাল থেকে।
তার ইন্দ্রিয়স্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে,
মহাকাশে বিরাট রঙ্গমঞ্চে
বিলীয়মান দৃশ্যশ্রেণীর মত
স্বর্গের লোকরাজি বিলুপ্ত হয়ে গেল অধ্যাত্মের আলোকে।
স্পন্দন ছড়িয়ে গিয়েছে এক, কণ্ঠ এক, বাণী এক
আদিহীন বৃহৎ আবিষ্কার নিয়ে তার,
ক্ষণিকাবলির অতীত অচিন্ত্য প্রত্যাবর্ত্তন তার ;
শুনল সে চিরন্তন চিন্তা প্রশান্ত সাগরে সব তুলেছে সঙ্গীত-সঙ্গত,
স্পন্দিত হয়ে চলেছে বাহিরের জগতে অনির্ব্বচনীয় ভঙ্গিমায়,
আকাশ-শূন্য কক্ষধারায় কাল-শূন্য পথ বেয়ে।

বাক্যাতীত জগতে নিবাস এখন তার পরিপূর্ণতার মাঝে।
ত্রিধা শাশ্বতের ক্রিয়াবলম্বরূপে
অনেয় সম্বন্ধের মাঝে অধিষ্ঠান তার।
উল্লাস সে, জীবন্ত চেতনা সে, ক্রিয়াশক্তি সে,
পূর্ণতা সে, সুসম্বদ্ধ, বহুল-বিচিত্র গতিময়,
অক্ষত একত্ব সে, জ্যোতির্ম্ময়ী অর্দ্ধাঙ্গিনী,

বহন আলিঙ্গন সে ধারণ করে আপন আধারে,
বিশ্বের সকলকে উদ্বাহ-বন্ধনে বেঁধেছে ভগবানের বিপুল মতসে,
ধারণ করে চলেছে প্রতি আত্মসত্তার আনন্ত্য,
বহন করে চলেছে বিশ্বভূত প্রেমের গুরুভার,
সংখ্যাতীত জীবাত্মার অপরূপ জননী সে।
সব জ্ঞান তার যা-কিছু কল্পিত, যা-কিছু সংকল্পিত,
উন্মুক্ত শ্রবণে পশে তার ধ্বনির আদর্শ যত,
দৃষ্টিতে তার রূপ আর বন্ধ নয় পুরাতন প্রথায়,
হৃদয় তার একত্বের সমগ্র পূর্ণায়,
আবির্ভূত হ'ল এই স্নেহ-ভারানত আলোকের নীড়,
আলোকের দেউল,
অন্তিম গর্ভগৃহ, বিশ্বাতীত বস্তুরাজি রহে যেথা।

বিপুল-বৃহৎ বিধি এবে স্তব্ধ করে পরিক্রমা তার,
নীরবতা প্রত্যর্পণ করে অজ্ঞেয়কে দিয়েছিল একদিন সে যা-কিছু;
স্তব্ধ সাবিত্রীর উৎকর্ণ চিন্তা,
অন্তরাত্মার তার রূপাবলি সব গিয়েছে মিলিয়ে।
অনন্ত এখন তবে পূর্ণ মহাদেব।
চারিদিকে সাবিত্রীর ঘিরে সত্তা এক অপরিসীম,
গলিতপ্রায় মুক্তাকে যেন ঘিরেছে অদ্ভুত বহ্নি।
বিলুপ্ত আকাশের প্রেতছায়াবাঝে
শ্রবণে অশ্রুত বাণী এক কহে উচ্চারি
"হে জীব, বরণ কর তবে সর্বশ্রেষ্ঠ বর
দ্বিতীয়বার হবে না সুযোগ।
আমার এই উর্দ্ধতম সত্তা থেকে চেয়ে দেখে তোমাকে এখন
নামহীন রূপহীন প্রশান্তি, বিশ্ববস্তুর বিশ্রামস্থল।
আনন্দময় বিশাল সমুচ্চ স্তব্ধতার তলে—
শাশ্বতের কোলে বিপুল নির্বাণ এই,
বিন্দু যেমন হারিয়ে যায় অনন্তের তলে—
এখানে কর অনুভব নির্বাপিত বহ্নিশিখার পরিতৃপ্তি,
সীমাহীন সাগরের অঙ্কে তরঙ্গের অন্তিম নিমজ্জন;

ধ্যানমগ্ন চিন্তাবলীর যতেক বিপত্তি তোমার বিরতি তাদের,
তীর্থযাত্রী আত্মার তোমার যাত্রাশেষ।
হে সঙ্গীত, স্বীকার কর তোমার সুরবালার পরিশ্রান্তি,
হে স্রোতধারা, স্বীকার কর অবাধ ভাজন তোমার দুই তীরে।"

মুহূর্তেরা স্তব্ধ হয়ে ডুবে গেল শাশ্বতের তলে।
কিন্তু অজানা কোন বুকের মাঝারে দুলে ওঠে কার আকুলতা—
নীরবে তবে দেয় প্রত্যুত্তর নারীর হৃদয় :
"তোমার শান্তি, হে ভগবান, বর হয়ে থাক অন্তরে আমার
দুর্বার কালের হুংকার আর ধ্বংসের মাঝে,
পাপিষ্ঠ মানুষের মহিমাময় অন্তরাত্মার জন্যে
তোমার প্রশান্তি, হে ভগবান, প্রসারিত করে ধরে
আনন্দবাহন তোমার হাত দুখানি যেন।"
নিঃসঙ্গ দ্বীপের চারিভিতে সীমাহীন সাগর যেমন
দ্বিতীয়বার ওঠে উচ্ছ্বসি সেই চিরন্তন বাণী
"উদার উন্মুক্ত অপরূপ দুয়ার তোমার সম্মুখে,
আমার চেতনা আনত এই পার্থিব গ্রন্থি ছিন্ন করবার জন্য
একত্বের প্রেমী সে, সেখানে চিন্তা নাই চিহ্ন নাই,
চায় সে দেওয়াল আড়াল সব ফেলে দিয়ে
স্বর্গকে অনাবৃত করে ধরতে,
চেয়ে দেখতে অনন্তের আয়ত চক্ষু দিয়ে,
তারকার মালা খুলে ফেলে চলে যেতে নীরবতার তলে।"

বিশাল বিশ্বপ্রলয়ঙ্কর স্তব্ধতার মাঝে
শোনে সাবিত্রী কোটিকণ্ঠ যেন ডাকে তারে।
চিন্তাধারার অপ্রমেয় প্রশান্তি ভেদ করে
নারীর অপ্রমেয় প্রকৃতি কহে তার কথা :
"তোমার একত্ব, ভগবান, রয়েছে বহুল উন্মুখী হৃদয়ের মাঝে,
আমার মধুময় আনন্ত্য তোমারই সংখ্যাতীত জীবকুল।"
উত্তাল সাগর ক্রমে অপসরি যায় যেন,
তৃতীয়বার হয় উচ্ছ্বসিত সাবধান বাণী :

"আমার পক্ষ দুখানির উদার আশ্রয় ছড়িয়ে দিয়েছি ;
তার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে
শক্তি আমার পরম প্রোজ্জ্বল মহিমা নিয়ে চেয়ে রয়েছে,
আপন সৃষ্টির মহিমা-মাঝে আপনাকে স্তব্ধ করে, প্রত্যাহৃত করে
সৃষ্টির ভীতিপূর্ণ দূষির উর্দ্ধে।"
এ কণ্ঠের প্রত্যুত্তর অস্ফুট কাতরোক্তি এক বিশ্ববস্তুর অন্তরে,
আবেগে তবে বলে ওঠে নারীর হৃদয় :
"তোমার বীর্য্য, হে ভগবান, ধরবে আলিঙ্গনে পুরুষকে নারীকে,
সকল জিনিসকে, সকল জীবকে, গ্রহণ করতে তাদের সব দুঃখ নিয়ে
সকলকে মায়ের বুকের মধ্যে টেনে মিলিয়ে ধরতে।"

গম্ভীর সুদূর যেন স্বর্গের বীণা শেষবার চরম মুহূর্ত্তে শোনা গেল সতর্কবাণী :
"একান্তের বিপুল নয়ন খুলে ধরি আমি,
আমার পরমানন্দের বাক্যাতীত উপভোগ প্রকট করতে,
সেখানে নির্দ্দল চিরস্থায়ী স্তব্ধতার মাঝে ডুবে রয় তা,
নিষ্পন্দ আত্মাদানের সুপ্তি-কোলে
বিরাম লভেছে যে নৃত্যের যত মধুর উন্মত্ততা হতে
স্পন্দনে যার দুলে ওঠে হৃদয়ের ছন্দ।"
নিনাতিপূর্ণ আবেগপূর্ণ কণ্ঠ এক বীণা করে নীরবতা,
উর্দ্ধে উঠে চলে অবিশ্রান্ত পূজাগান যেন
সম্মিলিত আত্মাদের গগনবিহারী পক্ষ-সঙ্গীত।
সনির্ব্বন্ধে উচ্চারে নারী তার সমগ্র নারীত্ব নিয়ে
"তোমার যে আলিঙ্গন দুঃখের জীবন্তগ্রন্থি যত ছিন্ন করবে,
তোমার যে আনন্দ, হে ভগবান, সকল জীব শ্বাসপ্রশ্বাসে গ্রহণ করবে,
তোমার যে গভীর প্রেম চালবে নিরন্তর যাদুকর ধারা তার,
তোমার যে মধুরতা দাও, দাও আমাকে পৃথিবীর জন্যে মানুষের জন্যে।"

(১১)

[সাবিত্রী যবশেষে ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ একত্ব লাভ করেছে—শুধু অন্তরের আত্মার মধ্যে নয়, বাহিরে কর্ম্মের প্রকাশেও—তাই ভগবান এখন বলছেন কি রকমে তাঁর লীলা ফুটে উঠবে ভাগবতী সাবিত্রীর ভিতর দিয়ে, জগৎ মানুষী জীবন কি রকমে ফলে পরিবর্ত্তিত হয়ে উঠবে।]

নীরব সব। প্রশান্ত আনন্দময় কণ্ঠ ক্ষণপরে
শুরু হ'ল—একদিন অনন্তের গর্ভ হতে উঠেছিল যেমন
অদ্ভুত পুলকের অস্ফুট প্রথম স্ফুরণ
গড়ে যে আপন গভীরে কল্পনার কাম্য স্বপ্ন তার,
গড়ে আর সে-দিব্য-আবেগ সন্ধান করে যে, স্পর্শ করতে চায় যে
প্রেমাপ্লুত হাস্য জগৎ-সঙ্গীতে বেঁধে দেয় যে সুর-ছন্দ
"প্রসূর্ত্ত বাণীর হে চাঞ্চল্য তনু!
তোমার চিন্তা আমার চিন্তা,
তোমার কণ্ঠে আমার কথা,
আমার সংকল্প তোমারই সংকল্প,
তুমি যা বরণ কর আমি তাই বরণ করি।
যা কিছু তুমি চেয়েছ তাই আমি দেব
মানুষকে আর পৃথিবীকে;
সব লিপিবদ্ধ করবে নিয়তির পাতায়
আমার চিন্তা আমার পরিকল্পনার আমার কর্ম্মের প্রতিভূ যে,
আমার ইচ্ছার পালনকর্ত্তা—শাশ্বত কাল।
তুমি যখন প্রত্যাখ্যান করেছ আমার অক্ষত প্রশান্তি,
ফিরে দাঁড়িয়েছ যখন আমার অন্তহীন স্থিতি হতে,
যেখানে মুছে যায় দেশের রূপ, হারিয়ে যায় কালের আকার —
ফিরে দাঁড়িয়েছ যখন আমার নিঃসঙ্গ শাশ্বতের একান্তে
তোমার পৃথক সত্তার অনাবিল নির্ব্বাণ হতে—
তোমার জন্যে নয় ত' নামহীন রূপহীন নাস্তি,
নয় ত' তোমার জীবন্ত অন্তরাত্মার বিলুপ্তি
চিন্তার ও আশার, জীবনের ও ভালবাসার সব শেষ

এক স্নিগ্ধ শুভ্র অনেয়ের অজ্ঞেয়ের মধ্যে—
তুমি মেনে নিয়েছ আমার কালাতীত ইচ্ছাকে
তাই আমি তোমার প্রস্ফলন্ত অন্তরাত্মাকে
তুলে নিলাম দুহাতে,
তুলে নিলাম তোমার প্রেমসার হৃদয়কে,
বেঁধে দিলাম তোমাকে আমার কালান্বিত
কর্ম্মশক্তির সঙ্গে।

তুমি মেনে নিয়েছ আমার কালাতীত ইচ্ছাকে,
তুমি বরণ করে নিয়েছ পার্থিব সংঘর্ষ আর নিয়তির মধ্যে
তোমার আপন স্থান,
পৃথ্বীবদ্ধ মানুষের তরে করুণায় আনত হয়েছ,
ফিরে দাঁড়িয়েছ তাদের সাহায্যের জন্যে, তাদের উদ্ধারের প্রেরণায়,
তাই তোমার হৃদয়ের প্রবেগ দিয়ে তোমার হৃদয়কে
আমার হৃদয়ের সঙ্গে বেঁধে দিলাম,
তোমার অন্তরাত্মার উপর আমার অপরূপ কর্ম্মদায় চাপিয়ে দিলাম।
এখন তবে তোমার মধ্যে আমি করে যাব আমার অদ্ভুত কর্ম্ম সব।
তোমার প্রকৃতিকে বাঁধব আমি
আমার আত্মবলের রজ্জু দিয়ে,
আমার আনন্দের বশে নিয়ে আসব তোমার চিন্ময় অঙ্গ সব,
তোমাকে গড়ব আমার সকল সুখের জীবন্ত গ্রন্থিরূপে,
তোমার মধ্যে গড়ে তুলব আমি আমার স্ফটিকস্বচ্ছ গর্ব্বের নীড়।
তোমার দিনসব হবে আমার শক্তির, আমার জ্যোতির শরাবলি,
তোমার রাত্রি হবে আমার উল্লাসের তারকাখচিত রহস্যমালা,
আমার সকল মেঘমালা তোমার কেশদামে জড়িয়ে থাকবে,
আমার সকল বসন্তের উষাহ হবে তোমার ওষ্ঠাধরে।
হে সবিতৃবাণী, তুমি পৃথিবীর অন্তরাত্মাকে
তুলে ধরবে আলোকের মধ্যে,
ভগবানকে নামিয়ে আনবে মানুষের জীবনের মধ্যে;
পৃথিবী হবে আমার কর্ম্মশালা, আমার আপন গৃহ,
আমার জীবন-উদ্যান—দিব্য বীজ এক রোপণের জন্যে।

মানুষী কালক্রমে তোমার কর্ম যখন শেষ হবে
তখন পৃথিবীর মন হবে জ্যোতির আপন ভবন,
পার্থিব জীবন হবে স্বর্গ অভিমুখে ক্রমবর্ধমান বৃক্ষ এক,
পৃথিবীর দেহ হবে ভগবানের পুণ্য দেউল।
মর্ত্যের অজ্ঞান থেকে মুক্ত হবে
মানুষ সবিদ্ধ হবে শাশ্বতের কিরণে,
তাদের চিন্তায় দেখা দেবে সূর্য্য-মাত্রার মহিমা,
হৃদয়ে অনুভব করবে আমার প্রীতির মাধুর্য্য
আর তাদের কর্মে আমার মহাশক্তির অলৌকিক প্রবেগ।
আমার ইচ্ছাই হবে তাদের প্রতিদিনের অর্থ
আমার জন্যে, আমার সহায়ে, আমার মধ্যে যে জীবন
তাই হবে তাদের জীবন।
আমার সৃষ্টির রহস্যময় অন্তরে
তোমার অন্তরাত্মার নাট্যখানি আমি
অভিনয় করাব,
অঙ্কিত করব তোমার আমার সুদীর্ঘ রাস-লীলা।
যুগক্রম ধরে তোমায় আমি অনুসরণ করব;
প্রেম ধেয়ে চলবে তোমার শিকারে জগৎ ভরে,
অজ্ঞানের অবগুণ্ঠন তোমাকে আর বন্ধ করবে না,
তুমি দাঁড়াবে নগ্ন হয়ে,
আমার জ্যোতির্ময় দেবতাদের কাছে থেকে
লুকোবার আশ্রয় পাবে না
কোন রূপই আমার দিব্য কামনা থেকে আবডালে রাখবে না,
আমার জীবন্ত দৃষ্টি থেকে তুমি কোথাও পরিত্রাণ পাবে না।
তুমি আবিষ্কৃত হবে তোমার অন্তরাত্মার নগ্নতায়,
যা-কিছু আছে সকলের সঙ্গে তোমার হবে অসম্বৃত একত্ব,
মানুষী চিন্তার ঘন আবরণ হতে নির্মুক্ত তুমি,
সকল মনের সকল দেহের সকল হৃদয়ের সঙ্গে এক তুমি,
এক তুমি সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে,
ভগবানের সঙ্গে,
তোমার ঐ একমাত্র অন্তরাত্মার আমার

সমস্ত অলৌকিক লোক সমাহৃত
তোমারই মধ্যে আমি অধিকার করব আমার বিশ্ব,
বিশ্ব তোমার মধ্যে সব লাভ করবে আমি যা-কিছু।
তুমিই সকল জিনিষ বহন করবে, সকল জিনিসের যাতে রূপান্তর হয়,
তুমিই বিশ্বের সব ভরে দেবে তোমার
ঔজ্জ্বল্য দিয়ে, তোমার আনন্দ দিয়ে,
সকলের সঙ্গে মিলবে তুমি আমার রূপান্তরকারী
অন্তঃপুরুষের আশ্রয়ে।
ঊর্দ্ধের অনন্তব্যাপ্তি তোমায় আক্রান্ত করবে,
নিম্নের অসীমকালা তোমার মধ্যে শিহরণ তুলে দেবে,
আমি তোমায় অনুসরণ করে চলব
আমার মানসের প্রবাধ বৃহৎ প্রসার পার হয়ে,
মহাসাগর যেন আমার তরঙ্গায়িত জীবনের,
তুমি সাঁতার দিয়ে চলবে দুই উচ্ছ্বসিত জলরাশির মাঝে—
বাহিরের বেদনা আর অন্তরের মধুরিমা
তোমার আনন্দ হবে আমার বিপরীত রহস্যযুগল নিয়ে
আমাকে তুমি সাড়া দেবে তোমার প্রতি নাড়ির মধ্যে।
দৃষ্টি এক নিমন্ত্রিত করবে তোমার শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রবাহ প্রবেগ,
হৃদয় তোমার তোমাকে বাধ্য করবে কর্ম্মচক্রের ধারায় চলতে,
তোমার মন তোমাকে প্রচালিত করবে অগ্নিময় চিন্তাধারার
ভিতর দিয়ে চলে যেতে,
আমার সাক্ষাৎ লাভ করতে অতলের তলে আর উচলের উপরে,
আমাকে অনুভব করতে ঝঞ্ঝার মধ্যে আর প্রশান্তির মধ্যে,
আমাকে ভালবাসতে মহানের মধ্যে আর হীনের মধ্যে
সুন্দর জিনিসের মধ্যে আর ভীতিকর কামনার মধ্যে।

দেশে, কত দূরে—কালে, কত আগে···

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আমরা আকাশে যে জ্যোতিষ্ক বা আলোর মণ্ডল সব দেখি, সাধারণতঃ মনে হয় তারা রয়েছে একই সমতলে, আমাদের কাছ থেকে সকলেই সমান দূরে। গ্রহ হোক, উপগ্রহ হোক বা নক্ষত্র হোক কোন পার্থক্য তাদের মধ্যে দেখা যায় না—শিশুর দৃষ্টিতে যেমন। রবি, সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—সব ঘুরে চলেছে যেন এক চালা কন্বাসের উপর দিয়ে।

কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়। বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের ফলে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের ও মনের ভুল সংস্কার করে চলে। সে দেখতে পায়, চাঁদ হলো সকলের চেয়ে কাছে, চাঁদের আলো আমাদের কাছে পৌঁছে প্রায় দেড় সেকেণ্ডে। তুলনায় সূর্য্য বহু দূরে, সূর্যের আলোর পক্ষে দরকার আট মিনিট। আলোর বেগ গণনা করে আবিষ্কার করা হয়েছে, তা হলো সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটার (প্রায় দুই লক্ষ মাইল)। আর চাঁদের চেয়ে বেশ দূরে রয়েছে পৃথিবীর সমগোত্র আর আর সব গ্রহ। তার কয়েকটি আমাদের অপেক্ষাকৃত কাছে সূর্য্যের তুলনায়। বুধ গ্রহ হল এখান থেকে দু'তিন মিনিটের রাস্তা আলোর পক্ষে, শুক্র হলো পাঁচ ছয় মিনিটের রাস্তা। অন্য গ্রহগুলি আরও বেশ দূরে। শনি আগে ছিল সবচেয়ে দূরে—তাই তার নাম হয়েছিল শনৈশ্চর অর্থাৎ ধীরে ধীরে চলে যে অথবা মন্দী, মন্দ গতিতে যে চলে, তার হল ঘন্টা দেড়েকের রাস্তা। পরে অবশ্য আবিষ্কার হয়েছে নেপচুন, ইউরেনাস, প্লুটো—এদের সকলের কয়েক ঘন্টার পাল্লা। আমাদের এই সূর্য্য আর তার গ্রহ এবং গ্রহের উপগ্রহ হলো একটা গোটা রাজ্য। একে বলা যায় রবিক্ষেত্র (solar system)। এর প্রসার বা আয়তন হবে বড় জোর ঘন্টা পেরিয়ে দিনের পাল্লা।

কিন্তু এরকম রবিক্ষেত্র রয়েছে আরো অনেক অসংখ্য অগণিত। ফলতঃ আমরা যাদের বলি নক্ষত্র, তাদের প্রত্যেকটিই হলো এক একটি সূর্য্য। এবং এমন নক্ষত্র আছে যা আমাদের সূর্যের চেয়ে এত বড় যে তার মধ্যে বহু সূর্য্য ডুবে তলিয়ে যেতে পারে। স্বাতী নক্ষত্রের মধ্যে স্থান পাবে আট হাজার সূর্য্য—তার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের বিশগুণ। আর জ্যেষ্ঠা (Antarès) নক্ষত্র ধরে রাখতে পারে কয়েক কোটি সূর্য্য, তার ব্যাস সূর্য্যের ব্যাসের পাঁচশ গুণ। পৃথিবীর ব্যাস আমরা জানি সাড়ে সাত হাজার মাইল, সূর্য্যের ব্যাস এর ১০৯ গুণ—অর্থাৎ সূর্যের মধ্যে ডুবে যায় ১৩ লক্ষ পৃথিবী। এখন তাদের দূরত্ব? সব

চেয়ে কাছে যে সব নক্ষত্র তাদের দূরত্ব মাপতে হবে মিনিট, ঘন্টা বা মাস দিয়ে নয়, বছর দিয়ে অর্থাৎ এক বছরে আলো যতদূর যায় তাই হল মাপকাঠি। এই হিসাবে সর্বাপেক্ষা নিকটতম নক্ষত্র রয়েছে তিন-চার বৎসরের পথ পারে। তার কিছু দূরে, কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী জান ত? তার কাছে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে তারাটি—সকল তারকার মধ্যে উজ্জ্বলতম একটি তারকা, উজ্জ্বল গ্রহের মতই দেখতে, নাম লুব্ধক (Sirius)—তার পথ হ'ল ন বৎসরের। তারপর কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ—এর প্রয়োজন হয় প্রায় বহুর চব্বিশেক। আর ধ্রুব নক্ষত্র, তার পাল্লা পঞ্চাশ বৎসরের। উপরে যে স্বাতী ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের কথা বলেছি—স্বাতীর হ'ল চল্লিশ বৎসরের পাল্লা কিন্তু জ্যেষ্ঠার সাড়ে তিনশ বৎসরেরও বেশি, আরও দূরে হলেন অগস্ত্য ঋষি (Canopus), দক্ষিণ আকাশ প্রান্তে সবচেয়ে বৃহত্তম উজ্জ্বলতম যে জ্যোতিষ্ক—তাঁর প্রয়োজন সাড়ে ছশ বৎসর। দূরের চক্ষুগ্রাহ্য তারকা এ রকমে তবে ছশ সাতশ বৎসরের পাল্লা। কিন্তু তারপর এ সব ছাড়িয়ে দেখেছ ছায়াপথ? এক সময়ে মনে করা হত ও-সব হল ধোঁয়ার পুঞ্জ, মেঘের মত, বাষ্পীয় কিছু কিন্তু নিরীক্ষণ করে, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল আসলে ওরা তারকাগোষ্ঠি, রয়েছে আরও বহুদূরে—এত দূরে বলে, দেখায় সব যেন একসঙ্গে মিশে গিয়েছে, একাকার হয়ে পেয়েছে বৃত্তাকার। কিন্তু কতদূর? এদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের পাল্লা হবে আড়াই হাজার বৎসর অর্থাৎ আলোকের লেগেছে আড়াই হাজার বৎসর এখানে পৌঁছতে—সূর্য্য থেকে পৌঁছতে যে আলোকের লাগে আট মিনিটমাত্র, যে আলোকের গতিবেগ বলেছি সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল। অর্থাৎ অন্য কথায় এই সব আলোক-বিন্দু আজ যে আমরা দেখছি সেটা হ'ল যুগের সময়কার এবং আজ তারা এখনও আছে কি না তা জানা যাবে আরো আড়াই হাজার বৎসর পরে। এই আড়াই হাজার বৎসর তাহলে আমাদের মণ্ডলটির ব্যাসার্দ্ধ—আমাদের দুপাশে হাত বাড়ালে অর্থাৎ দৃষ্টি ফেলালে পারাপার হবে তাই পাঁচ হাজার বৎসর। এই পাঁচ হাজার বছর পরিমাণ যে মণ্ডলটি নিয়ে আমরা রয়েছি তার নাম দেওয়া হয় galaxy, নক্ষত্রমণ্ডলী। কিন্তু এও হলো একটা মণ্ডলীমাত্র। এর বাইরে, এর থেকে দূরে ক্রমেই বেশি দূরে দূরে রয়েছে আরও অগণিত মণ্ডলী অর্থাৎ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এই রকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে দূর হতে দূরান্তরে—কিন্তু এও তবু শেষ নয়। মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যখন বেড়ে গেল অসম্ভব রকমে, যান্ত্রিক উদ্ভাবনে এবং গাণিতিক কৌশলে, তখন ক্রমে লক্ষ্য করা গেল, আমাদের দৃষ্টিগোচর কয়েকটি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অর্থাৎ পিছনে রয়েছে কতকগুলি পৃথক বিশেষ রকমের নক্ষত্রপুঞ্জ অথবা বাষ্প বা ধূলিপুঞ্জ। এদের বিশেষত্ব ধরা গেল এদের দূরত্ব দিয়ে—হাজার, দশ হাজার বছরের দূরত্ব কিছু নয়, এদের দূরত্ব লক্ষ লক্ষ বছরের উপরে।

এদের আলো আমাদের কাছে পৌঁছতে লেগেছে যে কত আলোক-বৎসর তার ইয়ত্তা নাই। এ রহস্যের অর্থ, ব্যঞ্জনা অনেকখানি। কিন্তু আমরা এতক্ষণ বলেছি দৃষ্ট আলোকের কথা। কিন্তু এদেরও পিছনে এদের থেকেও বহুদূরে রয়েছে উৎস—চক্ষুগ্রাহ্য আলো নয়, অদৃশ্য আলোকের—রেডিও সংকেতের তরঙ্গ। এবং এদের দূরত্ব হ'ল কোটি কোটি কোটি অর্বুদ, খর্ব নিখর্বের পাল্লা। কারণ এ-আলো এ-দৃশ্য আলো হল সেই দূরতম অতীতের—আদিতম সৃষ্টির একখণ্ড আমাদের হাতের মুঠোয়, মধ্যে এসে গিয়েছে, কি গুপ্ত কথা ব্যক্ত করেছে তারা, তাদের ধর্মের কর্মের গঠনের সম্বন্ধে? কারণ আমরা এমন একটা অতীতে পৌঁছে গিয়েছি যেখানে জড় আর জড়মূর্তি নেই, হয়ে গিয়েছে জড়চূর্ণ—মূল ভূত পর্যন্ত বিচূর্ণ হয়ে পর্যবসিত হয়েছে তাদের আদি বিদ্যুৎ-চৌম্বক কণা-তরঙ্গে।

এখন আরো কিছু আগে চলতে হবে। এই যে নীহারিকা-বাহিনী বা ব্রহ্মাণ্ড-শ্রেণী প্রসারিত হয়ে গিয়েছে আকাশের পর আকাশ বেয়ে অনন্ত ধারায়, যাদের স্থিতি-কালের পরিমাণ কল্পনায় ধরা যায় না, তাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য—বিচিত্র বৈশিষ্ট্য—বিশেষভাবে ধরা দিয়েছে। এই সব জগৎ স্থির নয়, তারা গতিশীল। একটা সুগঠিত ছকের মত তারা যে অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে আদিকাল হতে আজ অবধি তা আদৌ নয়। সমগ্র সৃষ্টিখানি, সৃষ্টির অন্তর্গত সকল বস্তুই, স্থির কেউ নয়, সকলেই গতিমান, তবে গতি অর্থ আবার এমন নয় যে সকলেই ছুটে চলেছে একদিকে একভাবে সমান বেগে। তারা ছুটে চলেছে বটে কিন্তু প্রথমতঃ ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ যত এগিয়ে চলেছে প্রত্যেক অংশ বা প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অংশ বা অঙ্গ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে দূরে সরে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শুধু তাই নয়, যত এগিয়ে চলেছে ততই সকল বস্তুর বেগ বেড়ে চলেছে। যত দূরে এগিয়ে গিয়েছে, গতিবেগ তত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এমন অবস্থা হয়েছে, দূরতম অংশের গতি এমন হয়েছে যে প্রায় তা পেয়েছে আলোর গতি। আমরা যে দূরতম অদৃশ্য আলোর কথা বললাম তারাই প্রায় উঠে গিয়েছে গতির এই পর্যায়ে। এই দূরতম অংশ বর্তমানে আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে গণনার মধ্যে এসে গিয়েছে, তাদের গতি যদি আলোর গতি ছাড়িয়ে যায় অর্থাৎ যদি আরও আমরা এগিয়ে চলি—আরও দূরের বা আরও অতীতের অবস্থায় গিয়ে পৌঁছি, তাহলে আমরা একটা গভীর অতলে যেন তলিয়ে যাব, আর কিছুর হদিশ পাব না; কারণ আলোর গতির বাইরে যদি এসে পড়ি তবে সেখানে কিছু জানবার উপায় থাকবে না। নরকের পুতুলের মত সত্যসত্যই আমাদের সত্তা অনন্তের প্রসারে গলে হারিয়ে যাবে।

আলোই হল সমস্ত মানুষী জ্ঞানের মাপকাঠি—জড় যত সূক্ষ্মতম, ক্ষুদ্রতম হোক তা

আবিষ্কার করে ধরে আলো, ব্যক্ত আলো এবং অদৃশ্য আলো। জড়ের নিবিড়তম স্বরূপ ও স্বধর্ম তা রশ্মি-তরঙ্গের মাপে আপনাকে মেপে দেয়। আলোর বেগের বেশি যার বেগ তাকে আমরা ধরতে পারি না। আমাদের আলো তার পিছনে গিয়ে ক্রমে পিছনেই পড়ে যায়, তার নাগাল পায় না।

সুতরাং আলো-তরঙ্গের বাইরে উত্তীর্ণ যখন আমরা, তখন মনে হয় আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি উপনিষদ-উক্ত প্রসারের দুয়ারে—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি...। এই রকমে জড়ের প্রসার ক্রত থেকে দ্রুততর বেগে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে যেখানে এবং যখন লাভ করেছে আলোর বেগ, তখনই হঠাৎ সে পড়ে যাবে যেন একটা শূন্যের মধ্যে। এ তুলনা কতকটা হবে শব্দের সীমানা (Sound-barrier) যে মুহূর্তে পার হয়ে যায় বিমান-যাত্রীরা, তখনকার অনুভবের সঙ্গে। অনেক পাইলটরা বলেছেন এ কথা।

এখানে কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আরও একটা রহস্যের কথা বলছেন, তাঁরা পিছু-পা হবার নন। তাঁরা বলছেন সৃষ্টির এই শেষ অর্থাৎ আদি প্রান্তে, এবং তারও পারে জড়ের যে রূপ তা হল বিপরীত-জড়। আমাদের স্বাভাবিক সাধারণ সৃষ্টি পরিমাণে গঠিত কতগুলি সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম কণা দিয়ে—কণা অর্থ একটুকরো বৈদ্যুত-মাত্রার তরঙ্গ। আজকাল আমরা অনেকেই একথা জানতে শিখেছি : মূল নিত্যানৈমিত্তিক কণা হল তিনটি—(১) ইলেকট্রন যা ভারহীন ও বিয়োগ-বিদ্যুৎ (২) প্রোটন—তা হল ভারযুক্ত সংযোগ-বিদ্যুৎ, আর (৩) নিউট্রন—ভারযুক্ত কিন্তু বিদ্যুৎমাত্রাহীন। এখন দেখা গিয়েছে এদেরই সঙ্গে, জড়-ব্যাপনে এখানে পাওয়া গিয়েছে এদের ঠিক বিপরীত ধর্মী কণা। যেমন প্রথম, বিপরীত-ইলেকট্রন যার হবে সংযোগ-বিদ্যুৎ, এর নাম হয়েছে পোজিট্রন। দ্বিতীয়, বিপরীত-প্রোটন যার হবে বিয়োগ-বিদ্যুৎ। তারপর, বিপরীত-নিউট্রন—নিউট্রনের কোন বৈদ্যুৎমাত্রা নেই, তবে তার বিপরীত কি হবে? এখানে তা হ'লে বলতে হয় আদি-কণাদের আর একটি গুণের বা ধর্মের রহস্য। তা হ'ল তড়িৎমাত্রা ছাড়া, তড়িৎমাত্রার ভাব অভাব ছাড়া, ঘূর্ণি-মাত্রা অর্থাৎ তারা নিজের চারদিকে ঘোরে বা পাক দিয়ে চলে, লাট্টুর মত। এ ঘূর্ণি থেকেই আসে কণাদের চৌম্বক-শক্তি। নিউট্রনের তড়িৎমাত্রা নেই, আছে ঘূর্ণি বা চৌম্বক মাত্রা। তারা দেয় অর্দ্ধেক মাত্রার ঘূর্ণি। তবে ঘূর্ণি হতে পারে আবার ডান দিক দিয়ে বা বাঁ দিক দিয়ে (দক্ষিণাবর্ত্ত কি বামাবর্ত্ত)। বিপরীত নিউট্রনের হল বিপরীত ঘূর্ণি।

যা হোক সাধারণ বা স্বাভাবিক শ্রেণীর কণাগুলি হ'ল যেন জগৎ-ইমারতের ইঁট-পাথর। তাদের যথাযথ সমাবেশে গঠিত হয়েছে এই জড়-জগৎ। বিপরীত কণাগুলি আছে বটে কিন্তু অতি দুর্লভ আর তারা স্থায়ী নয়, ক্ষণিকের প্রকাশ। এখন অনেক বৈজ্ঞানিকেরা বলতে সুরু করেছেন, আলো-তরঙ্গের (দৃশ্য বা অদৃশ্য) বাহিরে গিয়ে সৃষ্টি যেখানে

চূর্ণিত বাষ্পাকার হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে বা সেখানেই হ'ল এই কেমন বিপরীত-কণা দিয়ে গঠিত জগৎ, আমাদের জগতের উল্টা বা পাল্টা জগৎ একটা। আরও বলা হয়েছে, আলোর জগৎ অর্থাৎ বৈদ্যুত-চৌম্বক-তরঙ্গমালা-সমষ্টি ছুটে চলতে চলতে যখন তার বিপরীত তরঙ্গ-সমষ্টির জগৎকে গিয়ে আঘাত করে, তার উপর পড়ে একটা বিকট ধাক্কা দিয়ে, তখন ঘটে মহা বিপর্য্যয়, মহাপ্রলয়। অর্থাৎ সহজের ও বিপরীতের পরস্পরের সংঘাতে সূত্রপাত হয় নবসৃষ্টির। এইরকমেই আমরা কল্পনা করতে পারি, জগতের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং নব নব জগৎও সৃষ্টি হয় এই রকমে। আমাদের জগৎ ক্রমে প্রসারিত হয়ে বিকীর্ণ হয়ে, আমাদের পরিচিত জড়কণা যখন তার আপন বেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে, তার আদিতম সূক্ষ্ম কণাতরঙ্গে পর্য্যবসিত হয়েছে (এর নাম দেওয়া হয়েছে fission—বিয়োজন) এবং বিষম বেগে পড়েছে গিয়ে তাদের বিপরীত গুণাবলির উপর, বিপরীত-জড়কণা-তরঙ্গাবলির মধ্যে, তখন সৃষ্টি আবার সংহত ঘনীভূত হতে সুরু করেছে (এর নাম দেওয়া হয়েছে fusion—সংযোজন)। বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন পরমাণুর পরম সূক্ষ্ম তরঙ্গ-উপাদান আবার তাদের গতি ও তাপ সংযত করে এনেছে, ক্রমে আলোর স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে, নীহারিকা-পুঞ্জ গড়ে দিয়েছে, আবার তারকামণ্ডলী সূর্য্য দেখা দিয়েছে। এরকম একটা প্রলয় ও নব সৃষ্টির পারম্পর্য্য জগৎ-রহস্যের মূলধর্ম্ম।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জনৈক যুক্তিবাদী সমালোচক

শ্রীঅরবিন্দ

(৩)

এ-পর্যন্ত এই সমালোচনা তেমন প্রচণ্ড নয়; এর ধার, উগ্র বিকৃতি ছাড়া অন্য ধার যদি এর থেকে থাকে, কাটছে গিয়ে আক্রমণকারীকেই। দর্শনের উচ্চ মূল্য দেওয়া, তা দিয়ে সত্তার সমুচ্চতম রহস্যের সন্ধান, জীবনের উপর কার্যকরী দার্শনিক চিন্তার প্রয়োগ এবং মনীষীকে ও গভীরতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির, সমুন্নত ভাবের, বৃহত্তম প্রাপ্ত জ্ঞানের মানুষকে ডেকে সমাজ শাসন ও গঠন করতে বলা, ধারণা ও মতকে দার্শনিক মন দিয়ে যাচাই করে নেওয়া এবং ধর্মবিশ্বাসকে আধ্যাত্মিক সম্বোধি, দার্শনিক চিন্তা ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠা করা বর্বরতা কিম্বা হীন ও নৃচ সংস্কৃতির চিহ্ন নয় বরং সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ধরণের সভ্যতারই পরিচায়ক। এখানে এমন কিছুই নেই যাতে জড়বাদী যুক্তির বিগ্রহদের সামনে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে, যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির মতি ও লক্ষ্যকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মতি ও লক্ষ্যের কিছুমাত্র নীচে রাখতে হবে—তা সে-সভ্যতা তার ন্যায়ালোক বা কল্পনা-দৃষ্টির প্রাচীন যুগের বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও প্রবল ব্যবহারিক জ্ঞানের আধুনিক যুগের হোক। আমাদের সংস্কৃতি ভিন্ন, কিন্তু অপকৃষ্ট কিছুতেই নয়, তার বরং উৎকৃষ্টের স্পষ্ট এক উপাদান রয়েছে উদ্দেশ্যের অতুলনীয় সমুচ্চতায়, প্রয়াসের আধ্যাত্মিক মহত্বে।

এই মতি ও লক্ষ্যের মহত্বের উপর জোর দেবার উপকারিতা আছে, তার কারণ শুধু এ নয় যে এর প্রভূত গুরুত্ব এবং একটা সংস্কৃতির মূল্যায়নে এ প্রধান নিরিখ, বরং আক্রমণকারীরা এখানে দুটি বাহ্য পারিপার্শ্বিকের সুযোগ নিয়ে একটা পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি ও আসল সমস্যাগুলি ঘোলা করে। তাদের পাকুণ সুবিধা রয়েছে ভারতকে আক্রমণ করার যখন সে ভূপাতিত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত, স্থূলত ভারতীয় সভ্যতার যখন মনে হয় যেন সমাপ্তি ঘটেছে একটা শোচনীয় পরাজয় ও পতনে। এমন এক সাময়িক নওকার শক্ত আসন পেয়ে তাদের পক্ষে চূড়ান্ত উদার সাহস দেখিয়ে চারপাশের ধুলোবালি খুরের লাথিতে উড়িয়ে ব্যাধের জালে বন্দী ক্ষুণ্ণ ও আহত সিংহীর গায়ে ফেলে দুনিয়াকে বোঝানর চেষ্টা সহজ যে সত্যিই এর শক্তি বা সামর্থ্য কোনোকালে ছিল না। যুক্তি, ন্যায়ন এবং যোলকের স্থানবর্তী বিজ্ঞানের এই মহৎ সংস্কৃতির যুগে এ-কাজ বেশ সহজ, এখন তো কাংসবিগ্রহ সফলতাদেবীর যেমন

পূজা দেওয়া হয় তেমন আর কোনো দিন সভ্য মানুষ করেনি। এর ওপর আরো সুবিধা আছে তাদের বিশ্বের সম্মুখে এক অন্তমিত সভ্যতার ক্ষণের ভারতকে উপস্থাপিত করায়, যখন অন্তত দুই হাজার বৎসরব্যাপী এক জ্যোতির্ময় ও বহুধা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পর ক্ষণিকের জন্য অতীতের স্মৃতিটুকু ছাড়া আর বহুবিস্তৃত ও বলিন কিন্তু চিরজাগ্রত এবং এখন আবার সবলে জাগরূক ধর্মভাব ছাড়া সব হারিয়ে রয়েছে।

এই ব্যর্থতা এই সামরিক গ্রাসগ্রাসের তাৎপর্য অন্যত্র উল্লেখ করেছি। তার বিশদ আলোচনাই হয়ত আবার করতে হবে, যেহেতু ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল্য সম্বন্ধেই আপত্তি তোলা হয়েছে। আপাতত এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, পার্থিব সাফল্য দিয়ে সংস্কৃতির পরিমাপ হয় না; আধ্যাত্মিকতার যাচাই তা দিয়ে তো চলেই না। দার্শনিক, রূপরসিক, কাব্যিক ও মনীষী গ্রীস ব্যর্থ ও পতিত হল আর জয়ী ও সার্থক হল সুশৃঙ্খল সামরিক রোম, অথচ সেই জন্য বিজয়ী সাম্রাজ্যকে কেউ বৃহত্তর সভ্যতা ও মহত্তর সংস্কৃতির অধিকারী বলে বাহবা দেবার কথা কল্পনায়ও আনবে না। য়িহুদী-রাষ্ট্র ধ্বংসের দ্বারা জুডিয়ার ধর্ম-সংস্কৃতি অপ্রমাণ বা ন্যূন হয়ে পড়ে না, যেমন প্রমাণ হয় না য়িহুদী-জাতির ছড়িয়ে পড়ায় তার ব্যবসা-বুদ্ধির যে বৃহত্তর মূল্য দেওয়া হয় তা। আমি স্বীকার করি, প্রাচীন ভারতীয় মনীষা যেমন করেছে, যে স্থূল ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি সমগ্র মানবসভ্যতা-প্রয়াসের শ্রেষ্ঠ বা অপরিহার্য না হলেও প্রয়োজনীয় অংশ। সেদিকে ভারতবর্ষ তার দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক কর্মব্যাপৃতির মধ্যে যে-কোনো প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় দেশের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। আধুনিক কালের আগে কোনো দেশ এত ধনৈশ্বর্য, বাণিজ্যোন্নতি, এত পার্থিব সুব্যবস্থা, সমাজশৃঙ্খলা লাভ করেনি। ইতিহাসের, প্রাচীন দলিলপত্রের সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীর স্বাক্ষর তা-ই, তাকে অস্বীকার করা অর্ধ সত্যের গোঁড়ামি ও অন্ধতা, একটা বেশ চমৎকারী কল্পনায়—কিম্বা অকল্পনায়—অতীত ঘটনার স্থানে বর্তমান ঘটনাকে বসিয়ে বিকৃত পাঠ। এশিয়ার এবং ততোধিক ভারতীয় সমৃদ্ধি, অরন্ধুজ ও ইতের ঐশ্বর্য—বর্বর দুয়ার সোনায় দুর্ভার (Barbaricae postes squalentes auro), একদা দরিদ্র পাশ্চাত্যের কাছে আধা পেয়েছিল বর্বরতার চিহ্ন বলে। আশ্চর্যের বিষয়, অবস্থা এখন ঠিক উল্টো; সমৃদ্ধ বর্বরতা এবং ঐশ্বর্যের অনেক কম শ্রীময় প্রকাশ এখন দেখা যাচ্ছে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক এবং প্যারিসে, আর ভারতের নগ্নতা এবং দারিদ্র্যের কাদামাটি তার মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে তার সংস্কৃতির তুচ্ছতার প্রমাণ হিসাবে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন কম কৃতিত্বের জিনিস নয়; দলিলপত্রের সমর্থন অকাট্য, তারই উপর ছেড়ে দেওয়া যায় অশিক্ষিতের অজ্ঞতা ও সাংবাদিক সমালোচকের অথবা স্বার্থপর রাজনীতিকের বাগাড়ম্বর

প্রতিহত করার। অবশ্য ব্যর্থতা ত্রুটির ভাগ একটু ছিল, কিন্তু তা তো সম্পূর্ণ সমস্যাটির এমন বিরাট বিস্তারের অঙ্গে এবং সেকালের পরিবেশে প্রায় অনিবার্য। কিন্তু লোটকে অত্যুক্তি দ্বারা তার সভ্যতার বিরুদ্ধে সাজালে এমন এক কঠোর সমালোচনা করা হবে যে তার নিরিখে শেষ পর্যন্ত দেখলে কোনো সভ্যতাই টিঁকবে না। শেষের দিকে ব্যর্থতা, স্বীকার করলাম, তার হেতু তার সংস্কৃতির অধঃপতন, তার মহার্ঘ উপাদানগুলি নয়। অধিকন্তু প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির পরে লোপ পাওয়া তাদের আদি মূল্য নাকচ করে না। ভারতীয় সভ্যতার বিচার করতে হবে তার সংস্কৃতি এবং যুগযুগান্তের মহত্ত্ব দিয়ে, মাত্র কয়েক শতাব্দীর অজ্ঞতা ও দুর্বলতা দিয়ে নয়। একটা সংস্কৃতির পরিমাপ হবে প্রথমত তার মুখ্য উদ্দেশ্য দিয়ে, পরে তার প্রাপ্তির সাফল্য এবং পরিশেষে জাতির চিরন্তন দাবির নব নব লগ্নের সঙ্গে নানিয়ে উজিয়ে চলবার শক্তি দিয়ে। একটা সাময়িক অবনতির দারিদ্র্য বিশৃঙ্খলা অনিয়মের মধ্যে যৌরীর দৃষ্টি শ্রেয়ের সেই কল্যাণাঙ্কাটি দেখতে ও মানতে চায় না যা এখনো এই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যা তার শাশ্বত আদর্শের মহত্ত্বে আবার সবেগে সতেজে ফিরে যাবার অভয়বার্তা ঘোষণা করছে। তার প্রশান্ত নমনীয় প্রত্যাবর্তনশক্তি, তার পুরাতন অসীম পরিবর্তনশীলতা আবার সক্রিয়; সে আর নিছক আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত নয়, আক্রমণেও সাহসী। শুধু টিঁকে থাকা নয়, ভবিষ্যতে সম্ভাবনা এখন জয় এবং বিজয়।

আমাদের সমালোচকটি ভারতীয় সভ্যতার সমুন্নত লক্ষ্য এবং মহৎ প্রেরণাকেই শুধু বাতিল করেননি, যদিও তা এ-ধরনের অজ্ঞ এবং পক্ষপাতদুষ্ট আক্রমণের বহু উর্ধ্বে; তিনি এর মুখ্য ভাবগুলি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন, এর বাস্তব জীবনমূল্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন, এর সুফল কার্যকারিতা ও প্রকৃতির নিন্দা করেছেন। এই নিন্দার কোনো সমালোচনা-মূল্য আছে? না এই নেজাজী বক্তিমা পৃথক জীবন-দর্শনের পূজারী ও একান্ত বিরোধী বিচারকের পক্ষে স্বাভাবিক বলে আমাদের প্রকৃতির উর্ধ্বতন অর্থ ও সত্যেরই একটা ভুলবোঝা? যদি আক্রমণ ও তার ভাষা লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব যে এসব জীবনের সাধারণ মূল্য দিয়ে বাঁধা জড়বাদী মনের নিন্দাবাদ মাত্র—অপর এমন এক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পৃথক মানের উপর যা মানুষের সাধারণ জীবনের উর্ধ্বে দৃষ্টি ফেলেছে, তাকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর কিছুর দিকে নির্দেশ করছে, নিজে সনাতন শাশ্বত অসীম কিছুর দিকে যাবার পথস্বরূপ হয়ে উঠেছে। শুনলাম ভারতে আধ্যাত্মিকতা নেই, কি ভীষণ আবিষ্কার; বরং, মনে হবে, সমস্ত সুস্থ সজীব আধ্যাত্মিকতার বীজাণু সে নাশ করতে সক্ষম হয়েছে। বেশ বোঝা যায় নিঃ আর্চার কথাটার উপর নিজের অর্থ চাপিয়েছেন, একটা অভিনব কৌতূহলদীপক এবং অত্যন্ত বিলেতী অর্থ। এযাবৎ আধ্যাত্মিকতা বলতে বোঝা গেছে মন ও প্রাণের চেয়ে মহত্তর কিছু, আমাদের সাধারণ মানসিক সাধারণ প্রাণিক প্রকৃতির উপরে

একটা নির্মল মহৎ দিব্য চেতনার দিকে আস্পৃহা, আমাদের নিম্নতর অঙ্গের ক্ষুদ্রতা এবং শৃঙ্খলপাশের মধ্যে থেকে অন্তরে এক গুহাহিত গহ্বরেটের দিকে মানুষী আত্মার উন্মেষ ও অভিযান। এই ভাব এই অভিজ্ঞতাই ভারতীয় চিন্তার সারবস্তু। কিন্তু যুক্তিবাদী অধ্যাত্মের এই মর্ম বোঝে না; তার শ্রেষ্ঠ দেবতারা হল মানুষী ইচ্ছাশক্তি ও যুক্তি। আধ্যাত্মিকতার তাহলে,—যে বস্তুর উপর তার প্রতিষ্ঠা তা-ই যখন নাকচ তখন কথাটাই বাতিল করে দেওয়া আরো সহজ ও সঙ্গত,—দিতে হয় অন্য অর্থ, অসীমের দিকে নয়, সসীমের দিকে একটা সমুচ্চ প্রবৃত্তি ও আবেগ ইষণা যুক্তির সমস্ত প্রয়াস, শাশ্বতের দিকে নয় ক্ষণস্থায়ী বস্তুর দিকে, নশ্বর জীবনের দিকে, এমন বৃহত্তর সত্যের দিকে নয় যা অগভীর প্রাণবস্তুটাকে ধরে আছার ছাড়িয়ে রয়েছে। চিন্তা ও যন্ত্রণার যে রেখা হোমরের আদর্শ ললাটপটে বলীরেখা টেনে দিয়েছে তা-ই আমাদের বলা হল সুস্থ প্রবল আধ্যাত্মিকতা। দুঃখ ও অজ্ঞান জয়ী বুদ্ধের প্রশান্তি ও করুণা, নিত্যের সঙ্গে নিবিড় সংযুক্ত মনীষীর ধ্যান—সন্ধানী চিন্তার উর্ধ্বে উন্নীত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির সঙ্গে একাত্ম, হৃদয়ে নির্মল প্রেমের বলে তুরীয় বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে বিলিত ঋষির আনন্দ, কর্মযোগীর সংকল্পকে স্বর্গীয় বিশ্বৈষণার নির্ব্যক্তিকতায় তুলে ধরা অহনাত্মক বাসনা ও প্রবৃত্তির উর্ধ্বে এসব জিনিসকেই ভারতবর্ষ দিয়েছে শ্রেষ্ঠ মূল্য, তার যুগপুরুষ এই যে মহাপ্রয়াস করেছেন, এসব তাহলে সুস্থ নয়, বীর্যময় নয়। বলা চলতে পারে, এসব নিতান্তই পশ্চিমী কায়দা, আধ্যাত্মিকতার আধুনিক ধারণা। হোমর, শেক্‌সপীয়র, রাফায়েল, স্পিনোজা, কান্ট, শার্লমাঞ্জ, এ্যাহান লিঙ্কন, লেনিন, মুসোলিনি—এঁরা, বলব কি তাহলে, আর কবি শিল্পী চিন্তাবীর কর্মবীর নন, আমাদের এই আধ্যাত্মিকতার বীর ও বিভূতি? বুদ্ধ নয়, খ্রীষ্ট নয়, চৈতন্য, সেন্ট ফ্রান্সিস বা রামকৃষ্ণ নয়; এঁরা হয় প্রতীচীর অর্ধবর্বর নয়ত প্রাচ্যধর্মের নারীসুলভ উন্মাদনায় পঙ্কলিপ্ত। ভারতীয় মনে এতে যে ছাপ পড়ে তার তুলনা হয় সংস্কৃতিবান বীমানের সেই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যখন তাকে বলা হয় সুরক্ষন, সুবেশ-ধারণ, যন্ত্রবিজ্ঞান, অধ্যাপনায় পারদর্শিতাই হল সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা এবং এদের চর্চাই সঠিক সুস্থ বীর্যপূর্ণ রসতত্ত্ব, আর সাহিত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা কাগজে অর্থহীন হিজিবিজি দাগকাটা, পাথরে গায়ে পাগলের কোপ মারা, পটে রং মাখানোর মেয়েলিপনা; ভোরাস, পেস্তোলোৎসি, ডক্টর পার, ভটল এবং যো ফ্রুমেল তখন রসসৃষ্টির বীরর্ষভ, দাভিঞ্চি, আঞ্জেলো, সোফেক্লিস, দান্তে, শেক্‌সপীয়র বা রোদিন নয়। মিঃ আর্চারের বিশেষণগুলি এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তুলনায় টেঁকে কিনা, তা সুধীজনেরাই বিচার করবেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখলাম দুই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধতা, বুঝতে শুরু করলাম প্রতীচ্য ও ভারতের মধ্যে পার্থক্যের অন্তঃশীলতা।

275681

ভারতীয় দর্শনের কার্যকরী মূল্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের এটিই মূলাংশ, সে নাকি জীবন প্রকৃতি প্রাণ এবং পার্থিব মানুষের প্রয়াসের দিকে বিমুখ। জীবনের কোনো মূল্য সে দেয় না ; প্রকৃতিকে জানবার দিকে সে নিয়ে চলে না, তার কাছ থেকে সরিয়েই নেয়। সবরকম ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি সে দূর করে দেয় ; প্রচার করে জগৎ মায়া, পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি, ভূত এবং ভবিষ্য অস্তিত্বের অনন্তধারার তুলনায় ক্ষণিক জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা। নিরাশাবাদ, সন্ন্যাস, কর্ম, পুনর্জন্মের জঞ্জালে জড়ানো—এ যেন একটা ঘুমপাড়ানি অধিবিদ্যা—সব সেই পরম আধ্যাত্মিক বস্তুটির—স্বেচ্ছা ব্যক্তিত্বের নাশক ভাব। ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের এ বিকৃত অত্যুক্তি, পদ্ধতি হল ভারতীয় মনের একটি দিক কালো রং চড়িয়ে দেখানো, এ-পাঠ তিনি নিয়েছেন, আমার মনে হয়, আধুনিক বস্তুবাদী দিকপালদের কাছ থেকে। কিন্তু সারাংশে এবং হাবভাবে অতীতে য়ুরোপীয় মন ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতিকে কী চোখে দেখেছে এতে মোটামুটি পরিষ্কার বলা হয়েছে, অবশ্য কখনো অজ্ঞানের বশে, কখনো বা প্রমাণের বিরুদ্ধেই। একদা কিছু কালের মতো এই প্রবটা সে শিক্ষিত ভারতীয়ের মনের উপরও দিব্যি চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। ছবিখানার নানা রং শুধরে নিয়ে আরম্ভ করাই ভালো ; তা হলে নিশাবাদের মূলে যে বৈরী মনোভাব তার আরো সঠিক বিচার করতে পারব।

ভারতীয় দর্শন প্রকৃতিপাঠ থেকে দূরে রয়েছে বলা মহা অসত্য বলা এবং ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বল ইতিহাসটি অস্বীকার করা। আর প্রকৃতি বলতে যদি জড় প্রকৃতি বোঝায় তবে নির্ভেজাল সত্য হল এই যে, আধুনিক যুগের আগে কোনো দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রাচীন ভারতের মতো এতদূর এবং এতখানি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে অনুশীলন করেনি। এসব ইতিহাসের পাতায় সকলেই পড়তে পারেন ; স্বনামধন্য কিছু ভারতীয় পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিকরা এটি অকাট্যভাবে সবিস্তারে জনসমক্ষে এনে ধরেছেন, যেসব য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা যাঁরা কণ্ঠস্বীকার করে বিষয়টির তুলনামূলক বিচারে নেমেছেন তাঁরাও ইতিমধ্যে এটি বুঝেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, শল্যবিদ্যা, পার্থিব জ্ঞানের সকল বিভাগে ভারতবর্ষ শুধু প্রথম শ্রেণীতেই ছিল না, গ্রীকদের সঙ্গে শুরু ছিল আরবের, যার কাছ থেকে য়ুরোপ আবার ফিরে পেয়েছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পুরানো অভ্যাস, সেই ভিত্তি যার উপর আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু। অনেক বিভাগে আবিষ্কারে ভারত ছিল অগ্রণী,—বহুর মধ্যে মাত্র দুটি অলন্ত দৃষ্টান্ত ধরা যাক, গণিতে দশমিক চিহ্ন আর জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই জ্ঞান যে পৃথিবী সচল জিনিস—'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি' ভারতীয় জ্যোতির্বিদই গালিলেওর বহু শতাব্দী আগে বলেছিলেন। আধিবিদ্যক প্রবণতা যদি জ্ঞানী মনীষীদের প্রকৃতি-পরিচয় থেকে সরে থাকতেই শেখাত তবে সেদেশে এমন ঘটনা ঘটতেই পারত না।

ভারতীয় মনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হল জীবন-ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ মনোযোগ, এর মূল সত্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করবার প্রবৃত্তি, সমন্বয় সাধন, এবং প্রত্যেক অঙ্গে একটা বিজ্ঞান বা শাস্ত্র গড়ে তোলা, একটা সুপ্রতিষ্ঠ নিয়ম ও পরিকল্পনা রচনা। বৈজ্ঞানিক ধারার অন্ততপক্ষে এ একটা চমৎকার আরম্ভ, শুধু অন্তঃসারহীন অবিদ্যা-প্রসবসমর্থ সংস্কৃতির চিহ্ন নয়।

একথা সত্যি যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞান হঠাৎ থেমে যায় এবং অন্ধকার ও নিষ্ক্রিয়তার একটা অবকাশ তার অগ্রগতি ব্যাহত করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্প্রসারণে অংশ নিতে বাধা দেয়। কিন্তু দেশের মনকে এই জড় প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নেবার মূলে আধিবিদ্যক প্রবণতার বৃদ্ধি বা অসহিষ্ণুতা নেই। নতুন মানস-চর্চার সার্বিক স্থাণুত্বেরই এটা একটা অংশ, দর্শনেরও তো গতি প্রায় এই একই সময়েই থেমে গিয়েছিল। অধ্যাত্মদর্শনে শেষ উল্লেখযোগ্য মৌলিক প্রয়াসের সময় তো শেষ উল্লেখযোগ্য মৌলিক বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাবের মাত্র দুই-তিন শতাব্দী পরে। একথা অবশ্য সত্যি যে বিফল আধুনিক দর্শনের মতো ভারতীয় অধিবিদ্যা জড়প্রকৃতির সত্যালোকে সৃষ্টিস্থিতির রহস্য বুঝতে চেষ্টা করেনি। এই পুরাণীপ্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা একটা পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব এবং গভীর আত্মিক জ্ঞানের ওপর, যা ভারতের বিশেষ সামর্থ্যের উৎস,—কিন্তু মনের এবং অন্তরের শক্তিধারার পরিচয় তো নিঃসন্দেহে প্রকৃতি-পরিচয়ও—পার্থিব জ্ঞানের চেয়ে এক্ষেত্রে তার সাফল্য বৃহত্তর। এ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না, কারণ সে খুঁজেছিল বিশ্বপ্রপঞ্চের আধ্যাত্মিক সত্যটি এই ভিত্তি ছাড়া যথার্থ মহৎ ও স্থায়ী কোনো দর্শন গড়ে উঠতেও পারে না। একথাও সত্যি যে তার সংস্কৃতিতে দার্শনিক সত্য এবং ধর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সত্যের মধ্যে যতখানি সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল ততখানি জড় প্রকৃতির সত্যের ক্ষেত্রে হয়নি; জড় বিজ্ঞানে তখন সেসব সার্বভৌম সত্যের সন্ধান মেলেনি যা তখন পায়ত আর এখন সম্ভব করে তুলেছে এই আজকের সমন্বয়। তবু প্রথম থেকে, বৈদিক চিন্তার সেই শুরু থেকেই, ভারতীয় চিন্তা স্বীকার করেছিল যে একই সাধারণ নিয়ম এবং বল সমানভাবে আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং জড়ের ক্ষেত্রে খাটে। এও সে আবিষ্কার করেছিল যে জীবন সর্বব্যাপী, প্রকৃতিতে উদ্ভিদ পশু থেকে মানুষী আকারে আত্মারই বিবর্তন, অনেক যেসব সত্য আধুনিক বিজ্ঞান তার জ্ঞানাকর্ষণের দিক থেকে এখন আবার মানছে সে-ও তাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল একটা দার্শনিক সম্বোধি এবং আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এগুলি তো উষর শূন্য অধিবিদ্যার ফল নয়, গব্য নাভিমুগ্ধ স্বপ্নালুর কপোলকল্পনা নয়।

একথা বলাও বিকৃতবাচন যে ভারতীয় সংস্কৃতি জীবনের কোনো মূল্য দেয় না, পার্থিব বিষয় থেকে দূরে থাকে, ক্ষণিক জীবনের তুচ্ছতার উপরই জোর দেয়। এসব য়ুরোপীয়

বক্তব্য পড়লে মনে হবে গোটা ভারতীয় চিন্তার মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদ ছাড়া আর কিছু নেই, কিছু নেই আর শঙ্করের অদ্বৈত মায়াবাদ ছাড়া, এবং ভারতীয় শিল্পকলা সাহিত্য সমাজ-চিন্তা সবগুই মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ থেকে পলায়নের কাহিনী। ভারত সম্বন্ধে গড়পড়তা য়ুরোপীয় শুধু এইসব শুনেছে বলেই কিংবা ভারতীয় চিন্তার কোনো বিশেষ বস্তু তার কাছে চিত্তাকর্ষক বা কৌতূহলপ্রদ বলে তা-ই যে—যতই প্রবল হয়ে থাক তার প্রভাব—ভারতীয় চিন্তার সবখানি তা বলা চলে না। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা স্বীকৃত চারটি মানব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রথম—বাসনা ও ভোগ, পরে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য লক্ষ্য এবং দেহমনের দাবি, তৃতীয়—ধর্মাচার এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্ম, শেষে—আধ্যাত্মিক মুক্তি; কাম, অর্থ, ধর্ম, মোক্ষ। সংস্কৃতি এবং সমাজ-প্রতিষ্ঠানের কাজই হল মানুষের মধ্যে এসব জিনিস চালনা, তৃপ্তি ও ধারণ, এসব প্রবৃত্তি ও প্রকাশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন। বিশেষ বিরল ক্ষেত্রে ছাড়া প্রথম তিনটি লৌকিক লক্ষ্যের চরিতার্থতা অন্যটির আগে; জীবন ছাড়িয়ে যাবার আগে পরিপূর্ণ জীবন চাই। সংসার সমাজ দেবতাদের ঋণ এড়িয়ে যাওয়া চলে না, পৃথিবীকে তার ভাগ দিতে হবে, আপেক্ষিককে তার লীলাবকাশ, যদিও তার ওপারে স্বর্গের মহিমা কিংবা পরমের শান্তি। সবাইকে গুহায় আশ্রমে ছুটতে হবে এমন কোথাও বলা হয়নি।

ভারতীয় জীবনের সুসংবদ্ধ প্রকৃতি এবং তার সাহিত্যের উচ্ছল বৈচিত্র্য একান্ত পারলৌকিক প্রবণতার সঙ্গে খাপ খায় না। বিশালায়তন সংস্কৃত সাহিত্য এই মানবজীবনেরই সাহিত্য; কোনো কোনো দার্শনিক এবং ধর্মীয় রচনায় ইহবিমুখতার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু সেখানেও জীবনমূল্যের অবমাননাই উদ্দেশ্য তা নয়। ভারতীয় মনীষা আধ্যাত্মিক মুক্তিকেই প্রধান স্থান দিয়ে থাকে,—বস্তুবাদী মতিগতি যা-ই বলুক, কোনো ধরনের একটা আধ্যাত্মিক মুক্তি মানবাত্মার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা—তবে তাকেই একমাত্র উপবীক্ষ্য করে ধরেনি। সমান তার দৃষ্টি নীতিবিদ্যা, আইন, রাজনীতি, সমাজ, বিজ্ঞান, ললিতকলা, শ্রমশিল্প যা-কিছু মানবজীবনের অঙ্গ সবের উপর। এসব বিষয় সে গভীরভাবে ও তন্নতন্ন করে ভেবেছে, রচনা করেছে জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই, 'শুক্রনীতি' রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিভার কি অনুপম কীর্তিস্তম্ভ, একটা সুসভ্য জাতির বাস্তব সংগঠনের কি প্রতিচ্ছায়া! ভারতীয় কলাশিল্প চিরকাল নিছক ধর্মাশ্রিত ছিল না,—মন্দিরে ও গুহা গুম্ফায় তার মহৎ কীর্তির অবশেষ টিঁকে রয়েছে বলেই যা মনে হয়; প্রাচীন সাহিত্য যেমন প্রমাণ দিচ্ছে, রাজপুত ও মোগল চিত্রকলায় যেমন দেখি, ভারতীয় শিল্প যেমন রাজসভা, সহর এবং জনসাধারণের শিল্পভাব এবং জীবন নিয়ে তেমনি মন্দির মঠ ও তাদের ভাবধারা নিয়েও। সেই ভারতীয় নর- ও নারীশিক্ষা আধুনিক যুগের আগের যে-কোনো পদ্ধতির চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ বিস্তারিত বিচিত্র ছিল।

এসবের প্রামাণ্য দলিলপত্র জিজ্ঞাসু মাত্রেই হাতের কাছে পাবেন। এখন সময় এসেছে, ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি যে অবাস্তব, আধিবিদ্যক, স্থবির, প্রাণবিমুখ এই তোতাপাখির বুলি আওড়ান থামা উচিত, তার স্থানে আসা উচিত একটা সত্য সহৃদয় বিচার।

তবে একথা সর্বৈব সত্য যে ভারতীয় সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে তারই উপর সর্বোচ্চ মূল্য আরোপ করেছে যা লৌকিক উপজীবিকা ছাড়িয়ে যায়; মানব প্রচেষ্টার চরম সে মনে করেছে কঠিন ও পরম আত্ম-অতিক্রমের আদর্শটি। এর চোখে অধ্যাত্মজীবন যাহা জীবনের ক্ষমতা ও ভোগের চেয়ে মহত্তর জিনিস, মনীষী কর্মবীরের চেয়ে বড়, আধ্যাত্মিক মানুষ মনীষীর চেয়ে বড়। ভগবানে স্থিত যে আত্মা সে শুধু বহির্মুখী মনের বাসিন্দা বা ভাবুক ও জীবন্ত জড়ের দাবি ও সুখের জন্য আত্মার চেয়ে পূর্ণতর। এখানেই নিছক পাশ্চাত্য ও নিছক ভারতীয় মতিগতির পার্থক্যটি ফুটে ওঠে। পাশ্চাত্য ধার্মিক মন অর্জন করেছে কিন্তু স্বভাবগুণে পায় নি, এই কষ্টার্জিত পোশাক সে পরেছে বেশ ঢিলেঢালা। ভারতবর্ষ বিশ্বাস করেছে অন্তরালের নানা জগৎ, জড় জগৎ তো সেখানে পায়ের কালিঝরাটি মাত্র। নিজের মধ্যে চিরকাল সে দেখতে পেয়েছে মন ও প্রাণ-পুরুষের চেয়ে বড় এক পুরুষ, অহংয়ের চেয়ে মহীয়ান। চিরদিন সে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে এই জাগ্রত ও অস্তিকের চিরনিত্যটির কাছে যার মধ্যে বিধৃত এই ক্ষণিকের জীব, মানুষের মধ্যে যার কাছে ক্রমেই সে ফিরছে উত্তরণের উদ্দেশ্যে।

বাঙ্গালী কবির, মায়ের পাগল ভক্ত ও সুকণ্ঠ গায়কের—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা—

মানব-জীবন সম্বন্ধে খাঁটি ভারতীয় অনুভূতিটিই প্রকাশ করেছে। এই জীবন পার্থিব জীব-কুলে একমাত্র মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা তারই দিকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রাচীন আর্য সভ্যতা মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু তাকেই দিয়েছে শ্রেষ্ঠ আসন, জীবনকে চতুর্বর্গ ও চতুরাশ্রমের সুশৃঙ্খল পরম্পরা ধারায় সাজিয়ে ধরেছে। বৌদ্ধধর্ম প্রথমে বর্ণানুরাগ ও সন্ন্যাসের আদর্শকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল, ধারা-বাহিকতাটি মুছে ফেলল এবং ভারসাম্যটিও ভেঙ্গে ফেলল। এর বিজয়ী ব্যবস্থায় থাকল মাত্র দুই শ্রেণী—গৃহী এবং সন্ন্যাসী, সাধু এবং সাধারণজন, যার জের আজ পর্যন্ত বর্তমান। এই জন্যই ধর্মের এই লাঞ্ছনাকে গল্পচ্ছলে বিষ্ণুপুরাণে দারুণ আক্রমণ করা হয়েছে, কারণ এর উগ্র অত্যুক্তি এবং দুই বিরোধীর অনমনীয় ব্যবস্থা শেষে সমাজ জীবনকেই দুর্বল করে ফেলেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের আর একটা দিকও ছিল, যা ছিল কর্ম ও নবসৃষ্টির দিকে উন্মুখ, তা জীবনে এনেছিল একটা নতুন আলো, নতুন অর্থ, একটা নতুন নৈতিক ও আদর্শ

শক্তি। তারপরে আমাদের সংস্কৃতির দুই সুপরিচিত যুগের অন্তে এসেছিল শঙ্করের গগন-চুম্বী মায়াবাদ। এবার থেকে জীবনের নিদারুণ নিন্দা শুরু হল অবাস্তব বলে, আপেক্ষিক ঘটনা বলে, শেষে ধারণেরও অযোগ্য বলে, আমাদের সমর্থনের অযোগ্য বলে, এর মূলভাবের জন্য আমাদের নিত্য অভ্যাসের অযোগ্য বলে। এই মতবাদ সর্বজনস্বীকৃত হয়নি, বিনা বাধায় গৃহীত হয়নি; বিরুদ্ধপক্ষ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে দোষারোপ পর্যন্ত করেছেন। পরবর্তী ভারতীয় মন তাঁর এই মায়াবাদের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু গণবুদ্ধি ও গণচিত্তকে এ কখনো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে পারেনি। ভক্তিভাবের যেসব ধর্ম জীবনকে দেখে ভগবানের লীলাক্ষেত্র বলে, শাশ্বতের শুভ্র বৌদ্ধতা মুছে দেওয়ার আধ-কালো আধ-ধূসরকালো মায়া বলে নয়, তারই ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান প্রভাব। নীরস আদর্শকে আক্রমণ না করে তারা তাকে মানবীয় করে তুলেছে। অতি সম্প্রতি শিক্ষিত ভারত ইংরেজ ও জর্মন পণ্ডিতদের ভাবধারা গ্রহণ করেছে, আপাতত ভেবে নিয়েছে যে শঙ্করের মায়াবাদই আমাদের দর্শনের সর্বস্ব না হলেও একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু, সবচেয়ে দর্শনীয় স্থানে বসিয়েছে। কিন্তু এই প্রবণতার বিরুদ্ধে এখন একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, প্রাণহীন আধ্যাত্মিকতার বদলে আধ্যাত্মিকতাহীন প্রাণ প্রতিষ্ঠা নয়, বরং অধ্যাত্মের প্রাণ-মন-তনুকে আলিঙ্গন। তবু একথা সত্য, আমাদের সংস্কৃতির প্রাচীন প্রাণপ্রাচুর্যে যে কৃচ্ছ্রতার আদর্শ জীবনসৌধের সূক্ষ্মচূড়া হয়ে উঠেছিল শাশ্বত জীবনে, পরে তা-ই হল বাধাভাবী, এই নিরাভরণ ও বিরাট বহত্বের নীচে সমস্ত সৌধকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিল।

এখানেও কিন্তু অতিরঞ্জন ও ভ্রান্ত মনাকর্ষণ এড়িয়ে সত্যদৃষ্টি চাই। মিঃ আর্চার তাঁর প্রাণবিমুখ-ভাবের তালিকায় কর্ম ও পুনর্জন্মকে টেনে এনেছেন। এটা ভাঁড়ামি, পুনর্জন্মকে এমন মতবাদ বলা যা অতীত ও ভবিষ্য অস্তিত্বের অনন্তধারার সঙ্গে তুলনায় সাময়িক জীবনের তুচ্ছতাই প্রচার করে, এ একটা মূঢ় ভ্রান্ত বোধ। পুনর্জন্ম ও কর্মের তত্ত্বটি বলছে যে আত্মার অতীত বলে একটা জিনিস আছে, তা নিরূপণ করছে তার বর্তমান জন্ম ও অস্তিত্ব; তার যে ভবিষ্যৎ, তাকে এ-ই রূপায়িত করছে; আমাদের অতীত যেমন নিয়েছে আমাদের বর্তমানও তেমনি বারংবার পার্থিব জন্ম নেবে, আর আমাদের কর্ম সেই আত্মগত ও বস্তুগত শক্তি যা চিরন্তনতা ও চিরবৃদ্ধির সূত্রে সমস্ত প্রকৃতি এবং পরিণামে জীবনের এই পুনরাবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান কর্মের প্রকৃতির মূল্য অপরিসীম কারণ তা শুধু এই মুহূর্তের নয় পরবর্তী ভবিষ্যতেরও নিয়ামক। ভারতীয় সাহিত্যে প্রকটভাবে ছড়িয়ে আছে এবং জনমানসে গভীরভাবে আকৃষ্ট দেখা যাবে এই ভাব যে একাগ্র নিবিষ্টমনা বর্তমান কর্ম ও উদ্যম,—তপস্যা—অতীতসিদ্ধির পক্ষে সর্বক্ষম যাদুকরী শক্তি, মানুষী ইচ্ছার তা আধ্যাত্মিক বা পার্থিব অতীত হোক।

একথা স্বীকার্য আমাদের বর্তমান জীবন আমাদেরই দেওয়া তার সেই অবিসম্বাদী গুরুত্ব হারায় যখন তার পরিচয় বলি কালের প্রবাহে পুনরাবির্ভাব-হারা নশ্বর মুহূর্ত, আমাদের একটিমাত্র সুযোগ, তার ওপারে কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বর্তমানের ওপর এমন সংকীর্ণ গুরুত্ব আরোপ মানুষের আত্মাকে জেলবন্দী করে ফেলে : কর্মে হয়ত তা তীব্র উদ্দীপনা যোগায়, কিন্তু অন্তরাত্মার প্রশান্তি আনন্দ ও বিরাটত্বের তা পরিপন্থী। অবশ্য একথাও সত্যি যে আমাদের বর্তমান দুর্দশা নিজেদের অতীত কর্মেরই ফল এই ভাব ভারতীয় মনে একটা নিস্তরঙ্গতা, একটা নির্ভরতা, একটা নম্রতা এনে দেয় যা পাশ্চাত্য বুদ্ধির পক্ষে বোঝা বা সহ্য করা দুরূহ। দেশের বিপুল দুর্বলতা অবসাদ দুর্ভাগ্যের সময়ে এটা নামিয়ে নিতে পারে শোধনকারী প্রয়াসবহ্নিনাশী এক অলস ভাগ্যনির্ভরতায়। তবে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই তা নয়, আমাদের সংস্কৃতির অধিকতর সতেজ অতীতের ইতিহাসেও এই পরিণতি নেই। সেখানে কর্মের সুর, তপস্যার সুর। কালের ধারায় আর একটা গতি দেওয়া হয়েছিল এই বিশ্বাসের, তাহল জন্মান্তর কর্মশৃঙ্খল কাটিয়ে আত্মাকে পালাতে হবে অনন্ত নৈঃশব্দ্যে। হিন্দুধর্মকে এই ভাব প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে ; কিন্তু এর মধ্যে নিরাশকর যা-কিছু তা ঠিক পুনর্জন্মবাদের দরুন নয়, তা অন্য জিনিস—যাকে য়ুরোপের প্রাণমুখর চিন্তা সন্ন্যাসীর নিরাশাবাদ বলে লাঞ্ছিত করেছে।

নিরাশাবাদ শুধু ভারতীয় মনেরই বৈশিষ্ট্য নয় ; সকল পরিণত সভ্যতার চিন্তায়ই তা উপাদান। এ-চিহ্ন দেখে বোঝা যায় যে সংস্কৃতিটি বুড়িয়েছে, এ-ফল দেখে চেনা যায় মনটার বয়েস চের, অভিজ্ঞতা প্রচুর, জীবনভোগ বেশ এবং এই জ্ঞানলাভ যে এখানে দুঃখের ডালা ভরা, আনন্দ ও সাফল্য বিস্তর আর তার সঙ্গে এই বোধ যে সবই অহংকার ও চিত্তবিক্ষোভ, সৌরলোকরাজ্যে নতুন কিছুই নেই কিংবা থাকলেও দিনেকের মাত্র।

নিরাশাবাদ এদেশে যেমন য়ুরোপেও তেমনই দেখা গিয়েছে এবং এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার যে শেষে জড়বাদীরা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে জীবনের মূল্যহ্রাস করার অভিযোগ তুলছে। মানব-জীবনকে একান্ত জড় ও ক্ষণিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার চেয়ে আর কী হতাশা-জনক হতে পারে ? কয়েক ধরনের য়ুরোপীয় নিরাশাবাদ, চিররাত্রির ভয়ংকর শহর যেখানে বর্তমানের আনন্দ বা ভবিষ্যতের আশা নেই, আর য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর সম্মুখে বিমর্ষ কুণ্ঠিত ভাব, ভারতীয় মনে কঠোরতম কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও তার কিছু নেই। খ্রীষ্টধর্মে যে সচরাচর পাওয়া যায় নীরস নিরাশাবাদ সেটি একান্তই পাশ্চাত্যের সুর ; কারণ খ্রীষ্টের বাণীতে তার স্থান নেই। ক্রুশ, কষ্টের ভিতর দিয়ে মুক্তি, শয়তান ও দেহাধিপত্য, কবরের ওপারে অপেক্ষমাণ অনন্ত নরকের লেলিহান শিখা—এ সব দুঃখ-ভয়ের প্রকৃতি ভারতীয়ের অপরিচিত, ভারতীয় মনের কাছে ধর্মত্রাস একটা অভাবনীয় বস্তু। পৃথিবীর দুঃখকষ্ট এখানেও আছে তবে দুঃখসীমার ওপারে তা আধ্যাত্মিক আনন্দ ও শান্তিতে মিলিয়ে

যায়। বুদ্ধের বাণী দুঃখ ও অনিত্যতার উপর অত্যধিক জোর দিয়েছে, কিন্তু নৈতিক আত্মজয় এবং প্রশান্ত জ্ঞানের দ্বারা বীর পুরুষের অর্জিত বৌদ্ধ নির্বাণ একটা অনির্বচনীয় আনন্দ ও শান্তির অবস্থা, খ্রীষ্টীয় স্বর্গের মতো শুধু শুচি কয়েকের কাছে নয় বরং সকলের কাছে খোলা, এ-জিনিস একেবারে আলাদা সেই দুঃখ-দ্বন্দ্বের বাস্তিক অবসান থেকে, পশ্চিমী নিরাশাবাদীর দুঃখার্ত নির্বাণ থেকে, জড়বাদীর মুক্ত চালাও এক সর্বসমাপ্তি থেকে। বাস্তবাদ প্রচার করেছে দুঃখবাদ নয়, বরং সুখ-দুঃখ এবং যাবতীয় বিশ্ব-অস্তিত্বেরও যে শেষ পর্যন্ত যায়, তা-ই। এতে জীবনের কার্যকরী সত্যতা যেমন স্বীকৃত তেমনি এ মূল্য তাদেরই জন্য যারা অজ্ঞানে নিমজ্জিত। ভারতীয় সকল কৃচ্ছ্রসাধনার মতো এখানেও মানুষের সামনে স্থাপিত একটা মহাপ্রয়াসের সম্ভাবনা, জ্ঞানের প্রদীপ্ত তপস্যা, এমন এক এষণার প্রবল উদ্যোগ যাতে মানুষ উঠতে পারে পরম শান্তি ও পরমানন্দে। মানুষের সচরাচর যে রকম জীবন তাতে তো রয়েছেই একটা উদার নৈরাশ্য, তার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তীব্র বোধ, তার অন্ধকার ক্ষুদ্রতা অজ্ঞানের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ; তবে এ-মনোভাবের আর একটা দিক হল তার আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে এক দুর্বার আশাবাদ। জাতির বিরাট পার্থিব উন্নতির কিংবা জাগতিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পূর্ণতার আদর্শে বিশ্বাস না থাকলেও তার বিশ্বাস ছিল প্রত্যেক মানুষের নিশ্চিত আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতিতে, জীবন-তরঙ্গাঘাতের ঊর্ধ্বে এক অক্ষিন পরিপূর্ণতায়। জীবন সম্বন্ধে এই নিরাশাবাদ ভারতীয় ধর্মচিন্তার একমাত্র কথা নয় ; এর সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপগুলি জীবনকে দেখেছে ভগবানের লীলা বলে, জেনেছে আমাদের বর্তমান অবস্থার ওপারে প্রত্যেকের জন্য ভগবানের চিরসান্নিধ্য। প্রত্যেক মানুষের দেবতায় জ্যোতির্ময় উত্তরণ, এই সিদ্ধিই চিরকাল গ্রাহ্য ছিল। একে নৈরাশ্যকর বা হতাশাজনক জীবন আদৌ বলা চলে না।

তপস্যার কিছু অংশ না থাকলে কোনো সংস্কৃতি মহৎ ও সম্পূর্ণ হতে পারে না ; এই কৃচ্ছ্রসাধন মানেই সেই আত্মত্যাগ ও আত্মজয় যার বলে মানুষ তার নিম্নতর প্রবৃত্তিকে দমন করতে ও প্রকৃতির ঊর্ধ্বতর স্তরে উঠে যেতে পারে। ভারতীয় কৃচ্ছ্রসাধনা শোকাচ্ছন্ন দুঃখবাদ অথবা শারীরিক যন্ত্রণাভোগের কাতর প্রায়শ্চিত্ত নয়, পরন্তু তা এমন এক মহৎ প্রয়াস যা নিয়ে চলে একটা উচ্চতর আনন্দে ও আত্মার চিরপ্রতিষ্ঠায়। তার অভিজ্ঞতার রহস্য হল আত্মজয়ের আনন্দ, আত্মার শান্তির নিরুত্তাল উল্লাস, পরম আত্ম-অতিক্রমের প্রবল এক প্রসন্নতা। একমাত্র মেধাবিই মূঢ় অথবা বাহ্যজীবন-মুগ্ধ চঞ্চল প্রয়াস ও ক্ষণিক তৃপ্তির গুরুঠাকুর মনই কঠিন তপস্যার মহত্ত্ব বা সমুচ্চ আদর্শ অস্বীকার করতে পারে। এসব অতিরঞ্জন এবং বিকৃতি—সব আদর্শের ভাগ্যেই জোটে। মানুষের কাছে আবার যে-সব আদর্শ কঠিনতম তাদের বরাতে আরো বেশিই জোটে, তপস্যা হয়ে পড়ে উগ্র আত্ম-নিগ্রহ, কড়ারকমের প্রকৃতি-দমন, ক্লান্তিবশে জীবন থেকে পলায়ন অথবা আলস্যবশে

জীবনবুদ্ধ পরিহার ও পুরুষোচিত উদ্যম থেকে নির্বীর্য বিমুখতা। আনন্দিত গুটি-কয়েকের দ্বারাও আচরিত নয় কিন্তু বহুজনের কাছে চূড়ান্তরূপে প্রচারিত এবং অযোগ্য হাজার হাজার লোকের দ্বারা গৃহীত হয়ে এর মূল্য কমে গিয়ে থাকতে পারে, জাল-নকলে ছেয়ে ফেলতে পারে, সমাজের জীবনীশক্তি তার নমনীয়তা ও অগ্রগতির বেগ হারাতে পারে। এ-ভাণ করা মিথ্যে যে এমন ত্রুটি ও কুফল ভারতবর্ষে দেখা যায়নি। আমি স্বীকার করি না যে কৃচ্ছ্রসাধনাই মানুষের জীবন-সমস্যার শেষ সমাধান; তবে এর অতিরঞ্জনার মধ্যেও আছে এমন এক আদর্শ যা য়ুরোপীয় সংস্কৃতির বিপরীত দোষত্রুটির প্রাণিক অতিরঞ্জনার চেয়ে মহত্তর।

আসলে সন্ন্যাস ও মায়াবাদ তুচ্ছ প্রশ্ন। মূল জরুরী কথা হল, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা তার সব স্বর্ণময় যুগে শ্রান্ত নিষ্ক্রিয়তা বা প্রচলিত মঠচারিতা ছিল না, তা ছিল মানবাত্মার মহৎ প্রয়াস বাসনাময় জীবন ও ভোগের উর্ধ্বে ওঠার জন্য, আধ্যাত্মিক প্রশান্তি বীর্য জ্যোতি, ভাগবত সিদ্ধি, অটুট শান্তি ও আনন্দের চূড়ায় পৌঁছাবার জন্য। ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধুনিক মনের জড়ধর্মী ক্রিয়াপরতার মধ্যে প্রশ্ন হল যে এই ধরনের প্রয়াস মানুষের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য কি না। যদি অপরিহার্য হয় তাহলে অন্য এই প্রশ্ন আবার উঠবে যে এটি গুটিকয়েক বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে অসাধারণ শক্তিরূপে সীমাবদ্ধ থাকবে না একে একটা বিরাট পূর্ণাঙ্গ মানব-সভ্যতার প্রধান প্রেরণাদায়ক শক্তি-উৎসে পরিণত করা যাবে।*

---

* Foundations of Indian Culture: A Rationalistic Critic on Indian Culture—Chapter II

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

(১৪)

দিব্যকর্মের তৃতীয় পর্বে এলাম—Works of Life-এ, যাকে আমরা বলেছি প্রাণের কর্ম। পূর্বে প্রজ্ঞার কর্ম ও প্রেমের কর্মে চৈত্যপুরুষের অভিব্যক্তি ও দিব্যকর্ম-যজ্ঞের ঊর্ধ্বায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা গেল যে, প্রাকৃত স্বভাবের দিব্যায়নের দিকে দৃষ্টি রেখেই এইভাবে প্রজ্ঞা প্রেম ও প্রাণকে পরপর রেখে কর্মযোগে দেখান হয়েছে। আমাদের মধ্যে যখন জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসপিপাসা দুই-ই প্রবল ভাবে সাধনজীবনে জেগে ওঠে, তখন তার শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণশক্তিকেও পুষ্ট করে; আর তা হলেই আমাদের মাঝে সঙ্কল্পশক্তি গড়ে ওঠে। দেবযজ্ঞ সম্পন্ন করতে আমাকে যে কর্ম করতে হবে, সেটা প্রতিভাত হয়। এমনি করেই প্রজ্ঞা প্রেম ও প্রাণ, এই ত্রিবেণীর শক্তিধারা কর্মে যুক্ত হলে তবেই পূর্ণযোগের সমন্বয়ী সর্বাবগাহী প্রয়োগক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়। আমরা দেখলাম, পূর্ণযোগে শুধু পরাবিদ্যাই নয় অপরাবিদ্যার অনুশীলনেও উত্তম জ্যোতিকে যেমন নামিয়ে আনতে হবে, তেমনই আবার ভগবানকে ভালবেসে মানুষকেও সেই ভালবাসা বিলাতে হবে। তাতে সমাজ-সেবা বা সংসার কোনটাই উপেক্ষণীয় হবে না। আর সব রকম কর্মই অতিমানস শক্তিযোগে প্রজ্ঞায় প্রেমে ও প্রাণে দিব্য হয়ে উঠবে।

আমরা যতই বলিনা কেন ভগবানই সৃষ্টিতে সব হয়ে আছেন, সব মানুষে তিনিই অধিষ্ঠিত, তবুও সংসারের সাধারণ এই প্রাকৃত জীবনকে অধ্যাত্মপথের বাধা মনে না করে পারি না। এই লৌকিক জীবনে সংসারের ঝামেলায় ও মানুষের ব্যবহারের বিষে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে নাস্তানাবুদ হয়ে বলে উঠি যে, তাঁকে ডাকবই বা কখন, ভাববই বা কি করে? তখন নিজের খেয়ালে নিজেকে সামলে রাখার মত কোনরকমে এক গর্ত কেটে যেন নিজেকে চুকিয়ে রাখতে চাই সেই বিবরে; আর তা না হলে জগৎসংসার থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে যাই। তা-ও যদি না পেরে উঠি, তখন ভাল মানুষটি হয়ে ধর্মসম্মত এক কল্পিত জীবনে বাঁধা পড়ি। তাতে চারিদিকটা এলোমেলো হয়েই পড়ে থাকে। আর বেশী করণীয় কিছু আছে বলে মনে করতেও

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

পারি না, শেষ পর্যন্ত আর কিছু যেন পেয়েও উঠিনা। এই ভাবে সাধনজীবন বা যোগকে জীবনের স্রোত থেকে যদি বিচ্ছিন্ন করেই রাখি, সেটা হবে যোগ-সাধনার এক মারাত্মক ত্রুটি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বতন্ত্রর ও সত্যান্তর বাণীতে এবং Mother তাঁর দিব্য জীবনবেদে এই অখণ্ড সমাহারের (Integration) আদর্শ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন অহেতুক ভালবাসার অপরাজিতা শক্তি দিয়ে, যাতে এই জীবনেই আমরা দিব্য জীবনকে উপলব্ধি করে, তাকে নামিয়ে এনে মনুষ্যজন্ম সার্থক করে, তাতে উন্নীত হতে পারি। সেই মান ও মর্যাদা লাভ না করা পর্যন্ত যোগসাধনার সার্থকতা নেই। দেবতার অমৃতত্ব লাভ করে নরের মহিমা এখানে দেবধর্মকেও অতিক্রম করে যাবে—এই লক্ষ্যটি ধরে অগ্রসর হতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয় করে ঘোষণা করছেন অতিমানস শক্তির অবতরণ মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাঁর এই নির্দেশেই অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তুলতে হবে ওই অতিমানসের প্রসাদেই।

যোগ-সাধনায় জীবনে দুটি শক্তিই সমানভাবে সক্রিয় থাকে—সাধকের দিক থেকে আকূতি, আর ভগবৎকৃপা বা তাঁর প্রসাদ। মূলে একই ব্রহ্মবস্তুর দুদিকের গতিবেগ, আকূতি চায় উত্তরণ আর প্রসাদে ঘটে তার অবতরণ। এই করে দুই-এর অঙ্গাঙ্গিভাবের সহযোগিতায় উচ্চতর মানস ও মানসোত্তর চেতনার ভূমিগুলি সাধকের কাছে অপাবৃত হতে থাকে। উত্তরণের পথে নির্বাণ মুক্তির তুঙ্গতায় এক চরম নেতিতে অস্তিত্বের বিন্দুটুকু হারিয়ে যায়, তা আমরা শুনেছি। বুদ্ধের জীবনে যে নির্বাণ নেমে এসেছিল, তাঁর অনির্বাণ জীবনেই তিনি সে নির্বাণের শক্তি অধিগত করে জগতে তাকে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। জীবন থেকে নির্বাণকে বাদ দেওয়া যাবে না, এই দেহ প্রাণ মনের ত্রিবৃতেই সাধনার পরম ফল প্রকাশিত হয়, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। "জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে"—এই হল কবির ভাষায় আমাদের জীবনে নচিকেতার অভীপ্সা (human aspiration)। জীবন সম্বন্ধে ওই বিমুক্তির অনুভবকে বৌদ্ধ দর্শনে ও শঙ্করের মায়াবাদে জ্ঞানের চরম ভূমি বলে দেখান হয়েছে। জ্ঞানবাদীর "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" এই অনুভবকে যোগ সাধনায় আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু তা যে অনুভব ও প্রতিবোধের শেষ কথা নয়, এ কথা আমরা শুনেছি ও জানতে পেরেছি। জীবনকে অস্বীকার করে করে অস্বীকৃতির এক চরম পর্যায়ে, ওই সর্বগ্রাসী শূন্যতার গহ্বরে সর্বহারা বিনাশকেও অনুভব করা যায়। মহাশূন্যে উজিয়ে গিয়ে শূন্যতায় পর্যবসিত হওয়া—যাকে বলে "অসৎ", অথবা সেই চরম অসৎকেও এক অস্তিতার বোধে আস্বাদ করা—যাকে বলে "রসো বৈ সঃ", এই নেতি বা ইতিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি সাধনার পূর্ণতাও সেখানে হয়ে গেল, তা বলা চলে না। তাঁর শক্তির তো ক্ষয়

নেই! যে শক্তির উত্তরণ হয়েছিল, ঠিক সেই রূপেই সে আর ফেরে না বটে, কিন্তু তাঁর শক্তির অবতরণ তো তা থেকে ঘটেই চলে। তাই তো জীবের মধ্যে সনাতন সেই যে অংশ—White Immobile Ray, সে ক্ষয়কে অতিক্রম করে যে অক্ষয় তার চেয়েও উত্তমকে লাভ করে, অমৃতরসে পরিপক্ক হয়ে, আবার এই জীবনেই মৃত্যুকে জয় করে ফিরে এসে জীবনকে অধিকতর অমৃত আনন্দে ভরিয়ে তুলবে—এই তার নিয়তি। কবির ভাষায় তখন—

"চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।"

এই হল সাধকের ভাব।

সেই চরম নেতির অনুভবে বোঝা যায় এ জগৎ-সংসার স্বপ্নের মত ঘুমের ঘোরে চলে, এ সত্য নয়। তবুও জগতে জীবনে থাকতে হয় ও তা থেকে কর্ম সম্বন্ধে নানারকম ভাব ও মনের সংস্কার তখন এসে পড়ে। কেউ বলেন প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় করতে হবে, সেটা কেটে গেলে "ন পুনরাবর্ততে"। এ সংসারে আর নয়, প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় করে জীবনের মূল বৃন্ত থেকেই সরে পড়া। আর এক দিকের ভাব হল, ওপারে গিয়ে রসবস্তুকে চিনে এসেছি, জেনেছি আনন্দ কি বস্তু। সেই রসেই সব কিছু আপ্লুত দেখছি—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তিনিই সব। বৌদ্ধেরা বলেছিলেন শূন্যতাই শেষ কথা—পুদ্গলনৈরাত্ম্যবাদ। আত্মাকেও নেতি করে চরম শূন্যতায় একেবারে অসৎ হয়ে যাওয়া, কিছুই আর থাকল না। তাই যদি ফিরেও আসতে হয় আগ্রতে, জগৎ তখন ছায়াবাজির মত থাকে, সে তো শূন্যে অক্ষক্রীড়ার মত দেখা যায়। তাতে তটস্থভাবে আমার থাকা মাত্র, কর্ম থাকে না। এতে জগতের প্রতি যে সুবিচার হয় না, এ তথ্য শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে গোড়া থেকেই আমরা শুনে এসেছি। আবার জগতে থেকে শূন্যতায় সব কিছুকে অনুস্যূত রেখেও যে নির্বাণের কর্ম করা যায়, তাও আমরা এ যুগে প্রত্যক্ষ করেছি মহর্ষি রমণের জীবনে। মরণকে নিয়েই যেন ছিল তাঁর রমণ। তাঁর সমীপে জিজ্ঞাসুরা সেই আকর্ষণে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন, সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁরা দিয়ে গেছেন। ওদিকে লীলারস আস্বাদন করতে লীলাবাদীরা জগতে থেকেও জগতের কর্মের প্রতি বিমুখ ভাব এনে ধর্মজীবনে শুধু রসে বিভোর হয়ে থাকার জন্য নিজেকে যদি আবদ্ধ করে রাখেন, তাতেও যোগ-সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। কেননা নেতি বা অসৎকে অস্বীকার করে তাঁর দিব্য লীলারসেই শুধু ডুবে থাকলে সাধনার পূর্ণতা আসবে কি করে? শ্রুতি শুনিয়েছেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'।

ব্রহ্মের আনন্দ জানলে তো কোন কিছুতে ভয় থাকে না, তাহলে অস্বীকার করব কি আর কিসের থেকেই বা ভয় পেয়ে সরে থাকব? তাই মায়াবাদই হোক আর লীলাবাদই হোক, কোন বাদে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। "আমার মত" বলে শেষ পর্যন্ত কোন কিছু তো থাকে না, এই আমিটা তো আর থাকবে না। জগৎসৃষ্টির মূলে রয়েছে তাঁর অর্থ, তাঁর সৃষ্টি নিরর্থক নয়, একটা দুর্ঘটনা মাত্র নয়। সেই অর্থকে আবিষ্কার করতে গেলে পাই শূন্যতা ও রস, লীলা বা তাঁর এক অসঙ্গ কামনাকে। তাই তাঁর সৃষ্টিতে রয়েছে উল্লাস, আর সেই উল্লাসই প্রাণ—"প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্"। তাই জিজীবিষা বা will to live—এই বেঁচে থাকার চাহিদা রয়েছে সৃষ্টির মূলে। সৎ ও অসৎ-এর এক টানা-পড়েনে এই জগৎ-বস্ত্র খচিত হয়ে রয়েছে। সেখানে ওই জিজীবিষা সার্থক করে তুলেছে ব্রহ্মের শক্তিরূপ—প্রাণ।

ব্রহ্মের সদসৎকে যখন বলা হয় "অস্তীত্যুপলব্ধিমাত্রম্", তার মধ্যে শুধুই আলো বা শুধুই আঁধার এরকম অনুমান করা ঠিক নয়। কেননা তাকে আলো বা আঁধার কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তখন ভেদক ও নির্দিষ্ট কোন দিকও নেই। কালাতীত অনির্বচনীয় এক উপলব্ধিমাত্র এই বোধ, অনন্ত কালপ্রবাহে তার গতি শুরু হতে দেখা যায়। ব্রহ্মকে ওই শুদ্ধ প্রজ্ঞান বললে তারই মধ্যে আলো ফোটে, তাঁর শক্তির উল্লাস জেগে ওঠে, তাও বলতে হয়। এরকার থেকেই অনন্ত বৈচিত্র্যের সম্ভূতি—আর তখনই আমি তুমি বিষয়ী বিষয় দ্রষ্টা সৃষ্টি, এই রকম করে দুই কোটিতে আনন্দ ব্রহ্ম প্রেমে উচ্ছলিত হতে থাকেন। এরকম দেখলে বলতে পারি আনন্দ প্রেম সৌন্দর্য সবই যেন সৎ ও চিৎ-এর বুকেই সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই ভাবে দর্শন সিদ্ধ হলেও আমাদের ব্যবহারিক অসিদ্ধ জগৎ প্রাত্যহিক জীবনে ওই মূল থেকে যেন বাদ পড়েই থাকে। সেখানে আমাকে সকলের সঙ্গে মিলতে হবে, যেমন ভাবের জগতে তেমনি কর্ম-জগতে। সেই কর্মকে প্রাণের কর্ম করে তুলতে হবে।

এই জগৎ-সংসারে যে তাঁর শক্তির প্রকাশ তা দেখলাম বুঝলামও। কিন্তু ব্যবহারে যে এক নেতির দুর্বোধ্য আড়াল রয়েছে; সেই "বিশ্ব মধ্য পাথরের" আড়াল সরাতে যে শক্তি-সাধনার প্রয়োজন। তখন এই অসিদ্ধ জীবনে তাঁকে স্বীকার করে নিলে তবেই শক্তি উদ্বুদ্ধ হতে থাকে, আর তাতেই জিজীবিষার সার্থকতা। তখনই ঠিক বলতে পারব, সৎ চিৎ আনন্দ শক্তি সবই ব্রহ্মের বিভঙ্গ। আবার এসব ছাপিয়েও তিনি অসৎ। এই পঞ্চপর্বা নিলনটি জীবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে খাটিয়ে কর্ম সিদ্ধ করতে পারলে, তবেই জীবন সহজ হতে পারবে। আমরা জানি, তাঁকে এখানে নামিয়ে এনে বাস্তব জীবনে সহজ হওয়াটা কত বড় দায়, তবুও প্রাণের কর্ম সেখানেই পূর্ণতা এনে দিতে পারবে—এই তার পরিচয়। তখন এই বাস্তব জীবনের বৃহত্তম থেকে তুচ্ছতম পর্যন্ত ব্রহ্মের আপন স্বভাব-কর্ম সম্পাদিত হয়ে চলবে।

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি তিন গুণের সমাহারে গুণময়। সে গুণগুলি হল সত্ত্ব রজ আর তম। প্রকৃতির নিসর্গ জগতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে গুণগুলিকে বর্ণিত করতে পারা

যায়। ভোরের আকাশে আলো আঁধারের খেলায় আঁধার হয় তমোগুণের প্রতীক, সেই আঁধারের বুক চিরেই আলো ফুটতে দেখা যায়। তাতে প্রথমে রজোগুণের ক্রিয়া, যখন লালরঙে আকাশ ভরে যায় তারপর আকাশ কত বর্ণবৈচিত্র্যে আলোর খেলা দেখিয়ে আবার রংছুট হয়ে যায় বালসূর্যের উদয়ে। তখন সেই "আলো আমার আলো"কে পেলাম। সেই সোনার আলোর বর্ণ হল সত্ত্বগুণের প্রতীক। দিন এল, সমস্ত দিন পরে আবার সন্ধ্যার বিপরীত ক্রমে এইভাবে সব রঙ ও তম বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়ে আঁধার নেমে এল পৃথিবীতে আকাশেরই বুক থেকে। এই আবর্তনে চলছে জীবন চলছে জগৎ, যার ওপরে স্থির হয়ে জ্বলছে দিনের সূর্য একলা—জঙ্গম ও স্থাবরের তিনি আত্মা। তিনিই আমাদের সাধ্য ও সাধনের দেবতার প্রতীক। কিন্তু সেই আলোকে পেতে অন্ধকারকে অস্বীকার করলে কি তাকে পাওয়া যেত? ওই আলোকে আবৃত করে রাখার জন্য অন্ধ তমিস্রার আবরণেরও প্রয়োজন আছে। অন্ধকারের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে আলোর প্রতীক করে তুলতে হয়। সঙ্ঘর্ষণের যোগশক্তিতে শক্তিকে আকর্ষণ করে গুটিয়ে নিয়ে জানতে হয় তাঁর অভীষ্ট তপকে, জানতে হয় শক্তির নিমেষকে। আলোকে ধরে আছে যে অন্ধকার সেই রাত্রিকে দুই দিক দিয়েই বুঝতে হবে। এক অন্ধ তমিস্রা থেকে যেমন আমার অজ্ঞান, তেমনি জ্ঞানের আলোকে পেরিয়ে তাকে ঘিরে রয়েছে এক বিরাট অন্ধকারের আলো (Holy Ignorance), আর সেই অ-জ্ঞানই জ্ঞানের প্রসূতি। এই ভাবের ধারণায় অসৎ ব্রহ্ম ও মূল অকৃতনিস্রা এক হয়ে যায়, তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাকে অবলম্বন করেই জীবনের ঋতি প্রকাশিত। নির্ঋতি থেকে অমৃত ও তা থেকে ঋত আমাদের বোধে আসে। প্রাকৃত জীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তিতে এই রীতিই লক্ষ্য করা যায়।

জড় বস্তুতে আমরা দেখি তমোগুণের প্রাধান্য। কিন্তু একটা electron-এর গঠনে যে শক্তিবিন্যাস (Pattern) নিয়মিত হয়েছে, বৃহৎ সৌর জগতের গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তনে, এমন কি মানবদেহের জীবকোষে পর্যন্ত সেই নিয়মকে কলিত দেখতে পাই। এক প্রবল শক্তি নির্ঋতির আলো-অন্ধকারের ভিতরে ওই নিয়মের বশী ও প্রেরয়িতা। জড় থেকে প্রাণশক্তি উদ্বোধিত হলে, আমরা সেই প্রবল শক্তিপ্রবাহকে একটা দিক নির্ণয় করে লক্ষ্যাভিমুখে প্রবাহিত দেখতে পেলাম। কিন্তু সে শক্তি-প্রবাহের দুর্দমনীয় বেগ থাকা সত্ত্বেও তার লক্ষ্য তখনও তার কাছে স্থির নয়। তার প্রেরয়িতা ও বশীকে সে চেনে না, এক অজ্ঞাত শক্তিবেগে আপন খেয়ালেই সে শক্তি ছুটে চলেছে। এই ভাবে চলতে চলতে প্রাণশক্তির পরে মনোজ্যোতি এসে পড়েছে, আর জড় প্রাণ মনের ত্রিপুটিতে আবির্ভূত হয়েছে মনু—মননশীল মানব। মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগ্রত ও পুষ্ট হয়ে আমাদের পরিচিত জগৎকে পরিচালিত করতে চলেছে, এ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই। শক্তির মত্ততায় যারা দাপিয়ে বেড়ায় যাদের বৃত্তিকে আসুরী আখ্যা দেওয়া যায়, তাদেরও ঘরে রেখেছে এক বুদ্ধিদীপ্ত মন—সে

নিশ্চয়। এমনি করে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে সত্যকে দেখে অনুত থেকে প্রতিচ্ছন্দের দর্শন পেলাম। তারও পরে দেখি দার্শনিকের অনুসন্ধানের ফলে মননের গভীরে জাগে এক আত্মজিজ্ঞাসা। আসুরী জীবন পর্যন্ত জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি টানতে গেলে, এক অন্ধ আসুরী শক্তির যদৃচ্ছাকেই মানুষের নিয়তি বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু "আমি কে"? এই জিজ্ঞাসা ওখানে অতৃপ্ত হয়ে না থেকে মননের গভীরে অনুসন্ধান চালাতে থাকে। তখন ব্যাকুল হয়ে সমস্ত দিক দিয়েই সহস্রচক্ষু হয়ে অর্থ খুঁজে পেতে চাই—এ হল গরুড়ের ক্ষুধা। এই দিব্য তৃষ্ণা (divine discontent) থেকেই উদ্ভিত সত্যের ভূমা-দর্শনে অধ্যাত্মজীবন গড়ে ওঠে। সেই ভূমার আবরণ খসে গেলে নব নব বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে অনির্বচনীয় রসে প্লাবিত হতে থাকলে, বাহিরটা হারিয়েও যায়। তবুও সে রসের পরিপাকে জগতের সত্য দর্শনে এই বাহিরকে তারই অঙ্গীভূত দেখতে গিয়ে আর এক নতুন করে জানার দিক উদ্ঘাটিত হতে থাকে। কাজেই দেখতে পাওয়া যাবে, পরিপূর্ণ দর্শন পরিপূর্ণ জ্ঞান পরিপূর্ণ জীবনকে কর্মে ব্যাপ্তিত না করা পর্যন্ত আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিচিত্র শক্তির লীলায় তার অধীশ্বর হয়ে দেহ প্রাণ মনকে তিলে তিলে সমন্বয় করে গড়ে তুলতে হবে। এই ভাবে নিজেকে নতুন করে পাওয়ার ও ক্ষণে ক্ষণে হারাবার সাধনাকে পূর্ণ করে তুলতে চাই যে কর্ম দিয়ে, তাকে আমরা নাম দিয়েছি প্রাণের কর্ম।

আমরা দেখেছি যে সাধন-জীবনে নিরালায় চিত্তবিশ্রাম বা নির্জনতায় ছুটি (spiritual holiday) নেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে থাকে। প্রাকৃত জীবনেও আমরা সুপ্তির ভিতর দিয়ে আপ্লুত জীবনের শক্তি সঞ্চয় করে থাকি। সেই রকম পরিবেশের অসহযোগিতায় যখন জগৎ-সংসারের সাথে সংঘর্ষ বাধে, তখন নির্জনতায় ডুবে শান্ত হতে চাই। এটাকে জীবনের অতি প্রয়োজনীয় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নিলে দেখতে পাওয়া যায়, বাধা আসছে অন্তরের ও বাহিরের কোন স্তর থেকে, কোন ছিদ্রপথে। তখন এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকৃতির ওই তিন গুণের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। গুণবিক্ষোভের ফলেই আত্মপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতিতে জট পাকিয়ে উঠেছে। সাংখ্যকার বলেছেন, তুমি যে গুণ দিয়ে জগৎকে গ্রহণ কর, তার অধীন আছ বলেই টলমল করে ওঠ, আর তাতে বিভীষিকা দেখে ভয় পাও। যদি ভয় না পেয়ে অটল থেকে জগৎকে ও আত্ম-প্রকৃতিকে দেখতে শেখ, তাহলেই দেখতে পাবে গলদ কোথায় আর কি করতে হবে। কাজেই গীতার ভাষায় নিস্ত্রৈগুণ্য হতে পারলে গুণাধীন হয়ে প্রনত হতে হবে না। কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই একটা মৎলবকে মনের সদরে বা অন্দরে স্থান দিয়ে রাখি, আর ঠিক সেই কারণেই সে চাহিদাটা বিঘ্নিত থাকলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। ওই মৎলবটির মূলে অনুসন্ধান করলে দেখব আসক্তি বা বাসনার জট পাকানো ছোট বড় পচা ডোবার মত এক "অংহঃ" সত্তার মধ্যে আটকে রয়েছে। তাই বলে যাই আর আশ্রমে বাস করি, ওই মগ্ন বাসনার অশুদ্ধির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। জন্মের সঙ্গে থেকেই ঐ সংস্কারগুলি চিত্তকে যেন নাগপাশে বেঁধে রেখেছে,

এই রকম বোধে আসে। তাই আঘাতের পর আঘাতে জগৎ-সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দেয়, আর আমরা পেতে চাই সাক্ষী দ্রষ্টা পুরুষ খাঁটি মুক্ত আত্মাকে, প্রকৃতির গুণ-বিক্ষোভের মধ্যে যাতে আর থাকতে না হয়। দুঃখের মূল কারণকে তাহলে এভাবে দেখে পাওয়া গেল, আসক্তি বা বাসনা (desire) আর ক্ষুদ্র অহং (অংহঃ)।

গীতায় আমরা আসক্তি ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করার নির্দেশ পেয়েছি। শ্রীভগবান দেখিয়েছেন জগৎ ও জীবন আছে, থাকবেও। তারই মধ্যে সাবধানে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে যেতে হবে, কর্মত্যাগ করা চলবে না। স্বভাব ও প্রয়োজন অনুসারে নিয়ত কর্ম প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট আছে, সেটা ধরতে পারা যায়, তা আমরা জানি। কিন্তু রুচি অনুসারে অনেকের কর্মে একটা নেশার (hobby) মত একদিকে প্রবণতা দেখা দেয়। সেটা করতে বাধা নেই কিন্তু কর্মফলে যেন মত্ততা না আসে, তাতে সাবধান হতে হবে। আবার মনের মত কর্মফল না হলে নিরুদ্যম হওয়া চলবে না। এক কথায় কর্মে জড়িয়ে পড়তে নেই, আর ওই ছোট অহংবুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে হবে। তাঁর হাতের যন্ত্রটি হয়ে অকর্তার ভার রেখে কর্ম করে যেতে হবে। অতীতের চিরকালের সংস্কার যেমন আমাকে তেমনই জগৎ-সংসারকে কর্মপ্রবাহে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তাই দুই দিক সামলিয়ে চলতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আমি করি না, তাঁর কর্ম তিনি করে চলেছেন, এই অকর্তা ভাবনার দৃঢ় ভূমি লাভ করলে এক নিরন্ন শান্তি লাভ করা যায়। আর বাহিরের চাপে কর্ম গ্রহণ করলেও কর্মের মধ্যে শান্ত ও নিষ্কম্পিত থাকতে পারব। এই রকম অকর্তার কল চালাতে পারলেই ওই প্রাকৃত অহংটির আড়াল সরে গিয়ে চৈত্যপুরুষকে সামনে পাওয়া যাবে। তাঁকে দেখেছি রসস্বরূপে এখন আমার তাঁকেই কর্মের মধ্যে দেখছি অবিচলিত তাঁরই রূপে, আর তাতে অকর্তা হয়েও নিস্পৃহ থেকেও না করবার তাই করে যাই শ্রীকৃষ্ণকে যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দর্শন করেছি, সব কর্মের নির্দেশ ও প্রেরণা দিয়ে শক্তি যুগিয়েও তিনি যুদ্ধকর্ম নিজ হাতে না করে অর্জুনকে নিমিত্ত করে যুদ্ধ করালেন। সেই রকম প্রশান্তির ভাবকে চয়ন করে ধরে ঠিক অকর্তা হতে পারলে নৈষ্কর্ম্য যোগেও সিদ্ধি লাভ করা যায়। আবার ভক্তির জোয়ারে সাধকের সত্তা প্লাবিত হতে থাকলেও তাকে ওই প্রশান্তিতে যুক্ত রাখতে হবে। সাধকের দিক থেকে প্রশান্ত ভক্তির ভাবটিই ভাল ও সাধ্য।

গীতার কর্মযোগের অনুসরণ করলে দেখা যাবে, অকর্তা নিমিত্ত মাত্র হয়েও ভগবানের কর্ম করে যেতে হবে। তিনি বলেছেন "মৎ কর্মপরমো ভব"। তাই তাঁর হাতে বীণা করেই বাজান আর যন্ত্রী হয়ে যন্ত্র চালনাই করুন, কর্মে আর কর্মফলে উদ্বেগ থাকবে না। তখন আধারে শান্তি নামে, আর অন্তঃকরণে রস সঞ্চারিত হয়; তাতে কর্মে আনন্দ লাভ হয়ে থাকে। শান্ত আত্মায় রসে বশে থাকলে অনুময় পুরুষ জেগে ওঠেন। তখন দুরকম ফল দেখা যায়। জগতের প্রকৃতির দিকে আর পুরুষের দিকে। প্রাণময় পুরুষের জাগৃতি ঘটলে সাধকের প্রকৃতিও আত্মচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই প্রাণময় পুরুষে প্রাকৃত ভোগ ঐশ্বর্যের সব কিছু সব দিক দিয়ে অব্যাহত থাকে। তাই তখন প্রাণের ও মনের

দুটি বৃত্তি—মনন-বৃত্তি ও সংকল্পের বৃত্তি উদিত হয়। রস-চেতনায় সম্ভোগ ও ঐশ্বর্য এই দুই রকম প্রকাশই প্রাণময় পুরুষ জাগিয়ে তোলেন। এখানে এক সঙ্কট এসে উপস্থিত হতে পারে। যদি ছোট অহংটি মনে স্ফীত হয়ে ওঠে, তাহলে ভোগও পঙ্গু ও অশুদ্ধ হয়ে আসুরী বৃত্তির কবলে পড়ে যায়। কিন্তু শুদ্ধ প্রাণময় পুরুষ যখন দিব্য সম্ভোগ আস্বাদন করেন, তখন বাহিরের উপকরণ সরে গেলেও অন্তরে দিব্য ভোগের সূক্ষ্ম জগৎ খুলে যায়। তা থেকে ভোগের উপর ঈশনা (mastery) আসে। তখন ভোগের জন্য ঐশ্বর্যের জন্য কর্ম করতে গেলেও প্রাণময়পুরুষ চৈত্যপুরুষের দোসর হয়ে জেগে থাকেন। এই ভাবে কর্ম চলতে থাকলে, কর্ম যেন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রাণময় সত্তাকে চৈত্যপুরুষ প্রাণপুরুষে পুষ্ট করে তোলেন আর তাতেই আত্মপ্রকৃতি—প্রাণের সাড়া মেলে, যিনি সদাজাগ্রত। কর্মফলে নিষ্কিয়তা থেকে সাধক বুঝতে পারেন আড়াল থেকে তিনিই ঠেলছেন, তিনিই হয়ে আছেন ও হয়ে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে মিলে তখন আপনাকেই বৃহৎ করে পাওয়া যায়, বৃহৎসত্তাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রকম করেই আসক্তি আর অহমিকা (অহং, ego) থেকে মুক্তি পেলে বৃহৎ হয়ে স্বীয় প্রকৃতির সত্যকে লাভ করা যায়।

গীতার উপদেশ বিশ্লেষণ করে এবার আবার প্রাণপ্রকৃতি ও প্রাণের কর্মের স্থানটি সাধনায় ধরতে চেষ্টা করব। প্রথমেই শুনেছিলাম ত্রিতিক্ষার কথা। যা কিছু আসুক, সমস্ত শক্তি সংহরণ করে সয়ে যেতে হবে। গুণবিক্ষোভে চারিদিক টলমল করে উঠলেও আপূর্যমান অচল-প্রতিষ্ঠা থেকে জানতে হবে অবিনাশী সেই পরম সত্তাকে, যা সব ছেয়ে সব কিছু ধরে আছে। সেই ব্যাপ্তি চৈতন্যকে অবলম্বন করে আসক্তির কবল হতে মুক্ত হয়ে কর্ম করতে প্রাণের কর্ম অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তাতে প্রেমের কর্ম যুক্ত হলে ওই ব্যাপ্ত আত্মচৈতন্য যে বিশ্বচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই দৃষ্টি উন্মুক্ত ও প্রসারিত হতে থাকবে। তখন যে কর্মের কর্তা সে অকর্তা কিন্তু তাঁরই নিমিত্ত, তাই তাঁর শক্তিতে শক্তিমান। হনুমানের মত বজ্রাঙ্গবলী হয়ে সমস্ত বিশ্বকে তার করতলগত করে রাখতে পারে, এমনই সাধিষ্ঠ সেই শক্তি। এই রকম করে বৈরাজ ছন্দে শক্তিকে কর্মের মাঝে নামিয়ে সার্থক করে তুলতে পারলে প্রাণের কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হতে পারবে। বাসনা থেকে বিমুক্তি ঘটাতে নেতি নেতি করে সাধনায় উজান গতির কথা বলা হয়েছে, সেখানে ওই ক্ষুদ্র অহং বা কাঁচা আমিটিকে সরে পড়তেই হবে। তখন তাঁর নিমিত্ত হয়ে চৈত্যপুরুষই সামনে আসেন আর কর্মে ভোগ ও ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকৃতি তাঁর বুকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আত্মপ্রকৃতির শক্তিতেই সব কিছু কর্মযজ্ঞ সিদ্ধ হয়ে চলে। দিব্যকর্মযোগের পূর্ণতার পরিচয় এই প্রাণের কর্মশক্তিতে। প্রজ্ঞা ও প্রেমযোগে কর্ম করেও জগতের এক তুরীয় সত্তাতেই থেকে যাওয়া যায়, কিন্তু প্রাণের শক্তি তাতে যুক্ত হয়ে যখন তাকে এইখানে নামিয়ে আনতে চায়, তখন সেই দিব্যশক্তির স্ফুরণে দিব্যকর্মের অনুষ্ঠানে আসতে থাকে বিরাট বাধাসমূহ। প্রধান বাধাই হল, এখানকার ক্ষুদ্র অহং তার আসক্তি নিয়ে দ্বৈতবুদ্ধির জগতে এমনভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুদিক

দিয়েই অজ্ঞান ও মিথ্যার (Ignorance and falschood) স্বত্বকে কায়েমী করে রেখেছে যে, সেখানে সত্যের শক্তিকে তারা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবে না। দিব্যকর্মযোগের পরিকল্পনাই থেকে গেল, সে শক্তিকে নামিয়ে মিথ্যা মায়াকে অপসৃত করা গেল না, এমনও অনেক ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব। শক্তির প্রয়োগে বার বার তাল কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই মনের ওপারে অতিমানস বিজ্ঞানশক্তির সন্ধান পেলে তবেই মূল অক্ষয় শক্তি-ভাণ্ডারের যোগান পাওয়া যায়; আর তখনই জীবনে শান্ত ও সুস্থির হওয়া যায়। আবার সনন্ময় প্রতিষ্ঠিত না হলেও অতিমানস জ্ঞান অবতরণ করতে পারে না, তাঁর দিক থেকে এও এক বিধা। ভগবান নিজেই বলেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।।

তাঁর মায়া তাঁরই শক্তিতে পেরিয়ে যেতে হবে এই হল রহস্যের মূল শক্তি। তখন মায়াকে ছাপিয়ে গিয়ে আবার মায়ার অধীশ্বর হয়ে বসতে পারলে তবেই সমস্যার সমাধান হবে।

আত্মাকে কেন্দ্রে রেখেই তো শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মযোগের অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়। কিন্তু সেখানে অহং ত্যাগ করতে বলা হয়েছে; আমি বা আমার জীবন থাকবে, তবুও আমি বোধটি থাকবে না। কোন বাসনার গাঁট না থাকাতে চাওয়ার কিছু নেই, কোন প্রত্যাশাও রাখতে নেই। এটা সম্ভব হয় চৈত্যসংস্পর্শে অকর্তার বোধে। তাঁর প্রসাদই যে আমাকে তাঁর দিকে নিয়ে চলেছে, আমি যে তাঁর দ্বারাই বৃত। তিনি চেয়েছেন বলেই না আমি তাঁর কর্মে নিযুক্ত হয়েছি। আমার চিদাকাশে প্রেমসূর্য হয়ে তিনিই তো জ্বলছেন। এই চৈত্য ভালবাসার অবলম্বনটি চাই, তবেই পরিণামে পূর্ণ অতিমানস প্রেমের অবতরণ সম্ভব হবে। এই ভাবে প্রেমের মধ্যপথ ধরেই শান্ত হয়ে চলতে হবে, শ্রীঅরবিন্দ সেই রকম নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু চলতে হবে অন্তরের গভীরের প্রেরণায়, বাহিরের তাড়নায় নয়। তিনিই মূলে শক্তি জোগান দেন, তা থেকেই অন্তরে প্রেরণা আসে। অনেক সময় গহন কর্মের পথে প্রশ্ন আসে মনে খটকা লাগে। তখন পথের দিশারী গুরুকে মূল শক্তিনির্বাচনের প্রতিভূ বলে বুঝতে হবে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে স্থির হয়ে ধরে থাকতে হবে। তাঁতে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আদেশ নির্বিচারে মেনে চলতে হবে। কর্মপথে তাঁর বশে থেকে চলাই কর্মযোগের ধর্ম। তৈত্তীরিয়োপনিষদে দেখি, আচার্য শিষ্যকে ব্রত দিয়ে বলছেন—যাও নিজের মধ্যে সাধন করে সমাধান কর আর সমাধান করতে না পারলে সংশয় হলে আশেপাশে যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁদের কাছে বিনীত ও নম্র হয়ে জিজ্ঞাসা করে নিও। তাঁরা যে রকম আচরণ করবেন, তোমার কর্মানুষ্ঠান সেই ভাবে চালিত কর। এই রকম উপদেশকেই তাঁরা কর্মের বিধি ও বেদের রহস্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাহলে প্রাণের কর্ম সমাধান করতে গিয়ে পেলাম—ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে বাধা বিপদ সব মেনে নিয়ে, বিরোধী শক্তির স্পর্ধিত আহ্বান (challenge) গ্রহণ করে অন্তরের পবিত্র নির্দেশটি বেছে নিয়ে কর্মপথে চলতে হবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি

কর্মের গতি আসলে ঘুরে যাচ্ছে বাহিরের বিচারের দিক থেকে অন্তরের মূল্যবোধের দিকে। তাঁকেই পরমারীয় বলে চিনে নিতে হবে। তিনিই আমার দোসর বুঝতে পারলে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণে নিজের মধ্যে কোন হীনতা বোধ আসবে না। বরং জাগ্রতে তাঁর বিরাট রূপের মধ্যে তাঁর মত তাঁর সাথী হয়েই চলতে হবে। পথের বাধায় সংশয় উপস্থিত হলে সনাক ঋষিকে প্রণিপাত করে পথের নির্দেশ গ্রহণ করে বিনীত নম্র হয়ে পথ চলতে হবে।

* * *

যজ্ঞকর্মের উত্তরায়ণের পথে প্রজ্ঞার প্রেমের ও প্রাণের কর্ম বিশ্লেষণ করে দেখলাম। এর পর চতুর্থ পর্বে এসে সবগুলিকে মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট করে দেখা যাক। পুরুষ-প্রকৃতি সকলের মধ্যেই একাকার হয়ে আছে। আবার কারও মধ্যে পুরুষ ভাবের ও কারও মধ্যে প্রকৃতি ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। আমরা জানি পুরুষের ধর্ম প্রজ্ঞা আর প্রকৃতির ধর্ম প্রাণ এবং দুয়ের মধ্যে সেতু হলেন প্রেমরূপী চৈত্যপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে সর্বাগ্রে প্রজ্ঞার কর্মের স্থান। চৈত্যপুরুষ দিয়ে সাধনার শুরু, তাই পুরুষের দিক থেকে এই দর্শন, আবার চৈত্যপুরুষের স্থান প্রকৃতির দিকে। সে ভাবে দেখলে, বৈষ্ণব-দর্শন যেমন বলেছেন, বলা যায় জীব মাত্রেই প্রকৃতি আর একমাত্র পুরুষ হলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতি চলেছে পুরুষের দিকে—এই তার উত্তরায়ণ তপস্যা ও পরিণামে দেবায়ন। সেই কারণেই গোড়ায় প্রজ্ঞানের প্রসঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করে প্রেম ও প্রাণকে শোধন করে নিলে তিনকেই সমানভাবে কার্যকরী করে তোলা যাবে। এই রকম সমন্বিত করে কর্মযোগের অনুষ্ঠান আমাদের যোগজীবনের ধর্ম।

ভগবানকে ভালবাসা ও জানা—প্রেম ও প্রজ্ঞা দিয়ে লাভ করলেও যোগ পূর্ণ হয় না। এই পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রেম ও প্রজ্ঞাকে নামিয়ে আনতে হবে, সেটা হল প্রাণের কর্মের দায়। All life is Yoga তখনই বলতে পারব, যখন প্রাণের কর্ম দিয়ে জীবনকে এখানেও যোগযুক্ত করে রাখতে পারব। সে দিকটা এবার এই প্রসঙ্গে বিচার করে দেখা যাক, তার সাধন সঙ্কেত কি কি পেলাম।

আত্মসচেতন না হলে যোগ হয় না—এ হল যোগের প্রথম কথা। জীবনের উন্মেষকে সচেতনভাবে স্ফুরিত হতে দিতে হয়। তাতে প্রাকৃত জীবন বলতে আমরা যেটা বলি ও বাহিরে দেখতে পাই, সে দিক থেকে যোগে জীবনের মোড় ঘুরে যায় ভিতরের দিকে। জীবনের এক পর্ব থেকে অন্য পর্বেই চলে যেতে হয়। কেননা এমন ভাবেই শারীর-ইন্দ্রিয়গুলি সংস্থাপিত যে প্রথমেই তাদের দৃষ্টি পড়ে বাহিরের দিকে— "পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্"। তাই আত্মানুসন্ধানের তাগিদে যখন প্রত্যাক্ দর্শনের দিকে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলতে থাকে, সেটাই যোগের দর্শন বলে অভিহিত হয়ে থাকে। সেইজন্য এই বহির্মুখী অহং বা "কাঁচা আমি"টাকে ভাল করে চেনা দরকার। আর সেই কারণেই বিবেক-বিচারকে ঠিক মত জাগাতেই দুঃখবোধের প্রয়োজন। সাধারণত মানুষ স্বভাবে (অধ্যাস) চলে

না, চলে শক্তির তাড়নায় অবশ হয়ে। শেষ পর্যন্ত নিজের শক্তিতে আর কুলিয়ে ওঠে না আর তাতেই দুঃখ দেখা দেয়। কিন্তু কামপুরুষ প্রবল থাকলে, দুঃখ পেয়ে পেয়ে অসাড় হয়ে গেলেও দুঃখের কারণ আমরা বুঝতে চাই না, বা তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারি না। জীবাত্মা (Soul) জাগছে কিন্তু তাতে কামনার মুখোস, আর তার পুঁজি আসক্তি। তাই কামপুরুষের আসক্তির থেকে চাওয়া ভোগের উপকরণ জড় হতে থাকে, উপকরণ বাড়তেও থাকে, কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। এই হল জীবনের প্রাথমিক পর্ব ও জীবনের চাহিদা। এই চাহিদাকে অবলম্বন করে জীবনের অভ্যুদয়কে কিছু পরিমাণে সার্থক করা যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি, এর পর আরও কিছু চাই, এই অব্যক্ত-তৃষ্ণা থেকেই যোগজীবন শুরু হয়। তাই ভোগ ও ঐশ্বর্যকে প্রকৃতির ধর্ম বলে বিচার করে সাংখ্যদর্শন পুরুষকে তা থেকে বিবিক্ত করার সাধনা দিয়ে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়েছেন। পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র হয়ে থাকেন, আর প্রকৃতি ভোক্তা থেকে যান। কিন্তু বৈরাগ্যের পথে চলে এই প্রকৃতি থেকে পুরুষের বিয়োগে পূর্ণযোগ সিদ্ধ হবে না, প্রকৃতি তাতে বাদ পড়ে যায়। তাই প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিলে প্রথম কর্তা প্রাণপুরুষ (true vital being), তাঁকে চিনে নিয়ে, তাঁর প্রেরণা ও দোসর জেনে চৈত্য-পুরুষকে ধরতে হবে। তখন গভীরের দিব্যপুরুষ, যিনি অন্তর্যামী পুরুষোত্তম তাঁকেই প্রকৃতির ভর্তা ভোক্তা ও মহেশ্বর বলে জানা দেখা ও পাওয়া যাবে।

প্রাকৃত জীবনে কামময় পুরুষের চাই-চাই খাই-খাই ভাবকে সংহত করে, চাওয়াটা বুঝে নিয়ে ঠিকমত চাইতে পারলে প্রাণময় পুরুষ জেগে ওঠেন। তাঁর জাগরণের অর্থ এককথায় বলতে গেলে জীবনে উল্লাসের স্ফূর্তি। তা থেকেই রস সৃষ্টি—"রসো বৈ সঃ।" সাহিত্য শিল্পকর্ম সঙ্গীত সবই জীবনের উল্লাস থেকে সৃষ্ট হয়, সবেতে তাঁরই রস প্রবাহিত। কাজেই জীবনের ভোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার প্রয়োজন নেই তো। কিন্তু সে সবের উপরই ঈশনা থাকা চাই (mastery of circumstances)। সকল রকমের অঘটন ঘটনের মধ্যে জেগে থাকবে শুদ্ধ আত্মার নির্বিকার দ্রষ্টৃত্ব। ভোগের বাধা আছে কামপুরুষের আসক্তি ও অহন্তার স্ফীতির মধ্যে, এগুলি হল আসুরী ও রাক্ষসী বৃত্তি। এ সবগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক নবজন্ম লাভ করতে হয়। আমরা দেখেছি সাধনায় শিশুর মত হয়ে যেতে হয়, এ হল তা-ই।

পরম পুরুষের শৈশব কল্পনা করলে দেখতে পাই, তাতে ভোগও আছে ঐশ্বর্যও আছে। কিন্তু তিনি যেন বালক-স্বভাব, কিছুতে আঁট নেই। তাতে বাসনার ক্ষুদ্রতা ও অহংএর স্ফীতি থাকে না। "সাবিত্রী" কাব্যে দেবশিশুর বর্ণনায় দেখেছি শুদ্ধ প্রাণ-পুরুষের জাগরণকে। সে হল বালগোপালকে নিয়ে লীলা, যাতে সমস্ত কিছুই সাবিত্রী-দ্যুতিতে উদ্ভাসিত করে নিতে হবে। এরই কাছাকাছি হল রসচেতনায় গন্ধর্বলোকের স্থান। তা থেকে রস নিঃসৃত হয়ে সৌন্দর্য-সৃষ্টিকে সম্ভবপর করে তোলে শিল্পে কলায় সাহিত্যে সঙ্গীতে। গন্ধর্বলোকেরও দুটি অংশ আছে, দেবগন্ধর্ব ও মনুষ্যগন্ধর্ব। যেমে

'সবিতাই' হলেন দেবগন্ধর্ব। উষার আলোয় জেগে উঠে বালসূর্য উদিত হলেন, এই হল বালগোপালের রূপরেখা। শুদ্ধ প্রাণময় এই পুরুষটি বোধির আশ্রিত, কিন্তু তখনও তার সম্পূর্ণ প্রতিরোধ হয়নি। "আমি তোমার", "মা যাব" এই অস্ফুট ভাব। এর পর কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে আত্মচৈতন্য গভীর হলে তটস্থ হয়ে নিজেকে জানা শুরু হয়। আর রসচেতনার সান্দ্রতায় রসবন্ত হয় রাসবন্ত। গোষ্ঠের পর যেমন দেখি গোপীচেতনাকে। নিজেকে জানতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও আভাসে পেতে হয়। প্রেম গভীর হয়, কিশোর চিত্তের আত্মনিবেদন তিনি গ্রহণ করেন। "তুমি আমার" এই দাবীর প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন-ভর্তৃকার কর্তৃত্ব লাভ হয়। তারপর এই দাবীকে স্বীকার করে তিনি আমাকে যখন জড়িয়ে ধরেন, তখনই "যা সুপর্ণা সযুজা সখায়া..." সেই সমভাব পুষ্ট হতে থাকে। তাহলে আমি তাঁর তিনি আমার। আমিই তিনি—এইভাবে লক্ষ্যের দিকে রসচেতনায় আত্মচৈতন্যের পুষ্টিবর্ধন হতে থাকে।

সাধনার কথায় শ্রীঅরবিন্দ একটি করে ধাপ ধরে প্রকৃতি-পুরুষের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সবের মধ্যেই এই তত্ত্ব কেমন করে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সেটা দেখতে পাওয়া সহজ নয়। নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে বহু সময় লেগে যায়। সদা নির্ঝরিত সোমধারাকে পবমান করে রাখা হল প্রাণময় পুরুষের পরিশুদ্ধি। প্রাণ শুদ্ধ না হলে প্রজ্ঞার দর্শন সিদ্ধ হয় না। বাসনা আর সংকল্পের প্রভেদ বুঝে চলতে হবে। দুর্বলের চাওয়া সংকল্প নয়, তাই সে পায় না। চাওয়ার শক্তি হল ইচ্ছা (Will)—শক্তির (Energy) সেটা দিব্য রূপ। তার ক্রিয়া-সামর্থ্য আছে, সেই ক্রতুই হল সংকল্প। বেদে অগ্নি হলেন কবিক্রতু। অন্তরে অভীপ্সার আগুন জ্বলে উঠল, আর ক্রান্তদর্শী কবিচেতনা পরিস্ফুট হল। তখনই বুঝতে পারা যাবে, কি চাই। চাতকের তৃষ্ণার মত একাগ্র সেই চাওয়া—অন্য আর কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই, তুষ্টি নেই। এইভাবে সকল চাওয়া একমুখ হলে হয় সঙ্কল্প, আর তখনই তাতে দেখা দেয় সৃষ্টিসামর্থ্য। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, God said, Let there be light and there was light. আমরা বাহিরে সেটার সিদ্ধরূপ প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও সত্য সঙ্কল্প অন্তরে সিদ্ধ হয়েই থাকে।

এই রকম করেই বাসনা রূপান্তরিত হয় সঙ্কল্পশক্তিতে। সেটা কামসংকল্প বর্জিত হলে হয় গীতার ভাষায় সমর্পণ; আর তখনই আসে সমত্বের বোধ। তাহলে এদিক থেকে পেলাম, বাহিরের বস্তুনির্ভর কামনা বাসনাকে আমল না দিয়ে তাতে বন্দী না থেকে অন্তরে সত্যসংকল্পে বজ্রশক্তির মত দৃঢ় হয়ে থাকা। বাহির থেকে বাধা যখন আসে, তাতে বিক্ষুব্ধ না হয়ে সহজভাবে গ্রহণ করা শিখতে হয়। মনের ঔদাসীন্য নিয়ে চললে জড়ত্ব এসে পড়ে, অতে প্রাণপুরুষ স্তিমিত হয়ে যান, তাঁর সাড়া মেলে না। আবার বাহিরের সুখের সন্ধানে ছুটে প্রাণের উল্লাসে মত্ত হলেও চলবে না। এ থেকে গীতার অনাসক্ত যোগকে পাওয়া যাবে। বাহিরের ব্যবহারে ও প্রতিক্রিয়ায় সমত্বের বোধ রাখতে হবে—কোন ঘটনাতেই জড়িয়ে যেতে নেই। তাই বলে একেবারে নিষ্কর্মা (inert) থাকলে হবে না। অন্তরে যে সংকল্পের

আগুন জ্বলেছে ; বাহির থেকে তাতে রস জোগান হলে সেটা সহজ ও শোভনভাবে জ্বলতে পারে। তাই সুখদুঃখ প্রিয় অপ্রিয় সব কিছু থেকেই রসটুকু টেনে নিয়ে স্বাদ পেতে হয়—তাতেই চৈত্যপুরুষ জেগে থাকতে পারেন। বাউল গেয়েছেন—

"ত্রিভুবন জুড়ে তাঁর প্রেমের প্রকাশ
পরনা প্রকৃতি সেই প্রেমেতে উদাস
অন্তরে বাহিরে প্রেম, প্রেম ঘরে ঘরে
ভোগে প্রেম যোগে প্রেম রোগে প্রেম ঝরে।"

শুদ্ধ প্রাণময় পুরুষটি এই ভাবেই তখন জেগে থাকেন, আর তাতেই হয় সত্যকার জীবনের স্বীকৃতি। তাহলে দেখছি, সাধনার ফলে আসক্তির ত্যাগ ও অহংএর নিবৃত্তি হয়ে গেলে এই আনিষ্ট তাঁর হয়ে যাবে। তাতে সুখদুঃখের আঘাতে বিরহমিলনের দোলায় শুধু যে অচুট থাকতে পারব, তা নয়, তা থেকে প্রাণপুরুষ রস আহরণ করে নেবে। জীবন হয়ে উঠবে "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"।

শিশুর মত সহজ ও সরল থেকে মনন করার ফলে আসবে ভাব ; রামকৃষ্ণদেবের জীবনে সেই বালক-স্বভাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বিবেকানন্দ জ্ঞানী ও প্রচণ্ড কর্মী ছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে একটি বালকের ভাব তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তিনি আকুল হয়ে থাকতেন, "কখন তুমি ডাকবে?" এই সিদ্ধ অবস্থাতেও কিন্তু পূর্ণযোগের লক্ষ্য হল আরও এগিয়ে চলা। কেননা এরও পরে আছে প্রকৃতির ঐশ্বর্যের দিক, শক্তির অক্ষয় সৌন্দর্যের ধারা। তাতে পুরুষ-প্রকৃতির মিলিত ছন্দে কৈশোরলীলা চলতে থাকে। চৈত্যসত্তার জাগৃতি ঘটলে তাঁর আপনজন পরাপ্রকৃতিও সামনে এগিয়ে আসেন। এই প্রকৃতি জীবভূত তাঁরই সনাতন অংশ—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। তিনিই চৈত্যের দিশারী। শৈশবে তো ঐ দিশারীর দিশায়ই চলে ছিলাম, কিন্তু কে চালিয়েছে তাকে দেখিনি, জানিওনি। দিব্য চক্ষু খুলে গেলে তবে তো তাঁকে দেখতে পাব। সে সময় বোধির ভূমি লাভ করলে পরে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি (Pure Reason) ধীরে ধীরে স্ফুরিত হয়ে রজ তম এই দুই-এর মিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়ে বোধির সঙ্গে শুদ্ধভাবে মিলিত হতে পারে। তখনই বুদ্ধির ভূমিও সবটাই উদ্ভাসিত ও অগ্র্য হয়ে ওঠে। এই ভূমি লাভ করলে সাধনায় সাবালকত্বের বোধ (maturity of the soul) আসে। তখন আর পদে পদে বিচার করে চলতে হয় না। প্রতিভ-সংবিৎ আবির্ভূত হতে থাকে আর শুদ্ধ বুদ্ধি প্রতিভাত হয়। বিবেকজ জ্ঞান স্পষ্ট হয়। অন্তর থেকে অন্তর্যামীর চালনা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সংবিতের ভিতর দিয়ে ধরা পড়ে। এই অবস্থার কথাতেই রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে কিছুকাল সাধনা করলে পরে শুদ্ধমনই গুরু হয়। এ তো আর তর্ক বিচারে বোধগম্য হবেনা, শিশুর মত এক সবিশ্বাস জ্ঞান নিশ্চিতরূপে প্রতিভাত হয়। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, ছোট মেয়েটি বলছে যে কাল আমার দাদা আসবে। এ বলা কোন কিছুকে না জড়িয়ে কোন স্মৃতি অবলম্বন করে কিন্তু নয়, এ তার সিদ্ধ দর্শন। সেটা ফলবেই। সিদ্ধেরা যেটা ফলবে, সেটা

বলেন। তাঁদের মনে নিশ্চয় জাগতেই পারে না। ভবভূতি বলেছিলেন, "তখন বাককে অর্থ অনুসরণ করে।" বাকের সেই শক্তি আছে। কোন মতলব না রেখে দেখতে শিখলে ওই "কন্যা কথয়তি..."-এর মত সত্য সরলভাবে বাক্ উচ্চারিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বলেছেন যে, সাধনা তখন করতে হয়না, তিনিই হাত ধরে নিয়ে যান।

এরপরে আরও গভীরে গেলে যাঁকে দেখা যাবে, তিনি হলেন অন্তর্যামী পুরুষ। পৃথিবীর অন্তরে থেকে তিনি তাকে ঘোরাচ্ছেন কিন্তু পৃথিবী তাঁকে জানতে পারে না। সে হল এক চিরতারুণ্যের টলমলে সমর্থ ভাব—কুঁড়ে ঘরে হাতী চোকার মত তাঁর শক্তির আয়তন, তাকে বহন করাই দায়। তিনি তো আর সহজে ছাড়েন না। একদিক থেকে সেটা একটা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা। যোগের গতিতে সেটা গভীরের বোধশক্তির পরিণাম। সেখানে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে যেতে হয়, সঙ্গে আছে ব্যাপ্তির আনন্দ, আবার ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে তার তুঙ্গতার পরাকাষ্ঠা—সবগুলিকে মিলিয়ে এই বোধ। এর মধ্যে যে কোন দিকে ন্যূনতা থাকলে তা পূর্ণযোগ হবে না। তাঁকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যদি লক্ষ্য হয়, তিনিও পরিপূর্ণ করে ভরে দিতে চান। এ সবের প্রত্যক্ষ বিবরণ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর লেখায় দিয়ে গেছেন। মহাজন সাধকদের অনুভূতির বিবরণেও এ সবের আভাস পাওয়া যায়। আধারে যেন এক ভূমিকম্প শুরু হয়। অলৌকিক আনন্দের ভার আর অপার বেদনাবোধকে একসঙ্গে বহন করাই হয় দায়। বারবার শক্তিতে হন বিদীর্ণ হয়ে "আমি"র আবরণ একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে উড়ে না যাওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই। এই দেহটাকে নিয়েও যে তিনি কি করেন, তাকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। এমনই তীব্র সেই আবেশ ও তার পরিণাম। শাস্ত্রে বলা হয়েছে জড় উন্মত্ত পিশাচবৎ সিদ্ধের অবস্থা। সে এক ভাবের পাগলের অবস্থা এসে যায়। বাহিরের কৃচ্ছ্রসাধন তো নয়, এ হল গভীরে তাঁরই তপস্যা। সে আধার নিয়ে তিনি তার যাঁধেন, তার ব্যথা যে বড় বিষম। বিরহ-মিলনের দোলায় দুলছে সমস্ত সত্তা সমস্ত পৃথিবী, আর মন্থন চলছে আধারের সমগ্র বোধ নিয়ে। তাতে উঠে আসছে অমৃত, উঠে আসছে হলাহল দুই-ই। সিদ্ধ জীবনে সেই বিষামৃত পান করে অমর হতে হয়। আধারের জড় কণিকাগুলি পর্যন্ত আলোড়িত করে করে তাঁর চিন্ময় আসন তৈরী করা হয়। এই পিণ্ডই তখন হয় ব্রহ্মাণ্ড! তাই পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের সংস্কারসাধনে অবচেতনের অনেক পুঁজি কুণ্ডলিত শক্তিসমূহ বেরিয়ে পড়তে থাকে। তাদের শক্তিও মুক্ত হয়। এভাবে একের সাধনায় বংশপরম্পরা অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। সেই মহাপ্রাণ শামুকের খোলে বহিয়ে দেন সমুদ্রের কল্লোল, শুক্তিকে করেন মুক্তার ধারক।

এই রকম করে অবচেতন (Sub-conscious), অধিচেতন (Subliminal-consciouness) ও অতিচেতন Super-conscious হয়ে যোগী পরা গতি লাভ করেও চলতে থাকেন। এ তো গেল সিদ্ধ সাধকের জীবনের দিক। যে কোন সূত্র অবলম্বন করে তখন আবার যোগীর দর্শনে বিশ্ব সব দিক দিয়ে খুলে যেতে থাকে। সিদ্ধ সাধক দেখতে পান, তাঁর মণিপুর তিনি জয় করেছেন, কিন্তু বিশ্ব (cosmic) মণিপুর তো

এখনও বিজিত হয়নি। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুচৈতন্যে তাঁর সত্তার শক্তি মিলে তখন চলে আবার এক মহা-সংঘর্ষ, জগতের মূল বিরোধী-শক্তির সঙ্গে—এই হল রূপান্তরের যোগ (Yoga of Transformation)। অসিদ্ধ অবস্থায় প্রবর্ত্ত সাধক ধারণাও করতে পারে না, তার পক্ষে সেটা কত ভয়াবহ হতে পারে। বুদ্ধের মার, শয়তান ইত্যাদি নাম দিয়ে বিশ্বব্যাপী বিরুদ্ধ শক্তিকে দেখান হয়েছে। অধিচেতনার তাদের কারেনী স্বত্ব অধিকৃত হয়ে রয়েছে। তাদের সমূলে পরাবর্তিত করে যে বিজয়, সেটাই অতিমানস লোকের ভূমি। সেখানে সব বিষই অমৃত, সব ছায়াই আলো। অতিমানসের শক্তিতে যুক্ত থাকতে হবে সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে আত্মসাৎ করে নিয়ে; পরিণামে তাদের দিব্য রূপান্তর ঘটে যাবে।

অতএব রূপান্তর-যোগের প্রথম ভাবনাতে পাব—"আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম"...। এই দেহই আত্মা আকাশ-শরীর ব্রহ্ম। প্রাণারাম ও মন-আনন্দ সেই সত্যাত্মতনুতে অন্বিত। "সাবিত্রী" মহাকাব্যে শ্রীঅরবিন্দ বৃহত্তর প্রাণ ও বৃহত্তর মনের বিকাশ ঘটিয়ে যেমন চিত্রিত করেছেন, সেইরকম ওই যোগ-তনুকে ঘিরেই বৃহতের পটভূমিকায় একদিকে প্রাণের তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভেঙে ভেঙে পড়ছে উঠছে, অপর দিকে আবার জ্ঞানের সিদ্ধির ভূরভূনির পরও ভূস্ভূনির সুউচ্চ চূড়াগুলি দেখা দিচ্ছে। প্রাণের বিক্ষোভে অমৃত তরঙ্গও যে জীবনের কূলে কূলে এসে উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে, তাকে গ্রহণ করাও সেই মহান্ সিদ্ধ-জীবনের দায়। শিবের মত নীলকণ্ঠ হয়ে, মন্থন-জাত হলাহলকেও অমৃতের শক্তিতে গ্রহণ করতে হবে, তবেই পূর্ণতা। তিনি যেমন বিশ্বের সঙ্গে, পূর্ণযোগীকে বিশ্বব্যাপারে সেই রকমটিই হতে হয়। এইভাবে অতিমানস-যোগে ব্যক্তি বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণ লোকোত্তর—তিনটি অবস্থাকে একসঙ্গে নিয়ে পূর্ণ হয়ে পূর্ণযোগে চলতে হবে। অতিমানসের শক্তি-সম্পাত ছাড়া তাই এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। অধ্যাত্ম-সাধনার শৈশব কৈশোর পেরিয়ে নিত্য তারুণ্যের ঈশানে পূর্ণার শক্তি নিয়ে অতিমানসের ত্রি-পর্বা রূপান্তর ঘটিয়ে যিনি পৌঁছবেন, তিনিই চিন্ময় বিজ্ঞান-ঘন পুরুষ (Gnostic Being) তিনি বিষ্ণুচৈতন্য তিনি যুবা, অতিমানস স্বরূপ শক্তির যুগনদ্ধ পুরুষ তিনিই। তাঁর সাবিত্রী শক্তির অবন্ধ্য প্রচোদনার জ্যোতিঃশক্তি ছড়িয়ে পড়বে পার্থিব জীবনের পরে, স্নিগ্ধ হবে তার মর্মমূলে,—দিব্যজীবনের তাম্বর মহিমায় ঘটাবে তার রূপান্তর।

অতিমানস রূপান্তর লক্ষ্যে রেখে বিজ্ঞান-ঘন পুরুষের মহিমা ও প্রাপ্তি পর্যন্ত আমরা যজ্ঞকর্মের প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখলাম। এই চরম অবস্থার পরম প্রাপ্তিতে প্রজ্ঞা প্রাণ ও প্রেমের মিলিত সমর্থ কর্মের সার্থকতা। ওই অবস্থা মনে রেখে কর্মযোগে ইঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। বিজ্ঞানঘন চেতনা লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠিত থেকেই লোকায়ত হয়ে প্রাকৃত চেতনাকে আপন স্বভাবে রূপান্তরিত করবে, অতেই পার্থিব জীবনের সিদ্ধি। অহংটিকে সমূলে উপড়ে ফেলে বাসনার ভারমুক্ত হয়ে সমর্পিত হয়ে চলা শুরু করেছি। শুধু নিজেকে খুলে দিতে দিতে তাঁর কাছে মুচিয়ে পড়া—এইভাবে কর্মযোগের পূর্ণাহুতিতে ষোড়শকল সৌম্যপুরুষ এসে দাঁড়াবেন ষোড়শী তনুতে—তা-ই পূর্ণতা। (ক্রমশঃ)

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

জুলাই ১, ১৯৫৩

প্রশ্ন : মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"মানব সত্তা থাকে স্থূলদেহের মধ্যে এক নিরাপদ আশ্রয়ে : দেহই তাকে নানা বিপদ থেকে বাঁচায়। কিন্তু কেউ কেউ এই দেহটার উপর খুবই নারাজ, তারা ভাবে যে মৃত্যুর পরে দেহের বন্ধন থেকে ছাড়া পেলে মুক্ত থেকে খুব বুঝি সুবিধা হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহই দুর্গের মতো হয়ে তোমাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ ওর আশ্রয়ে রয়েছ ততক্ষণ বিরোধী শক্তিরা সহজে তোমার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারেনা।...কিন্তু যেমনি এ রাজ্য ছেড়ে ওদের রাজ্যে চলে যাও অমনি সেখানকার সেই সব সত্তা চারিদিক থেকে তোমাকে ঘিরে ধরে তোমার যথাসর্বস্ব কেড়েকুড়ে নেয়, যেন হিঁড়ে খাবার মতো ভালো শিকার জুটেছে। যদি তোমার মধ্যে তাদের প্রতিরোধ করবার মতো তেমন আলো আর শক্তি না থাকে, তখন দেহাশ্রয় থেকে রিক্ত হয়ে তোমার এমন অবস্থা হয় যেন পরুষ শীতে তোমার গায়ে কোনো জামা নেই, নগ্ন হয়ে কাঁপছ, কোনো ঘরবাড়ি নেই যেখানে ঢুকে আশ্রয় নিতে পারো, গায়ে এমন কি, চামড়াটুকুও না থাকায় স্নায়ুশিরাগুলো বেরিয়ে পড়ে হি হি করছে। অনেকে বলে 'এই দেহ রেখে কি সুখ আছে, ভাবে যে মৃত্যু হলেই নিষ্কৃতি মিলবে' কিন্তু মৃত্যুর পরেও সেই প্রাণের রাজ্যেরই খপ্পরে গিয়ে পড়বে, সেখানকার যে সব শক্তিরা জীবনকালে যন্ত্রণা দিয়েছিল তারাই সেখানেও তোমার বিপদের কারণ হবে।...এখানে এই পৃথিবীতে এই দেহের মধ্যে থেকেই তোমার জ্ঞানসঞ্চয় করা চাই আর শক্তিকে পুরোপুরি আয়ত্ত করা চাই। তাই করতে পারলেই তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদে যে-কোনো জগতেই স্বচ্ছন্দে যোয়াফেরা করতে পারবে।"

(অল্পবয়স্ক শ্রোতা) মৃত্যুর পরে সবাই কি প্রাণের রাজ্যে যায়, যারা ভালো কাজ করে তারা তো স্বর্গরাজ্যে চলে যায়?

উত্তর কোথায় তোমার সেই স্বর্গরাজ্য? কে তোমাকে এ কথা শিখিয়েছে? বলেছে বুঝি তোমাকে স্বর্গের আর নরকের আর অগ্নিকুণ্ডের কথা?...না? ও সব নয়? তবে স্বর্গের ধারণা কোথায় পেয়েছে? কোন বই থেকে?

প্রশ্ন : আমি শুনেছি তাই।

উত্তর : কিন্তু কার কাছে শুনলে?

প্রশ্ন : তা এখন মনে নেই।

উত্তর : এ সব কথা ধর্মাজকেরা বলে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে যাতে তারা সেই লোভে পুণ্যকাজ করে। এ কথা সকলেই জানে যে ভালো লোকদের জীবন যে মন্দ লোকদের চেয়ে সুখের হয় তা নয়, বরং উল্টোটা হবারই হয়; যারা মন্দ হয় তারাই বরং জিতে যায়। তাই দেখে যাদের আধ্যাত্মিক মতিগতি নেই তারা বলে, "ভালো হয়ে কি লাভ আছে? তার চেয়ে মন্দ হতে পারলে সুখে থাকব।" তাদের এ কথা বোঝানো কঠিন যে ভালো অনেক রকমেরই আছে, আর ভালো হবার জন্যে যে কষ্ট করা হয় তারও কিছু দাম আছে। তাই যারা অল্পবুদ্ধির লোক তাদের মনকে বোঝাবার জন্যে বলতে হয়: "সহজ কথা শোনো, যদি তুমি সুবোধ ও নিঃস্বার্থ হয়ে কেবল ভালো কাজ নিয়েই থাকো, যেমন বলছি তেমনি ভাবে ধর্মপালন করো, তাহলে মরবার পরে ভগবান তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। আর যদি তুমি কখনো ভালো কখনো মন্দ ইচ্ছাতে চলো, পরের দিকে না চেয়ে স্বার্থপর হয়ে কেবল নিজের কথাই ভাবো, তাহলে শোধনের জন্যে তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে বা অন্য কোনো নরকে যেতে হবে। আর যদি তুমি পুরোপুরি মন্দ হয়ে কেবল যত দুষ্কৃতির কাজ আর পরের অনিষ্ট করতে থাকো, বিশেষত আমাদের ধর্মশিক্ষা যদি না মানো, তাহলে তোমার ভাগ্যে চিরন্তনের জন্য নরকবাস।"

এ একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা—এই চিরন্তন নরক। অর্থাৎ একবার যদি নরকে গিয়ে পড়লে তো চিরকালই সেখানে রয়ে গেলে। চিরন্তন মানে জানো তো? চিরদিন সেখানে পীড়ন চলতে থাকবে আর পুড়তে থাকবে (গরম দেশ হলে অগ্নি দাহ, আর ঠাণ্ডা দেশ হলে বরফকল)। এমন চমৎকার ধারণা কে যেখানে জানি না কিন্তু এ-সমস্তই ঐসকল ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা, যাতে লোকে ভালো হয়ে সংযত হয়ে থাকে।

কিন্তু ও ছাড়া আবার অন্যরকম শিক্ষাও রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মমতে বিভিন্ন রকম কথা বলে। এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়ে স্বর্গের কথা বলা হয়, সে এমন আশ্চর্য স্থান যেখানে কেবল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দই পুরোমাত্রায় বিরাজিত...কিন্তু সে কেমন স্বর্গ তা নির্ভর করবে তুমি যে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত তারই উপর। কারণ কোনো ধর্মের স্বর্গ এমন যেখানে কেবল ভগবানেরই গুণগান করেই সময় কাটে, আর কিছুই করবার নেই—যদিও তা অবশেষে একঘেয়ে হয়ে পড়বে কিন্তু তবু সেখানে অমনি সঙ্গীতাদিই চলবে। আবার কোনো ধর্মের স্বর্গ এমন যেখানে মিলবে কেবলই সুখ, আর সেই সব সুখ যা তুমি জীবনকালে কামনা করেছিল। তা ছাড়া অন্য রকমের স্বর্গও আছে যেখানে গিয়ে তুমি আনন্দপূর্ণ ধ্যানেই মগ্ন হয়ে থাকবে, যদিও ধ্যানের দিকে যাদের তেমন টান নেই তাদের পক্ষে একটু মুশকিল হবে। যাই হোক, মোটের উপর স্বর্গ নির্ভর করছে তোমার ধর্মের উপরে; কত রকমের স্বর্গের উদ্ভাবনা করা হয়েছে যাতে লোকে ধর্মের প্রতি অনুগত থেকে তার নির্দেশগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে।

মানুষের কল্পনাশক্তি এমনই সৃষ্টিসুখর ও গঠনকুশলী যে ঐ সব স্বর্গের মতো স্থান এখানেও আছে, আবার অমন নরকের মতো স্থানও আছে। মানুষ যা মনে ভাবে তা বাস্তবেও রূপায়িত করে। তোমার চেতনা বিশুদ্ধ হলে তুমি সে সব জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, নতুবা সারা জীবনের ভুল বিশ্বাস নিয়ে সেখানেই আবদ্ধ থেকে যাবে। তুমি বলবে যে তাও তো জীবনই, কিন্তু সে বাস্তার জীবন, খুবই সংকীর্ণ। যারা ভাবে ঐরকম, তাদের কাছেই তা বাস্তব। অন্যরূপ ভাবলে তা হতে পারেনা, ওর থেকে বেরিয়ে আসা যায়। অন্য কাউকে টেনেও আনা যায়, তখন সে দেখে যে নিজের গড়া মোহের মধ্যেই সে আবদ্ধ হয়েছিল।

মানুষের সৃষ্টিশক্তি অসাধারণ। নিজেরই প্রতিবিম্ব থেকে সে এমন সব দেবতার রূপ দিয়েছে যাদের মধ্যে মানুষের মতোই মানুষের দোষগুণ সবই আছে, কেবল তা খুব বড়ো রকমের মাপে, সকল কাজ করবার জন্যে তাদের তেমনি বৃহত্তর রকমের শক্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের অস্তিত্ব যদিও আপেক্ষিক, তবু তা স্বাধীন অস্তিত্ব, যেমন ধরো তোমার স্বাধীন চিন্তা। কোনো চিন্তাকে যদি তুমি সুস্পষ্ট ও জোরালো রকমের গঠন দাও তখন সে তোমার থেকে বেরিয়ে একটা স্বাধীন সত্তার মতো কাজ করতে থাকে, যে কাজের জন্যে সে তৈরী হয়েছে। তখন সে আর তোমার অধীনে না থেকে নিজেই তার কাজগুলো করে, সুতরাং এ বিষয়ে তোমার সতর্ক হওয়া চাই। সেই চিন্তা যখন বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে তার কাজ করছে, তখন হয়তো তুমি দেখলে যে অমন চিন্তা করাটা তোমার ঠিক হয়নি, ওর ফল মঙ্গলজনক হচ্ছেনা কিন্তু তখন সে তোমার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। তার জন্য যথেষ্ট ওঘাশক্তির দরকার। সে তার কাজ করবেই...মনে করো খুবই প্রচণ্ড রাগের বশে তুমি বললে (এমন যে তোমরা করো তা নয়, তবু মনে করো) বলে বসলে "ওঃ, ঐ লোকটার কি মারাত্মক অপঘাত কিছু হয় না!" চিন্তাটি যেমনি বেরিয়ে গেল, তার উপর আর তোমার কোনো হাত নেই, আর কিছুকাল পরে দেখলে যে তার সত্যই অমন মারাত্মক কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু তোমার সমুচিত জ্ঞানের অভাবে তুমি বুঝলে না যে তুমিই তার জন্য দায়ী। এই হয়।

আবার তেমনি চিন্তা-গঠনের শক্তির বিশেষ উপকারিতাও আছে, যদি তার সদ্ব্যবহার করতে জানো। মঙ্গল করবার চিন্তাও গড়া যায়, তাও ঐভাবে কাজ করবে। নিজের ঘরে বসেই তুমি অনেকের ভালো করতে পারো, হয়তো বাহ্য সাহায্যের চেয়েও তাতে ভালো কাজ হবে। যদি তেমন শক্তি ও সদিচ্ছা ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তুমি তেমন চিন্তাকে গঠন দাও, যেমন মনে করো তুমি কাউকে ভালোবাসো আর মন প্রাণ ও হৃদয়ের আন্তরিক ইচ্ছা দিয়ে তার মঙ্গল চাইতে থাকো, তাহলে নিশ্চয় তার মঙ্গল হবে, এমন কি যতটা তুমি ভাবতে পারো তার চেয়েও বেশি হবে। এটা আমি প্রায়ই বলি এখানে যারা থাকে তাদের দেশের বাড়িতে কারো কঠিন অসুখ হয়েছে খবর পেয়েই তারা তখনই সেখানে

ছুটে যেতে চায়। আমি তাদের বলি যে নিতান্ত অস্বাভাবিক যদি কিছু না হয় বা সেখানে যদি তাকে সেবা করবার কেউ না থাকে (এবং থাকলেও), তাহলে সেখানে ছুটে না গিয়ে যদি দূর থেকেই শুদ্ধ মনোভাব নিয়ে পরম আগ্রহে ঐকান্তিকভাবে তার মঙ্গল কামনা করতে থাকো, যদি এটা জানো যে আন্তরিক প্রার্থনার দ্বারা কেমন ক'রে জোরালো শুভ ইচ্ছাকে গড়ে তোলা যায়,—তাহলে তার কাছে গিয়ে সেবা করে পথ্যাদি যাইয়ে যতটা সাহায্য তুমি করতে পারতে তার চেয়ে এতে অনেক বেশি কাজ হবে। সেবাযত্ন তো যে-কেউ যে-কাউকে করতে পারে। কিন্তু সকলে পারেনা এমনি জোরালো মঙ্গল চিন্তাকে পাঠিয়ে আরো ভালোরকম ভাবে আরোগ্যের কাজ করতে।

যাক এবার আমরা আমাদের স্বর্গের কথাতে ফিরে আসি ওটা একটা ছেলেমানুষী রকমের ধারণা অথবা মতলব নাফিক বিকৃতগঠন—কথাটার মধ্যে সত্য থাকলেও অনেকটারো একেবারেই নয়।...যে কথা তোমাদের বহু বহু বার বলেছি সেই কথা এখনো কি আবারো বলতে হবে যে মানুষ কেউই একটা আগাগোড়া অখণ্ড জিনিস হয়ে গড়া নয়। আমাদের সত্তার মধ্যে অনেক আলাদা আলাদা অংশ আছে এবং তার প্রত্যেকটারই স্বতন্ত্র রকমের জীবনক্রিয়া আছে। সবগুলিতে মিলেমিশে একটাই দেহের মধ্যে স্থান নিয়ে থাকে আর যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ সেই দেহের মাধ্যমেই তারা ক্রিয়া করে। সেই জন্যই মনে হয় যে সেই একজনই সব কিছু করছে। কিন্তু সেই একজনের মধ্যে রয়েছে অনেক বিভিন্ন সত্তা বিশেষত তাদের ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের; তোমার মধ্যে রয়েছে আলাদা আলাদা প্রাণসত্তা মনঃসত্তা, দেহসত্তা, এবং এর মধ্যবর্তী আরো অনেক সত্তা। ব্যাপারটা কিছু জটিল বটে, হয়তো বা বুঝতেও পারো। মনে করো তুমি কেবল কামনা ও প্রবৃত্তির বশেই জীবনযাপন করছ, সেখানে তোমার প্রাণসত্তাই পেয়েছে সব চেয়ে প্রাধান্য; কিন্তু তার বদলে যদি তুমি আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে ঝোঁক দাও, সকলের যাতে ভালো হয় সেই ভাব নিয়ে নিজে নিঃস্বার্থ হয়ে কেবল মঙ্গল ইচ্ছা নিয়েই জীবনে অগ্রসর হতে থাকো, সেখানে তাহলে তোমার চৈত্যসত্তাই সব চেয়ে প্রাধান্য পাবে। শেষে তোমার দেহত্যাগের সময় সত্তাগুলি পৃথক হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেবল যদি তুমি একজন পাকা যোগী হও তাহলে সেটা হবেনা, তোমার দিব্যকেন্দ্রকে ঘিরে সেগুলিকে তুমি ধরে রাখতে পারবে। নতুবা মৃত্যুকালে সত্তাগুলি ছাড়া পেয়ে যে যার রাজ্যে ফিরে যাবে। তোমার প্রাণসত্তার প্রাধান্য থাকলে তার বেলাতে এই হবে যে তার বিভিন্ন কামনাগুলি ছাড়া পেয়ে স্বাধীনভাবে ছুটবে তাদের সার্থকতার দিকে, কারণ তখন আর তাদের ধরে রাখার মতো দেহটা নেই। আর তা না হয়ে যদি তোমার চৈত্যসত্তারই প্রাধান্য থেকে থাকে, তাহলে মৃত্যুকালে তার সেইরূপ চেতনা নিয়েই সে ফিরে যাবে চৈত্যের রাজ্যে, যা হলো মঙ্গল, শান্তি, আনন্দ, নিরুদ্বেগ ও জ্ঞানদীপ্তির রাজ্য। সেই রাজ্যকে যদি তুমি স্বর্গ বলো তাহলে তা ঠিক কথাই বলা হলো; কারণ চৈত্যের সঙ্গে যতটা তুমি একাত্মভাবে ছিলে ততটাই তুমি তার সঙ্গে এক হয়ে

থাকলে, যার চৈত্য হলো অমর সত্তা, তাই তুমি তার সঙ্গে অমৃতের রাজ্যে পরমানন্দে বাস করবে। তাকে স্বর্গ বলতে যদি চাও তাই বলো। মোট কথা এখানে যদি তুমি ভালো থেকে চৈত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তারই প্রাধান্য নিয়ে অবস্থান করো তাহলে মৃত্যুর পরে তারই রাজ্যে গিয়ে পরমানন্দে থাকবে।

কিন্তু তুমি যদি তোমার প্রাণসত্তার আবেগময় আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সার্থক করা নিয়েই জীবন কাটাও...যেমন মনে করো কোনো কৃপণ ব্যক্তি তার টাকার চিন্তা নিয়েই সারা জীবন কাটালে, তাহলে মৃত্যুর পরে তার প্রাণসত্তার সেই অংশটা সেখানেই আঁকড়ে থেকে তাকে আগলাবে, যেন তার টাকা অন্য কেউ না নেয়। সে অদৃশ্য হলেও সেখানেই রয়ে গেল, তার এত যত্নের অর্থ নষ্ট হতে দেখলে সে দুঃখভোগ করতে থাকল। এক মহিলাকে আমি জানতাম, তার ছিল কিছু সঞ্চিত অর্থ আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে; তারা পাঁচজনেই ছিল অমিতব্যয়ী, একজন না খরচ করত অন্যজন করত তার চেয়ে আরো বেশি। মহিলা যত যত্নে সঞ্চয় করেছিল ছেলেমেয়েরা ততই দরাজভাবে তা উড়িয়ে দিতে থাকল, কারণে অথবা বিনা কারণে। মৃত্যুর পরে সেই মহিলা এসেছিল আমার কাছে, অনেক দুঃখ ক'রে বললে "দেখ দেখ, ওরা আমার টাকাগুলোকে কেমন ক'রে ওড়াচ্ছে!" দেখলাম যে মহিলা খুবই অসুখী। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে অনেক কষ্টে বোঝাই যে টাকার দিকে আর মন দিওনা, তাহলে অপব্যয় হবেনা।

এখন, তুমি যদি তোমার দেহচেতনাকে নিয়েই থাকো (তা থাকা কঠিন, কারণ চিন্তা আর অনুভবগুলো তো থাকবেই) তাহলে দেহসত্তা চলে গেলে তুমিও চলে যাবে, সেই দিকটা নিঃশেষ হয়ে যাবে।...কিন্তু দেহেরও একটা চেতনাধারা আছে, মৃত্যুর পরেও সে সাত আট দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। ডাক্তারেরা যদিও বলে গেল যে তোমার মৃত্যু হয়েছে, তবু তোমার চেতনাধারা রইল বেঁচে, কেবল বেঁচে নয় কিন্তু প্রায়ই পুরোপুরি চেতন অবস্থায়। সাত আট দিন পরে তার বিলোপ হবে। অবশ্য যোগীদের কথা নয়, আমি বলছি সাধারণ মানুষের কথা। যোগীদের সম্বন্ধে কিছু আইন নেই, তাদের জগৎ স্বতন্ত্র। যারা সাধারণ মানুষ সাধারণ জীবন নিয়ে থাকে তাদের বেলা ঐ রকমই হয়।

এ কথার তাৎপর্য এই যে তোমার চেতনাকে যদি বাঁচাতে চাও তাহলে তোমার সত্তার সেই অংশের বিষয়েই সর্বদা একাগ্র থাকবে যে অংশ অমর; নতুবা অগ্নিশিখার মতো নিভে গিয়ে তুমি বাতাসে মিলিয়ে যাবে। এটা তোমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা, কারণ এমন না হলে উপরের দেবতারা ও উচ্চস্তরের মানুষরা তাদের বাঁধা কল্পনার দ্বারা যে সব স্বর্গ নরকের সৃষ্টি করে রেখেছে তারই মধ্যে তোমাকে আবদ্ধ করে ফেলত, তাদের খুশি করা অথবা অখুশি করা অনুযায়ী স্বর্গে কিংবা নরকে। তা খুবই কঠিন অবস্থা হতো; কিন্তু ভাগ্য ভালো যে তা হবেনা।

প্রশ্ন : মৃত্যুর একজন দেবতা আছেন শুনেছি। সে কথা কি সত্য?

উত্তর : হাঁ। তাকে আমি বলি মৃত্যুসত্তা। বিলক্ষণ চিনি তাকে। তার প্রতিষ্ঠান খুবই সুপরিচালিত সুশৃঙ্খল রকমের। তার যে কেমন নিখুঁত ব্যবস্থা তা জানানো।

আর আমার মনে হয় যে মৃত্যুসত্তা বিস্তর আছে, প্রায় শত শত। তাদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, একজন ফ্রান্সে আর একজন জাপানে, তাদের চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম: তাতেই মনে হয় যে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিশ্বাস অনুযায়ী হয়তো তারাও তদনুরূপ হয়ে থাকে। তেমনি আবার প্রকৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তিরও ভিন্ন ভিন্ন সত্তা আছে যেমন আছে অগ্নির আলাদা, বায়ুর আলাদা, জলের আলাদা, ঝড়-বৃষ্টির আলাদা মৃত্যুরও তাই।

মৃত্যুসত্তারা যেন দৈনিক কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যার মৃত্যুর জন্য দাবি নিয়ে আসে। সে এক বিচিত্র রকমের ব্যবস্থা যেন এখানকার প্রাণশক্তিদের ও প্রাকৃতিক শক্তিদের সঙ্গে একটা কিছু রফা করা আছে। যেমন, কোনো মৃত্যুসত্তা স্থির করলে "আজ এতগুলি লোকের মৃত্যু আমার চাই"। হয়তো একাধিক জন বা চার পাঁচ জন, যেদিন যেমন। যার মৃত্যু সে চায় এমন কোনো মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে গিয়ে সে তখন বসে। তুমি যদি সে কথা জানতে পারো (সে নিজে নয়) আর যদি এমন হয় যে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হওয়া তুমি চাওনা, তাহলে তোমার যেমন গুহ্যশক্তির জোর থাকলে তুমি তাকে বাধা দিয়ে বলতে পারো, "না, ওকে নিতে পাবেনা।" এমন অনেকবারই হয়েছে, একবার নয়, জাপানে এবং এখানে। কিন্তু সে একই রকম সত্তা নয়। তাতেই বলছি যে তারা অনেক আছে। আমি তাদের বলি

—ঐ লোকটির মৃত্যু আমি চাইছিনা, তুমি সরে পড়ো।

—কিন্তু একটা মৃত্যুতে যে আজ আমার অধিকার রয়েছে।

—এখান থেকে যাও, অন্য কোথাও খুঁজে নাও।

এমন ঘটনা অনেক হয়েছে এর ফলে কখনো বা একজনের বদলে অন্য কোনো প্রতিবেশী হঠাৎ মারা গেছে, কখনো বা কোনো পরিচিত ব্যক্তি কখনো বা কোনো শত্রু। অর্থাৎ ভালো মন্দ কোনো একটা সম্পর্ক বা প্রতিবেশিত্ব থাকে (বা অন্য কিছু) কিন্তু দেখায় যেন হঠাতের মতো। কিন্তু সে তার আপন প্রাপ্যটি নিয়ে গেছে। একটি মৃত্যুর দাবি থাকলে কেবল একটিই নেবে। তুমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারো, "একে নিতে পাবেনা" বলে, কিন্তু ফিরে যেতে বাধ্য হলেও সে তার পাওনা ছাড়বেনা। তাই অন্য কোথাও একটা মৃত্যু হবে।

আগুনের সম্পর্কেও তাই। আগুনের সত্তাকেও আমি দেখেছি, বিশেষত জাপানে। সেখানে আগুন লাগা একটা বিপর্যয় কাণ্ড, একটা কোথাও আগুন লাগলে সেই পাড়াতে

পাশাপাশি প্রায় আশিটা বাড়ি একসঙ্গে পুড়ে যাবে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বাড়িগুলি সব কাঠের তৈরি বলে দেশলাই কাঠির মতো সব পুড়ে যায়। একটা কোথাও আগুন লেগেছে তো ব্যস্, হয়ে গেল। একটা দেশলাইয়ের বাক্স হঠাৎ কেমন ক'রে জ্বলে ওঠে তা দেখেছ কি? ঠিক তেমনি ব্যাপার। আমার চোখের সামনে দেখতে দেখতে একটা থেকে দুটো, তিনটে, দশটা, কুড়িটা বাড়ি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। আগুনেরও ঐরকম সত্তা আছে। একদিন শুয়ে আছি আমার বিছানাতে। এক মনে বাইরের লোক দেখছি। হঠাৎ দেখি কালো ধোঁয়া নিয়ে আগুন ছুটে আসছে বাড়িটার দিকে। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম ওর মধ্যে চেতন সত্তা রয়েছে। তাকে বললাম:

—এখানে কেন আসছ?

—এখানে আগুন জ্বালাব, আমার অধিকার আছে।

—হতে পারে, কিন্তু এখানে তা চলবে না, সরে যাও।

সে আমার কথা অগ্রাহ্য করতে পারলে না।

এরূপ স্থলে কার জোর বেশি তাই নিয়ে কথা। আমি বললাম, "এখানে আগুন লাগানো হবেনা, কিছুতেই না!" পাঁচ মিনিট বাদে "হা: হা!" করে একটা চিৎকার শুনলাম। এখানকার দুটো তিনটে বাড়িকে বাদ দিয়ে একটু দূরের বাড়িতে আগুন লাগল। আমার কথাতে আমার বাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু একটা বাড়ি তার চাইই।

প্রশ্ন মরবার আগে কেউ কেউ টের পায় যে মৃত্যু আসছে। তারা তখন সেই মৃত্যুসত্তাকে অমনি করে চলে যেতে বলেনা কেন?

উত্তর ও! তা সেটা নির্ভর করে যে যেমন ব্যক্তি তার উপরে। দুটো জিনিস এখানে থাকা দরকার। প্রথমত, তোমার সত্তার ভিতরকার একটু কোনো অংশও যেন মৃত্যুকে না চায়। তেমন প্রায়ই কিন্তু হয় না। ভিতরে থাকেই এমন কোনো একটা হার-মানা অংশ। জীবনে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, বিরক্ত, সংগ্রামকাতর হয়ে সেই অংশটা হতাশভাবে বলতে থাকে "যথেষ্ট হয়ে গেছে, আর পারছি না, এবার শেষ হয়ে যাক।" সেখানে মৃত্যু এসেই যাবে।

এটা কিন্তু যথার্থ কথা তোমার ভিতরকার কোনো অংশই যদি মরতে রাজী না থাকে তাহলে তুমি তখন মরবে না। যে মরছে সে নিশ্চয় এক সেকেণ্ড বা তার শতাংশের এক ভাগ মাত্র সময়ের জন্যও নিশ্চয় সম্মতি দিয়েছে তবেই সে মরছে। তা না দিলে সে মরে না।

এমন লোকের কথা জানি যাদের দেহ ও প্রাণের অবস্থা অনুসারে নিয়মমত ভাবে মারা যাবারই কথা, কিন্তু তারা নিজেরা তাতে একটুও সম্মতি দেয়নি। তারা বলেছে,

"না, আমি মরতে চাই না," তাতেই তারা বেঁচে গেছে। আবার অনেকে যাদের মোটেই মরবার কথা নয়, তাদের প্রকৃতি হেরে যাবার মতো হওয়াতে যখন বলেছে, "আর না, এবার শেষ হয়ে যাক, তাই ভালো," তারা তখন শেষই হয়ে গেছে। ঐটুকু বললেই যথেষ্ট হয়, বেশি বলার দরকার নেই ; সর্বক্ষণ ইচ্ছা করাও দরকার নেই, শুধু একবার বললেই হলো, "বাঁচার পালা যথেষ্টই হয়েছে, আর না," তাতেই কাজ হয়ে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে। এমনই হয়। আর তুমি যে কথা বললে, শয্যাপার্শ্বে যখন মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে তখন যদি তাকে জোর দিয়ে বলা হয়, "তুমি চলে যাও, তোমাকে আমি চাইনা, তাহলে বাধ্য হয়ে সে চলে যাবে। কিন্তু সাধারণত লোকে এলে দিয়েই থাকে, কারণ তাকে আটকাতে হলে রীতিমত লড়তে পারা চাই, শক্তি হওয়া চাই, সাহসী ও সহ্যশীল হওয়া চাই, আপন জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আস্থা থাকা চাই যেমন কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জানে যে তার এখনও কিছু করণীয় রয়েছে আর সে কাজ তাকে করতেই হবে। কিন্তু এমন ক'জন মানুষ আছে যার মধ্যে পরাজয়ের ভাব কিছুমাত্র নেই, যে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে না, "যা হবার হোক?"...অথচ সেটাই দরকার, একমনা হয়ে শক্ত থাকা।

আর সব জিনিসের বেলাই তাই। যে পথই আমরা ধরি, যে-কোন বিষয়েই লেখাপড়া শিখি, তার বেলাতেও এই কথা, প্রত্যেকেরই আপন দিব্য কেন্দ্রের অভিমুখে একমনা হওয়া চাই ; তবেই সে আপন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলে নিজের উপর ও নিজের নিয়তির উপর প্রভুত্ব করতে পারে। নতুবা স্রোতে ভাসা শোলার মতো হলে অদৃশ্য শক্তিরা তাকে এদিক ওদিক ক'রে ছিনিমিনি খেলে। যেখানে যেতে চাইছেনা সেখানেও তাকে যেতে হয়, যা করতে চাইছে না তাও তাকে করতে হয়, শেষে গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে আর সেখান থেকে ওঠবার কোনো শক্তি থাকে না। কিন্তু চেতনভাবে নিজেকে ঠিকভাবে গুছিয়ে নিয়ে একমনা হয়ে আপন দিব্য কেন্দ্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে পারো, তাহলে তুমিই হবে তোমার নিয়তির মালিক। এরূপ চেষ্টার যথেষ্ট দাম আছে।...তাই আমি বলি যে দাস হয়ে থাকার চেয়ে প্রভু হওয়াই ভালো। যদি দেখ যে কেউ তোমাকে দড়িতে বেঁধে যা করতে চাওনা তাই তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে তবে সেটা খুবই অস্বস্তির কথা আর খুবই অসহ্য জিনিস, —কিন্তু যদি এমন হয় যে কে তোমাকে দড়ি বেঁধে টানছে তা দেখতে পাচ্ছনা অথচ তার টানে বাধ্য হয়ে তোমাকে কিছু করে যেতে হচ্ছে—তাহলে তা নিতান্তই অসহ্য। আমি জানিনা কেমন করে হয়েছিল, কিন্তু খুব ছেলেবেলাতেই আমার একবার এমনি অসহ্য লেগে-ছিল। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে এমনি অসহ্য হয়ে ওঠাতে আমি ভাবলাম কেমন করে তা এড়ানো যাবে, এমন হবে যাতে কেউ কিছু আমাকে না বলতে পারে। তখন তো এমন কেউই ছিলনা যে সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারে, এখন যেমন তোমাদের সুবিধা

রয়েছে তখন তেমন ছিল না যে কেউ আমাকে বলে দেবে "এমন এমন করো, তাহলে ভালো হবে!" আমাকে তেমন বলবার মতো কেউ ছিলনা। আমাকে তাই নিজে নিজেই রাস্তা খুঁজে নিতে হয়েছে। সেই পাঁচ বছর বয়স থেকেই আপন রাস্তা চিনে কাজ শুরু করেছি। আর তোমাদের পাঁচ বছর তো কবেই পার হয়ে গেছে...

*

জুলাই ১৫, ১৯৫৩

প্রশ্ন : মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"কেউ নাকি বলেছে যে যোগের দরজা যেমনি তুমি খুলবে অমনি অগণ্য বাধাবিঘ্ন এসে তোমাকে ছেঁকে ধরবে...কিন্তু তা যে একটা অনিবার্য নিয়ম এমন নয়, তা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপরে। বিরুদ্ধ অবস্থা অনেকের বেলাতেই আসে তাদের প্রকৃতিতে কোথায় দুর্বলতা আছে তারই পরীক্ষা হিসাবে। যোগের যেটি অপরিহার্য ভিত্তি তা হলো সমচিত্ততা, এ পথে ঋজুভাবে চলতে গেলে এই ভাবটিকে সুপ্রতিষ্ঠ করা চাই। সেদিক থেকে দেখলে সকল রকমের বাধাবিঘ্নই পরীক্ষা, তাকে তোমায় অতিক্রম করতে হবে। আর তোমার মনের মধ্যে যে সব মনগড়া সীমারেখা টানা আছে যা উপরের আলো ও সত্যের দিকে তোমার অবাধ উন্মীলন হতে চিচ্ছে না, তাকে ভেঙে দেবার জন্যও ঐ সব পরীক্ষাগুলির দরকার।"

কিন্তু যখন আমরা একটা সুনিশ্চিত আশ্বাস নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের পথে প্রবেশ করেছি, তখন কি বিরোধী শক্তিরা আমাদের আক্রমণ করতে থাকবে?

উত্তর : সকলকেই, বিনা ব্যতিক্রমে।

প্রশ্ন : কিন্তু আপাতত তাদের তো বেশ মনোরম দেখায়?

উত্তর : কখনো কখনো তাই বটে। আবার কখনো কখনো অতি ভয়ংকর।

প্রশ্ন কেমন করে তা ধরতে পারা যাবে?

উত্তর : হাঁ, সব চেয়ে সোজা উপায় হলো, তোমার কেউ গুরু থাকলে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা। এটা সকলেরই আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। গুরুর উপর পুরোপুরি আস্থা থাকা চাই, তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা তাঁকে বলা চাই। তিনি ঠিক ঠিক কথাই বলে দেবেন, কারণ তিনি তা জানেন।

আর তোমার যদি কেউ গুরু না থাকে তাহলে ব্যাপারটা কিছু জটিল হয়, কারণ ঐ সব শক্তিরা খুবই চতুর ; তারা দুর্বৃত্ত বা উৎপীড়ক বা অনিষ্টকারীর চেহারা নিয়ে আসেনা, যাতে তুমি সহজেই ধরে ফেলে তাদের খপ্পরে না পড়তে পারো ; তাই তারা আসে বন্ধুর ভেক ধরে। তুমি যদি রীতিমত ঐকান্তিক থাকো তাহলে সামান্য কিছু কিছু লক্ষণ তুমি পেয়ে যাবে, এমন কিছু ইসারা পাবে যাতে মনে হবে তোমার আত্মগর্বকে উস্কানি দিচ্ছে, কিংবা কি করা উচিত বা অনুচিত সে বিষয়ে সন্দেহ আসবে, কিংবা তাই নিয়ে অচেতনের ভাব আসবে,—এমনি একটা কিছু দেখতে পাবে। খুবই ঐকান্তিক থাকলে তুমি তাদের ভিতর পর্যন্ত দেখে ফেলবে ; সতর্ক থাকলে তাদের কোনো প্রশংসাতে বা প্রলোভনে ভুলে যে আত্মশ্লাঘার দিকে তোমাকে টানছে সেদিকে মোটে ঘেঁসবে না। তোমার আত্মগর্বকে কোনো কিছু উৎসাহিত করছে সেটাই তো অন্যান্য লক্ষণ ; যা কিছুর দ্বারাই তোমার মনের মধ্যে এমন চিন্তা আসে : "মোটের উপর আমি লোকটা মন্দ নই। যা কিছুই করি তা ভালোই ক'রে থাকি। যে কাজ করছি সে বিষয়ে আমার বেশ পটুত্ব আছে। অন্তত আমার ঐকান্তিকতাতে কোনো খুঁত নেই," ইত্যাদি— এতে উত্তরোত্তর আত্মশ্লাঘা বাড়তে বাড়তে নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে ওঠো। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই আবার এমন আকার নেয়না, ব্যক্তি অনুসারে আরো অনেক রকম হয়। কারো বেলা ঐরকম ; আবার কারো বেলা এমন ধারণা আসে "এইরকম ভাবে চালিয়ে যেতে পারলে আমি কালে একজন মস্ত যোগী হবো, অনেক রকম শক্তির অধিকারী হবো। ভালো ভালো অনেক কিছু কাজ করব। এমনই সুন্দরভাবে ভগবানের সেবায় লেগে যাব যাতে নিশ্চয় তিনি খুব খুশি হয়ে উঠবেন!" এমন ভাব আসা খুবই বিপজ্জনক। আবার এর উল্টো রকমের ভাবও আসে "আমি বোধহয় নিতান্তই অপদার্থ। এত সব চেষ্টা করলেও কি আমার কিছু হবে? আমার বেলাতে এর কিছুই ফল হবে না। আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে কি আমি উপযুক্ত? কিছুই হয়তো হবেনা আমার দ্বারা। একটা অসম্ভব রকম স্বপ্নের লোভে সম্ভব রকমের সব কিছুই তো ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমি তো আসলে একটা তুচ্ছ বালুকণা মাত্র। এমন লোক হয়ে ভগবানকে খুঁজতে যাবার কি কোনো মান আছে? শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না, সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।" এ ভাব আরো বেশি বিপজ্জনক। এমন আরো শত শত দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

কেবল একমাত্র জিনিস যা তোমাকে ওর থেকে রক্ষা করতে পারে তা হলো তোমার চৈত্যসত্তার সঙ্গে সংস্পর্শে আসা, এমন কি তা অতি সামান্য মাত্র হলেও। তাহলে এর দ্বারা বা ওর দ্বারা যাই কেন আসুক তাকে চৈত্যের সামনে ধরে দেখতে পারবে যে তা ভালো কি মন্দ জিনিস। এমন কি যেখানে তুমি নিজেই খুশি হয়ে

মনে মনে বলছ "এবার আমি ঠিক বন্ধুই পেয়ে গেছি যেমন দরকার। কিংবা আমার জীবনে একটা সৌভাগ্য এসে গেছে" ইত্যাদি, সেটিকেও তুমি তোমার সামান্যমাত্র চৈতন্যের কাছে নিয়ে দেখবে যে তাতে তার মধ্যে কোনো ঔজ্জ্বল্য আসছে না যথুশির অস্বস্তি জাগছে, যদিও তেমন জোরালো প্রতিবাদ নয় তবু অল্প কিছু অস্বস্তি। তখনই তুমি বুঝে নেবে যে যেমন তুমি ভেবেছিলে তেমন কিছু তা নয়। হাঁ, ঐ সামান্য ইঙ্গিতের দিকেই লক্ষ্য রাখবে। তাকেই যদি সত্য বলে ধরে নাও তাহলে আর কোনো কিছুই তোমাকে দুঃখ দিতে পারবে না।

ঐকান্তিক আস্পৃহা নিয়ে যদি তুমি আধ্যাত্মিক জীবনের পথে আসো, তাতে হয়তো কখনো কখনো বিস্তর অপ্রীতিকর ব্যাপার পাহাড় পর্বতের মতো তোমার ঘাড়ে এসে পড়বে : প্রিয়তম বন্ধুর সাথে মনোমালিন্য, বাড়ির লোকের কাছে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হওয়া, যা কিছু সম্পদ পেয়েছিলে তা খোয়া যাওয়া ইত্যাদি...একজনের কথা বলি, সে প্রকৃত জ্ঞানলাভের চেষ্টায় আর যোগ শিক্ষা নিতে নানাস্থানে ঘুরে শেষে পুরো আস্পৃহা নিয়ে ভারতে এলো। এ বলছি অনেক কাল আগের কথা, যখন লোকে চেনে বাঁধা পকেট-ঘড়ি ব্যবহার করত, চেনের সঙ্গে ঝুলতো সৌখিন কিছু লকেট প্রভৃতি। এই লোকটির ছিল ছোটো একটি সোনার পেনসিল, সেটি তার ঠাকুমার উপহার, তাই মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সেটিকে সে চেনের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিল। জাহাজ থেকে যখন সে বন্দরে নামছে—পণ্ডিচেরী বা কলম্বোতে—বোধকরি কলম্বোই হবে, সেখানে জাহাজ থেকে প্রথমে নৌকোতে নামতে হয়, নৌকো থেকে তীরে এসে নামে। জাহাজের গ্যাংওয়ে থেকে একটু লাফ দিয়ে নামতে হয় নৌকোতে। তেমনি লাফ দিতে গিয়ে একটু পা হড়কে যাওয়াতে যেমনি সে টাল সামলাতে গেল অমনি সেই সোনার পেনসিলটি চেন থেকে খসে সমুদ্রের অগাধ জলের মধ্যে তলিয়ে গেল। প্রথমে সে এতে মনে খুবই একটা ধাক্কা পেলে, তার পরে কিন্তু সে নিজেকে এই বলে বোঝালে "আমি এখন ভাবতে এসেছি, তাই এটা হলো আমার আসক্তি যা ছিল তা এমনি করে ঘুচিয়ে দিলে।"...যারা ঐকান্তিক হয় তাদের সকল রকমের ক্ষতিতেই এমনি মনোভাব আসে। আর ঐকান্তিক ব্যক্তিদের উপরেই যত কিছু বিপত্তির বোঝা এসে পড়ে। যারা তা হয়না তাদের জন্যে আসে যত কিছু ঝল্‌মল্ করা সুন্দর সুন্দর জিনিস তাদের ছলনা করতে, আর তারাও তাই চায় এবং শেষ পর্যন্ত ঠকে। যখন দেখবে যে কারো ভাগ্যে প্রবল রকমের বিপত্তি এসে জুটছে, তখন জানবে যে তার মধ্যে ঐকান্তিকতা এসে গেছে।

প্রশ্ন এখানে আপনি এ কথাও বলেছেন : "ভগবানের কাছে যদি যেতে চাও তাহলে তোমার মনের যা কিছু ধারণা সবই ত্যাগ করতে হবে ; কিন্তু তার বদলে তোমরা চাও নিজেদের মনের ধারণাকে ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে, তিনি তাই মেনে নিন।"

উত্তর হাঁ, প্রত্যেকেই চায় তাই, সর্বদাই। তুমি ভগবানকে যেমনভাবে বুঝে রেখেছ তেমন যদি তিনি না হন তাহলে তিনি ভগবানই হলেননা। তুমি যেমন চাও

তা যদি তিনি না করেন, যেমন তুমি আশা করছ তা যদি তিনি পূরণ না করেন, যেমন চরিত্র তাঁকে দিতে চাও তেমন যদি তিনি না হন, তাহলে তিনি আর ভগবান হলেননা "আমি ভগবান বলে তোমাকে মানব যদি তুমি তেমনটি করো যেমনটি আমি চাই!" অবশ্য এই কথাগুলিই ঠিক কেউ স্পষ্ট করে বলেনা, কিন্তু ভাবটা হয় এইরকমই। এর দৃষ্টান্ত কেবল শত শত নয়, লক্ষ লক্ষ দিতে পারি। তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে নিজের অজ্ঞাতে এইরকমই কিছু চাইবেনা। এমনিই নিয়ম, তুমি বলবে "হাঁ, ভগবানকে আমি নিশ্চয়ই মানব এবং তাঁর উপস্থিতিকে ও ক্রিয়াকলাপকে অনুসরণ করে তাঁরই ইচ্ছার পূরণ করব, কিন্তু তা এই শর্তে যে তিনি এমনি বা তেমনি রকম ভাববেন আর এই ধরণের কাজগুলো করবেন," ইত্যাদি। এবার প্রথম দৃষ্টান্ত পেলেই তোমাদের তা দেখিয়ে দেবো দড়িতে ঝুলিয়ে। তাতে ভুল হবেনা, দৃষ্টান্ত অল্পদিনের মধ্যেই মিলে যাবে।

প্রশ্ন : মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"অর্থশক্তি এখন রয়েছে প্রাণময় সত্তাদের ও শক্তিদের কবলে বা তাদেরই প্রভাবের মধ্যে। সেই প্রভাবের জন্যই সত্যের কাজে অধিক অর্থ আসা কখনই তোমরা দেখতে পাওনা। অধিকাংশ অর্থই চলে যায় অন্য দিকে, কারণ বিরুদ্ধ শক্তির কবলে থাকায় তাই দিয়েই তারা প্রধানত পৃথিবীকে ধরে রেখেছে আপন মুঠোর মধ্যে। তাদের দখল এতই আটঘাট বাঁধা যে তার নিয়েট ব্যূহ ভেদ করে ভেতর থেকে কিছু বের করে আনা খুবই দুঃসাধ্য। বর্তমান অর্থাধিকারীদের হাত থেকে অল্প কিছুও বের করে আনতে চাইলে তার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়।"

বর্তমান জগতের আধিক অবস্থা কেমন? এখনও কি অর্থের উপর ঐ সব সত্তাদের প্রভুত্ব খুব বেশি?

উত্তর : হাঁ, এখনও তাইই চলছে। আগের চেয়ে ভালো কিছু হয়নি। আর যে শর্তের কথা আগে বলেছিলাম তারও এখনও পূরণ হয়নি (না কিছুকাল পূর্বে বলেছিলেন যে ব্যক্তিগত যৌন-প্রবৃত্তি শমিত হলেই অর্থের উপর প্রভুত্ব হাতে আসবে)। তাহলে কেমন করে তার প্রত্যাশা করতে পারো। আজই সকালে আমি অনুযোগ করছিলাম (অর্থাৎ আমার কথা বোঝাবার জন্য বলছিলাম) আমরা যা করতে চাইছি তার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার—অল্প হবেনা—তার পরে নিজেই বললাম যে অর্থের তো কোনো অভাব নেই, জগতে যথেষ্টই অর্থ রয়েছে। এমন কি অনেকের এত বেশি আছে যা তা নিয়ে কি করবে তাই ভেবে পায়না। কিন্তু ভগবৎ কাজে দেবার কথা একবারও তাদের মনে জাগেনা।...কি করবে তা যে জানেনা এমন কথা তারা বলতে পারেনা, কারণ জানবার ইচ্ছা থাকলে অনায়াসেই তা জানা যায়। এই ভাবটা যদি মনে আসে: "আমি আমার অর্থের সদ্ব্যবহার চাই," (তার মানে অমুক ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যেমন ভাবে মনে করছে তা নয়), তাহলে নিশ্চয়ই তার পথ

সে পেয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণত (সামান্য ব্যতিক্রম বাদে) যার অর্থ আছে তার একটা শর্ত থাকে, তাতে তার নিজের যেন কিছু সন্তোষ মেলে। ঐ গুণটি সেখানে থাকা চাই—তারা দেবে, কিন্তু দিয়ে নিজেরা কিছু পাবে। যারা ব্যবসাদার নয় কারণ তারা কিছু লাভের আশাতেই দেয়, কিন্তু যারা মানবহিতৈষী হয়ে মানুষের সাহায্য করতে চায়, তারাও অল্পবিস্তর চেতনভাবে (প্রায়ই পুরো চেতনভাবে) কামনা করে যে তাতে তাদের খ্যাতি বাড়ুক, কিছু আত্মপরিতৃপ্তি হোক। তারা টাকা দেয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে, সে তাদের নামে হবে। কোথাও মন্দির গড়তে টাকা দেয়, সেখানে লেখা থাকবে যে অমুক ব্যক্তি এত দিয়েছে, ইত্যাদি। একসময় যখন আমি গোলকণ্ডে বাড়িটি (আশ্রমের অতিথি সৌধ) গড়ে তুলেছিলাম তখন অনেকে আমার কাছে এসেছিল আর লোকও পাঠিয়েছিল, তারা এসে বললে "আমি এত টাকা দিচ্ছি, কিন্তু একটা কোনো ঘরে মার্বল ফলকে যেন লেখা থাকে যে অমুকের দানে এই গৃহ নির্মিত।" আমি বললাম "তা হবেনা। মার্বল ফলক দিতে রাজী আছি কিন্তু তাই দিয়ে নীচেকার নেঝে গাঁথা হবে।" এই হয়েছিল ব্যাপার।

অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে, যেমন সব নিয়মেই থাকে : তবে অর্থ যে আপনাআপনি মন্তভাবে বিনা প্রচেষ্টায় কোনো বাস্তবিক প্রয়োজনীয় কাজের দিকে চলে যাবে, এমন কথা বলতে পারি না। না, তা হয়না। বরং সেখানেই দেওয়া হয় যেখানে ফলটা স্থূলভাবে বোঝা যাবে (অর্থাৎ যা সহজবোধ্য)। যেমন, কোনো হাসপাতাল স্থাপনা, শিশুপালনের প্রতিষ্ঠান। এই সব ভালো কাজের কথা লোকে সহজেই বোঝে। কিন্তু যদি বলা হয় যে আমরা চাইছি মানব চেতনার একটা পরিবর্তন আনতে, আমরা চাই যাতে নব জগতের সৃষ্টি হয়, তাহলেই ওঃ! অমনি তারা বলবে "রক্ষা করো! ভগবানের কথা আর বোলো-না, তিনি যদি তেমনই কিছু চান তাহলে নিজেই তার ব্যবস্থা করবেন, ওতে আমাদের সাহায্যের দরকার হবেনা।" আর তোমাদের মধ্যেই না কতজন আছে যারা এমন ধারণা থেকে মুক্ত (বা ঐরূপ ভাব থেকে).—যে ভগবান যখন সর্বশক্তিমান তখন তিনি নিজেই তো যা খুশি তাই করতে পারেন।

এই হলো প্রথম যুক্তি, এই হলো থিওরি। ভগবান সর্বশক্তিমান, যা খুশি তাই করতে পারেন। অন্য কারো সাহায্য তাঁর দরকার নেই। কিন্তু এই ধারণাটিকেই অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাও, তাহলে দেখবে যে বাস্তবিক যদি তাই হয়, তিনি জগতে যা খুশি তাই করতে পারেন, তাহলে বিশ্বের মাঝে তিনি তো সব চেয়ে বড়ো রকমের দানব হলেন! কারণ যিনি সর্বশক্তি নিয়ে এমনই একটা জগৎ গড়লেন আর লোকের এত সব দুঃখ দুর্গতি হচ্ছে দেখে হাসিমুখে বলেন যে যা হচ্ছে তা ঠিকই হচ্ছে, তাহলে আমি তো তাঁকে দানবই বলব। আমার পাঁচ বছর বয়সেই আমি এমন কথা ভেবেছি। তখনই বলেছি "তা সম্ভব নয়,

যে কথা শেখানো হচ্ছে তা ঠিক নয়!" এখন কিন্তু তোমাদের অনেকটা দার্শনিক মনোভাব এসেছে, এখন তোমাদের বলতে পারি এ প্রশ্নের কি মীমাংসা। প্রথমেই বোঝো যে ওটা নিতান্ত ছেলেমানুষী ধারণা। আমি সহজ বুদ্ধির দিক থেকেই বলছি। তোমরা ভগবানকে একজন ব্যক্তি বলে ধরে নাও, কারণ তাতেই তাঁকে ভালো করে বোঝা যায়। সেই ব্যক্তি এত বড়ো একটা জায়গা গড়লেন (পৃথিবী তো খুবই বড়ো, বুঝতে কষ্ট হবে, এর চেয়ে ছোটো জায়গা ধরে নাও) আর তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে ইচ্ছামত একে দাঁড় করালেন। তার ফলে কি হয়েছে—এর মধ্যে রয়েছে যত অজ্ঞানতা, মূঢ়তা, অশুভ ইচ্ছা, ভয়, ঈর্ষা, গর্ব, দুষ্কৃতি, ব্যথা পীড়া, দুঃখ কষ্ট, নানারকম যন্ত্রণা, আরো অনেক কিছু; এখানে বাস করছে এমন সব মানুষ যারা দিনের মধ্যে হয়তো মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্যই কিছু সুখের মুখ দেখে, আর বাকী সমস্ত সময় কাটায় মৃতের মতো অসাড় থেকে,—আর একেই বলবে ভগবানের সৃষ্টি!...আমি তো বলব এ নরকের মতো ব্যাপার। আর তিনি ভেবেচিন্তেই এটা নাকি করেছেন, আর শুধু তাই নয়, ছয়দিন খেটে সপ্তম দিনে নিজের কাজ দেখে বলেন, "বাঃ, খাসা হয়েছে" এই বলে সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিতে বসেন, অনেক ধর্মপুস্তকের মতে।...কখনই এমন নয়, আমি তাকে ভগবান বলবনা। অথবা আনাতোল ফ্রাঁসের মতো বলব যে তিনি তাহলে একজন আধানতলবী ভয়ংকর প্রাণী।

কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসার একটি সোজা রাস্তা আছে (একটি ছেলেকে) তুমি কি জানো সেই রাস্তা? হাঁ, নিশ্চয়ই জানো! দেখতেই পাচ্ছ যে এই সব ধারণা ও কল্পনা কেবল একটা ভুল থেকেই হয়েছে—একজনকে বলছ তিনি ঈশ্বর, আর একটা জগৎকে বলছ তাঁর সৃষ্টি, অতএব দুটো আলাদা জিনিস, একটা গড়েছে অন্যটাকে, আর সেই অন্যটা প্রথমটির অতি সুবাধা হয়ে যেমন গড়তে চেয়েছে তেমনি গড়ে উঠেছে। এইখানেই মস্ত ভুল রয়ে গেছে। খুব গভীরভাবে ভেবে দেখ তাহলেই বুঝবে যে যাকে বলছ ঈশ্বর আর যাকে বলছ সৃষ্টি এ দুইএর মধ্যে আসলে কিন্তু অমন প্রভেদ কিছু নেই; যখন মন থেকে বলতে পারো যে "দুইই এক" আর যদি এই কথাটা বোঝো যে সেই ঈশ্বর কিংবা ভগবান (ও একটা শব্দমাত্র) তিনিই পাচ্ছেন দুঃখ যখন তুমি পাচ্ছ দুঃখ, তুমি যেটা জানছ না সেটা তিনিও জানছেন না; এই অপূর্ণ সৃষ্টির ভিতর দিয়ে অল্পে অল্পে, ধাপে ধাপে তিনিই নিজেকে খুঁজে বের করছেন, নিজের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে আনতে চাইছেন, স্বৈরাচারীর মতো খেয়ালের বসে কিছু করা নয়, এ একটা ক্রমবিকাশমান চেতনা যা নিজের কাছেই নিজেকে উত্তরোত্তর পূর্ণভাবে বিকাশ করতে প্রয়াস করছে...অর্থাৎ আর কিছু নয় কেবল সমষ্টিগতভাবে অধিকতর সার্থকতার দিকে এগিয়ে যেতে এ একটা সামগ্রিক ক্রিয়া, একটা জ্ঞানময়-চেতনার ক্রমিক আত্মোপলব্ধি, যাতে সমগ্রভাবে ঐক্য এসে আবার সেই প্রথম দিকের চেতনাতে সব কিছুর পুনর্বিকাশ হয়—

তাহলে সমস্ত সমস্যাটাই বদ্‌লে যায়।

কেবল এ কথা বুঝতে পারা কিছু কঠিন, এ বিষয়ে একটু মনের উন্নতি করা চাই। ছোটো ছোটো ছেলেদের মতো হাঁটু গেড়ে বসে জোড়হাত ক'রে বলা "প্রার্থনা করি হে ভগবান, আমাকে ভালো ছেলে করো, আমার মাকে যেন কোনো দুঃখ না দিই"।...এ তো খুবই সোজা কাজ, আর আমি যে একে মন্দ বলছি তাও নয়। এ ভালোই জিনিস। কেবল সকল ছেলেমেয়েদের কাছে এটা চলেনা, তারা বলবে: "আমাকে ভালো ক'রে দাও এ কথা বলতেই বা যাবো কেন? আমার না বলাতেই তুমি করবে, নইলে তুমি আর কী ভালো?" যারা সরল হৃদয় হওয়াতে কোনো কিছুই ভাবে না তাদের পক্ষে ভালো কথা, কিন্তু যারা ভাবে তাদের বেলাতেই গোলমাল বাধে। কিন্তু কেউ যদি এমন শেখায়, বাতি জেলে হাঁটু গেড়ে না বসে নিজের হৃদয়ের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে বলো "তুমি এই করো, আজ যা আমি জানিনা কাল যেন তা জানতে পারি, আজ যা করতে পারিনা কাল যেন তা করতে পারি, আর দিনে দিনে তা যেন নিয়ে যায় আরো সুন্দর সত্য ও বৃহত্তের দিকে।" তখন আরো অগ্রসর হয়ে যদি জগতের দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয়, কোনো কাতর বন্ধু বা পীড়িত আত্মীয় বা অন্য কিছু বিপত্তি তোমার চোখে পড়ে, তখন প্রার্থনা করবে যে জগতের নেপথ্য চেতনা যেন পূর্ণতায় অভিব্যক্ত হয়, যে অজ্ঞানতা জগৎকে এমন অসুখী করেছে তা যেন দীপ্ত জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, সকল অশুভ ইচ্ছা তার দ্বারা শুভেচ্ছায় রূপান্তরিত হয়। এমনি প্রার্থনা করবে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে—কার কাছে প্রার্থনা?—সে তাঁরই কাছে যে জানে, যে তা পারে, যে তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান, সেই পারবে তোমার প্রার্থনার পূরণ করতে। আর তা কতই সুন্দর!

শোনো তোমরা, আরো পাঁচ বছর পরে আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে তোমাদের আমি শেখাবো। পাঁচ বছর সময় দিলাম তোমাদের প্রস্তুত হবার জন্য এখন সামান্যই কিছু বললাম, আলো কেমন জিনিস তা বোঝাতে একটা মোমবাতি জেলে দেখাবার মতো। কিন্তু আমি চাই যে সাধারণ জিনিস ছাড়া অন্য কিছু বোঝাতে যেন বারে বারে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে না হয়। যেমন এই বইতে বলা হয়েছে সন্ন্যাস জীবন আর আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে ভুল বুঝে লোকে কতখানি গণ্ডগোল করে, তেমনি তোমাদের বোঝাবো যে তোমরা যাকে ভগবান বলো আর আমি যাকে ডিভাইন (Divine) বলি তার মধ্যে কতখানি ভুল ধারণা রয়েছে। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

এখন রাত্রি হলো ৯টা ২০—এবার বন্ধ হোক।

এর পরে বলব স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা সম্বন্ধে, আর যারা রোগের নিগড়ে সর্বদা বাঁধা হয়ে আছে, কিছুতে সে নিগড় ছাড়তে চায়না, তাদের আমি অবাক ক'রে দেবো। সেই শিকল কাটার কাঁচি তাদের হাতে দিয়ে দেবো। —শ্রীমা

প্রসঙ্গত

আগষ্ট ২২, ১৯৬৮

মায়ের সাম্প্রতিক অগ্নিপরীক্ষাতে
দৈহিক অসুস্থতা সম্বন্ধে না লিখলেন—

ডাক্তার আমাকে নিষেধ করেছে যেন দেহকে ক্লান্ত না করি। কিন্তু ক্লান্তি আসে কিসে? যা কিছু নিষ্প্রয়োজন কেবল তারই যারা।

যারা ঐকান্তিক, যাদের সাক্ষাৎ দিলে তাদের ভালো হয়, এতে ক্লান্তি আসে না।

কিন্তু যারা আসে তাদের মত ও কাজ সম্বন্ধে ওজন যাচাই করতে, বুদ্ধির জোরে নিজেদের খুব বড়ো ভেবে যারা মনে করে যে সত্য মিথ্যার বিচার করতে তারা খুব দক্ষ, যারা বিচার করে যে কোন রকমের শিক্ষা দেওয়া ভালো, কোন কাজগুলি পরাৎপর সত্তার পক্ষে সহায়ক, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষ্প্রয়োজন, তাতেই আসে ক্লান্তি।

এই সব বড়ো বড়ো বুদ্ধিমানেরা নিজেদের বুদ্ধির পথে হাজার বছর চলুক, যারা সরল বুদ্ধির মানুষ ভগবৎ কৃপাতে বিশ্বাসী তাদের চলতে দিক তাদের আপন আলোর পথে।

—শ্রীমা

পথের কথা

আগষ্ট ২৮, ১৯৬৮

মা হাঁ গো আমার ছেলে, এর মধ্যে কৌতূহলের ব্যাপার আছে। সবই আমি লিখে রেখেছি। একত্রে পড়া যাবে। এখনও শেষ হয়নি, কবে হবে জানিনা। আর কোনো খবর আছে?

সাধক : না না। ১৫ আগষ্টের আগে এক রাত্রে কিছু দেখেছিলাম ১১ আগষ্ট সম্পর্কে। শ্বেত ফেনপুঞ্জে পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড এক ঢেউ অতি আশ্চর্য, একটা মস্ত অট্টালিকার চেয়েও বেশি লম্বা। আর সেই ঢেউয়ের ঠেলাতে চলে আসছে এক প্রকাণ্ড নৌকো, আগাগোড়া নিশ কালো, সমস্ত পাথরগুলোকে উৎরে চলে যাচ্ছে কিন্তু তার ধাক্কা খেয়েও ভাঙছে না। আরো একটা নৌকো ছিল হাল্কা পাঁশুটে রঙের, সেটা ছুটছিল আরো বেগে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য ঐ সাদা ফেনায় ভরা ঢেউ।

মা ওখানকার অনেক কিছুই এমন চমকপ্রদ।...চোকোশ্লোভেকিয়াতে কি হচ্ছে তার খবর রাখো? একটা কিছু হচ্ছে সেখানে। কালো নৌকোর কথাই বললে?

সাধক : হাঁ, মস্ত বড়ো নৌকো সেটা। যার আশ্চর্যের কথা এই যে মারাত্মক সব পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে যাচ্ছে অথচ ভেঙে চুরমার হচ্ছে না।

মা নিশ্চয় একটা কিছু ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে।...তবে কতকাল যে লাগবে পুরোপুরি সফল হয়ে বাহ্যদৃষ্টিতে জমাটভাবে দেখা দিতে? তা বলতে পারিনা।

আরম্ভ হয়েছে নিশ্চয় কিছু।...তাই ঠিক, নতুন রকমের একটা জাতি বেরিয়ে আসছে, নতুন রকম একটা সৃষ্টি, কিছু সৃষ্টি তো বটেই।

আমার পক্ষে সবই উঠল উগ্র হয়ে।...একটি কথাও বলা গেল না। কিছু বলতে গেলেই কেবল কাশি আর কাশি, বেজায় কাশি। দেখলাম যে আমার কথা বলাই বন্ধ। সেই ভাবে থেকেই আমি ক্রিয়ার বৃত্তাংশকে বেড়ে যেতে দিলাম। তখন বুঝলাম। শেষ প্রান্তে আমরা আসিনি কিন্তু...(কি যে বলি।) রয়েছি অন্যপ্রান্তে।

একসময় সবই উঠল উগ্রতর হয়ে...সাধারণত আমি ধৈর্য হারাইনা, কিন্তু এমন অবস্থায় পড়ে গেলাম যাতে সত্তার শক্তির সব কিছুই যেন ব্যর্থ হয়ে গেল। কেবল কথা বলাই বন্ধ নয়, নাথার অবস্থা এমন হলো যা আমার জীবনে কখনো হয়নি। অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক তো বটেই। কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা, কানে শুনতে পাচ্ছিনা। এর পরে একদিন যা হলো (সে অনুভূতির কথা পরে বলছি)...দারুণ কষ্ট আর

ব্যথা সর্বত্রই লেগে রয়েছে; কিন্তু দেহটা আপনা হতেই জোর ক'রে বললে: "আমার কাছে সবই সমান কথা, আমি নয় পেতেও রাজী কিংবা বেঁচে থাকতেও রাজী, কিন্তু এমনতরো অবস্থা অসহ্য—এভাবে চলতে পারে না, বাঁচি অথবা মরেই যাই, কিন্তু এগুলো চাইনা।" তখন থেকে যেন ভালোর দিকে ফিরল। আস্তে আস্তে সব কিছু যথাস্থানে ফিরে এলো।

আমি লিখে রেখেছি সবই, তার দাম নেই বিশেষ কিছু, কিন্তু তার কিছু কিছু কাজে লাগতে পারে (মা তাঁর নোটগুলি টেবিলে খুঁজলেন) দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু আমি সেগুলো।

প্রথম নোটের তারিখ ২২ আগষ্ট—

"কয়েক ঘন্টা ধরে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর দেখছি, সবই চমৎকার সঙ্গতিপূর্ণ।"

আর সেই সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখলাম মস্ত মস্ত মন্দির, তার মধ্যে রয়েছেন জীবন্ত দেবতারা। প্রত্যেকটির অর্থ নির্দিষ্ট, লক্ষ্য নির্দিষ্ট, চেতনার বিকাশ বিভিন্নরূপ কিন্তু তা মনের দিক থেকে নয়।

নিত্য দেখছি ঐ সব দর্শন।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
মস্ত মস্ত বৃহৎ অট্টালিকা।
অনেক রকম শহর।

বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপার সমস্ত দৃশ্যভূমি জুড়ে, দেহচেতনার বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবি।

বিস্তর বাড়িঘর নিয়ে বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠছে...

২৩ তারিখে ছিল অনুকের জন্মদিন...ডেকেছিলাম তাকে, সে কাছে বসল। হঠাৎ আমার মাথাটা উঠল সক্রিয় হয়ে—কিন্তু "মস্তিষ্ক"ও নয় "চিন্তা"ও নয় (মা হাত ঘুরিয়ে দেখালেন তরঙ্গ ওঠার ভঙ্গীতে) কি করে বোঝাই; চিন্তা নয়, কেবল দর্শন ও বোধ মাত্র। তখন তাকে যা প্রশ্ন করেছিলাম সে তা লিখে নিয়েছিল (মা একটি টাইপকরা কাগজ দিলেন সাধকের হাতে) এর মধ্যে কেবল প্রশ্নগুলোই আছে, উত্তর নেই।

"২৩শে আগষ্ট বিকেলে মায়ের প্রশ্ন—

ওরা কি জানে বস্তুর সৃষ্টি কেমন ক'রে হয়েছে?"

এ প্রশ্নটি উঠেছিল দেহের দিক থেকে, আমি জানিনা, সম্ভবত ঐ ক-এর (একজন বিজ্ঞানী) উপস্থিতিতে তারই আবহাওয়ার সংস্পর্শ পেয়ে দেহ তাই জানতে চেয়েছিল। আর ক—উপস্থিত ছিল সেখানে, আমি জানতাম সে জবাব দিতে পারে, তাই তাকেই ঐ প্রশ্ন করলাম।

"ওরা কি জানে বস্তুর সৃষ্টি কেমন ভাবে হলো?

যদি বলো শক্তি ঘনীভূত হয়ে এমন হয়েছে, তাহলে ঐ প্রশ্নেই ফিরে আসা হয়। আসল প্রশ্ন : পরাৎপর চেতনা কেনভাবে জড় রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করলেন?"

দেখতেই পাচ্ছ এ সব কথা কত গুরুতর, কতদূর ব্যাপক ও উচ্চ সমস্যার জিনিস...

কিন্তু আমি বলেছিলাম যেন ছেলেমানুষিভাবে সাধারণ ভাষাতে (মা হাসলেন)

"ওরা কি জানে পৃথিবী রয়েছে কখন থেকে?

যদি বলো কোটি কোটি বছর আছে, তার মানে কি হবে?"

ওদের তখন কোনো ঘড়ি ছিলনা নিশ্চয়ই তা জানো। দেহটাই বলেছে অমন ছেলেমানুষের মতো কথা কোটি কোটি বছর, কিসের দ্বারা তা মাপা হয়েছে?

"ওরা কি নিশ্চত করে জানে যে আমরা যাকে একটা বছর বলে থাকি তা সুনির্দিষ্ট একটাই সময়?...এরই মধ্যে আমি দেখেছি যে সময়ের সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা কত অবাস্তব। কখনো দেখেছি যে একটা মিনিট যেন কিছুতে ফুরোতে চাইছেনা ; আবার কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা বা গোটা দিনটাই কেটে গেছে অথচ এতখানি সময় চলে গেছে বলে মনেই হয়নি।

ওরা কি বলতে পারে যে একটা আরম্ভ ছিল?"

(এখানে ক—সেই তরুণটি মাকে বোঝালেন যাতে বিশ্ব চলেছে উত্তরোত্তর প্রসারণ ও সংকোচনের ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, শুনে মা খুশি হলেন)

হাঁ, ওরই নাম প্রলয়।

"কিন্তু তখন দেহই প্রশ্নগুলি করেছে, মন ছেড়ে চলে গেছে। দেহ ও দেহের কোষগুলি চাইছে মূল সত্তার সংস্পর্শ, মন প্রাণের ভিতর দিয়ে নয়। তাই হচ্ছিল।

ঐ সময়ে দুই তিনবার আমি প্রজ্ঞার স্পর্শ পেয়েছি।"

হাঁ, সেই মুহূর্তগুলি বড়ই চমৎকার ও অনবদ্য—ব্যাখ্যার অতীত, অবর্ণনীয়।

"কিন্তু যেমনি ঐ অনুভূতির কথা জানা গেল..."

অনুভূতির কথা যেমনি জ্ঞানে জানা হলো, অমনি তা ধোঁয়াটে হয়ে গেল।

সাধক : হাঁ, মন তাই নিয়ে কিছু গড়তে গেলেই তার সারবস্তুটা লোপ পাবে আগামী নবজাতির মধ্যে।

মা হাঁ, তাই হবে।

(নোটের লেখা) "যেমনি তুমি ঐ অনুভূতিতে স্মৃতির ছাপে ধরে নিতে যাও অমনি তা মিথ্যা হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যেও তাই হয়। একটু কিছু জ্ঞানের সন্ধান পেলেই তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সাধারণ মানব চেতনার মাপে তাদের মনের বোধগম্য করে দিতে চায়।

(কিছুক্ষণ থেমে) ওরা কি জানে মানুষের অস্তিত্ব কখন থেকে ?

মানুষ তৈরি হয়ে আসতে যত সময় লেগেছে, অতিমানবের আসবার বেলাতে তার চেয়ে কম সময় লাগবে, কিন্তু তা এখনই হয়ে যাবার নয়।"

ঐ ২৩ তারিখে আমি তখন ছিলাম তালগোল পাকানো শিশুর মতো তখন নিজেকেই বলেছি এ অবস্থা হতে অস্তিত্বের কর্মক্ষম অবস্থায় ফিরে যেতে অনেক সময় লাগবে। আমি তাকে সেই কথাই বলেছিলাম।

সাধক কিন্তু এই নোটে শেষকালে আপনি বলেছেন
"আমাদের যতটা করা সম্ভব ছিল তা করেছি।"

মা হাঁ, তাই বলেছিলাম তাকে সান্ত্বনা দিতে।
তারপর সে রাত্রে হলো এই ব্যাপার (মা নিজের লেখা খাতা নোট দিলেন)

"২৬ বা ২৭ তারিখের রাত্রি

প্রবল অতিমানস শক্তি দীর্ঘক্ষণ যাবৎ প্রবেশ করলে দেহে, সর্বত্র এককালে"

দেহের মধ্যে ঐরূপ অনুপ্রবেশ, হাঁ, তরঙ্গের মতো ঢুকে আসা, এ তো অনেকবারই হয়েছে, কিন্তু সেই রাত্রে (অর্থাৎ গত রাত্রির আগের রাত্রে) তা হঠাৎ এসে গেল যেখানে তারই যাবতীয় প্রস্তুত রয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু নেই। আমার দেহও তারই মধ্যে। সে চারিপাশ থেকে, সকল দিক থেকে একসঙ্গেই ঢুকে পড়বার জন্য চাপ দিচ্ছে। শুধু শক্তিরই তরঙ্গ নয়, তার সঙ্গে আসছে সমগ্র আবহাওয়াটাই। তিন চার ঘন্টা পর্যন্ত এই ভাবে চলল। কেবল একটা অংশে ততটা তা হলোনা, এই এখান থেকে এখানে (গলা থেকে মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত) এইখানটুকু রয়ে গেল নিষ্প্রভ, অদীপ্ত, যেন শক্তিতরঙ্গ সেখানে কখই ঢুকতে পেরেছে।...কিন্তু এটুকু ছাড়া সর্বত্রই ঢুকছে, কেবল ঢুকে আসছে। এমনতরো হতে আর কখনো দেখিনি। ঘন্টার পর ঘন্টা তাই চলল, সম্পূর্ণ চেতনভাবে।

যতক্ষণ তা এলো আর যতক্ষণ রইল ততক্ষণ আমি সর্বদা চেতনই ছিলাম : "বুঝেছি, এমন হচ্ছে এই কারণে ; হে প্রভু, আমাকে দিয়ে তুমি এই কাজ করাতে চাও, তাতেই এমন হচ্ছে, এইরকমই তুমি চেয়েছ।" সেই সময়ে বোধ হচ্ছিল যে এবার একটা কিছু হবে।

পরের রাত্রেও এমনি আশা করেছিলাম, কিন্তু তা আর হলোনা।

ওই প্রথম। কয়েক ঘন্টা যাবৎ। ও ছাড়া কিছুই না। আর দেহটা তখন যেন পাথরের মতো।

কেবল মাথাটা ছিল ধোঁয়া ধোঁয়া, বোধ মতন হয়ে। কিন্তু দৃষ্টি ছিল খুবই সজাগ, কয়েক মাস ধরে দেহের যা হয়েছে সবই সে দেখেছে...আর কেবল আশা করেছে। কেউ যেন আশা দিয়ে শোনাচ্ছে যে এবার এখানে কিছু হবে। এই পর্যন্ত।

দেহ যা বলেছিল দুই তিন দিন আগে এ যেন তারই জবাব, তোমাকে গোড়াতেই যা বললাম : যে দেহটা ভেঙে যেতেও প্রস্তুত আছে (পূর্ণ সমর্পণের ভাবে) আবার বেঁচেও থাকতে প্রস্তুত, যে ভাবে যাই কেন হোক, কিন্তু এমন পচতে থাকার অবস্থা নয়। দুদিন পর্যন্ত সে কথার জবাব পাইনি, তার পর এলো ঐ অপুপ্রবেশের পালা। পরের দিন থেকেই আমি ভালো বোধ করলাম, দাঁড়াতে সক্ষম হলাম...এর আগে দাঁড়াতেই পারছিলাম না !...ভারলামা কিছু ছিলনা, আমায় কাউকে ধরতে হতো, এক পাও নড়া যেতোনা। এরই বিরুদ্ধে ছিল আমার নালিশ। পরের দিন থেকে সবই ফিরে আসতে শুরু করল।

তারপর ২৩ তারিখে দেখলাম ক-কে...সামনে তাকে দেখে দেহ কৌতূহলী হলো, কিন্তু মনও নয় প্রাণও নয়, ওগুলি তখন ছেড়ে গেছে ! যা বলছি তা বুঝতে পারলে কিনা জানিনা।

সাধক হাঁ, খুবই আশ্চর্যের কথা।

মা মন প্রাণকে বাদ দেওয়া দেহটা। ক যখন এসেছে তখন এর সেই অবস্থা। ছিল কেবল দর্শনবোধ (শহর, ঘরবাড়ি, মন্দির) একটা আত্মিক অবস্থাতে ; অন্য কিছুরও আত্মিক অবস্থা আছে, পৃথিবীর আত্মিক অবস্থা। তাই রূপ নিচ্ছে যত প্রতিচ্ছবিতে। আশ্চর্যের কথা তো বটেই, নয় এমন বলবনা কিন্তু বাস্তব জীবনের তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই যা আছে খুবই সামান্য আমি তখন কথা বলতে অক্ষম, কিছু খেতেও পারিনা...কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি এমন কিছু যা সর্বদা চলতে থাকে।

আর তার পরে সংস্পর্শ ঘটল ক-এর সঙ্গে...দেহ আপনা হতেই কৌতূহলী হয়ে তাকে প্রশ্ন করতে থাকল, কেন তা সে জানে না। কেবল সেই প্রশ্ন "কেমন ভাবে এমন হয়েছে, আমি এমন হয়েছি... এইই প্রশ্ন।

যখন পরক্ষণ ঘটল সেই শক্তির অনুপ্রবেশ, আমি তখন বললাম, "আহ্।" আশা করলাম যে বৃত্তাংশটা এবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে, আর আমি শীঘ্রই বেরিয়ে আসব, কিন্তু এ রাত্রে কিছুই হলোনা। তাতেই বলছি যে আরো সময় নেবে।

সাধক কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আপনার ২৬ থেকে ২৭ তারিখের নোটে লেখা রয়েছে :

"সমগ্র দেহ যেন ঐ সর্বানুপ্রবিষ্ট শক্তির দ্বারা ওতপ্রোত হচ্ছে কিন্তু ঘর্ষণ সমেত..."

অথচ তারপর আপনি বলছেন :

"মাথা থেকে গলা পর্যন্ত গ্রহিষ্ণুতা খুবই কম ছিল।"

তাই আশ্চর্য হচ্ছি যে সর্বত্র সমানভাবে ঢুকে ঐখানটুকুতে কেন কম হলো।

মা : সেজন্য নয়, ঐ অংশটাই মনের বিশেষ রাজত্ব। মনই সেখানে বাধা এনে দেয়।

সাধক : তাই তো আশ্চর্যের কথা, আপনার মধ্যে এমনি যখন মহাযুহূর্ত এসে পড়ে, আর প্রত্যেকবারই এমনি কঠিন আঘাত পান, তখন মন ও প্রাণ তো কোথায় চলে যায়। প্রথম বারেও তাই হয়েছিল, ১৯৬২ সালে।

মা : হাঁ, প্রত্যেক বারেই এমনি।

আমি জানি তাই হয় মন ও প্রাণ এক রকমের যন্ত্র...জড়বস্তুকে পিষে রাখা—সব রকমে নিষ্পেষিত করাই তার কাজ ; প্রাণ করে সংবেদনাদির দ্বারা আর মন করে চিন্তাদির দ্বারা—কেবল পেষণ। কিন্তু আমার মনে হয় তা সাময়িক অবস্থানী যন্ত্র, এর জায়গাতে আসবে অন্যরূপ নতুন চেতনার অবস্থা।

বুঝতেই তো পারো, এ হচ্ছে বিশ্ব উন্নতির মধ্যবর্তী একটা পর্যায়, এর পরে... এইসব যন্ত্র অকেজো হয়ে আসবে।

পরে স্পষ্ট অনুভূতি পেলাম যে মন প্রাণের দ্বারা পিষে রাখা জড়দেহটা কি জিনিস যখন ওগুলো আর রইল না...সে এক স্বতন্ত্র জিনিস।

কিন্তু ঐ যে "আধিক অবস্থার বোধ," তার মধ্যে যা দেখলাম তা...চমকপ্রদ। কোনো মানসিক বোধ নয়, তাতে মনন হতে পারেনা। ঐ কয়েক মুহূর্তের ভিতর দিয়ে যা দেখলাম, কোনো মানুষের দেখা বা অনুভবের সঙ্গে তার তুলনা হয়না। সেই মুহূর্তগুলি...অতি অতি আশ্চর্য। কিন্তু চিন্তা বিন্দুমাত্র নেই, চিন্তার স্থানই নেই।

সাধক আরো অনেক নোট আছে, আপনাকে পড়ে শোনাই নি। আপনি বলেছেন

"অধিকাংশ মানুষের বেলাতে চেতনা আসে সংবেদনের ভিতর দিয়ে। দেহের বেলাতে সকল সংবেদনই স্থিমিত হয়, চাপা থাকে। দেখা আর শোনা হয় যেন পর্দার আড়াল থেকে। কিন্তু অতি সুস্পষ্ট বোধ আসে সঙ্গতির এবং অসঙ্গতির। প্রতিচ্ছবিরূপে তর্জমা হয়ে আসে চিন্তার দ্বারাও নয়, বোধের দ্বারাও নয়।"

মা : বলেছি তো, আমি যে তাই দেখেছি,...ছবি যেমন দেখি তেমন দেখা নয়। ভিতরে কোথাও ঢুকে গিয়ে দেখা। এমন সুন্দর কখনো কোথাও দেখিনি বা বোধ করিনি, আর তাকেবল অনুভব মাত্র নয়...কী তা বোঝাতে পারব না। কেবল বলতে পারি সেই মুহূর্তগুলি ছিল অত্যাশ্চর্য, অসাধারণ। চিন্তার জিনিস তো নয় তাই লিখতে পারিনি—কেমন ক'রে লিখব ? চিন্তার মধ্যে আকার নিলে তবে তো তা লিখে বর্ণনা করা যায়।

সাধক : আরো একটি নোটে আছে :

"দৈহিক চেতনার যা অবস্থা ও তার তৎপরতার যা গুণাগুণ তার নির্ভর করে যে যেমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তাদেরই উপরে।"

মা : হাঁ, তাও মনোরম, কারণ আমি এইভাবেই দেখলাম (গোটানো ফিল্ম খুলে দেখার ভঙ্গীতে) বরাবর বদ্‌লে যাচ্ছে। কেউ আসছে আমার দিকে, তার বদল হচ্ছে। কিন্তু একটা ঘটছে যাতে অমন পরিবর্তন হতে পারছে। আমার কাছে ছিল খ...এবং ঘ... একদিন ছিল তারা (তাদের কি হলো জানিনা, তারা ছিল অতিমানব ; সেদিন হয়তো বাধ্যতঃ আমি ছিলাম বিপত্তির মধ্যে, ঠিক বলতে পারিনা), সেদিন সারাদিনই তারা ছিল ছবির মতো ("প্রতিচ্ছবি নয় : যে স্থানে আমি ছিলাম সেই স্থানেই), সে অতি সুন্দর, সঙ্গতিময় ব্যাপার, বলা যায়না। তারপর যেমনি একটু পরিবর্তন এলো তাদের চেতনাতে, অমনি সবগুই একেবারে বদ্‌লে যেতে থাকল। যেন নিরন্তর দিবারাত্রিব্যাপী চলচ্চিত্র ঘটে যাচ্ছে। সেগুলো যদি লেখা যেতো...অবর্ণনীয়, অতুলনীয়। তার দেহটা ছিল তারই মধ্যে, যেন চালুনির মতো ছিদ্রময়, যার ভিতর দিয়ে সব কিছু ভেদ ক'রে যাচ্ছে।

সেই কয়েকঘন্টা কেটেছে অপরূপ ভাবে। পৃথিবীতে তেমন আশ্চর্য কিছুই হয় না।

আর তা এমন সুস্পষ্ট, এমন দৃষ্টি খুলে দেয়। এক রাত্রে দুই ঘন্টা ধরে দেখলাম সেই মন্দিরগুলি যার কথা বলেছি (স্থূল ভাবে নয়) যেমন বিরাট, তেমনি তার মহিমা।... হাঁ গো ছেলে, সেখানে সব জীবন্ত দেবতা, প্রতিমূর্তি নয়। আমি জানি সে কী ব্যাপার। আর চেতনার সেই শাশ্বত অবস্থা, আহা। সকল কিছু ঘটনার উর্ধ্বে।

সবই ছিল অনির্বচনীয়, কিন্তু কেমন করে তা বলা যায় :—অসম্ভব, অসম্ভব, কোনো চেতনাই সে জিনিস লেখার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সাধক : এই নোটে আরো রয়েছে :

"দেহচেতনার যা অবস্থান ও ক্ষেত্র আর তার ক্রিয়ার যত গুণাগুণ, তার বদল হয় সত্তার বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী, সম্পূর্ণ স্থূল বাস্তবের অবস্থা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্যন্ত, সকল প্রকার বুদ্ধিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। কিন্তু চেতনা যেমন অবস্থারই হোক, মূল যে উপস্থিতিবোধ তা বরাবরই ঠিক থাকে।"

মা : হাঁ, আমি জানলাম দেহকোষগুলির ব্যাপার, সর্বত্র সর্ব সময়েই তারা তাদের মন্ত্র আবৃত্তি করে চলেছে নিত্যকাল ধরে—

"এবং সেই মন্ত্র আপনা হতেই আবৃত্তি হচ্ছে এক 'তরল' প্রশান্তির মধ্যে।" সেইজন্যই তাকে কষ্ট-পাওয়া বলা যায় না, অসুস্থতা বলা যায়না, তা আর সম্ভব হয়না।

*

সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৬৮

কতগুলি পুরোনো কাগজ পেয়েছি, জানিনা কি আছে ওতে। ওর মধ্যে তোমার কাছ থেকে আসা একটা পাস আছে।

সাধক : একটি প্রশ্ন আছে ওর মধ্যে "সূত্রবাণী" (Aphorisms) সম্পর্কে :

(শ্রীঅরবিন্দের 'Thoughts and Aphorisms' থেকে) "যখন শুনি কোনো সাধুঅপ্রযুক্ত রাগের কথা, তখন মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনা দেখে বিস্মিত হই।"

না এ তো খুব চমৎকার কথা।

সাধক আরো এক প্রশ্ন "মানুষ সরল বিশ্বাসেই নিজেকে প্রবঞ্চনা করে : অবশ্যই আমি পরের ভালোর জন্য করছি বা মানুষের মঙ্গলের জন্য করছি বা তোমাদের সেবাতেই করছি, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেমন ক'রে লোকে নিজেকে এমনভাবে ঠকাতে যায় এবং কেমন ক'রে সত্য কথাটা জানা যাবে ?"

না এও অত্যন্ত সঠিক কথা।

আশ্চর্য এই যে গতকালই ঠিক ঐ বিষয়েই আমি দীর্ঘকাল যাবৎ একটা দৃষ্টি পেলাম, যদিও একথাটা আমি পড়িনি, তবে তা সম্পূর্ণ আলাদা স্তরে...

হাঁ, যখন তুমি তোমার মনের উচ্চাংশকে তোমার কাজের বিচারক করো, তখন তুমি তার দ্বারা "সরল বিশ্বাসেই নিজেকে প্রতারণা করো।" অর্থাৎ সে মন আসল সত্যটি দেখতে পায়না, নিজের সংকীর্ণ ক্ষমতামতই সে বিচার করে...আর সত্যটি সম্বন্ধে অচেতন থেকে যায় অতএব মনের স্তরকে তা সরল বিশ্বাসই হলো, যেটুকু তার সাধ্য তাই সে করলে।

অবশ্য যারা তাদের চৈত্য সম্বন্ধে পুরো সচেতন, তাদের পক্ষে এমন আত্মপ্রতারণা সম্ভব নয়, সমস্যাটি চৈত্যের সামনে হাজির করলেই সঠিক জবাবটি মিলে যাবে। কিন্তু যারা চৈত্যের সংস্পর্শ পেয়েছে তাদের জবাবও ঐ মনের জবাবের মতো যতো নিঃসন্দেহ ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়না ; আসে কেবল একটা ইঙ্গিতের মতো মন তার অন্য অর্থ করে নিতে পারে।

গতকালের অনুভূতির কথাটা বলি। সেদিকে চেয়ে আমি ভাবলাম, যে-মানুষ তার আপনার চেতনা অনুযায়ী যথাসম্ভব করছে তাকে দোষ দেওয়া সঙ্গত হয় না, কারণ সে তার চেতনার বাইরে যাবে কেমন ক'রে ?...এই ভুলটাই প্রায় সকলে ক'রে থাকে : তারা অন্যকে বিচার করে নিজের চেতনা দিয়ে, কিন্তু তার চেতনা তো তেমন নয়। তাই অমন ভাবে বিচার করা চলেনা (যারা ভালো মনেই করে তাদের কথাই বলছি)। সামগ্রিক

বা উচ্চচেতনার দিক থেকেও যে ভুল হয় তা বিচারকের, কারণ কর্মী যথাসাধ্যই করেছে তার আপন বিশ্বাস অনুসারে।

তাহলে এই কথাই বলতে হয় যে দোষ কাউকেই দেওয়া যায়না, যে আপন সংকীর্ণ চেতনাতে যা করেছে তা আন্তরিকভাবেই করেছে। আর বলতে গেলে এ জগতে সকলেরই চেতনা সংকীর্ণ, কেবল স্বয়ং চেতনাকে ছাড়া। কেবল মূল চেতনারই সীমা নেই। কিন্তু অন্য সকল অভিব্যক্তিই সীমিত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বেরিয়ে এসে পরা-চেতনার সঙ্গে এক হয়ে না যাচ্ছে...কিন্তু কেমন অবস্থাতে তা হতে পারে? অর্থাৎ তা পরাৎপরের সঙ্গে একাত্ম হবার কথা—যিনি অদ্বিতীয়, যিনি সর্বৈব। (নীরব থেকে)

মানব চিন্তাধারাতে বরাবরই বলা হয়ে আসছে যে ব্যক্তি-সৃষ্টিকে ত্যাগ করলে তবেই ভূমা চেতনার সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ কথা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে নিজের সৃষ্টিকে ত্যাগ না করেও তা হতে পারে। তাদের তাই ধারণা ছিল যে সৃষ্টিকে লোপ করতে হবে, তারা নিজেদের স্তরে সেই কাজই করছিল—কিন্তু মানুষের পক্ষে তা করতে পারা অসম্ভব, কেবল অতিমানস সত্তাই তা করতে পারে। আর সেইদিক দিয়েই অতিমানস সত্তারা হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম; তারাই পারবে নিজেদের সীমিত আকৃতিকে বজায় রেখেই পরমতম চেতনার সঙ্গে মিলতে।

কিন্তু মানুষ কখনো তা পারবে না। সে কথা আমার জানা আছে।

তাই আমি বলছিলাম যে অনুভূতি যখন এলো তখন এলো, কিন্তু তাকে ধরে প্রকাশ করতে গেলেই তা বন্ধ হয়ে যাবে...(মা হাত বন্ধ করে দেখালেন), তার মানে আমরা যা দিয়ে গড়া তা যথেষ্ট নিষ্কলুষ জিনিস নয়, যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্ত বা রূপান্তরিত নয় (যাই বলো), তাই তা খাঁটি জিনিসের চেতনাকে বিকৃত না ক'রে প্রকাশ করতে পারে না।

(নীরব থেকে মা তখন অন্যরূপ অনুভূতিতে চলে গেছেন)

জড়ের ভিতরকার যে ঘোলাটে অস্বচ্ছতা, তাই চেতনাকে সম্যক বিকাশ করতে দে পায়েনা, আর সেই অস্বচ্ছতা থেকেই (নতুবা আর কি বলি) এনে দেয় তার একটা অস্তিত্ববোধ।

গত কয়েকদিন ধরে যে অনুভূতির মধ্যে আমি ছিলাম তারই এ হলো একটা অংশ। ঠিক বলতে পারি না, তবে কয়েক সপ্তাহ ধরেই ছিলাম এক স্বচ্ছতারল্যের মধ্যে সেই তারল্যের স্বচ্ছতা বদ্‌লে গিয়ে যখন এলো এই যাকে বলছি "অস্বচ্ছতা" তখনই কিন্তু এলো দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই নিয়েট রকমের বোধ।

তাহলে দেহসত্তার সঙ্গে চৈত্যসত্তার প্রত্যক্ষ সংযোগ বিনা কোনো মাধ্যমে ঘটলে তখনই এই অনুভবটা (sensation) আসে।...কিন্তু এটা কি ঠিক "অনুভব? ঠিক বলা যায় না, অনুভবও নয়, বোধও নয়। এ একরকমের "বোধাত্মক দৃষ্টি"

(যা খুবই স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট জিনিস), যার স্পন্দন সেই মূল্যের এবং যা গিয়ে মিলিত হয় প্রত্যক্ষভাবে সেই পরমতম স্পন্দনের সঙ্গে এবং তাকেই ব্যক্ত করে (যতদূর বলতে পারি)।

বলা খুবই কঠিন, কিন্তু দেহ চলেছে এমন সব অনুভূতির ভিতর দিয়ে যা তার আগে কখনো হয়নি, যেন অনির্দিষ্টের ভিতর থেকে সুনির্দিষ্টের ভিতরে চলে যাওয়ার মতো, তারল্যের অবস্থা থেকে...ঠিক জমাটের ভাবে নয় কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো কিছুর মধ্যে। যা কিছুই ঘটছে (যত সামান্যই হোক) তা বদলে যাচ্ছে কেবল নতুন বোধ এনে দেবার সুযোগ হিসাবে। আগে ছিল সবই তারল্যপূর্ণ অনির্দিষ্ট। এখন তা হয়ে আসছে স্পষ্টতর সুনির্দিষ্ট, অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার তারল্য ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

এ সব কথা বুঝিয়ে বলা খুব কঠিন।

এমন ভাবে আমি কখনো এ সব জিনিস ভাবিনি। এ খুবই আশ্চর্য এবং আগে আসার ইচ্ছাকৃত নয়। এই মাত্রই পেলাম একটা অনুভূতি। এখনো তা পরিষ্কার হয়নি।

অবশ্য যেখানে অসম্পূর্ণতা থাকে মনই সেখানে তাকে নির্দিষ্ট করে দেয়। মনের কাজই হলো তাই, নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া, ব্যাখ্যা করে দেওয়া, আর সেই সঙ্গে সীমা টেনে দেওয়া।

সাধক সাধারণ মন থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সব অনির্দেশ্য জিনিসের দ্বারা কি লাভ হবে?

না লাভ কিছু নেই!

এটা তো নিশ্চয় হবে যে অতিমানসের অভিব্যক্তি ঘটলে তখন তা মনের নির্দিষ্টতার গঠনগুলোকে একবারে বদলে দেবে, যা সংকীর্ণ ও সীমিত ক'রে সব কিছুকে অনেকটা মিথ্যা ক'রে তোলে, তার বদলে আসবে স্বচ্ছ দৃষ্টি যার মধ্যে সংকোচ নেই। সেটাই এখন আসছে।

বস্তুত এইরকমই বলা যায় (যদিও খুব ঠিক হয়না) যে একটা নির্দিষ্টতা দেবার জন্যই মন সব কিছুকে একটা সীমা দিয়ে পৃথক ক'রে নেয়; কিন্তু এমন সুনির্দিষ্টতাও হতে পারে যাতে অমন সীমা আর পৃথক করা না হয়েই সঠিক দৃষ্টি নেলে। তাই হবে অতিমানসের দৃষ্টি। সব জিনিসের পারস্পর্য ও সংযোগ ঠিক ভাবে বজায় রেখে কোনো কিছুকে পৃথক না ক'রে সব কিছুকেই যথাযথভাবে দেখা যাবে।

কিন্তু এখন কেবল তার প্রস্তুতি চলছে। হঠাৎ এক একবার বিদ্যুৎচমকের মতো দেখা দিয়ে আবার পুরোনো রাস্তায় চলে যাচ্ছে।

প্রাণসত্তা সম্পর্কেও তাই বলা যায়। তার এমন প্রবেগ যা অন্য কিছুতে হয়না; তেমন প্রবেগ অতিমানসেও আসে কিন্তু সেখানে তার ভেদাভেদ নেই। তার যা তীব্রতা তা কিছুকেই পৃথক ক'রে দেয় না।

দুই ধরনের অনুভূতিই আমি পেয়েছি, কিন্তু সাময়িকভাবে। এই সব জিনিসই বর্তমানে ক্রমশ গড়ে উঠছে। —শ্রীমা

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

এবার আমাদের অবস্থা দৌড়ের ঠিক পূর্বে ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার মত হইল। বারে বারে অনুশীলন করার পর পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত। দৌড়বাজির পূর্বে গেট্-সেট্-রেডি পর্যন্ত যেন বলা হইয়া গিয়াছে—এইবার গো বলিলেই হয়। তাহা হইলেই দৌড়ান শুরু করা যায়। এ ঘোড়-দৌড়ে নিজ-পক্ষের দিক হইতে অন্য কোন প্রতিযোগী নাই। প্রতিযোগী হইল শত্রুপক্ষের বিমানবাহিনী এবং বিমান-ধ্বংসী কামানবাহিনী।

মে মাসে আমাদের অনুশীলন শেষ হইয়াছে। জুন মাসের অর্দ্ধেক পার হইয়া গেল। তবুও হেড্-কোয়ার্টার দিল্লী হইতে কোন হুকুম আসিল না। ইস্পাতের তরবারি ফেলিয়া রাখিলে যেমন তাহাতে মরিচা ধরে, তেমনি সম্পূর্ণভাবে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর কাজে না নামিলে স্কোয়াড্রনে ঘুন ধরে। তখন সেই স্কোয়াড্রনকে যত সন্তর্পণে সাবধানে রাখা যাউক না কেন, তাহাদের কাজে আসে শিথিলতা, প্রস্তুতির ধার যায় নষ্ট হইয়া আর উদ্যম হয় ব্যর্থ।

জুন মাসে স্কোয়াড্রনের অবস্থা ছিল উৎকৃষ্ট। তাহার পর ক্রমেই স্কোয়াড্রনের চাল-চলনে উৎকর্ষের বদলে অবসাদ অপকর্ষ দেখা দিতে লাগিল আর পটুতার অবনতি ঘটিল।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে গোপন হুকুম আসিয়া গেল। রওনা হওয়ার দুই একদিন পূর্বেও যায়গার নাম পর্যন্ত কেহই জানিতে পারিল না। রওনা হওয়ার সময়ও গোপনতা বজায় রহিল। হুকুমে শুধু বলা হইল যে সবগুলি বিমান লইয়া স্কোয়াড্রন এগারই তারিখ দমদম বিমান বন্দর অভিমুখে রওনা হইবে।

এবার আঠারটি বিমান, ষোলখানা ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স ডাইভ বম্বার আর দুইখানা হার্ভার্ড ট্রেইনার বিমান তিন খেপে রওনা হইল। প্রথম খেপে রওনা হইল ১০ই অপরাহ্নে। স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী দুই ফ্লাইট হইতে দুইজন ফ্লাইং অফিসারকে দুইখানা হার্ভার্ড ট্রেইনার বিমানে দশই তারিখ অপরাহ্নে দমদম মিন-ঘাঁটিতে পাঠাইলেন। তাহাদের কাজ হইল পরদিন যে ষোলখানা ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমান বত্রিশজন বৈমানিকদেরকে লইয়া আসিবে তাহাদের অভ্যর্থনা করা, তাহাদের থাকিবার বাসস্থান, বিমান রাখার, বিশেষতঃ রাত্রে রাখার জন্য হাঙ্গার ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা আর বৈমানিকদের পক্ষে নানা প্রকার প্রয়োজনীয়

বস্তুগুলির মধ্যে যে বস্তুটি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ আহার্য্য—তাহার সুবন্দোবস্ত করা।

এগারই দুই ফ্লাইট দুই খেপে রওনা হইল। প্রথম খেপ 'বি' ফ্লাইটের কমাণ্ডার ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট লাল তাঁহার ফ্লাইটের আটখানা বিমানের নেতৃত্ব লইয়া রওনা হইলেন। কথা হইল তিনি মহারাজপুর হইতে সোজা লাইনে উড়িয়া আসিয়া দমদম বিমান বন্দরে উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহার সাথে আগত আটখানা বিমান নির্দ্দিষ্ট স্থানে যথাসম্ভব ভাল করিয়া সাজাইয়া রাখার পর 'এ' ফ্লাইটের আটখানা বিমানের জন্য অপেক্ষা করিবেন।

প্রায় একঘন্টা পরে 'এ' ফ্লাইটের কমাণ্ডার পিন্টো তাঁহার ফ্লাইটের আটখানা বিমানের নেতৃত্ব লইয়া রওনা হইলেন। স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী এ-ফ্লাইটের একখানা বিমানে চলিলেন। বিমানের সংখ্যা ছিল এ, এন, ৭১০। পশ্চাতের কক্‌পিটে রহিল সার্জেন্ট ভাদুড়ী।

সবগুলি বিমান আকাশে আরোহণ করার পর খুব আঁট ব্যূহ রচনা করিয়া রওনা হওয়া গেল। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর হইল দ্বিতীয় ভিকের (Vee-formation) প্রথম স্থান। তাঁহার বামদিকে অর্থাৎ দুই নম্বর হইলেন পাঞ্জাব হইতে আগত ফ্লাইং অফিসার কোচার এবং থানার কেরালার শঙ্কর। এবং দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ তিন নম্বর হইলেন ফ্লাইং অফিসার ভাটিয়া। ফ্লাইং অফিসার ভাটিয়ার সাথে বহুবার আকাশ অভিযানে গিয়াছি। সেইজন্য তাঁহার উড়িবার ভঙ্গি জানা ছিল। কিন্তু ফ্লাইং অফিসার কোচারের উড়িবার ভঙ্গি জানা ছিল না। সেইজন্য প্রায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার দিকেই নজর রাখিয়া চলা গেল।

ফ্লাইট-কমাণ্ডার ফ্লাইট-লেফটেনান্ট পিন্টো রহিলেন প্রথম ভিকের শীর্ষস্থানে। কিছুক্ষণ আঁট ব্যূহ করিয়া চলার পর ফ্লাইট-কমাণ্ডার ব্যূহ আলগা করার অনুমতি দিলেন। উড়িয়া চলা হইতেছিল প্রায় সোজা পশ্চিম দিকে। প্রথম দিকে সূর্য্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ছিলেন। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হওয়ার পর সূর্য্যদেব চলিয়া গেলেন আমাদের পিছনের দিকে।

ব্যূহ শিথিল করার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও ফ্লাইং-অফিসার কোচার ও ফ্লাইং-অফিসার ভাটিয়া আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে গেলেন না ; শুধু সামান্য দূরে থাকিয়া ব্যূহ আলগা করিয়া উড়িয়া চলিলেন। কিন্তু ফ্লাইটের অন্য চারখানা বিমান ব্যূহ শিথিল করার অনুমতি পাইয়া ক্রমেই একে অন্যগুলি হইতে দূর দিয়া চলিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

বেলা দুইটা নাগাদ আমরা দমদম বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিলাম। দমদম বিমান ঘাঁটির মাইল পঞ্চাশ নিকটে আসার সাথেসাথেই আমরা তাহাদের সাথে বেতারে সংবাদ আদান

প্রদান শুরু করিলাম।

দমদম বিমান ঘাঁটির দিকে শত্রু-বিমান যাহাতে অতর্কিতে না আসিতে পারে তাহার জন্য বিমান-বাহিনীর কর্তারা কতকগুলি নির্দেশ দিয়াছিলেন। বিমান ঘাঁটির কর্তারা সেই নির্দেশগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য। সেই গুলির মধ্যে একটা নির্দেশ এই যে বিমান ঘাঁটির পঞ্চাশ মাইল নিকটবর্তী হইলেই যে কোন বিমান চালক তাহার অন্তিম বিমান-বন্দরকে জানাইবে, এবং কোন দিক দিয়া বিমানকে বন্দরের দিকে উড়িয়া অগ্রসর হইতে হইবে সেই নির্দেশ চাহিয়া লইবে। নির্দিষ্ট দিক দিয়া বিমান-বন্দরের দিকে অগ্রসর না হইলে প্রখরে বিমান-ধ্বংসী কামান-গুলি গর্জিয়া উঠিবে এবং তাহার অনতিবিলম্বে দমদম নিবরানঘাঁটিও নিকটবর্তী অন্যান্য ঘাঁটিগুলি হইতে আগত জঙ্গী-বিমান-গুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। এ ছাড়া নিজ-দলীয় জঙ্গী-বিমানগুলি যাহাতে তাহাদের পরিচয় বিমানঘাঁটির কর্তাদের কাছে সহজে পৌঁছাইতে পারে তাহার জন্য কতকগুলি সাংকেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেকদিন এই সাংকেতিক শব্দ বা কথাগুলি পরিবর্তন করা হইত, এবং প্রয়োজন হইলে, অনেক দিন হয়ত দিনে দুই-তিন বারও পরিবর্তন করা হইত। শত্রু-বিমান-চালকের পক্ষে সেই দিনের এবং সময়োপযোগী গোপন-সংকেত-বাণী জানা সম্ভব নয়। সেইজন্য তাহাদের পক্ষে নির্দিষ্ট নিরাপদ যাত্রাপথও জানা সম্ভব নয়। উপরন্তু গোপন সংকেত-বাণী বিমান বন্দরের কর্তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লওয়াতে যথেষ্ট বিপদ আছে। কেননা তাহাদের কথায় বার্তায় বা কাজে যদি একটু ভুল বা কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক বিমান-বন্দরের কর্তাদের মনে হয়, তাহা হইলে বিমানধ্বংসী কামানের পাল্লার মধ্যে আসা মাত্র তাহাদের নিস্তার নাই। অনেক দৃষ্টান্ত আছে যখন নিজদলীয় বিমানের চালক এইরূপ ভুল করিয়া নিজেদের বিমানধ্বংসী কামানের গোলার আঘাতে ভূপাতিত হইয়াছে। আবার অন্যরূপ দৃষ্টান্তও আছে, যেখানে বুদ্ধিমান বিমান-চালক তাহার মধুর কথায় বিমানবন্দরের কর্তাদের ঠকাইয়া নিজের কাজ হাসিল করিয়াছে।

আমরা আমাদের সাথী আর চারখানা বিমানের জন্য অবতরণ করার অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট 'গলি' দিয়া উড়িয়া চলিলাম। এতক্ষণ গঙ্গা নদীর পশ্চিম পারে ছিলাম। নৈহাটির নিকট গঙ্গা পার হইয়া সোজা দক্ষিণ দিকে আসিয়া দমদম-বিমান-ঘাঁটির উপর পৌঁছান গেল। তারপর বিমানঘাঁটির চতুর্দিকে একটা চক্কর দিয়া অবতরণ করা হইল।

আমাদের চারখানা বিমান অবতরণ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাইটের আর তিনখানা বিমানও পৌঁছাইল এবং অবতরণ করিল। তারপর দীর্ঘ পরিক্রমার পর বিমানবন্দরের উত্তর দিকে নূতন পথে আসিয়া বিমানগুলিকে ছোট ছোট ছাতশূন্য ঘরে

রাখা হইল। এই ঘরগুলির দেওয়াল পাকা আর বেশ শক্ত। শত্রুপক্ষের বোমা যদি নিকটে পড়িয়া বিদীর্ণ হয়, তাহা হইলে শক্ত দেওয়ালে বোমা-বিস্ফোরণ-জনিত প্রচণ্ড হাওয়ার চাপে দৃঢ় থাকিবে এবং সেই চাপে ভিতরে স্থিত বিমানের কোন ক্ষতি হইতে পারিবে না। আর বোমা যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন একটি এই প্রকার ঘরের মধ্যেই পড়িয়া বিদীর্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ একটি বিমানই নষ্ট হইল, অন্য বিমান যেগুলি ঐ ঘরের মধ্যে নাই, সেইগুলির কোন ক্ষতি হইতে পারিল না।

বিমান হইতে অবতরণ করা মাত্রই মনে হইলে যে এ স্থান খুব পরিচিত। তার পরই মনে পড়িল এ সেই স্থান যেখানে পূর্ব্বে সুন্দর গ্রাম ছিল—বৎসর দুয়েক পূর্ব্বেও সেখানে আমরা গ্রাম দেখিয়াছি এবং দুপ্রহরে গৃহস্বামীকে না বলিয়া নিষ্ট কাঁচা আম সংগ্রহ করিয়া লবণ-সংযোগে সদ্ব্যবহার করিয়াছি। এখন সেখানে গ্রামও নাই গাছপালাও নাই, আছে শুধু কয়েকখানা ছাত-শূন্য ঘরের আকৃতির অসুন্দর স্থান, ইংরাজীতে যাহার গালভরা নাম রাষ্টপেন।

অবতরণের পর গুণিয়া দেখা গেল যে মোট সাতখানা তলিট ভেন্‌জিয়ান্স বিমান রাষ্টপেনগুলির মধ্যে সাজান হইল। বি ফ্ল্যাইট এক ঘন্টা পূর্ব্বে রওনা হইয়াও পৌঁছায় নাই। আর আশ্চর্য্যের ব্যাপার হইল আমাদের ফ্ল্যাইট কমাণ্ডার ফ্ল্যাইট লেফ্‌টেনান্ট পিন্টোর কোন পাত্তা নাই। বিমানে আসার সময় তাহার নিকট হইতে কোন বিপদসূচক বেতার-বার্ত্তাও পাওয়া যায় নাই। আবার কি হইল? ক্যাম্বেলপুর হইতে রওনা হওয়ার কথা মনে হইতেই প্রাণটা চাঁক করিয়া উঠিল। আসল লড়াই করার পূর্ব্বেই কি আমাদের লড়াই সাঙ্গ হইবে?

বিমান রাখার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান আমাদেকে দেখাইবার জন্য বিমান-বন্দরের কর্ত্তারা একজন অফিসারকে জীপ গাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার জীপ গাড়িতে পূর্ব্বদিন হার্ভার্ড-ট্রেইনার-বিমানে আগত আমাদের স্কোয়াড্রনের দুইজন ফ্ল্যাইং অফিসারও ছিলেন। তাঁহাদের সাথে কথাবার্ত্তায় বি ফ্ল্যাইট বা ফ্ল্যাইট লেফটেনান্ট পিন্টোর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আঠারটি বিমানের মধ্যে মোটে সাত আর দুই মিলিয়া নয়টি বিমান পৌঁছাইল। জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, ইতিমধ্যে বিমান বন্দরের আর একখানা জীপ গাড়ীতে একজন অফিসার দ্রুত গতিতে আসিয়া স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে ফ্ল্যাইট লেফ্‌টেনান্ট পিন্টো বিমান-বন্দর হইতে নাইল পঁচিশ-তিরিশ দূরে, হুগলী সহরের সন্নিকটে এক ধানক্ষেতে অবতরণ করিয়াছে। আমাদের কাহারও সেখানে শীঘ্র যাওয়া প্রয়োজন।

জিনিষ-পত্র গুছাইয়া আবাসস্থলে লওয়ার ভার অন্যদের উপর ন্যস্ত করিয়া, স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর সহিত নবাগত জীপ গাড়ীতে চড়িয়া বসা গেল। মিনিট পঁচেকের মধ্যে

বিমান-বন্দরের কর্তাদের হুকুম লইয়া ঐ জীপ গাড়ীতেই সোজা হুগলী সহরের দিকে রওনা হওয়া গেল। সাথে ম্যাপ এবং তাহাতে হুগলীর নিকটবর্তী একখানা ধানক্ষেতের মধ্যবর্তী-স্থানে লাল পেন্সিলে তীর চিহ্ন অঙ্কিত। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল, কিন্তু ধানক্ষেত ও চারি দিকেই এবং প্রায় সবগুলিই সমুদ্রে ভরা ; কোথায় আমাদের ফ্লাইট কমাণ্ডার বা তাহার ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমান ? দুইএকজনকে জিজ্ঞাসা করিতেই তাহাদের মধ্যে একজন কিছুকাল আগে পতিত বিমানের স্থান অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানাইয়া দিল। তাহাদের কথা-বার্তায় হাবভাবে বোঝা গেল যেন বিমানগুলি সব সময়েই এই অঞ্চলের ধান ক্ষেতেই অবতরণ করে। তাহাদের বিবেচনায় বিমান-বন্দরে অবতরণ করার চেয়ে ধানক্ষেতেই অবতরণ করাই যেন সহজ। প্রত্যহই ধানক্ষেতে বিমান অবতরণ করায় তাহাদের ক্ষতি নাই, কেননা ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাহারা তাহাদের নাম লিখিয়া পাইয়া থাকে। উপরন্তু ধান যেটুকু নষ্ট না হইয়া গোলায় উঠিল তাহা হইল উপরি।

আর বিলম্ব না করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট পিনেলো ও তাহার নেভিগেটর গোলাবকে অক্ষত শরীরেই বিমানের নিকট অবস্থান করিতে দেখা গেল। ইতিমধ্যে থানা হইতে পুলিশ মোতায়েন হইয়াছে, যাহাতে পতিত বিমান হইতে অস্ত্রাদি ও মহামূল্য বস্তুগুলি গ্রামের লোকেরা স্মারকচিহ্ন হিসাবে না বলিয়া পকেটস্থ করে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছাইয়া ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট পিনেলো ও তাহার সহযোগীকে অক্ষত দেখিয়া আনন্দ হইল সত্যই, কিন্তু বিমানটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বড় কষ্টও হইল। কষ্ট হওয়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল।

ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমানে পেট্রোল রাখা হইত ডানার মধ্যে রক্ষিত এক বিশেষ প্রকার রবারের প্রস্তুত ছয়টি ট্যাঙ্কের মধ্যে। প্রত্যেক ডানায় তিনটি ট্যাঙ্ক। আর এঞ্জিনের পশ্চাৎ দিকে বিমানের খোলের মধ্যখানে আর একটি ট্যাঙ্ক ছিল। সেটিও এই বিশেষপ্রকার রবারের প্রস্তুত। এই রবারের বিশেষত্ব ছিল। ট্যাঙ্কগুলি গুলিবিদ্ধ হইলেও পেট্রোল বাহির হইতে পারিত না। কেননা গুলিবিদ্ধ ছিদ্র দিয়া পেট্রোল বাহির হওয়ার পূর্বেই রবার আপনা আপনি ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিত। সেইজন্য এই ট্যাঙ্কগুলির নাম ছিল আপনা-আপনিই-ছিদ্র-বন্ধ-ট্যাঙ্ক।

ট্যাঙ্ক হইতে এঞ্জিন পর্যন্ত পেট্রোল পাঠাইবার জন্য প্রত্যেক ট্যাঙ্কেই একটি করিয়া বিদ্যুৎ-শক্তি-চালিত পাম্প ছিল। পাম্পগুলি খুব ভাল জাতের ছিলনা। প্রায়ই পেট্রলে ভিজিয়া যাওয়ার জন্য অকেজো হইয়া পড়িত। তখন সেই ট্যাঙ্কের পেট্রোল এঞ্জিন পর্যন্ত পাঠান এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। নানাভাবে এই বিষয় আলোচনা ও পরীক্ষা করার পর বিমান-বাহিনীর এঞ্জিনীয়ারিং কর্তারা এই প্রকার পাম্প ব্যবহার বাতিল করিবার মনস্থ করিলেন। তাঁহারা সাব্যস্ত করিলেন যে সাতটা বিদ্যুৎ-শক্তি-চালিত পাম্পের বদলে

একটা এঞ্জিন দ্বারা চালিত পাম্প লাগাইয়া ট্যাঙ্ক হইতে এঞ্জিন পর্য্যন্ত পেট্রল পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই নূতন পাম্প লাগান হইল এঞ্জিনের পশ্চাৎ দিকে। আর এমন ভাবে লাগান হইল যে এঞ্জিন চালু হওয়া মাত্র এঞ্জিন এই পাম্পকেও চালাইবে এবং পেট্রোল সরবরাহ হইবে। তখন কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই যে এই একটি পাম্প অকেজো হইয়া পড়িলে এঞ্জিনে পেট্রল মোটেই পৌঁছাইবে না—বরঞ্চ প্রত্যেক ট্যাঙ্কে যদি একটি করিয়া পাম্প থাকে, অর্থাৎ সাত ট্যাঙ্কে যদি সাতটা পাম্প থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় সবগুলি অকেজো হইয়া পড়িবে না, অন্তত একটা দুইটাও যদি কাজের উপযুক্ত থাকে তবে পেট্রোল অভাবে এঞ্জিন বন্ধ হইয়া যাইবে না এবং এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার জন্য বিমান ভূপাতিত হইবে না।

আমাদের ছোয়াড্রনে এই নূতন ধরণের পাম্প-লাগান বিমান একখানাই আসিয়াছিল। আর মহারাজপুর হইতেই সেই বিমানখানি ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট পিনোটা উড়াইতেছিলেন। দমদম বিমানঘাঁটি অভিমুখে যাত্রাকালেও ফ্লাইট-লেফটেনান্ট পিনোটাই সেই বিমানে যাত্রা করিয়াছিলেন। দমদম বিমানঘাঁটির নিকটে আসিবার পর, এঞ্জিনের সাথে পাম্প সংযোগ-কারী অংশটি ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া যায়। ফলে পেট্রল অভাবে বিমানের এঞ্জিন বন্ধ হইয়া যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত আর এই বিশ মাইল পথ আসিয়া বিমানঘাঁটিতে অবতরণ সম্ভব হয় না। অবতরণ, সেইজন্য ধানক্ষেতে করতে হয়।

ফ্লাইট লেফটেনান্ট পিনোটার সহিত সামান্য কথা হইতেই স্পষ্ট বোঝা গেল, যে পেট্রল অভাবই বিমানটির পতনের কারণ। কাল বিলম্ব না করিয়া পাম্পটা এঞ্জিন হইতে খুলিয়া লওয়া হইল, এবং এঞ্জিনের সাথে যে অংশটি পাম্পকে সংযোগ করে, সেই অংশটিও খুলিয়া পাম্পসহ এটি পাত্রমধ্যে রাখিয়া, দমদম পৌঁছান গেল।

দমদমায় আসার পর জানা গেল যে আমাদের বাসস্থান দমদমায় নয়, একেবারে দূর আলিপুরে। আবার বার চৌদ্দ মাইল জীপ গাড়ীতে চড়িয়া বাসস্থানে পৌঁছিলাম।

বি-ফ্লাইটের খবর তখনও পাওয়া যায় নাই। রাত্রেই বি-ফ্লাইটের খবর পাওয়া গেল। দমদম অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় তাহারা যখন জামসেদপুরের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সম্মুখে লালধূলার ঝড় দেখিতে পায়। কিছুদিন পূর্ব্বে পাঁচখানা বিমান ঝড়ে নষ্ট হইয়া যাওয়ার কথা কেহই ভুলিতে পারে নাই। ফ্লাইট-কমাণ্ডার ধূলার ঝড়ের মধ্যে অগ্রসর না হইয়া শত্রু বিমানগুলি অবতরণ করান শ্রেয় মনে করেন এবং নিকটস্থ দুইটি বিমান-বন্দর রাঁচি ও ছাড়ার বিমান-বন্দরের কর্ত্তাদের নিকট অবতরণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিমানগুলি সমস্তই আঁট-ব্যূহ করিয়া এক সঙ্গে উড়িয়া চলিতেছিল। ছাড়ার তখন আমেরিকান বিমান-বাহিনীর গোটা দুয়েক ছোয়াড্রন ছিল। এই দুই ছোয়াড্রনের মধ্যে ঐ একটি ছোয়াড্রনের নিকট মিচেল

বম্বার অর্থাৎ বি-২৫ বিমান ছিল। তখনকার দিনে নিচের বম্বার খুবই উচ্চ স্তরের বোমারু বিমান বলিয়া গণ্য হইত। তাহাদের সাথে আমাদের এক সহযোগে কাজ অর্থাৎ বোমা বর্ষণের কাজ করার কথা। নিচের বম্বারের কর্তারা আমাদের সাথে আলাপের এই সুযোগ ছাড়িলেন না। বি-ফ্লাইটকে ছাড়ায় অবতরণের অনুমতি তখনই দেওয়া হয়। এবং বি-ফ্লাইটের বিমানগুলি অবতরণ করার পর, আমাদের স্কোয়াড্রনের প্রত্যেক বৈমানিককেই পরম সমাদরে তাঁহাদিকে সেই রাত্রি যাপন করিতে দেন। রাত্রে ভোজনে এবং পানীয়ের আপ্যায়নে আমাদের বৈমানিকরা খুবই বোহিত হইয়া পড়েন। মোহিত হইয়া থাকার অবস্থা বেশী দিন পর্যন্ত ছিল না। কেন? সে কথা পরে।

পরদিন প্রাতঃ-ভোজনের পর পূর্ব রাত্রের আপ্যায়নের চিহ্ন লইয়া বি-ফ্লাইট পুনরায় আঁটি-বূহ রচনা করিয়া দমদমে পৌঁছিল। স্কোয়াড্রনের সকলেই আবার আমরা একসঙ্গে মিলিত হইলাম। শুধু এ-ফ্লাইটের একখানা বিমান নষ্ট হইল।

একদিন গেল, দুইদিন গেল, তিন দিনও গেল, হুকুমের পরের অংশের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। সহরে কোথাও বেড়াইতেও যাওয়া বারণ, কেননা হুকুম কখন উড়িয়া নূতন স্থানে যাওয়ার কথা থাকিবে কেহই জানে না, সেইজন্য সকলকেই অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়।

চতুর্থ দিনের সকালে হুকুম পাইয়া প্রথমে দুইখানা বিমান চারজন বৈমানিক লইয়া যাত্রা করিল। প্রথমটিতে স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী আর সার্জেন্ট ভাদুড়ী ও দ্বিতীয়টিতে ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট পিন্টো ও আর একজন। গন্তব্যস্থল আসামের জঙ্গলে, শিলচরের নিকট কুম্ভিগ্রামে। কুম্ভিগ্রামের নাম তখনও অনেকেই জানে না। একটা পাহাড়ের মাথা কাটিয়া সমতল ক্ষেত্র বানান হইয়াছে। সেই সমতল ক্ষেত্রের মধ্যখানে অবতরণ-পথ। পাহাড়-কাটা—কোথাও পাথর বা শক্ত মাটি এবং কোথাও নরম মাটি বা জল পড়িলেই কাদা। অবতরণ-পথ তখনও সিমেন্ট কংক্রীট করা হয় নাই। একেবারে নূতন। অবতরণ-পথও মোটে একটি,—পাহাড়ের পিঠের সাথে সমান্তরাল। অবতরণ-পথের পরেই পাহাড় চালুতে নামিয়া গিয়াছে। একদিকে একটা ছোট নালা ও নালার অপর পাড়ে জঙ্গলের মাঝে এক চায়ের বাগান। অন্যদিকে চালুর পর সোজা খাত নামিয়া গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। আর সেই জঙ্গলে নাই কি?

কুম্ভীগ্রামে পৌঁছাইয়া, প্রথমে অবতরণ-পথ ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য খুব নীচু হইয়া, ঠিক অবতরণ-পথের উপর দিয়া, আকাশে কয়েকটা পাক দেওয়া গেল। তারপর ক্ষেত্রের কর্তাদের অনুমতি লইয়া অবতরণ করা হইল। অবতরণ করা মাত্র বিমানঘাঁটির কর্তারা বেতার মারফৎ বিমানের এঞ্জিন চালু রাখার জন্য হুকুম দিলেন,

কেননা জাপানীদের বোমারু বিমান তখন ঐ এলাকার নিকটে ছিল। প্রয়োজন হইলে আমরা যেন দেরী না করিয়া পালাইতে পারি। একটু পরে বিমান-বন্দরের প্রধান কর্ত্তা অর্থাৎ ষ্টেশন কমাণ্ডার জীপ গাড়ীতে আসিয়া হুকুম দিলেন, আমাদের জন্য নূতন বিমান-অবতরণ-পথ তৈয়ারী করা হইতেছে। নূতন স্থান কুন্তিগ্রাম হইতে শীলচরের পথে, প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। সেখানে ধানের মাঠ আর গ্রাম সমস্ত সমতল করিয়া বিমান-অবতরণ-পথ তৈয়ারী প্রায় শেষ হইয়াছে। যাহাতে বিমান সহজে অবতরণ করিতে পারে। গ্রামের নাম উদয়বন্দ্। আমাদের বিমানগুলি সেখানে রাত্রে বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া রাখা যাইবে। দিনে কুন্তিগ্রামে আনিয়া রাখা হইবে। উদয়বন্দে রাত্রে বিমান অবতরণ বা আকাশে আরোহণ সম্ভব নয়।

বাসস্থান—পাহাড়ের এক পাশে জঙ্গলে, ঢালুর উপরে কতকগুলি ব্যারাক-বাড়ী উঠান হইয়াছে—সেইখানে। এত কথা বলার পর, তিনি কতকগুলি সতর্কবাণী দিয়া গেলেন। আমরা যেন সব সময় সতর্ক থাকি—বাঘ, সাপ, মশা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পাহাড়ী কলেরা ছাড়া বিষাক্ত মাকড়সা ও পোক ত আছেই, এগুলি ছাড়া আছে প্রচুর জাপানীদেরকে সংবাদ আদান-প্রদানকারী নহোদয় ব্যক্তিরা।

তিনি জীপ গাড়ী লইয়া যাইতে না যাইতেই কন্ট্রোল টাওয়ার হইতে উদয়বন্দ্ যাওয়া যাওয়ার জন্য হুকুম আসিল। সেইদিনের মধ্যে আমাদের ষোলখানা ভলিট ভেন্‌জিয়ান্স আর দুইখানা হার্ভার্ড ট্রেইনার বিমান উদয়বন্দ্ বিমান-বন্দরে পৌঁছাইল। শুধু স্পেশাল ট্রেন যাবতীয় সরঞ্জাম ও দুই শতেরও অধিক বৈমানিকদের লইয়া পৌঁছায় নাই। তাহারা না পৌঁছান পর্য্যন্ত আমাদিকে চুপচাপই থাকিতে হইবে। বিমানগুলি মারণযজ্ঞে যাওয়ার পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সঠিকভাবে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন পেট্রল, তেল প্রভৃতি ট্যাঙ্কগুলিকে পরীক্ষা করার পর তেল ও পেট্রল ভরিয়া রাখা প্রয়োজন। এক কথায় অনেক কাজ।

প্রত্যেক মারণযজ্ঞে যাত্রায় বিমানের না-ফিরিয়া আসার প্রচুর কারণ হইতে পারে। একটু সাবধান না থাকিলে না-ফিরিয়া আসার কারণগুলি আরও সংখ্যায় অধিক হয়, কমে না। কাজেই এই প্রকার সাবধানতায় ভীরুতা নাই; এতে আছে অচঞ্চল-চিত্ত; ঠাণ্ডা থাকিয়াও অসম-সাহসিকতা, কোলুড কারেজ। কাজে কাজেই দিন-কয়েক সবুর করা গেল। ইতিমধ্যে স্পেশাল-ট্রেন নানা ঘটন ও অঘটনের পার হইয়া শিলচরের নিকট নদী পার হইয়া তিনটন লরীতে দশ-পনর জন করিয়া চাপিয়া প্রথমে উদয়বন্দ্ বিমান-ক্ষেত্রে এবং পরে কুন্তিগ্রামের জঙ্গলে আসিয়া পৌঁছিল।

আমাদের রাত্রিবাস কুন্তিগ্রামে, পাহাড়ের পিঠের পাশে ঢালুর উপরে তৈয়ারী ব্যারাক-বাড়ীগুলিতে। আর কাজ পাহাড় হইতে সমতলের উপর নামিয়া গিয়া প্রায় বিশমাইল

দূরে অবস্থিত উদয়বন্দ্ গ্রামে। সেখানে ধানক্ষেত চষিয়া দিয়া সমতল ক্ষেত্র বানান হইয়াছে। এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান কৃষকের কোঠাবাড়ী ভাড়া হয় নাই। সেই সুন্দর বাড়ী আমাদের অফিস-বাড়ী। সে বাড়ীতেই আমাদের প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া লওয়া হইল।

স্পেশাল ট্রেনে স্কোয়াড্রনের বৈমানিকরা পৌঁছাইবার পরদিন, তখনও ট্রেনে আসার ক্লেশ বা অবসাদ কাটে নাই, স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর ষ্টেশন-কমাণ্ডারের নিকট হইতে জরুরী তলব আসিল। ষ্টেশন-কমাণ্ডারের নিকট হইতে তলব আসিয়াছে, একথা রাষ্ট্র হওয়া মাত্র বৈমানিকদের কল্পনার পাখী পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া নানা জল্পনার সৃষ্টি করিয়া প্রচার করিল। অসত্য গল্প ছড়াইওনা (speed no rumour) সকলেরই জানা কিন্তু সব সময় দেখিয়াছি কথা বলার লোভ সংবরণ করা সাধারণের পক্ষে কিরূপ দুরূহ। সংযম নিজের ইচ্ছাধীন কেবল দুই চারিজনের থাকে, আর সকলের সংযম তাহাদের নিজ ইচ্ছাকৃত নয়, সে সংযমের পিছনে থাকে শাস্তির ভয়। সংযম আমাদেরও আসিয়াছিল—সামান্য মাস দুয়েকের মধ্যেই—সে গল্প যথাস্থানে। কাজেই "অসত্য ছড়াইও না" সাবধান-বাণীর মর্ম্ম আমাদের কাছে তখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

পরদিন প্রত্যুষে আমাদের স্কোয়াড্রনের প্রথম অপারেশন—বারখানা বিমানের বোমা বর্ষণের জন্য একই সাথে ব্যূহ রচনা করিয়া যাত্রা এবং ডাইভ করিয়া বোমা বর্ষণ এই প্রথম। পূর্বে তিন নম্বর ফ্ল্যাইটের সময়, বিমানের সংখ্যা কখনও আটের বেশী হয় নাই। তিনশত তিপ্পান্ন নম্বর স্কোয়াড্রনে যদিও বিমানের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু একসঙ্গে বারখানা বিমানব্যূহ রচনা করিয়া গিয়া কখনও বোমা বর্ষণ করে নাই। এবার একসঙ্গে বারখানা বিমানের শুধু বোমাবর্ষণ-যাত্রা নয়। নিশানার উপর আসিয়া বোমা বর্ষণ করিতে হইবে নিশানার উপর সোজা নামিয়া আসিয়া। নামিয়া আসার যদি একটুও ভুল হয়, তবে হয় জাপানী মারণাস্ত্রে নিশানার নিকট ভূপাতিত হইতে হইবে, অথবা তীব্র গতিতে নামিয়া আসার পর উঠিবার সময় শরীরের বিভিন্ন অংশে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার ফলে জ্ঞান হারাইয়া বিমানের উপর আধিপত্য না থাকার ফলে ভূপাতিত হইতে হইবে এই দুয়ের মধ্যে কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়।

এই নূতন ধরণের বিমান উড়াইবার অভিজ্ঞতা আমরা যথেষ্টভাবে সঞ্চয় করিয়াছি এ কথা ষ্টেশন-কমাণ্ডার জানিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে ভারতীয়দের কর্তব্য-বোধ এবং দক্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ঘোরতর সন্দেহ ছিল। অথবা হয়ত প্রথম অপারেশনে যাওয়ার সময় কিঞ্চিৎ সাহস দেওয়ার জন্য আমাদেরকে একলা ছাড়িয়া তিনি দিলেন না।

আমাদের স্কোয়াড্রন পৌঁছাইবার সপ্তাহ কয়েক পূর্বে রয়াল-বিমান-বাহিনীর একশত

দশ নম্বর স্কোয়াড্রন কুন্তিগ্রামে পৌঁছিয়াছিল। পৌঁছাইবার পর প্রায় প্রত্যহই তাহারা দিনে অন্ততঃ একবার করিয়া বোমা বর্ষণের জন্য যাত্রা করিত। কিন্তু নানা কারণে, বিশেষতঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুণ তাহাদের প্রচেষ্টা প্রায়ই সফল হইত না। তাহারাও ভলটি ভেন্‌জিয়ান্স ডাইভ বম্বার বিমান লইয়াই আসিয়াছিল। তাহাদের বৈমানিকরা থাকিত কুন্তিগ্রামের অবতরণ-পথের উল্টো দিকে ব্যারাক বাড়ীগুলিতে। আর বিমানগুলি রাখা হইত পাহাড়ের চালুতে জঙ্গল কাটিয়া ছোট ছোট খালি জায়গাতে। এই নূতন প্রকার বিমানে জাপানীদের সাথে লড়াইয়ে তাহারা আমাদের চেয়ে কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে আসিয়া মাত্র কয়েকবার জাপানীদের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে; আর তাহাদের গাত্র-বর্ণ আমাদের মত সূর্য্য-পোড়া প্রিয়দর্শন নয়, সেই সমস্ত হেতুর জন্য ষ্টেশন-কমাণ্ডারের নিকট হইতে প্রস্তাব আসিল যে প্রথমবার বোমা বর্ষণে যাওয়ার সময় আমরা তাহাদের সঙ্গী হইয়া যাইব অর্থাৎ তাহারা বোমা ফেলিয়া জাপানীদের বিমান বিধ্বংসী কামানগুলিকে নরম করিয়া ফেলিবার পর আমরা নিশানার উপর পৌঁছাইয়া বোমা বর্ষণ করিব। এদলে প্রস্তাব মানেই হুকুম। অমান্য করার প্রশ্ন উঠে না।

পরদিন প্রত্যূষের জন্য তেরখানা বিমান প্রস্তুত করান হইল। প্রত্যেক ফ্লাইট হইতে ছয়খানা করিয়া বারখানা আর এ-ফ্লাইট হইতে আর একখানা—ষ্টাণ্ডবাই শেষ মুহূর্ত্তে যদি ঐ বারখানা বিমানের কোনটায়, কোনপ্রকার ত্রুটি দেখা যায়, তবে সেই ষ্টাণ্ড্‌বাই, বিমান-চালক ষ্টাণ্ডবাই বিমান লইয়া উড়িয়া যাইবে এবং ত্রুটিপূর্ণ বিমানের স্থান লইবে।

স্কোয়াড্রনের প্রথম অপারেশনে স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরী অধিনায়কত্ব নিজেই লইলেন। সাব্যস্ত হইল যে নিশানাতক আমাদের স্কোয়াড্রন রয়াল-বিমান-বাহিনীর একশত দশ নম্বর স্কোয়াড্রনের পশ্চাতে যাইবে এবং একশত দশ নম্বরের বার খানা বিমান বোমা বর্ষণ শেষ না করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে এবং খাস বিলাতিদের কায়দা ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবে। অভিজ্ঞদের বোমা বর্ষণ শেষ হইলে নিজেরা নিশানার উপর আমাদের স্কোয়াড্রন বিপদশূন্য হইয়া নিশ্চিন্তে বোমা বর্ষণ করিবে। এর পর যদি আরও প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা হইলে একশত দশ নম্বর স্কোয়াড্রন আমাদেরকে আরও কয়েকবার সাথে লইয়া গিয়া বোমা বর্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষা দিবে। আমাদের অনুশীলনে তাহারা তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

দুরু দুরু বুকে আমাদের বারখানা বিমান ভূমি ত্যাগ করিয়া আসমানে উঠিল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে চারিটি ভিক প্রস্তুত হইয়া গেল। তারপর ব্যূহ আঁট করিয়া একশত দশ নম্বর স্কোয়াড্রনের অনুবর্ত্তী হইতে মোটেই বেশী সময়ের প্রয়োজন হইল না। দেখা গেল যে একশত দশ নম্বরের তুলনায় আমাদের স্কোয়াড্রনের ব্যূহ অনেক

আঁচ। এইবার নিশানার দিকে চব্বিশখানা ডাইভ বম্বার বিমান, সাথে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা ও প্রচুর অক্টাইক্সি মাপের গুলি লইয়া অগ্রসর হইল।

নিশানা ছিল প্রায় দুই ঘন্টার পথ দূরে। নিশানার প্রায় নিকটে আসার পর স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার চৌধুরী বেতারে ও ইশারায় বি-ফ্লাইট কমাণ্ডারকে তাঁহার স্থানে স্কোয়াড্রনের অধিনায়কত্ব লওয়ার হুকুম দিয়া কুন্তিগ্রামে ফিরিবার জন্য বিমানের মোড় ঘুরাইলেন। শুধু জানাইলেন যে তাঁহার বিমানের কোন অংশ বিকল হইয়াছে।

বি-ফ্লাইট কমাণ্ডার স্কোয়াড্রনের এগারখানা বিমানের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া নিশানার দিকে উড়িয়া চলিলেন। ততক্ষণ একশত দশ নম্বর সোজা নিশানার উপর আসিয়া, ডাক করিয়া সোজা অবতরণ করার পর বোমা বর্ষণ সুরু করিয়াছে। সাবধানী কিছু বিমানধ্বংসী কামানের গোলা নিশানার নিকটবর্তী স্থানগুলি হইতে জাপানী গোলন্দাজরা নিক্ষেপ করিতেছিল। গোলাগুলির ধরণ দেখিয়া খুব পরিচিত বলিয়া মনে হইল। পরে জানা গেল যে আমাদের বর্ম্মা ত্যাগ করিয়া আসার সময় অসংখ্য বোমের বিমানধ্বংসী কামান ও গোলা বর্ম্মাবুহলুকে ফেলিয়া আসা হইয়াছিল। জাপানী গোলন্দাজরা এখন সেইগুলি আমাদের উপর ডাক করিয়া নিজেদের গোলাগুলি বাঁচাইতেছে।

বোমা বর্ষণের পর যখন আমাদের এগারখানা বিমান কুন্তিগ্রাম বিমান ঘাঁটিতে আসিয়া অবতরণ করিল, তখনও স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডারের বিমান ফিরিয়া আসে নাই। তাহার নিকট হইতে কোন বেতার-বার্ত্তাও পাওয়া যায় নাই।

আমাদের বোমা বর্ষণ কত ভাল হইয়াছিল যে গ্রুপ হেড কোয়ার্টার তখনই তারিফ করিয়া বেতার-বার্ত্তা পাঠাইল।

Planning a new project ?

IT PAYS TO AVAIL OF INDIAN CONSULTANCY SERVICES

What should be the best process for the plant ? Will the plant be economically viable? Does the market justify the plant capacity ? Is the site selected ideal for the plant ? Is the production cost realistic ? How and where to obtain the best possible plant and equipment ? All this and many other project problems may confront you Why not leave these to competent Indian Consulting Engineers ? Indian Consultants have no interest other than yours. It is they who know the Indian conditions best

RANGE OF SERVICES

FEASIBILITY AND PROJECT REPORTS ☐ MARKET STUDY AND ECONOMIC INVESTIGATION ☐ SITE SELECTION AND SURVEY ☐ BASIC AND PROCESS ENGINEERING ☐ TENDER EVALUATION AND APPRAISAL ☐ DETAIL DESIGN ENGINEERING ☐ CONSTRUCTION SUPERVISION AND MANAGEMENT ☐ COMPLETE PLANT ERECTION ☐ START-UP AND COMMISSIONING ☐ INITIAL OPERATION ☐ TRAINING OF PERSONNEL ☐ POST-OPERATION CONSULTATION.

Indian consultancy helps the nation attain self-sufficiency in technical know-how

*

Issued in the interest of consultancy services by

THE KULJIAN CORPORATION (INDIA) PVT. LTD.

24-B, Park Street, Calcutta-16.

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

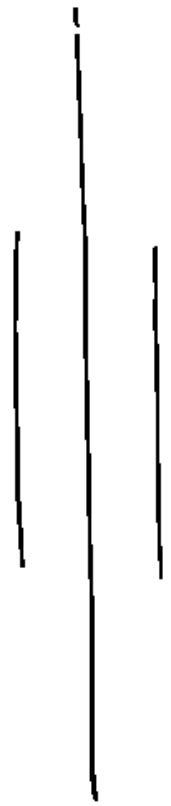

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

Evidently the reasoning mind finds it difficult to reach the Divine but a simple heart can enter into contact with Him almost without effort.

—The Mother

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Telegram : BIDYASEVA **Phone : 22-1532-33**

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

৯ ১০ অধ্যায় ৮—৯ অধ্যায়

৫—৬ অধ্যায় ,, প্রথম চার অধ্যায়

চারখানি বই। প্রতিটি—দুই টাকা

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-সি, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

এবং

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণীবহ

—বাংলায় আধ্যাত্মিক মাসিকপত্র—

শূন্যস্থ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

নিয়মিত লেখকদের মধ্যে আছেন : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, অমৃত, অনির্বাণ, নীরদবরণ, ঋষভচাঁদ, হিমাংশু নিয়োগী, নিখিলকান্ত গুপ্ত এবং আরও অনেকে।

বর্ণাঢ্য চিত্র ও রচনায় শোভিত হয়ে 'শূন্যস্থ' বাংলা মাসের প্রতি ৭ তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক সাত টাকা। বৎসরের যে-কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। দশ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।

শূন্যস্থ কার্যালয়

৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-১৩৫১

Reg. No. 13773/66

5 MAR 1965

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির প্রকাশনা

যোগ সাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
স্মৃতির পাতা (১ম পর্যায়)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪·৫০
ঐ (২য় ,,)	ঐ	৪·০০
কবিমনীষী (১ম খণ্ড)	ঐ	৩·০৫
ঐ (২য়)	ঐ	৪·৫০
রবীন্দ্রনাথ	ঐ	৩.৫০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও কর্ম	পশুপতি ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক)	৫·০০
Talks with Sri Aurobindo	by Nirodbaran	৮·০০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	অনিলবরণ রায়	২·০০
সাধনার জীবন	সমীরকান্ত গুপ্ত	১·০০

আশ্রম প্রকাশনা

বিবিধ রচনা	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০	উত্তম রহস্য	শ্রীমা	১·০০
ভারতের নবজন্ম		১·৫০	ছোটদের গল্প		১·৫০
কর্মযোগী		১·৫০	পুরাণো লেখা		১·৫০
জগন্নাথের রথ		১·০০	শিক্ষা		১·৫০
গীতার ভূমিকা		২.০০	মায়ের আলাপ		২·৫০
শ্রীঅরবিন্দের পত্র		১·০০	সর্বোত্তম আবিষ্কার		০·৩৭

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

ক লি কা তা—১২

ফোন—৩৪-২৩৭৬

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৯

বর্ষ—২৯ সংখ্যা—২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৯)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী		৫
সাবিত্রী	...	৭
সংগচ্ছধ্বম	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১১
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	১৭
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৩০
প্রসঙ্গত		৪৮
পথের কথা		৫৮
অমৃতের কবি		৬৪
কঠিন ডানার ওড়া	বীরবাহু	৬৯

পত্রিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০.০০	বার্ষিক	৩০০.০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০.০০		২০০.০০
ভিতরের মলাট	১৫০.০০		৫২০.০০
বাহিরের মলাট	২০০.০০		৬০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Edited By : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2
PRINTED IN INDIA

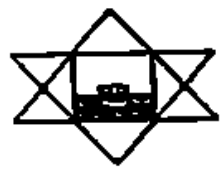

২৪শে এপ্রিল, '৬৯

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল—

ভগবৎ-প্রসাদকে কাজ করতে দাও তোমার মধ্যে, কখনও বাধা দেবে না তাকে, কখনও অকৃতজ্ঞ হবে না বা তার বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াবে না, সর্বদা তাকেই অনুসরণ করে চলবে লক্ষ্যের দিকে—আলো শক্তি ঐক্য ও আনন্দের দিকে।

—শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

বাহিরটা দেখে কখনও বিচার করবে না, গালগল্প শুনে ত' নোটেই নয়।

*

এক দেশে যা সুনীতি, অন্য দেশে তা কুনীতি।

*

ভগবৎ-সেবার দাবী হ'ল সকল সুনীতির অজ্ঞাত এমন ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ।

*

আশ্রমে কর্ম্মে গাফিলতি হ'ল কৃতঘ্নতা।

*

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন নিয়ম-পালন। জীবনধারণের জন্য শরীরকে পর্য্যন্ত তার সকল ক্রিয়াবই মধ্যে কঠোর নিয়ম-পালন করে চলতে হয়। এই নিয়ম-পালনে সামান্য শৈথিল্যও ব্যাধি নিয়ে আসে।

*

সংগঠন হ'ল কর্ম্মে নিয়মপালন। আমাদের লক্ষ্য, যে সব সংগঠন যথেচ্ছকৃত ও কৃত্রিম তা অতিক্রম করে যাওয়া। আমরা চাই এমন সংগঠন যা হবে একটা উচ্চতর চেতনার প্রকাশ, যার কর্ম্ম হ'ল ভবিষ্যতের সত্যকে প্রকাশ করা।

সে সংগঠন হ'ল স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধায়িত, পরম জ্যোতির্ম্ময় একটা কেন্দ্রের চারিদিকে সংগ্রথিত, একটা সমবেত বিধি-নিয়মের অনুগত।

*

কর্ম্মের জন্য সংগঠন ত' চাই-ই, তবে সে সংগঠন হবে সুনম্য এবং ক্রমোন্নত।

সকলের মধ্যে প্রয়োজন অখণ্ড সৎ-সঙ্কল্প, নিরবচ্ছিন্ন আশ্পৃহা সত্যকে জানবার জন্য এবং তার অনুগত হয়ে চলবার জন্য।

*

সুনম্য হবে এতখানি যে কর্ম্মের সকল দাবীর সম্মুখীন হতে পার আর ক্রমোন্নতির জন্য এমন অটুট সংকল্প রাখবে যাতে প্রতিনিয়ত চরম সত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়।

পরিশেষে সৎ-উপদেশ একটু :

নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে বেশী সজাগ থেকো অপরের ত্রুটির অপেক্ষা। প্রত্যেকে যদি আন্তরিকভাবে নিজের নিজের উৎকর্ষ সাধন করে চলে তবে সকলের সমবেত উৎকর্ষ আপনা হতে ঘটবে।

★

অরোভিল বাৎসরিক অনুষ্ঠানে মায়ের বাণী

স্বাধীনতা সম্ভব কেবল ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, আর ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হ'লে নিজের মধ্যে সকল বাসনার সম্ভাবনাকে পর্যন্ত জয় করতে হবে।

★

পয়লা জানুয়ারী রাত্রিতে আমার অভিজ্ঞতার কথা তোমাকে বলেছি কি...শোন তবে—অতিমানবের চেতনা আমার কাছে এসেছিল। প্রথমত: তিনিমাকে আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে পেরেছি খানিকটা পরে। বড় সুন্দর চেতনা এ, খুবই সুন্দর। অতিমানস সত্তার চেতনা এ নয়, এ হল অন্তর্বর্তী সত্তার চেতনা, যা হবে একটা সেতুর মত বর্তমান মানুষের আর অতিমানস সত্তার মধ্যে। এক প্রোজ্জ্বল চেতনা এ, জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞান। বিপুল শক্তি এক, বর্তমান মানুষী শক্তির চেয়ে অনন্তগুণে বিপুল--বর্তমান মানুষ জ্ঞান তো কিছুই নয়! চিরন্তন জ্যোতি আর মৃদু হাসা—কি হাসা সে কি বলব তোমায়... কি করুণা, কি কৃপা...অপরূপ, সত্যই অপরূপ! আর কি মাধুর্য্য, অতুলন মাধুর্য্য!

বাতাসে তা সে ছড়িয়ে গেল ধীরে ধীরে। যারা তৈরী, যারা গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত তারাই পাবে এ বস্তু। আমার কাছে এসেছিল, অতি স্পষ্টরূপে মূর্ত হয়ে এই এখানে। তবে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। অনেকে এখানে তার অনুভূতি পেয়েছে, যারা তৈরী তারা স্পর্শ পাবে তার।

★

১লা এপ্রিল—বার্ষিক শারীর ক্রীড়া উদ্বোধন উপলক্ষ্যে

এ বৎসরের আরম্ভ থেকে নূতন একটা চেতনা পৃথিবীতে কাজ করে চলেছে, মানুষ যাতে নূতন সৃষ্টির জন্যে, অতিমানসের জন্যে তৈরী হয়। এই সৃষ্টি সম্ভব হবে তখনই যখন মানুষের শরীর গঠিত যে পদার্থ দিয়ে তাতে ঘটবে একটা বিপুল পরিবর্তন, তা অর্জন করবে নবচেতনাকে গ্রহণ করবার অধিকতর সামর্থ্য, তার ক্রিয়াধারায় অধিকতর সহজনম্যতা।

শারীরিক শিক্ষায় আরম্ভ করা যায় ঠিক এই গুণগুলি।

এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে আমরা যদি উক্ত সাধনা অনুসরণ করে চলি তাহ'লে সার্থক সুফল আমাদের অধিগত হবে।

আমার আশীর্বাদ তোমাদের সকলের জন্য, উন্নতি ও সিদ্ধি যাতে হয় তোমাদের।

সাবিত্রী

(১২)

[ভগবান ভাগবতী সাবিত্রীকে বলে চলেছেন তাঁদের পৃথিবীর উপরে নরলীলা-রহস্য, তাঁদের পরস্পরের পরম প্রেমের ভিতর দিয়ে কি রকমে মাটির মানুষ পাবে নবজন্ম, পৃথিবী হয়ে উঠবে স্বর্গধাম।]

নরকের যন্ত্রণা তোমার পক্ষে হবে আমার চুম্বন,
স্বর্গের ফুল তোমাকে মনে করিয়ে দেবে যেন আমার স্পর্শ,
আমার কস্তুরিত নিশ্বাস বয়ে নিয়ে আসবে আমার যত মনোহারিতা,
অগ্নির কণ্ঠে সঙ্গীত তোমাকেই সাক্ষাৎ করবে,
সৌন্দর্য্য তোমাকেই অনুসরণ করবে
বহ্নির হৃদয় ভেদ করে চলে ;
তুমি আমাকেই চিনতে পারবে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আবর্ত্তন মধ্যে,
বিশ্বচক্রের পরমাণুর অন্তরে আমার সঙ্গে হবে তোমার সাক্ষাৎ,
আমার বিশ্বজগতে ঘূর্ণ্যমান শক্তিসব
তোমাকে ডেকে জানাবে আমার নামের আদেশ,
আমার মধুমান চন্দ্রিমা থেকে ঝরে পড়বে আনন্দধারা,
আমার সৌরভ বকুলের পাশবন্ধনে বাঁধবে তোমায়,
আমার দৃষ্টি তোমার দিকে চেয়ে রইবে সূর্য্যমণ্ডল হতে,
প্রকৃতির গুপ্ত আত্মচেতনা মূর্ত্ত হবে তোমাতে দর্পণে যেন,
তুমিই প্রতিফলিত করবে আমার অন্তর্হৃদয়গত আনন্দ ;
তুমিই আকণ্ঠ পান করবে আমার অনিন্দ্য মাধুর্য্য,
আমার তারকাখচিত আপূর্ণ শুভ্র পদ্মপাত্র হতে ;
তোমার বুকের উপর আমার নির্ম্মম হাত দু'খানির পীড়নে
তোমার সমস্ত সত্তাকে অভিসিক্ত করে দেবে
তোমার উগ্রতম এষণার ধারার স্রোতে ;
তুমি আবিষ্কার করবে সেই একমাত্র সুর
আর কণ্ঠাবেগ, আমার সকল ছন্দের বীণা তুমি,

উদ্বেলিত হয়ে চলবে প্রেমের মহাসাগরে, হে আমার
ফেনায়িত তরঙ্গ ;
যত দুর্গতির আলিঙ্গন দেব তোমাকে আমি,
সবই তোমার কাছে হবে
আমারই পরম উল্লাসের বিপরীত পরীক্ষণ,
বেদনার অন্তঃপুরে আমার নিভৃত মুখের হাসি,
তোমাকে সহ্য করতে হবে আমার নিত্যের পূর্ণপ্রকট সৌন্দর্য্য
জগতের অসহ্য নির্য্যাতনের মধ্যে,
কালের ক্রূর অনাচারে পদদলিত হয়ে
তোমার আকৃতি আহ্বান করবে আমার পরম উল্লাসের মধুস্পর্শ ;
সকল জীব তোমার জীবনে আমার দূত হয়ে দেখা দেবে,
তোমার প্রিয়ের বুকে তোমার আকর্ষণ হবে আমারই দিকে
শত্রুর দৃষ্টির মধ্যে আমাকেই সাক্ষাৎ করতে হবে,
আমার জীবেরা তোমার হৃদয়ে আমাকে কামনা করবে,
আত্মপ্রতিম কোন জীব থেকেই তুমি নিজকে সরিয়ে নিতে পারবে না,
অসহায়ভাবেই তুমি সকলের দিকে আকৃষ্ট হবে,
মানুষেরা তোমাকে দেখে অনুভব করবে আমারই আনন্দময় হস্তস্পর্শ
দুঃখের যন্ত্রণায় অনুভব করবে বিশ্ব-আনন্দের পদচারণ,
তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা হবে এই আনন্দেরই কল্লোলিত সংঘর্ষ
সৃষ্টি বিপরীতে পরস্পরে কামনার মধ্যে ;
যেখানে যে হৃদয় তোমার ভালবাসার স্পর্শ পেয়েছে
সে আমার আহ্বানে সাড়া দেবে,
আবিষ্কার করবে জ্যোতিষ্কমণ্ডলির আদিম-সঙ্গীত
তোমার কণ্ঠের ভাস্বর স্বরগ্রামে,
তারা আসবে আরও নিকটে আমার,
কারণ তুমি যে রয়েছ।
তোমার অন্তরের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে
তারা আমার দেহ আলিঙ্গন করবে
তোমার অন্তরাত্মার মধ্যে ;
তোমার জীবন-ধারায় শুনবে আমার মধুর কলহাস্য,
জানবে সেই রভস-শিহরণ যা দিয়ে আমি গড়েছি সকল সৃষ্টি ;

যা কিছু তোমার সব হবে আর সকলের আনন্দের জন্যে,
যা কিছু তুমি সবই হবে আমার করতলগত ;
আনন্দ আমি ঢেলে দেব তোমা হতে তৃপ্তার হতে যেন,
তোমাকে আমার রথের মত করে পথে পথে চালিয়ে নেব,
আমার তরবারি হয়ে, আমার বীণা হয়ে তুমি আসবে আমার সেবায় ;
তোমাকে আশ্রয় করে আমার মানস স্তোত্রমালা খেলিয়ে তুলব,
আর যখন তুমি নিখিল রভসে হবে স্পন্দিত মন্ত্রিত,
যখন তুমি সকল জিনিসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলবে
তখন তোমাকে আর আমার জীবন্ত বহ্নিশিখা থেকে
বাঁচিয়ে রাখব না
তোমাকে আমার সনাতন শক্তির বাহকরূপে গড়ে তুলব
আমার নিভৃত সত্তাই ত' তোমার যজ্ঞাতে তোমাকে চালিয়ে এনেছে
তোমার আদি আরম্ভ হতে ছিলে যখন ভূতলের কণ্ঠহারা বুকে,
জীবনের বেদনার কালের সংকল্পের নৃত্যের ভিতর দিয়ে,
বাহ্য সংঘর্ষের আর আন্তর নৈঃশব্দ্যের ভিতর দিয়ে,
দেশের কালের অলৌকিক পথ বেয়ে,
সেই অভিজ্ঞতার অভিমুখে সমগ্র প্রকৃতি যাকে
ঠেকে রেখেছে
যে ধায় আমার অনুসরণে, যে আমাকে অধিকার করে
সে হয় আমারই বন্দী,
এ কথা তুমি এখন বুঝবে তোমার আপন হৃদয়-স্পন্দন থেকে,
চিরদিন ভালবেসে চলবে তুমি, ভগবানের বরণীয়া দাসী তুমি,
আমার আনন্দের ক্রম-বিস্তৃত পাশবন্ধ তুমি,
আমার বিশ্বপ্রীতির গ্রন্থি হবে তুমি ;
তোমার যাদুপাশে আবদ্ধ যে জীব তাকে বাধ্য করে নিয়ে চল
সৃষ্টির মধুর অতল একত্বের আনন্দে ;
বাধ্য সে আমার সংখ্যাতীত যাবতীয় একক
আলিঙ্গন করতে,
আলিঙ্গন করতে যত আমার সীমাহীন রূপায়ণ
আর যত দিব্য জীব।
হে মন, শাশ্বত শান্তি নিয়ে পূর্ণ হও,

হে বাক্, গাও উৎকণ্ঠে অমর উদ্‌গীথ,
সোনার ঢেউল তৈরী হয়েছে, জন্ম নিয়েছে বহ্নিকুমার।

*　　*　　*

জীবনক্ষেত্রে তবে অবতরণ কর
　　তোমার হৃদয়ের কাম্য যে জন তাকে সঙ্গে নিয়ে
হে সত্যবান, জ্যোতির্ময়ী হে সাবিত্রী,
তোমাদের দুজনাকে আদিকাল হতে
　　আমি পাঠিয়ে দিয়েছি তারকাবওলি তলে,
ভগবানের যুগলশক্তি তোমরা, অজ্ঞানের জগতে,
সীমাবদ্ধ সৃষ্টির মধ্যে—
　　সীমাহীন আত্মস্থিতি হতে বহুদূরে—
ভগবানকে নামিয়ে আনবে তোমরা নিশ্চেতন দীপনের মাঝে
নশ্বর জীবকে তুলে ধরবে অমরত্বের মধ্যে।

সংগচ্ছধ্বং

(এক সঙ্গে হও, এক সঙ্গে চল)

সংঘবদ্ধ মুক্তিরও স্বপ্ন মানুষে দেখেছে তার সংঘবদ্ধ ভুক্তির মত। উৎসবে ব্যসনে আমরা যত ভীড় করি, আমাদের উৎসাহ আনন্দ তত বেশী হয়ে যায়—**The more the merrier.** তবে আধ্যাত্মিক জীবনে সাধারণ মন্ত্র হ'ল যেন—একলা চল রে। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যেন একক অদ্বৈত—দ্বিতীয় পক্ষ এসে বিভাগ বিভেদ এনে দেয় না—উচিতও নয়। এই যে একান্ত অনন্য অদ্বিতীয় অনুভূতি এই হ'ল আধ্যাত্মিক সিদ্ধির পরম ধাম—উত্তম ধাম—যার পরে আর কিছু নেই।

কিন্তু চেতনার আর একটি ধারা আছে, যা কেবলই উঠে চলে যেতে চায় না, এই সকলকে, এখানকার যাবতীয়কে ছেড়ে পরিহার করে নাস্তি করে। সে চায় একা নয়, সকলকে নিয়ে চলতে, সকলের সঙ্গে ভাগে জীবন ধারণ করতে। কেবল উর্দ্ধায়ণ নয়, প্রসারণও সত্তার ও চেতনার আর একটা স্বধর্মগত প্রবেগ। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" কেবল যে লোকায়ত আদর্শ তা নয় সকলকে নিয়ে যে জীবন তা যে কেবলই লৌকিক জীবন তা নাও হতে পারে—অধ্যাত্মজীবনেরও হতে পারে ও হওয়া উচিত ঐ ধারা।

বিশ্বকে নিজের মধ্যে সংহত করে ধরতে হবে, সেই সঙ্গেই আবার বিশ্বের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে হবে—ভগবানকে কেবল আত্মাকে দিয়ে গ্রহণ করা নয়, তাঁকে সমগ্র আধার দিয়ে আলিঙ্গন করাই হ'ল পূর্ণতর আধ্যাত্মিকতা। আবার শুধু ব্যষ্টি হিসাবে নয়, সমষ্টি হিসাবেও ভগবানের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ হতে পারে। এই তত্ত্বকে লক্ষ্য করেই বুদ্ধদেব তাঁর ত্রিরত্নের মন্ত্র দিয়েছেন

"বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি
ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি
সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।"

প্রথমে প্রয়োজন সম্বুদ্ধ সত্তা, পূর্ণ চিন্ময় চৈতন্য, সংহত জাগ্রত মূর্ত্ত দিব্য চেতনা। এই মূল মূর্ত্ত সত্তা গোড়ায়, তারপর সেই সত্তোর প্রকাশ তার ক্রিয়াবলির মধ্যে, সত্তোর বিধি-বিধান কর্ম্মধারা তাকেই বলে ধর্ম্ম, বৈদিক ঋষিরা বলতেন ঋতম্। সত্তা এবং ঋত অর্থ সত্যের প্রকাশ, তা আবার কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে নয়, তা হবে বহুর সমবেত জীবনের মধ্যে প্রকট ও প্রতিষ্ঠ। এমন কি সকল মানুষ, সমগ্র মানবজাতির হবে এই সত্যপ্রতিষ্ঠ, সত্যে কর্ম্মায়িত জীবন। বৌদ্ধ সাধনায় এরই নাম দেওয়া হয়েছে সঙ্ঘ, 'সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি', বহুর সম্মিলিত অধ্যাত্মজীবন।

বৈদিক ঋষিরাও বলেছেন "সমিতি"র কথা, অর্থাৎ সম্মিলিত গোষ্ঠী। এখানেও লক্ষ্য করতে হবে, শুধু যাহা প্রাকৃত জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য তাঁরা যে সকলকে আহ্বান করে বলেছিলেন—"সং গচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্", তা নয়, এ হ'ল বলেছি একটা সমবেত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি, তোমাদের সকলের কথা এক হোক, মন এক হোক, হৃদয় এক হোক, তোমাদের যাত্রা এক হোক, একই সত্য ফুটে উঠুক সকলের মধ্যে—এই ত হ'ল ঋষিদের আকূতি।

তোমাদের বৈদিকমন্ত্রটি সবখানি পড়ে শোনাই, এটি ঋগ্বেদের শেষমন্ত্র, ঋষিরা যেন তাঁদের বার্তার, উক্তির সু-উক্তের সারাংশ, নিভৃত উদ্দেশ্য বিবৃত করে উপসংহার করেছেন :

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইড়স্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর॥ ১॥

পুরুষবৃষ তুমি, হে অগ্নি, আর্য্য তুমি। বিশ্ববস্তুকে তুমি চারিদিক হতে সম্মিলিত করে রেখেছ।

প্রদীপ্ত তুমি পূজাস্থানে। আমাদের জন্য তুমি নিয়ে এস যাবতীয় ধন। (১)

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥ ২॥

এস তোমরা একসঙ্গে, কথা বল তোমরা একসঙ্গে—মন তোমাদের জানে যেন এক-সঙ্গে—দেবতারা যেমন একসঙ্গে জেনেছিল এবং একসঙ্গে যথা ভাগ পেয়েছিল। (২)

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ ৩॥

এক হোক তোমাদের মন্ত্র, এক হোক তোমাদের সম্মেলন, এক হোক তোমাদের মন, এক হয়ে যাক তোমাদের চেতনা।

তোমাদের সঙ্গে এক মন্ত্র আমি পাঠ করি, এক আহুতি অর্পণ করি। (৩)

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ৪॥

এক হোক তোমাদের আকূতি, এক হোক তোমাদের হৃদয় সব। এক হোক তোমাদের মন, যাতে একসঙ্গে সম্পূর্ণ সম্মিলিত হয়ে যেতে পার তোমরা। (৪)

সমবেত সাধনার ও সিদ্ধির রহস্যকে শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম একটা বিশেষ রূপ দিয়েছে। ব্যক্তিগত উন্নতি ও সিদ্ধির কথা অন্যান্য সাধনা-সম্প্রদায়ের মত সেখানেও আছে বলা বাহুল্য, সে তত্ত্ব ভিন্ন। কিন্তু এখানে শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আবার

মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে একলা একক নয়, বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ব্যষ্টিমাত্র নয়, সে হ'ল একটা গোষ্ঠির অন্তর্গত, গোষ্ঠির একটি অঙ্গ এবং সে-গোষ্ঠিরও একটা সিদ্ধি আছে গোষ্ঠি হিসাবেই। এই গোষ্ঠিগত সিদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তিগত সিদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত, শুধু তাই নয়, এক হিসাবে গোষ্ঠির স্থান ব্যক্তির উপরে, গোষ্ঠির সিদ্ধি অনুসরণ করেই চলবে ব্যষ্টিগত সিদ্ধি। খ্রীষ্টীয় গোষ্ঠি, চার্চ, একটা দলমাত্র নয়, কতকগুলি ব্যক্তির একত্র সমাবেশ নয়; চার্চ হ'ল জীবন্ত সত্তা, একটা সমষ্টি হয়ে সে পেয়েছে জাগ্রত ব্যক্তিত্ব। চার্চ হ'ল খ্রীষ্টের বৃহত্তর দেহ, আবার সে হ'ল খ্রীষ্টের পত্নিতা, অর্দ্ধাঙ্গিনী, প্রণয়িনী, বধূ। সলোমনের গানে যাকে sister বলে, spouse বলে আদর করা হয়েছে তা হ'ল খ্রীষ্টীয় তত্ত্বদর্শীদের মতে খ্রীষ্টের আপন প্রিয়তমা প্রিয়া—

A garden inclosed is my sister, my spouse; a spring shut up, a fountain sealed.

খ্রীষ্টীয় সাধকেরা তাদের চার্চকে গ্রহণ করেন খ্রীষ্টের সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিত হবার শ্রেষ্ঠ এবং অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপায় হিসাবে। তবে সেখানেও যে স্বর্গীয় জীবন কাম্য করা হয়েছে তা স্বর্গেতিষ্ট, ভূতলের নয়—ব্যক্তিগতভাবে মনেতভাবে। **The kingdom of heaven is within you.** স্বর্গে গিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে, স্বর্গের ভগবানের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে থাকতে হবে তাঁর পার্ষদ হিসাবে এবং তার পরম প্রীতি অনুভব করতে হবে—এই হল মানুষের সার্থকতা, তার পরম ইষ্ট।

এখন আমাদের কথা—আমরা বলি এই সৃষ্টির অর্থাৎ এই ব্যক্ত সমষ্টির একটা পরিণতি আছে—যেমনটি সে আছে তেমনটি থাকবে চিরকাল তা নয়, সৃষ্টি চলেছে একটা লক্ষ্যের দিকে এবং তার সমস্ত প্রয়াস সেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে, সেই লক্ষ্যকে বাস্তব ও বর্ত্তমান করে তোলা। প্রতি মুহূর্ত্তে তার প্রত্যেক গতির অর্থ এই এই প্রগতি। এবং তা হ'ল ভগবানকে পরম সত্যকে শক্তিকে আনন্দকে সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্ত করে তোলা পার্থিব উপাদানের মধ্যে। সৃষ্টি হ'ল বহুর সমাবেশ তবে বর্ত্তমানে বহু অর্থ শুধু বৈচিত্র্য নয়, বিরোধ। কিন্তু ভাগবত সমগ্রতার মধ্যে বহুর হবে সম্মেলন—একত্বে ঐক্যে সামঞ্জস্যে পারিপাট্যে তা স্বয়ম্-প্রকাশ—তুমি-আমি-সে প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টি এই সমগ্রতার অংশ বা অঙ্গ, বিশেষ প্রকাশ। ব্যষ্টি ও সমষ্টি সেখানে পরম একত্বের মূর্ত্তি—হরি-হর।

তবে বলেছি সমষ্টি কেবল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা ব্যষ্টির সংগ্রহ-মাত্র নয়, ব্যষ্টিরই সার্থকতা ও সিদ্ধি আপনা হতে সমষ্টির সার্থকতা ও সিদ্ধি যে এনে দেবে তা নয়, উভয়ের মধ্যে সেতুরূপে প্রয়োজন একটা ক্ষুদ্রতর সমষ্টি এবং বৃহত্তর ব্যষ্টি। এরই নাম গোষ্ঠি, আবার বলা হয়েছে সংঘ বা সমিতি, যখন তার লক্ষ্য হয়েছে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি। আমরা বলি কেন্দ্র, চক্র—চক্র হল বিশেষভাবে তান্ত্রিকদের। গোষ্ঠি শিক্ষা দেয় সমবেত

জীবন-ধর্ম্ম পালন, ব্যক্তিগত অহং-সর্বস্ব সত্তাকে বহুতর সত্তার মধ্যে একীভূত করে একটা সহজ সমৃদ্ধ সমবেত জীবনযাপন। জীবনে একটা সম্মিলিত শ্রী ও পারিপাট্য সাধন হল গোষ্ঠিগত সাধনার লক্ষ্য। গোষ্ঠি হল এই সাধনার ক্ষেত্র। এই সব গোষ্ঠিই হল সমবেত ঐক্যের একত্বের গ্রন্থি যেন। সমগ্রের গঠন-পারিপাট্য নির্ভর করে এই গোষ্ঠিগত পারিপাট্যের উপর। আদর্শ সংঘ-গঠনের জন্য চারিটি মূলমন্ত্র আমরা উল্লেখ করতে পারি, মা ও শ্রীঅরবিন্দের বাণী থেকে—

প্রথমেই হল শ্রীমা যে বাণী দিয়েছেন সংঘ-স্থাপন উপলক্ষ্যে। মা বলেছেন: "একটি শাখা-কেন্দ্রের উদ্বোধনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পূর্ণ আন্তরিকতা, অনন্ত অন্তরাগ্নি, ভগবানে অখণ্ড আত্ম-নিবেদন।" এ হল যেন প্রতিষ্ঠা-মন্ত্র, সকল প্রতিষ্ঠানের মূল সত্য—ফলতঃ যা হল সকল কর্ম্মের, সকল সৃষ্টিরই প্রথম সূত্র—কারণ, চাই আন্তরিকতা, অন্তরের অন্তর দিয়ে আকাঙ্ক্ষা করা চাই লক্ষ্যকে; এ হবে সর্বগ্রাসী সত্য আর সেই সত্যের জন্যে অখণ্ড সর্বব্যাপী আত্মোৎসর্গ, আত্ম-নিবেদন। এই হ'ল উদ্বোধন-মন্ত্র—আন্তরিকতা, আত্মনিবেদন। পরের মন্ত্র হ'ল বাহ্য কর্ম্মের বিধি। শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন তা এই ভাবে—"মাকে ভালবাসবে, সর্বদা তোমার আচরণ হবে এই বোধে যেন মা তোমার দিকে চেয়ে রয়েছেন, কারণ তিনি সত্যসত্যই রয়েছেন তোমার সম্মুখে।" কি কর্ম্ম করতে হবে, কি রকমে কর্ম্ম করতে হবে তার নির্দ্দেশ তোমার বিদ্যাবুদ্ধি থেকে আসে না, তোমার আপন যোগ্যতা থেকেও আসে না, তা আসে সকল কর্ম্মের উৎস যে শক্তি, সকল কর্ম্মের আদি অনুপ্রেরণা, মায়ের ইচ্ছা থেকে। তাঁকে সম্মুখে রেখে, তাঁর প্রভাব ও অনুভব নিয়ে যে কর্ম্ম স্বতঃ-উৎসারিত তাই হবে তোমার কর্ম্ম। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন এই যে জীবন-নিয়ন্ত্রী শক্তি তা সুদূরের বস্তু নয়, তিনি সর্বদা রয়েছেন তোমার সামীপ্যে, তোমার প্রত্যক্ষে, তোমার প্রয়োজন শুধু সেদিকে ফিরে চেয়ে দেখা। এইভাবেই যে কর্ম্ম হয় তাই হল করণীয় কর্ম্ম (গীতায় যাকে বলেছে কর্ত্তব্যম্), ফলতঃ যা হল দিব্যকর্ম্ম—ভাবগত কর্ম্ম। তাই তৃতীয় মন্ত্রে বলা হবে কর্ম্মের প্রকৃতি ও স্বধর্ম্ম, সে মন্ত্র মা নিজে দিয়েছেন: "কাজ করবে যেন প্রার্থনা করছ এইভাবে, শরীরের পক্ষে কাজই হল ভগবানের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা।"

ফলতঃ কর্ম্ম কর্ম্মমাত্র নয়, কর্ম্মকৌশলও নয়; কর্ম্ম হল স্থূলভাবে ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার উপায়—জড়ের ক্ষেত্রে যেন ভাগবত তনুর সঙ্গে, সাযুজ্য এবং সাধর্ম্ম্য লাভ। কর্ম্ম হ'ল শরীরের আকূতি, মূর্ত্ত আকূতি; কথা শরীরের থেকে আসে না, কথা বলে মন—শরীর যেন বোবা, তার ভাব সে ব্যক্ত করে কর্ম্মে। কর্ম্মেই প্রকাশ শরীরের আপন আগ্রহ, অন্তঃপুরুষের আহ্বানে শরীর উত্তর দেয় যে ভাষায় তারই নাম কর্ম্ম। এই আন্তর আকূতিকে রূপ দেয়, মূর্ত্ত করে যে কর্ম্ম সে কর্ম্মই করণীয় বা

কর্তব্য কর্ম, অন্যান্য সব কর্ম অকর্ম বা বিকর্ম। পরিশেষে এই যত অনুষ্ঠান আর যত প্রতিষ্ঠান আমরা রচনা করি তার সর্বসাধারণ রহস্যটি শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন, সেই হল আমাদের চতুর্থ যজ্ঞ—"সৃষ্টির সব সমস্যাই হ'ল সমন্বয়ের সমস্যা"। সৃষ্টি অর্থ জীবন অর্থ সমাজ অর্থ বহুর ব্যষ্টির সমাবেশ। আমরা জানি বহুর বহুই পার্থক্য, বিভেদ, বিরোধ এবং সংঘর্ষ। কিন্তু এ হল বিশ্ব আয়োজনের প্রথম পৈঠা, যজ্ঞানের অর্ধজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য বিধান, পাশ্চাত্যরা উচ্চকণ্ঠে যার নাম দিয়েছেন struggle for existence। তবে এটি গোড়ার আয়ত্তের প্রথম পথ। কিন্তু আবিষ্কার করতে হবে, সৃষ্টি আবিষ্কার করে চলেছে একটি সমন্বয়, বিরোধী ব্যষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য—মিলে মিশে থাকা ও চলা। এই সম্মেলনের নানা স্তর রয়েছে—আরম্ভে অপরিণত অপক্ক চেতনা, তবে মানুষের চেতনা যত বর্ধিত পরিণত হয়ে চলেছে তত বৃহত্তর ও নিবিড়তর সামঞ্জস্য তার মধ্যে ফুটে উঠেছে ও উঠবে। বাহিরের দিক থেকে দেখা যায় মানুষের ঐক্যক্ষেত্র ক্রমে প্রসারলাভ করেছে, চেতনা তার ক্রমে আপন অহং, পরিবার, বংশ, জাতি, দেশ, বিশ্বমানব আশ্রয় করে এই রকমে ধাপে ধাপে পরিবর্ধিত পরিণত পরিনাম লাভ করেছে। একান্ত ব্যক্তিগত এক ক্রমে বহু হতে বহুতরের ঐক্যে পরিণত হয়। ঐক্যের পরিধি বিশ্বকে আলিঙ্গন করে।

কিন্তু এই যে ক্রমবিস্তার তা যদি শুধু সমান স্তরে, সমতলে ঘটে তবে সে সমন্বয় বা সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হয় না, নিখোঁদ হয় না, স্থায়ী হয় না। সে সমন্বয়ের অর্থ বিভিন্ন বিরোধী ব্যষ্টিদের মধ্যে মিতালী, মিটমাট, রফা বা সন্ধি, তা আসল ঐক্য, একত্ব নয়। সমন্বয় ঐক্য পূর্ণতর নিবিড়তর স্ফুটতর হতে পারে যখন চেতনা কেবল তির্যক্ প্রসারিত নয়, কিন্তু যখন আপনাকে ক্রমোন্নত করে ধরে, স্বাভাবিক স্তর হতে ঊর্ধ্ব তর স্তরে উন্নীত হয়।

সুতরাং গোষ্ঠিবন্ধনকে দৃঢ়স্থায়ী সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে প্রয়োজন তার অন্তর্গত ব্যষ্টিদের ক্রমোন্নত চেতনা। আর এই চেতনার ক্রমোন্নতি হতে পারে কর্মসাধনার দ্বারাই। সুষ্ঠু কর্ম সাধিত হতে পারে সমবেত প্রচেষ্টায় অর্থাৎ একটা গোষ্ঠির মধ্যে। ক্রমপুষ্ট ক্রমোন্নত গোষ্ঠিদের সমবায়েই ঘটে সার্থক সমষ্টি। গোষ্ঠির প্রয়োজন, আমি বলেছি যে তা হল সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে সংযোগ-সেতু। একটা সীমায়িত সুসীম আয়তনের মধ্যে কর্মায়িত জীবন ব্যষ্টিদের শিক্ষা দেয় কি উপায়ে অহংকে সংযত বিশুদ্ধ, এমন কি রূপান্তরিত করে তোলা যায়, কি রকমে ঐক্যে একত্বে সম্মিলিত হতে হয় অপরাপরের সঙ্গে। কর্মময় রূঢ় জীবন এই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই পথেই ব্যক্তির চেতনাও ক্রমপ্রসার লাভ করে। অপরপক্ষে গোষ্ঠির গোষ্ঠিগত ক্রমোন্নতি ক্রম-ঊর্ধ্বায়ণ নির্ভর করে তার ব্যষ্টিদের চেতনার উপর—কারণ ব্যষ্টি হ'ল পুরোধা, তার চেতনার প্রবেগে পথ খুলে ধরে, দুয়ার উন্মুক্ত করে ঊর্ধ্বের দিকে, নিয়ে চলে ঊর্ধ্বতর চেতনার স্তরে। ব্যষ্টি-চেতনা গোষ্ঠি-চেতনাকে ঊর্ধ্বে

নিয়ে চলে আর গোষ্টি-চেতনা ব্যষ্টি-চেতনাকে প্রসারিত করে ধরে, এইভাবে উভয়ে উভয়ের সহায় ও পরিপূরক। এইভাবেই উভয়ে নিয়ে চলে সমষ্টিগত সিদ্ধির দিকে।

সংগঠনের এই হল যেন প্রকৃতির আপন ছক। মানবদেহেও দেখি তার মূল উপাদান বা উপকরণ হল জীবকোষ, এরাই ব্যষ্টি। এরা বিভিন্ন রকমে দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন গোষ্টি সৃষ্টি করে, তাদের নাম হল মণ্ডলি (system)—রক্ত-চলাচলের জন্য, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য, ধারণ-সারণের জন্য বিভিন্ন ধারা বা মণ্ডলি রয়েছে, আরও রয়েছে স্নায়ুমণ্ডলি, gland বা রস-গ্রন্থি-মণ্ডলি—এরা সকলেই বিভিন্ন ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করে এবং একটা সামগ্রিক সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে, পারিপাট্যে শরীরকে স্থাপিত করে। বাহিরে অনন্ত সৃষ্টির মধ্যেও দেখি একই অনুরূপ ছক, বিক্ষিপ্ত গ্রহ-নক্ষত্র কেবলই বিচ্ছিন্ন একক বস্তু নয়, তারাও দলবদ্ধ সংঘবদ্ধ হয়ে চলে যেমন সূর্য্যমণ্ডলি, নীহারিকা-মণ্ডলি। সৃষ্টির মধ্যে এরকম অসংখ্য মণ্ডলি রয়েছে এবং সকলের সুসংগত গতি গড়ে তুলেছে বিশ্ব-ছন্দ।

আমাদের গোষ্টির নাম যে আমরা দিয়ে থাকি কেন্দ্র (ইংরাজী centre) বোধ হয় সার্থক নাম। কেন্দ্রকে আশ্রয় করেই একটা গোটা সংগঠন তৈরী হতে পারে। সৌর-জগতের কেন্দ্র সূর্য্য, সূর্য্যকে ঘিরে আশ্রয় করে এই গ্রহ-নক্ষত্র সব যথা-নিয়মে ঘুরে চলেছে—পরমাণুতেও দেখি তার কেন্দ্র-কণাকে আশ্রয় করে তার চারিদিকে অন্যান্য কণাসব ঘুরছে এবং একটা গোটা অণু বা পরমাণু গড়ে তুলেছে। কিন্তু সকলের উপরে মনে রাখতে হবে কেন্দ্র কেন্দ্র হয়েছে কারণ তাতে রয়েছে কেন্দ্রশক্তি যাকে বলা যায় কেন্দ্রের কেন্দ্র। আমরা জানি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তার যে কেন্দ্র অর্থাৎ অন্তরাত্মা চৈত্যপুরুষ তাকে আশ্রয় করে। এই কেন্দ্রগত অন্তরাত্মাকে যতখানি সজ্ঞানে একান্ত অনুগত হয়ে চলে ব্যক্তির বাহ্য আধার অর্থাৎ তার দেহ প্রাণ-মন, ততই তার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট পরিণত সমৃদ্ধ ও সার্থক হয়ে ওঠে—ভাগবত সাক্ষপ্য লাভ করে।

সেই রকমে আমাদের গোষ্টিগত কেন্দ্রসকলেরও গড়া চাই বা থাকা চাই জীবন্ত কেন্দ্রশক্তি—তা হ'ল মায়ের জাগ্রত সংস্থিতি। বলা হয়েছে তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই জাগ্রত—মায়ের এই জাগ্রত স্থিতি সম্বন্ধে একটা গোষ্টি যত সজাগ সচেতন হয়ে ওঠে তার দৃষ্টি অনুসারে তাদের যত আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে ততই কেন্দ্র যথার্থ সার্থক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সবেতে সার্থকতা অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেও তার অন্তরাত্মার কেন্দ্রিয় প্রেরণা অনুসারে চলতে হবে কারণ অন্তরাত্মার কেন্দ্রই মায়ের প্রতিরূপ প্রতিভূ।

ব্যক্তির জীবনে পারিপাট্য তার পরিণামে গোষ্টিজীবনে পারিপাট্য দেখা দেবে তখন যখন তারা একীভূত হয়ে যাবে মাতৃশক্তির অঙ্কে। আর তখনই স্থাপিত হবে একটা সামগ্রিক সিদ্ধি ও সার্থকতা কারণ তখন সমগ্রটি হবে মাতৃপ্রসাদের প্রসার।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

ধর্মক্ষেত্র এই জীবনের কুরুক্ষেত্রে কর্মযজ্ঞসাধনার প্রসঙ্গে আমরা দেখলাম, পূর্ণ-যোগের সাধককে তার উপলব্ধ জ্ঞানসমূহ সেই একবিজ্ঞানে বিধৃত রেখে বিচার করে চলতে হবে। সেই অখণ্ড সমগ্রের জ্ঞান উপলব্ধি করতে না পারলে দেবরথ কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করে উত্তরায়ণের অধ্বর গতি লাভ করা যাবে না। সর্বব্যাপী অনন্ত সত্তার এক চৈতন্যে সবকে বজায় রেখে কর্ম করার মূলে তাঁরই ইচ্ছা উল্লসিত হয়ে চলেছে, এটা বোঝে আসা চাই। তা না হলে কর্মের আদর্শ আচরণ ঠিক করা যাবে না। কেননা কর্ম যে সকলকে করতেই হবে তা তো বোঝা গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্মের ভাল মন্দ কর্তব্য অকর্তব্যের বিচারও করতে হয়। সেই বিচার-বোধ দিয়েই মানুষ কর্তব্য কর্মের একটা আদর্শ গড়ে নেয়। সেই আদর্শ অনুযায়ী আচরণকে আমরা বলে থাকি ধর্মাচার বা সদাচার। আবার মানুষের মধ্যেই থাকে দেব-স্বভাব ও অসুর-স্বভাব। অসুর-স্বভাবেরা স্বেচ্ছাচারী। তারা তাদের কর্মপথে চলতে গিয়ে বাধা পেলেও প্রকৃতির পরিবর্তন করতে রাজী হয় না। কিন্তু মানুষের মনে আদর্শ-বোধ যখন উজ্জ্বল থাকে, তখন নিজের মধ্যে সে লোকোত্তরের আলো দেখতে পায় ও তার মহিমা উপলব্ধি করতে পারে। তাই মহাপুরুষ দর্শন করে ও তাঁর বাণীতে বড় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন সে চলতে চায়, তখন সাধারণ ভোগ-জীবনের ঊর্ধ্বে সে বিচরণ করে। কিন্তু সেই মহামানবের জীবন-বেদ অনুসরণ করতে গিয়ে সে যদি বাঁধা-ধরা এক প্রথামাত্রেরই দাস হয়ে পড়ে, তখন সে এক নৈতিক ধর্মের নিজেরই গড়া মোহ-জালে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। ধর্ম সদাচার এ তো চাই, না হলে চলবে না। কিন্তু সে ধর্মাচরণ যদি যান্ত্রিক সীমাবদ্ধ এক নীতিতেই পর্যবসিত হয়, তা থেকে বৃহৎ হওয়া যায় না। তাই ধর্মের বন্ধন থেকেও শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতে হয়। যে কোন নিয়ম, তা সে যত বড় আদর্শকেই বহন করুক না কেন, তা যদি চাপে পড়ে অনুকরণ করতে হয়, তাহলেই সেটা বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু সেই ধর্মের প্রেরণা অন্তরে অনুভব করে, তার আদর্শ অনুসরণ করে চললে ব্যক্তি হয় স্বতন্ত্র; প্রাকৃত ধর্মের নিয়ম তাকে আর তখন বেঁধে রাখতে পারে না। অন্তর্যামীর প্রেরণা তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে, তার গতি হবে আকাশ-বিহারী হংসের মত স্বচ্ছন্দ, আর তা হতেই সে তার স্বভাব ও স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। শ্রীঅরবিন্দ তাই যোগ-প্রস্থানে কর্মযোগের প্রসঙ্গেই সদাচার

ও স্বাতন্ত্র্য (Standard of conduct and spiritual freedom) যে একই সঙ্গে অন্বিত, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কর্ম করতেই হবে, কর্ম না করে উপায় নেই। কিন্তু অন্বয়জ্ঞানে আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞান এই তিন জ্ঞানেই সিদ্ধ হয়ে কর্ম করতে হবে, এ প্রসঙ্গ প্রজ্ঞার কর্মে আলোচিত হয়েছে। এই আমি বৃহৎ হতে চাই, আর তার আদর্শ হল ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া। আমার চারিপাশে যে বৃহৎ বিশ্ব, সেখানে আমি ও বস্তুর সমাহার। আবার সব ছাপিয়ে ঊর্ধ্বের এক তত্ত্ব আমাকে ও বিশ্বকে একই সঙ্গে ধরে আছে, সেই ঊর্ধ্বের তত্ত্বকেই বলতে পারি ঈশ্বর। কেননা এই যে আমি আছি, জগৎ আছে, একই ছন্দে সমন্বিত হয়ে সবার সঙ্গে সব কিছু নিয়ে যে চলেছি, সে ছন্দের নিয়ামক কে? কার ঈশনায় সেই ছন্দ প্রবর্তিত, কার শক্তিতে তা বিধৃত? সেই তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, কর্মে তাঁরই শক্তির প্রকাশ। এমন করে অনন্তের বোধে বিধৃত থেকেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিশ্বের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে সান্ত সসীমের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। তাই আমি (আত্মা) জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিনের সমীকরণ হয় যে সমন্বয়ী অনুভবে, তারই তিনটি মুখ (aspect) প্রকাশ পেয়েছে তিনটি মহাবাক্যে—"আত্মা সর্বভূতাত্মা" "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "অহং ব্রহ্মাস্মি" বা "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। তখন ব্যক্তির মধ্যে যে আত্মমহিমার বোধ স্ফুরিত হতে থাকে, তার পরিপাকে সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপী বিভুত্বের প্রকাশ ঘটে এবং "পরাঞ্চিখানি" এই ইন্দ্রিয় পথেও সেই মহিমাঘন ব্রহ্মজ্যোতিই বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এই ভাবে অনন্ত সত্তা বিশ্বচৈতন্যে ব্যাপ্ত বিশ্বদেবশক্তিতে যুক্ত হয়ে ব্যষ্টির মাধ্যমেই আবার কর্মে নেমে আসেন, তাতে তাঁর কর্মযজ্ঞ শান্তি সমৃদ্ধি ও অমৃত ফল দান করে।

আমরা জানি মন সান্ত খণ্ড দৃষ্টিতে অনন্তকে সীমিত করে। তাই সাধনার উদ্দেশ্য হল, সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ যাতে পরিবর্তিত হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগে পরাবিদ্যা দ্বারা অপরাবিদ্যাকে উদ্ভাসিত হতে দেখিয়েছেন। সেই বিদ্যার প্রয়োগে কাব্য সাহিত্য শিল্প দর্শন সবই দিব্য সৌন্দর্যের ধারক ও বাহক হয়ে থাকে। "সাবিত্রী" কাব্যে যোগের দর্শন ও বিজ্ঞান জ্ঞানের সব ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে সৌন্দর্য ও সুষমায় রূপায়িত হয়েছে এক মহান সঙ্গীতে। কবির প্রাতিভ-সংবিৎ মহান থেকে অণু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্র ও বস্তুর হৃৎকেন্দ্র উন্মোচিত করে দিয়েছে এক দিব্য মহিমময় উপলব্ধির আলোয়। সেই মহিমার বোধটি সাধককে লাভ করতে হবে, তুরীয় আলোয় জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি উদ্ভাসিত করতে হবে। এই তুরীয় সঙ্গে আবার আমার আছে এক প্রেমের সম্বন্ধ; না হলে সেই বৃহতের মধ্যে আমার অহং গলে যায় কি করে আর নিজেকে হারায় বা কি করে? তাই বলতে পারি অণু ও মহানের সম্পর্ক হল প্রেমের সম্পর্ক। চৈত্যসত্তা তাঁর প্রেমের যোগে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির শুদ্ধ চেতনা—শুদ্ধ শান্ত আমি। তার প্রথম ভালবাসা স্ফুরিত হয়

কৈশোরে। সেই কিশোর চিত্তের ভালবাসা দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে সে আপন হৃদয়ের সঙ্গে বাঁধতে পারে—"বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়, এ কি গো বিস্ময়!" এমনই সেই সহজ আবির্ভাবের শক্তি। এই কিশোর চিত্ত নিয়েই অনন্ত-স্বরূপের প্রেমে অবগাহন করতে হয়, গলে যেতে হয়। এই ভাবে প্রেম ও জ্ঞান নিয়ে যে কর্ম তাতে বিশ্ব সমাজ আত্মীয় পরিজন কেউ তো বাদ পড়তে পারে না। কৈশোরের পরিপাকে আসে তারুণ্যের বল, আর তখনই জীবনে বীর যোদ্ধার ভূমিকা দৃঢ় হয়। জ্ঞানের ও প্রেমের বীর্যে কর্মের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয় সবগ্রের ব্যাপ্তিতে ও চৈতন্যে। তাই জীবনের কুরুক্ষেত্রে সাধকের আচরণের আদর্শ হল সদাচার কিনা সত্যের আচরণ, আর বিশ্বের অন্তর্যামীর স্বতন্ত্র প্রশাসনেই তার স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা।

বিচার ও আচারে সমস্যা দেখা দেয় অহংকে কেন্দ্র করেই। যতই সাধক জ্ঞানের ঊর্ধ্বভূমিতে আরোহণ করতে থাকে, ততই তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। তার কর্মেও যে জ্ঞান ও শক্তি স্ফুরিত হয়ে চলেছে, তাও সে উপলব্ধি করে। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে তাঁকে জানলে বেতালে পা পড়ে না। কিন্তু তবুও কর্মজীবনে নামতে গেলে কতবারই তালভঙ্গ হয়, ঠেকে শিখতে হয়। কেন না মানুষের মধ্যে সুখদুঃখের দ্বৈতবোধ থাকেই, শ্রেয় ও প্রেয়ের সংস্কার থেকে যা ভাল লাগে না, বা যা শ্রেয় বোধ হয় না, তাতে বিরক্তি আসে। এই ভাল লাগা বা না লাগার দ্বন্দ্ব, একটা শিশুরও আছে। প্রথম দ্বন্দ্বই হল জীবন-বোধের দ্বৈত, বুদ্ধির ক্ষেত্রের বিচারণা থেকে বেছে নিতে হয় অশুভ থেকে শুভ, পাপ থেকে পুণ্য, প্রেয় থেকে শ্রেয়। দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব দেখা দেয় অনুভবের দিক দিয়ে, কোনটা ভাল লাগে কোনটা লাগে না, কোনটা প্রিয় কোনটা অপ্রিয় বোধ হয়। মনস্তত্ত্বের এই সব সমস্যা খুব গভীর এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সদাচার পালনে অনেক বাধা উপস্থিত হয়। জীবনের নীতি নীতি ও প্রীতি বিড়ম্বিত হয় তখনই, যখন দেখা যায় যেটা কল্যাণ-কর তাকে বিনষ্ট করে যে বিরুদ্ধ শক্তি, সেই অন্যায় সেই প্রবঞ্চনার নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় কর্তব্য কর্ম কোনটা হবে, তা নিয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়তেও হয়। কেন না বাহিরের দিক থেকে সমাজবদ্ধ মানুষের চেতনা বনের বাঘের চেয়ে উন্নত হয়েছে, সে সোজাসুজি প্রতিপক্ষের ঘাড় মটকাতে পারে না। আবার এক সূক্ষ্ম ধর্মবোধও তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করে। শিকাগোর ভাষণে বিবেকানন্দ "প্রতিবেশীকে ভালবাসতে হবে," এই নীতি নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে সেই ভালবাসার ভিত্তিটা কোথায় হবে? প্রতিবেশীকে ভালবাসব, তার সর্বনাশই বা করব না কেন? তার মধ্যে ও আমার মধ্যে এক আত্মা, এই আত্মবোধ না জাগলে ভালবাসা থাকে কেমন করে? কাকে ভালবাসব? এ অবস্থায় ধর্মবোধ জানিয়ে দেয় এই ভালবাসাই ধর্ম, এটা কর্তব্য কর্মও বটে। মানুষ তার সহজাত সংস্কার নিয়ে বনের পশুর মত একার কথা শুধু ভাবেনি। তার পরিবার সমাজ

দেশ ও দেশে সমগ্র বিশ্ব নিয়েই তার কারবার। এইভাবে তার মধ্যে ধর্মবোধ জেগেছে। যেটা আমি করব, সেটা আমার করা উচিত বলে আমাকে করতে হবে, এই শ্রেয়বোধ কর্তব্য কর্মের বিবেক জাগিয়ে তোলে। আমার খেতে ভাল লাগে বলে আমার খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি আর দশজনকে তার খাবার থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তখন আমার ধর্ম-বোধ বলে এটা ঠিক নয়। আবার আমার দাবী বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার অহং (ego)-ও জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। তখন ব্যক্তির সুখদুঃখের সঙ্গে সমাজের সুখদুঃখের সংঘর্ষ বেধে যায়। স্বার্থবুদ্ধিই প্রথমে মানুষকে অধিকার করে; তারপর সে বিস্তৃত হলে, স্বীয় প্রয়োজনেও মানুষ পরার্থপর হয়। শিশু খেলা করতে গিয়েও দলের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে শেখে। পরে আরও বড় হলে সে অহং ত্যাগ করতেও শিখবে—এই ত্যাগের বোধ থেকে ব্রহ্ম-ভাবনা আসে। অধ্যাত্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে ভালবেসে ত্যাগের মহিমা মানুষ তখন উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নিয়ে তারপরেও আবার দ্বন্দ্ব এসে পড়ে। সমষ্টির জন্য আত্ম-বিসর্জন নিশ্চয় একটা বড় ধর্ম। কিন্তু ব্যষ্টির আত্মপ্রতিষ্ঠাও ধর্ম। যে আত্মপ্রতিষ্ঠ, সে আত্ম-সচেতন হয়ে যখন আত্ম-বিসর্জন করতে পারে, সেই হল সত্যকার ধর্ম।

ব্যক্তি ও সমাজ দুই-ই অন্যোন্যনির্ভর। যুগে যুগে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কখনও ব্যক্তিতন্ত্র কখনও সমাজ-তন্ত্র একটাকে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজই ব্যক্তিকে লালন ও পালন করে কিন্তু সমাজকে বেগবান করে ব্যক্তির উর্ধ্ব চেতনা। এ যুগে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবাদ আর সমাজতন্ত্রবাদ এই দুটি মূল ধারণা নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেননা এখনও এ বিষয়ে দ্বৈত ও দ্বন্দ্ব রয়েছে মানুষের বুদ্ধিতে মানুষের মনে। সমাজতন্ত্রীর মতে ব্যক্তি সমাজদেহের একটি কোষ মাত্র। সমাজের দায়িত্বে নিজের সত্তাকে বিলিয়ে স্ফুরিত করতে হবে ব্যক্তিতে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চান ব্যক্তির জন্যই সমাজ। শিশুকে যেমন বড় করতে গেলে তার স্বভাব ও স্বধর্মকে পুষ্ট করার সুযোগ দিতে হবে, তাতেই সে নিজকে ছাপিয়ে বড় হতে পারবে। কিন্তু তার ওপর শুধু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য যদি রক্ষা করা না যায়, তাহলে তার স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হবে। ব্যক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলাই সমাজের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রবল হতে দিলে তখন ব্যক্তিতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে আবার বিরোধ বেধে যাবে। কাজেই মারামারি লাঠালাঠি বাদবিসম্বাদ বেড়েই চলবে, দুই মতের বিরোধে সমস্যার সমাধান হবে না। তাই দুদিক দিয়েই বিচার করে সমগ্র মানব-জীবনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে যে ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়ের মধ্যে চৈতন্যের স্ফুরণই হল প্রকৃতির লক্ষ্য। ব্যক্তি ও সমাজের উর্ধ্বে তাদের ধরে রেখেছে সেই চৈতন্য এবং তার স্ফুরণের একটা ক্রম আছে। দেহের চেয়ে প্রাণে

বেশী স্ফূর্তি, তার চেয়ে বেশী মনে, আর তার চেয়েও বেশী আত্মবোধে। তখন ব্যষ্টি আর সমষ্টি, ব্যক্তি আর সমাজে ভেদ-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সমষ্টিতে প্রসারিত হয়ে বিশ্বব্যাপ্ত ও সব ছাপিয়ে লোকোত্তর বৃহৎ অনন্তের স্ফুলিঙ্গ; কাজেই যেমন জনগণের প্রতি সমাজের প্রতি তেমনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে তার প্রাণের দাবী। সে সবের প্রতিই দায়িত্ব আছে। এদেশের ধর্মশাস্ত্রে মানুষকে পিতৃঋণ ঋষিঋণ দেবঋণ সব পরিশোধ করার নীতি গ্রহণ করে চলার বিধান দেওয়া হত। সমাজে থেকেই দেহ-প্রাণ-মনের ভূমির ভিতর দিয়ে চৈতন্যের ক্রমিক প্রসার ঘটিয়ে আত্মচৈতন্যের বিশ্বময় ব্যাপ্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রকৃতি-পরিণামের নিগূঢ় লক্ষ্য। সমাজ-ধাত্রী ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এইভাবে পুষ্ট করে তুলবে আর ব্যক্তিও যা পেয়েছে তার দশগুণ সমাজের পুষ্টির জন্য দিয়ে দেবে, যজ্ঞ-ভাবনার ত্যাগ করবে। "যদাত্মা সর্বভূতাত্মা"—এই উদার বোধে ব্যক্তি আর সমাজের পায় একাকার হয়ে যায়। এই দৃষ্টি দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিই হল সমাজের পথিকৃৎ—সমষ্টির চোখে সে-ই আলো ফেলে দেয়, দৃষ্টি দান করে। Individual consciousnessকে তিনি বলেছেন Cosmic consciousness-র spearhead। এ খুব গভীর কথা, আর সেখানেই ব্যক্তির স্বতন্ত্রবোধের সার্থকতা।

আমি বা আমার বোধ নিয়েই মানুষের মধ্যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সূচিত হয়। আমি আছি এই বোধই সর্বাপেক্ষা প্রবল। আর কিছু চৈতন্য আছে কিনা জানি না, আমার বোধে যা কিছু আসছে ভাসছে উদ্ভাসিত হচ্ছে, তা থেকেই আমার জ্ঞান। শিশু জন্মগ্রহণ করে একটি অতি সুকুমার নমনীয় কাঠামো নিয়ে। তার পরিবেশ থেকে লোকাচার দেশাচার স্ত্রী-আচার ইত্যাদি অনেক রকম আচরণ সেই কাঠামোতে অনেক সংস্কারের ছাপ ফেলে। সে যদি একটা সদাচারের নিয়ম না পায় তাহলে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না, বিশৃঙ্খল হয়ে থাকলে কোন কিছুই দানা বাঁধতে পারে না। এ জন্য একটা শৃঙ্খলা চাই, একটা ছন্দ চাই। কিন্তু একটা যান্ত্রিক নিয়মের ভার যদি আমার তার পরে শুধু চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় সে সমাজের ভিতর থাকলে দুষ্ট ক্ষতের মত আচরণ করবে, না হলে সমাজত্যাগী হয়ে অনধিকারী সন্ন্যাসী হতে চাইবে। কোন পথেই তার আত্মবিকাশ পূর্ণ হতে পারবে না। একটা জমিতে চাষ করতে গেলে মাটিতেই বীজকে অঙ্কুরিত করতে হয়। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী ভূমির উৎপাদনশক্তি ও বীজের অঙ্কুরিত হবার সামর্থ্যকে সার্থক করে তুলতে হয়। সেই রকম সমাজ বা গোষ্ঠী ব্যষ্টি-চৈতন্যকে স্ফুরিত করে, সেই সঙ্গে সমষ্টি-চেতনাও পুষ্ট হয়। এইভাবে অভিব্যক্তির দিক দিয়ে দেখলে বুঝতে পারি সমাজ বা সমষ্টি-চৈতন্য হল সার্বভৌম সমতল (horizontal) চেতনা, আর ব্যক্তির চৈতন্য হল বর্ষাফলকের মত ঊর্ধ্বমুখ বা উন্নয় (vertical)। সাংখ্যের ভাষায় সমাজ যেন প্রকৃতি

বা ক্ষেত্র আর ব্যক্তি তার অধিষ্ঠাতা পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ। পুরুষ প্রকৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তার দ্বারা শাসিত হয়েও আত্ম-চৈতন্যের আবেশে প্রকৃতিকে চিন্ময়ী করে তোলে। সাধারণত একটা নিয়মের আদর্শ যখন সমাজে প্রথাগত হয়ে ভোঁতা হয়ে পড়ে, আর সমাজ-চেতনা মুঢ় আচ্ছন্ন যান্ত্রিকভাবে সেটার আচরণ করে, আঘাত দিয়ে তার মূঢ়তা ভাঙে এক ব্যক্তিরই উচ্চতর চেতনা। একটি দুটি সচেতন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে সমাজ-চেতনা দীপ্ত হয়ে ওঠে আবার স্তিমিত হয়ে যায়। আঘাত দিয়ে আবার তাকে দীপ্তিমান করে তোলে ব্যক্তিই, প্রথাগত নিগড় বিদীর্ণ করে তার সত্য প্রকাশিত হয় আর বালিন্য মুক্ত হয়ে তার আচরণও নব কলেবর ধারণ করে। সমষ্টি-চেতনাও তখন একটা উন্নততর পরিণতি লাভ করে, ক্রম-অতিব্যক্তিতে সমাজ এক পদ অগ্রসর হয়ে যায়।

সমাজ-সচেতনতা এখনও ব্যক্তির ধর্ম। সমাজের সব ব্যক্তি আত্মসচেতন হয়ে উঠবে, সে সিদ্ধি এখনও অনাগত। সেদিন যখন আসবে তখন ব্যক্তি আর সমাজের বৈতও থাকবে না। আজকের দিনে সমাজের জনগণকে উন্নত করার ও জনমতকে প্রাধান্য দেবার জন্য নেতাদের ভাবনা ও গবেষণার অন্ত নেই। সেক্সপীয়র তাঁর "জুলিয়াস সীজার" নাটকে অপ্রবুদ্ধ জনমতকে উদ্বুদ্ধ করার বিপরীত দুটি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যে উচ্ছৃঙ্খল চিত্রটি নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে উপস্থাপিত করেছেন, আজও সেই রীতিতেই সাধারণ মানুষ বা জনগণ তাদের নেতাদের বাচনভঙ্গীতে বা উদ্দীপ্ত ভাষণে অভিভূত হয়ে পড়ে ও সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্ম করে থাকে। ওই দৃশ্যে রোমের অধিবাসীদের সামনে ব্রুটাস্ সীজারের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করছে এই বলে—যে দেশের মানুষের জন্য, তাদের মঙ্গলের জন্যই সে তার প্রিয় বন্ধু সীজারকে গভীরভাবে ভালবাসা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এতে সে কারও কাছে অপরাধী হয়েছে কিনা এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জনতার একবাক্যে রায় হল যে, না কেউই তা মনে করছে না। কিন্তু এই ভাষণের অল্পক্ষণ পরেই সীজারের মৃতদেহ নিয়ে মার্ক অ্যান্টনীর প্রবেশে মৃতুশোকের যে ছায়া পড়ল, তারপরে অ্যান্টনীর ধীর যুক্তিপূর্ণ ভাষণ শ্রোতাদের এমনভাবেই মুগ্ধ করে দিল যে তারা সীজারের গুণাবলী ও অপ্রতিহত ক্ষমতা স্মরণ করে তাঁর হত্যাকারীকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। সীজারের মহিমা তারা উপলব্ধি করে অন্যায়ের শাস্তি বিধান করতে আবার প্রবলতর বিদ্রোহের আগুন জালিয়ে দিল। উচ্ছৃঙ্খল জনগণকে গোষ্ঠীবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করার জন্য ও শিল্পসংস্থাতে দলগত সাফল্য (team-work) কার্যকরী করে তুলতে এখন অনেক চেষ্টা ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখা গেছে ত্রিশ জনের বেশি হলে একটি দল আর কার্যকরী হতে পারে না। সমষ্টির চাপে ব্যষ্টির গতি হয় নীচের দিকে। গণচেতনা তখন আর গণেশের চেতনায় বিবৃত থাকতে পারে না, তার যাদন মুষিকের চেতনায় নেমে যেতে চায়। সমষ্টির চাপে

ব্যক্তির চেতনার অধোগতি নিরুদ্ধ করতে না পারলে আত্মার মহিমাকে খর্ব করা হয়। সমাজ-চেতনা যখনই এইরকম করে নীচের তলায় তলিয়ে যেতে চায়, তখনই এক ব্যক্তি (individual) নেতা বা দলপতিরূপে আবির্ভূত হন। তাঁকে সকলে মেনে চলে এবং সমাজের দায়িত্ব পড়ে ঐ ব্যক্তিচৈতন্যের 'পরেই। সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভবও হয়েছে এইরকম করে। সমাজচেতনা তার মতেই সায় দিয়ে চলে বা চলতে তাকে বাধ্য করা হয়। সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বা নেতাকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সেই ব্যক্তির চৈতন্যে বিশ্বচৈতন্য প্রভাসিত হয়। রামকৃষ্ণদেব তাঁর বাণী ও স্পর্শ দিয়ে যেমন "চৈতন্য হোক" বলে জনে জনে চেতনার আলো জেলে দিয়েছিলেন ফুল ফোটানোর মত করে। সেইরকম করে প্রতিটি ব্যক্তি-চৈতন্য প্রবুদ্ধ হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মহান নেতাকে অনুসরণ করবে। তা যখন সম্ভব হবে তখন আচ্ছন্ন মূঢ় ও ঘোর গণচেতনা অন্ধ তামস থেকে আলোয় উত্তীর্ণ হবে। সেখানে ছলনা জুয়োচুরি রেষারেষির স্থান কোথায়? ভারতের ধর্মপ্রবক্তাগণ তাই সমস্যার সমাধান করেছেন এই ভাবেই। প্রতিটি জীবকে অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় তুলে নিয়ে প্রবুদ্ধ মানবসমাজ গড়ে উঠবে। মহামানব যখন জাতির পুরোধা হয়ে আসেন, তখন তিনি বর্ষা-ফলকের মত সূচীক্ষ্ণ তাঁর ক্রান্তদৃষ্টি ও মনীষা দিয়ে দীর্ঘকালের সঞ্চিত অজ্ঞানের আবরণ বিদীর্ণ করে বিশ্বের ঊর্ধ্বগতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন, অজ্ঞানের চাপে তাকে একেবারে তলিয়ে যেতে দেন না। মানব জাতির সমগ্র চৈতন্যের 'পরে সেই তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়ের আলোর ছটা সমাজ-চেতনাকে এক স্থায়ী দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই সমষ্টি-চৈতন্যকে মান দিতে গেলে প্রতিটি ব্যষ্টিকে চৈতন্যের ঐ ভূমিতে তুলে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করতে হবে। তখন সকলের মুক্তি হলে তো কথাই নেই। ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল স্বপ্নকে রূপায়িত করতে অপ্রবুদ্ধ সমষ্টিকে ব্যষ্টিচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর তাই হবে অতিমানস শক্তির অবতরণের ভূমিকা। একজন প্রবর্ত পুরুষও যদি সেই শক্তির ধারক ও বাহক হয়ে তাকে নামিয়ে আনতে পারেন, সর্বমানব বা সমগ্র মানবজাতি তাতে ক্রমে উন্নীত হতে পারবে। প্রতিটি ব্যক্তিচৈতন্যে তার ক্রিয়া হবে। তাই মহাপুরুষ তাঁর সাধনার সিদ্ধিতে যখন এইভাবে শক্তি-সঞ্চার করে দিয়ে যান, তখনই সমষ্টিচেতনা সেটা সচেতন ভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়না। কিন্তু প্রতিটি আধারে চেতনার সব স্তরেই তার শক্তি স্ফুরিত হতে থাকে, কয়েকটি ব্যক্তির গোষ্ঠী বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কিছু কিছু প্রাণকেন্দ্র তার মর্ম বুঝতে পারে ও ক্রমে ক্রমে ব্যাপক ভাবে তার সচেতন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

তাহলে দেখতে পেলাম সদাচারের আদর্শ মোটামুটি চারটি আছে, বলা যেতে পারে। প্রথম আদর্শের নিয়ামক ব্যক্তি ও তার স্বার্থ, দ্বিতীয় আদর্শ সমষ্টির হিতকল্পে সামাজিক নিয়ম, তৃতীয় আদর্শ অন্তরের ধর্মবোধ থেকে বিবেক ও বিচার, আর সর্বশেষে বলা যায়,

সর্বভূতের অন্তর্যামীর প্রশাসন। সেখানে সদাচারের মূলভিত্তি সমাজের অনুশাসনও নয়, ধর্মের অনুশাসনও নয়। প্রাকৃত মানুষের কাছে স্বার্থসিদ্ধিই আগে, পরার্থপরতা আসে তার পরে। পরার্থপরতায় তার চেতনা অহংএর সঙ্কোচ থেকে খানিকটা মুক্তি পায়। ব্যক্তির অহং প্রসারিত হয় সমাজের অহংএ, দেশের অহংএ এমন কি বিশ্বমানবের অহংএ। তা থেকে আবার এক নতুন ধর্মবোধের সৃষ্টি হয়েছে, আধুনিক কালে যার নাম মানবতাবাদ (**humanism**)। কিন্তু মন যদি জীবনের আদর্শ নিরূপণের ভার নেয়, তাহলে যে-কোনও আদর্শের অনুশীলনকে একান্ত করে তোলে। কোন আদর্শই নিরর্থক নয়, কিন্তু তাই বলে যতই কল্যাণকর আদর্শ হক না কেন, তার একটা মনগড়া খোপে জীবনকে পুরে দিলে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হয় না। জীবনের একটা দিকের বিশেষের প্রতি নজর দিতে গিয়ে গোটা জীবনটা বাদ পড়ে যায়। কেননা মনের দৃষ্টিতে অখণ্ডকে দেখা সম্ভবও নয়। তার জন্যেই যেতে হবে মনের উজানে অতিমানসভূমিতে, যেখানে সমস্ত বিরোধের সমন্বয় হয়েছে এক পরম সৌষম্যে। খৃষ্টানদের দশটি নৈতিক আদেশ, বৌদ্ধদের শীলপালন, মনুসংহিতার নির্দেশ ইত্যাদি সব দেশের শাস্ত্র থেকেই মহাপুরুষের আচরণ বিজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যে বাণীরূপ গ্রহণ করেছে, সাধারণ মানুষ সেগুলিকে ধর্মজীবনের সদাচারের আদর্শ বলে মেনে নেয়। কিন্তু সে প্রথা যদি প্রাণহীন আচার-সর্বস্ব হয়ে অর্থকে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ না হয়, মানুষের বুদ্ধি তাতে বিড়ম্বিত হয়। একনায়কের একচ্ছত্র সংবিধান এইরকম জনগণের বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে অনেক সময় তাকে প্রাণহীন কাঠামোতে পরিণত করে,. আর তা থেকে আসে মহতী বিনষ্টি। সেই কারণেই আচরণকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে আত্মার মহিমাবোধে তুলে নিতে না পারলে একদেশী দর্শনের সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে যে সব মহৎ ভাব আছে, ন্যায়বিচার বিবেক ভালবাসা সত্য বীর্য পরার্থপরতা—এগুলি সব বোধে পেয়েও বলতে বা আচরণ করতে নিজের মনোমত এক ছাঁদে পরিণত হতে পারে। আচরণের এ সমস্যা অবশ্যই দেশাচার লোকাচার এর চেয়েও জটিল বা উৎকর্ষস্তরের সমস্যা। ন্যায় অন্যায়ের বিচার এখানে ব্যক্তি আর তার সংসার ও সমাজেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, বৃহত্তর মানব-সমাজ নিয়ে গোষ্ঠি গঠন করে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পর্যন্ত এখানে গ্রহণ করতে হয়। তাই একদিকে বৃহৎকে লাভ করে অপর দিকে সমাজের মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে অনুশীলন করে যে মহামানব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, তিনিই জনগণের কল্যাণ ও সমাজ রক্ষার গুরু দায়িত্ব বহন করতে পারেন।

কিন্তু প্রায় মানুষের মধ্যেই আছে ধর্ম ও নীতি বিগর্হিত বহু রকমের আচরণ, সেগুলিকে একেবারে অস্বীকার করা যায়না ; পরস্পরের সঙ্গে আচার ব্যবহারে সেখানে

ঠকে যেতে হয়। আমাদের মধ্যে ধর্মনীতিবোধের ধারণা (ethical ideas) থেকে আমরা সুন্দর ধর্মপরায়ণ মানুষকে দেখে ও তার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে সহজেই তার বিধান মেনে নিতে পারি। কিন্তু সৌর কলঙ্কের মত ও চাঁদের কলঙ্কের মত মানুষের অবচেতন ও অচেতন গহ্বরে যে-সব জট পাকিয়ে থাকে, তাদের নিরাময় করার শক্তি লাভ না করা পর্যন্ত মহাপুরুষের বাণীই হক, আর দেশনায়কের নেতৃত্বই হক, তা মানুষের চেতনাকে সমগ্রভাবে যথার্থ উন্নতি এনে দিতে পারে না। মহাপুরুষের উদার দৃষ্টিতে মানুষের সবটাই যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন চেতনার প্রতিটি স্তরের সিদ্ধ ও অসিদ্ধ দুদিকই তাঁর কাছে খুলে যেতে থাকে। তাই যোগসাধনার শুরুতেই আচার-বিচার শুদ্ধির প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, এই রকম নির্দেশ যেমন থাকে; সে শুদ্ধীকরণের প্রয়োজন শুধু মাত্র মন ও বুদ্ধির স্তরে আবদ্ধ থাকে না। পাপ ও পুণ্য, দয়া ও নিষ্ঠুরতা, ধর্ম ও অধর্ম এইভাবে সাজিয়ে সব সময় তার বিচার করা চলে না। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ সর্বদাই এই সব সমস্যার সমাধানে অধ্যাত্মবোধের সমগ্র ভূমি উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। মানসিক শিক্ষা ও আদর্শ নৈতিক আচরণে মানুষের চেতনার শুদ্ধি সম্পূর্ণ হতে পারে না। আচারের ভাল-মন্দ নিশ্চয় আছে, কিন্তু সে ভাল-মন্দ বিচার করতে হবে পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে। যাতে দিব্যচেতনার উন্মেষ হয় তাই ভাল, আর যাতে সেটা বাধা পায় তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। একেবারে চরমে না পৌঁছানো পর্যন্ত একটা দ্বন্দ্ব থাকেই। অবশেষে লোকোত্তরে উত্তীর্ণ হয়ে উদাসীন ভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বাতীত হতে হবে। সে অবস্থায় "ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং... আর তখনই দ্বৈতের মালিন্য থেকে মুক্তির কৌশল আয়ত্ত হবে। এর অর্থ এ নয় যে বেপরোয়া পাপাচরণের অপরাধ রইল না। পুণ্য দিয়েই পাপাচরণকে নিষ্ক্রিয় করতে করতে এগিয়ে যেতে হয় ও তারপরে বিজয় সম্পূর্ণ করতে পুণ্যের সংস্কারও বর্জন করতে হবে। এই শিবচেতনায় অধিষ্ঠিত হতে না পারলে রাষ্ট্রনেতা বা সমাজের নেতাও মানুষের পথ প্রদর্শক হয়ে তাকে আলোর পথে নিতে পারবেন না। উপনিষদের মধ্যে আমরা বহু আখ্যান পেয়েছি যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ করেও ঋষি নেমে এসেছেন ক্ষত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজার কাছে, জগৎজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য। আচরণের চতুর্থ ভূমিতে এই আদর্শ রাখা হয়েছে। চেতনা যেখানে স্বচ্ছ, সর্বভূতাধিবাস কর্মাধ্যক্ষের প্রশাসনে সমর্পিত হয়ে ব্যক্তি তার স্বভাব ও স্বচ্ছন্দ অনুযায়ী আচরণ করে তার কর্মে। যোগের ভাষায় সে হয় "ধর্মত্যাগ"—অর্থাৎ যা সে ফেলে দেয় তাই ধর্ম, সেখানে অধর্মের আভাসটুকুও থাকে না। কিন্তু সে ধর্মকে কোনও লোকধর্মের ছাঁদে ফেলা যাবে না। কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রচোদিত করতে তার বুদ্ধিকে যেখানে তুলে ধরলেন, সে ওই দ্বন্দ্বাতীত

যোগভূমি। তাই গীতার ধর্মনীতি অনুসরণ করতে হলে প্রয়োজন হলে সবাইকে বেদেও মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ মানবধর্মের ওপরেও আছে ভাগবত ধর্ম। সে ধর্ম একদিকে ব্যক্তি-স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে, অপর দিকে বিশ্বের গতিচ্ছন্দ অনুবর্তিত করে। এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সনাতন ভারত ধর্ম ও সদাচারের আদর্শ বুঝতে হবে। এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গীর মূল ভিত্তি হল "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ব্রহ্মই সব হয়েছেন। তাই পাপ ও পুণ্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই সব দ্বৈতবোধের ধারক তো তিনিই। এ থেকে আমরা বলতে পারি ভগবানই ভাল ভগবানই মন্দ হয়েছেন (God is good, God is bad) তা থেকে সিদ্ধান্ত হল, ভগবান ভালও নয় মন্দও নয় (God is nither good nor bad)। সেই অবর্ণ সবদের বোধ হয়ে সবই ধরে আছেন তিনি।

শ্রীঅরবিন্দ অবিদ্যার মূল (origin of evil) দেখাতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ওই দ্বৈতবোধ হল মানবচৈতন্যের মাঝে মধ্যবর্তী এক অবস্থা মাত্র। অচেতনেও দ্বৈত-বোধ নেই আবার পূর্ণ চৈতন্যের মহিমা অদ্বৈতবোধেই প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যা ও অবিদ্যার টানাপোড়েনে অবিদ্যাকে বিদ্যায় রূপান্তরিত করবার যে ধারা (process) প্রকৃতিতে স্ফুরিত হয়ে চলেছে, তারই মাঝে "ব্যক্তমধ্য" মানুষের চিত্তে এই দ্বৈতের প্রয়োজন অনু-ভূত হয়েছে। কিন্তু সেই দ্বৈতকে পূর্ণ অদ্বৈতবোধে মুক্তি দিতে হবে, তবেই তার সার্থকতা। যেমন আমরা দেখেছি কাঠে আগুন ধরলে প্রথমে ধোঁয়া গাঁজলা এ সব বেরিয়ে দৃষ্টিও আচ্ছন্ন করে দিতে পারে, আবার আগুন প্রথমটা জ্বলে নিতে যেতে চায়। কিন্তু কাঠের সব তরলা ও জলীয় অংশ বেরিয়ে গিয়ে শুষ্ক কাঠ যখন অগ্নিময় হয়ে জ্বলে ওঠে, তখন সেই অগ্নিস্নাত কাঠ আর আগুনে তো কোন প্রভেদ দেখতে পাইনা। এই রকম প্রতিটি জীবের মধ্যেই তো চিদগ্নি ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে চৈত্যসত্তা বীজভাবে নিহিত রয়েছে এইভাবেই। তাই শুষ্ক কাঠের মত দেহপ্রাণ মন সবটাই অগ্নিস্নাত হয়ে প্রজ্বল হয়ে উঠবে ভর্গজ্যোতিতে। প্রেম দিয়ে জ্ঞান দিয়ে শক্তি দিয়ে সেই অগ্নিসত্তার বীজকে অঙ্কু-রিত করে, সমগ্র সত্তাব্যাপী চিদগ্নিময় বোধকে বহন করে চলতে হবে। এই হল চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদ এতে প্রয়োজন হলে অনেক কিছু বিনাশ করতেও হবে। তখন পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় চরম সত্তার মহিমাতে। সেখানে দ্বৈতবোধ নেই, কাজেই ঘৃণাও নেই। সেই অদ্বৈতবোধ থেকে দ্বৈত ও তা থেকে বহুকে নিয়ে আচরণ করবার শক্তি পূর্ণ হয়। সে আচরণে অনেক সময় আঁকা বাঁকা পথে চলে শঠের সঙ্গে শাঠ্য ও শাঠ্যের প্রতি বিদ্রোহ করে চলতে হয়। কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনের সঙ্গেও যুদ্ধ চালাতে তাঁরই হাতের যন্ত্র নিমিত্তমাত্র হয়ে যেতে হয়। সেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বুদ্ধির চালক ও সারথি হয়েও দুর্যোধনের বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষীও তো তিনি; "ময়ৈব নিহতা পূর্বমেব"—তাঁর হাতে পূর্বেই নিহত হয়ে আছে তারা সব।

অতিমানসের নীতিধর্ম (Supramental ethics) বুঝতে আমাদের গীতার ওই যোগকৌশল কর্মে প্রয়োগ করতে হবে। আজকের দিনেও কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পাপপুণ্যের দোলায় বারবার নামতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কালাগ্নি রুদ্রের চরণে আহুতি দিতে হয় জীবনের সব-কিছু অশিবকে নির্মম হয়ে। তখনই সেই জীবন ও মরণের দ্বৈতকে পেরিয়ে অমৃতকে ছিনিয়ে আনার বীর্য লাভ হবে। সেখানে শিব এবং কেবলম্—সেই এক জগদীশ্বর, যার তার বিভূতি হল এই জগৎ। কাজেই কি ব্যক্তি কি সমাজ কি রাষ্ট্র, সকলেরই চালক তিনি। আমার কর্তব্য কর্ম ধর্ম সদাচার পরস্পর-বিরোধী সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দেখা দিলেও তখন বুঝতে পারব অন্তর্যামীর পরিচালনা।

"জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—

এই হল সেই চরম সন্ধিক্ষণের গভীর মর্মবাণী এর অর্থ হল, "আমি জানি ধর্ম কি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই ; আমি জানি অধর্ম কি, কিন্তু তা থেকেও আমি নিবৃত্ত হতে পারছি না। হে আমার হৃদিস্থিত হৃষীকেশ ! তুমিই যে আমাকে কর্মে নিযুক্ত করে নিয়ে চলেছ !" এই রকম করে ধ্যানে ও কর্মে তাঁরই ইচ্ছাকে ঠিক মত অনুসরণ করতে পারলে তবেই ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে পরম একত্বে স্থিত হয়ে বুঝতে হবে উত্তমকে, শ্রেয়কে। উপনিষৎ বলেন, সেই পরম সত্যকে যে দেখেছে তার জ্যোতিও অম্লান। ভালমন্দ পাপপুণ্য এ সব দ্বন্দ্ব-বোধের ওপরে তিনি অবস্থিত, তাই দ্বৈতবোধ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সে সবের মধ্যে থেকেও একত্বেই থাকে।

এ এক বিপজ্জনক অনুশাসন সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই তুঙ্গিমাময় অবস্থা আসবে সাধনার পরিপাকে। সাধনার শুরুতে ধর্মাচরণ না করেই সেটা ছাড়া যায় না। মানুষের অনেক রকম প্রবৃত্তি থাকে, যাকে ধর্মাচরণ দিয়েই রুখে দাঁড়াতে হয় ; কেননা সেসব বৃত্তি মানুষের পরম অনিষ্টকারী অকল্যাণকর। কিন্তু দেখা যায় ধর্মাচরণ অনেক সময় যেন একটা বন্ধন হয়ে পূর্ণকে আড়াল করে রাখে। অনন্তের পথিককে কোন বাঁধনেই তো বেঁধে রাখা যায় না। তাই জীবনে এমন সময়ও আসে, যখন পূর্বজীবনের ধর্মাচরণ সব ফেলে দিয়ে উত্তর জীবনে প্রবেশ করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ ধর্মের সদাচার প্রসঙ্গে গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অনুশাসন আলোচনা করে দেখিয়ে দিলেন যে অষ্টাদশ পর্বের যোগ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সমূহ উপদেশ বিশ্বরূপ দর্শন সব করিয়েও শ্রীকৃষ্ণ শেষে বলেছেন—"সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—", কিনা "সব ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ কর"। এই ধর্ম ছাড়ার অর্থ হল এই ভগবৎশক্তিতে সম্পূর্ণ সমর্পিত অথচ এক স্বাতন্ত্র্যবোধ, তার

নিজের কর্মফলে আর তখন নিজের দায় থাকল না। রামপ্রসাদের গানও এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করতে হয়, "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি"।

পথ চলতে প্রাণের তাগিদে এগিয়ে চলার সময় ধর্মের বন্ধনও যে ভেঙে ফেলতে হয় বলা হল, এটা কিন্তু খুব সহজে হতে চায় না। এ নিয়ে অনেক সমস্যাও দেখা দেয় যে কোনটা ধরি আর কোনটা ছাড়ি। তাই বিশেষ একমুখী সংস্কার 'পরে ঝোঁক দিয়ে সাধককে অনেক সময় যে আঁকাবাঁকা ভাবের শাখানদীগুলিকে গুটিয়ে এনে প্রাণের স্রোতে ফেলে দিতে হয়, পরিণামে সেই সংস্কারগুলিই আবার দেখা দেয় অন্যভাবে। চিত্তে নির্বেদ এলে এক অবর্ণের অবস্থা এসে গেল, তখন সব পানসে লাগে আর কর্মে কোন স্ফূর্তি থাকে না—এমন ভাব আসতে পারে। অহং কুণ্ডলী পাকিয়ে তখন যেন বলতে চায় আমার কোন দায় নেই, কোন কর্ম নেই।' এই কুণ্ডলীকে তীব্র আঘাত হেনে সত্তার গভীরে অন্তর্দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখতে পারলে বোঝা যাবে যে, কর্ম করছিলাম যে আদর্শ নিয়ে তাতে আমার মনগড়া একটা উদ্দেশ্য ছিল, আর তাতেই ঠেকে গেছি। মনের সেই মংলবই আমার সদাচারকে ধর্মের আবরণ দিয়ে রেখেছিল। সেই আবরণটি খসিয়ে ফেলতে হবে, তখন দেখা যাবে ধর্মপথের লক্ষ্যে পৌঁছতে পথ আর গন্তব্য এক হয়ে গেছে। সেখানে ব্যষ্টির ধর্ম সমষ্টির ধর্ম সব উত্তীর্ণ হয় আর এক পদবীতে, আর তাই হল ভাগবত ধর্ম। সেই ভাগবত ধর্মকে বুঝে নিতে পারলে তখনই স্বধর্ম ও সদাচার পালন করা যায়। সচ্চিদানন্দের সৎ ভাব ধরতে পারলে বুঝতে পারব, কর্ম করতে পারি কিন্তু কর্মফল আমার হাতে নেই, তার দায়িত্বটাও আমার নয়। তখন কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা সহজ হয়, চিত্তে নির্বেদ আসে, অহং প্রসারিত হতে থাকে ও মন মুক্ত হয়। সৎ কর্মও যখন আমরা গ্রহণ করি, তখন প্রথমে ভালমন্দের দ্বৈতবোধ থাকেই। শ্রীঅরবিন্দ এখানে দেখিয়েছেন যে, কর্ম করারও স্তর ভেদ আছে। মন্দ বা অসৎ থেকে ভাল বা সৎ-এ যেতে কর্মই তো পথ। এইভাবে জড় থেকে চৈতন্যের অভিযান চলেছে বলেই আমাদের প্রকৃতিতে প্রথম দিকে দৃষ্টি থাকে মোহাচ্ছন্ন, আর সেই কারণেই কর্মের ভালমন্দের বোধ চিত্তকে আলোড়িত করে রাখিত করতেই। কিন্তু এই মন্থনের ফলে কর্মও ক্রমশ পরিশুদ্ধ হতে থাকলে দেখা যায়, চৈতন্য লাভের উদ্দেশ্যেই কর্ম এবং সে কর্মও স্তরে স্তরে উন্নীত হয়ে চলে যোগকর্মে।

আচরণে বা কর্মে শক্তিই প্রকাশিত হয়। মানুষের স্বরূপশক্তি হল চিৎশক্তি। পূর্ণযোগীর আচরণে সেই চিৎ-শক্তিই বিচ্ছুরিত হবে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও প্রেমের শক্তিতে। তাই বাইরের অনুশাসনের কোন আড়ষ্ট আচরণের ছকে তিনি বাঁধা পড়েন না। অন্তর্যামীর প্রশাসনে স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসে তাঁর গতি হয় নিরঙ্কুশ। কেননা তখন তো আর নিজের ইচ্ছা আলাদা বলে কিছু থাকে না—সবই তাঁর ইচ্ছা। বিশ্বের মূলে রয়েছে পুরুষোত্তমের সত্যসঙ্কল্প আর সেই সঙ্কল্পের বাহন হলেন পূর্ণযোগী।

তিনি আত্মাকে জানেন, জানেন বিশ্বেশ্বরকে আর সেই সঙ্গে বিশ্বকে জেনে জানেন তাঁর স্থান কোথায়, তিনি বিশ্বেশ্বরের কোন সঙ্কল্পের বাহন? বিশ্বের ধারা ধ'রে চলে তখনই মানুষকে সত্যকার সাহায্য করা সম্ভব হয়, মানুষকে সত্য করে ভালবাসাও সার্থক হয়। সকলকে চৈতন্যের আলোয় আলিয়ে দিয়ে দিয়ে চলা—তাতে অন্তরের প্রেম উথলে উঠে সব কিছু বিরোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে অবস্থায় জগাই মাধাই মহাপুরুষকে আঘাত করেও উদ্ধার হয়ে যেতে পারে।

এজন সিদ্ধসত্তাকে কেন্দ্র করে আধার গড়ে ওঠে একটি দিব্যসঙ্ঘ। সঙ্ঘ অবশ্যম্ভাবী সত্যযুগ-চেতনার হিরণ্যগর্ভ দিব্যবিগ্রহ, ব্যক্তি সেই বিগ্রহেরই একটি চিন্ময় কোষ। এই অনুভব থাকে অতিমানস কর্মের ভিত্তি রূপে, আর পূর্ণযোগীর আচরণ হবে তারই অনুগত। তার ভাবনায় বেদনায় এবং আচরণে তখন বৃহৎ সত্যসঙ্কল্পের প্রকাশ। তাই বৃহতের সত্যসঙ্কল্প বা বৃহৎ-সঙ্কল্পকে (Supreme Will) জীবনের কর্মে ধরতে পারলে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে ব্যক্তি হয় স্বতন্ত্র, আর তার সদাচারের আদর্শ সব কর্মে ফলিত হয়ে সকলকে যুক্ত করে অন্তরের সত্যধর্মবোধে।*

(ক্রমশঃ)

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

জুলাই ২২, ১৯৫৩

প্রশ্ন : (মায়ের 'কথাবার্তা' হতে) "রোগ হবার কারণ সম্পর্কে দুটো জিনিস বিবেচনা করতে হবে। রোগ বাইরের থেকেও আসে (আগন্তুক) আবার ভিতরের দোষেও হয় (স্বভাবজ)। ভিতরের দিকে যদি কোনো বৈকল্য বা বিদ্রোহ এসে পড়ে, কিংবা যদি সেখানকার কোনো অংশে প্রকৃতির রক্ষাশক্তির সঙ্গে আনুকূল্যের অভাব হয়, অথবা যদি কোনো অংশ প্রায় ইচ্ছা করেই বিরোধী শক্তির প্রভাবকে ডেকে আনে, তবে তাতেও রোগ জন্মায়। এমনি সামান্য কোনো কারণ থাকলেই যথেষ্ট, অমনি বিরোধী শক্তিরা তোমাকে পেয়ে বসবে, আর তার ফলে একটা রোগ দেখা দেবে।"

"রক্ষাশক্তির সঙ্গে আনুকূল্যের অভাব", এর কি অর্থ হবে না ?

উত্তর ঐখানেই তা তো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন জিনিসটা বোঝোনি ?

প্রশ্ন কথার মানে বুঝি, কিন্তু কেমন করে তা হয় সেটা বুঝতে পারলাম না।

উত্তর "কোনো অংশে" বলেছি বলে ? "রক্ষার আশ্রয়ে থাকা" এ কথার মানে বোঝো তো ? আর "আশ্রয়ের বাইরে চলে যাওয়া" এ কথার মানেও নিশ্চয় বুঝবে ? যদি তুমি উল্টো কাজ কিছু করো, যেমন ভগবানের আশ্রয়ে থেকেও তাকে সন্দেহ করতে লাগলে, কিংবা কোনো বিকৃত ইচ্ছা এসে পড়ল, এতে তখনই তুমি আশ্রয়ের বাইরে চলে গেলে। আর আশ্রয়ের মধ্যে থাকলে তা তোমাকে এমন ভাবে ঘিরে থাকবে যাতে বিরোধী কোনো আক্রমণ বা দুর্ঘটনা আসতে না পারে, এমন কি তুমি চেতন না থাকলে তখনও ওগুলো তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু যদি সেই আশ্রয়ের বাইরে চলে যাও, সতর্ক হয়ে না থাকো, তাহলে বিরোধী শক্তিরা তোমাকে আক্রমণ করবে কিংবা কোনো দুর্ঘটনাও ঘটতে পারবে।

প্রশ্ন : আর যারা চেতন হয়ে না থাকবে ?

উত্তর : যারা চেতন হয়ে না থাকবে ? কিন্তু আমি তো সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে বলছি না, তাদের অমন কোনো বিশেষ আশ্রয় থাকেনা। সাধারণ মানুষ থাকে সাধারণ নিয়মের অধীনে। সেখানে বিশেষ কোনো রক্ষা শক্তি কাজ করেনা, ঐ কথাগুলো আমি

তাদের সম্পর্কে বলিনি। জীবনের সাধারণ নিয়মেই তারা থাকে, এ সকল কথা তাদের কাছে এমন ভাবে বলাও যায় না। তুমি ভাবছ যে সকল লোকের বেলাতেই তা হবে? তা নয়, এ কেবল যারা যোগের রাস্তা নিয়েছে তাদের বেলাতেই, সকলের বেলাতে নয়।

প্রশ্ন: ভয়ের থেকেও কি রোগ আসতে পারে?

উত্তর, হাঁ, তা পারে। আমি একজনের কথা জানি, সে এমন ভয় পেল যে তাতেই তার কলেরা হয়ে গেল। পাশের বাড়িতে হয়েছিল কলেরা, তাতেই সে এত ভয় পেয়ে গেল যে বিনা কারণে তার কলেরা হলো, কেবল ভয় পাওয়া ছাড়া আর কিছু কারণ সেখানে ছিল না। এটা প্রায়ই হয়, মহামারীর সময় অনেক স্থলেই তা হয়ে থাকে। ভয়ের চোটে যেন দরজা খুলে যায়, আর রোগটা এসে ঢুকে পড়ে। যারা নির্ভয়ে থেকে মুক্তভাবে ঘোরা-ঘুরি করে তাদের প্রায়ই কিছু হয় না। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে তোমার মনে হয়তো ভয় না থাকতে পারে, আর প্রাণের মধ্যেও না থাকতে পারে, কিন্তু দেহেতেও কোনো ভয় নেই, এমন কটা লোকের হতে পারে?...তেমন মানুষ খুবই কম। দেহের থেকে ভয়কে ঘোচাতে হলে রীতিমত কঠোর সাধনার দরকার। দেহের কোষগুলি ভয়ে কাঁপতে থাকে। শুধু সাধনার দ্বারা, অর্থাৎ যোগের দ্বারা সে ভয়কে দূর করা যায়। ভয় থেকে সব কিছুই আসতে পারে, এমন কি দুর্ঘটনা পর্যন্ত। সেদিক থেকে দেখলে সব কিছুই সংক্রামক। একজনকে জানি সে অন্যের গায়ে আঘাতের ক্ষত দেখে এমনই ভয় পেল যে তারও গায়ে আঘাতের দ্বারা একটা ক্ষত ঘটল। ভয়ের ফলে তারও বেলা তেমনি দুর্ঘটনা ঘটল।

প্রশ্ন মনের প্রাণের ও দেহের ভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: আপনি মনের ও প্রাণের ও দেহের ক্রিয়া সম্বন্ধে চেতনা পেলেই তা জানবে।

মনের বেলা খুব সোজা কথা ভয় আসবে চিন্তা হয়ে। যেমন, তুমি ভাবতে শুরু করবে যে ঐখানে যে রোগ হয়েছে, ওটি খুব ছোঁয়াচে রোগ, হয়তো এবার আমাকেও এসে ধরবে, আর খুব মারাত্মক হবেই, তাহলে এ রোগ এড়াবার জন্য কি করা যায়?...এই সব ভেবে মন কাঁপতে শুরু করবে: কি জানি কাল কি হবে, ইত্যাদি।

প্রাণের ভয় অনুভব করবে সংবেদন রূপে। হঠাৎ তোমার খুব গরম লাগবে, বেজায় ঠাণ্ডা বোধ করবে, প্রচুর ঘামতে থাকবে, নানা অস্বস্তি বোধ করবে। হঠাৎ দেখবে বুকটা খুবই ধড়ফড় করছে, জ্বর আসছে, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে সব যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এই সব।

আর দেহের বেলাতে?...ঐ দুই রকম ভয় না থাকলেও শুধু দেহেরই ভয় হতে পারে। সাধারণত ঐ দুই রকমের ভয় এসে পড়াতে দৈহিকের ভয়টা চাপা থাকে। কিন্তু ঐ দুটি না থাকলে তখনই তা বেরিয়ে পড়ে। কোষগুলির মধ্যে একটা বিচিত্র স্পন্দন শুরু হয়, তারা কাঁপতে থাকে। তা হৃৎস্পন্দনের মতো অমন দ্রুত নয়। মৃদু মৃদু কাঁপুনি, তাকে থামানো দুষ্কর। তথাপি তাকেও থামানো যায়।

তোমরা অনেকে হয়তো সেটা বোধ করেছ। যেমন, একটা এমন কোনো কসরৎ করতে লেগেছ যার সম্বন্ধে অভ্যাস নেই অথবা এই প্রথমবার তা করছ সেই অবস্থায় কোষগুলির মধ্যে একটা কাঁপুনি লাগে। তাতে তোমার আপন গতিবিধির উপর সম্পূর্ণ দখল থাকেনা। দেহ তার শক্তি অনুযায়ী সাড়া দিতে পারেনা। কোনো কিছু করতে ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে চাইলে দেহে বাধা জন্মায় বা অক্ষমতা আসে। প্রায় সকল স্পোর্টেই (কৃতির বা প্রতিযোগিতার) কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা লক্ষ্য করা যায় লক্ষ্য থাকলে দেখলে যে কেউ কেউ হয়তো অসাধারণ রকমের ভালো খেলা দেখাচ্ছে, আবার কেউ কেউ আদৌ কিছু পারছে না বা সামান্য মাত্র করতে পারছে। এ সমস্তই নির্ভর করে দেহের কোষগুলির স্পন্দনের উপর। কারণ অমন স্পন্দনের কারণে দেহের উপর কোনো দখল থাকেনা, সেখানে তখন অন্য শক্তির দখল এসেছে।...অবশ্য তাদের কথা বলছি না যাদের মাথা ঘুরে যায় বা প্রাণসত্তা বেসামাল হয়ে পড়ে। তাদের পক্ষে সে চেষ্টা করতে না যাওয়াই ভালো। কিন্তু আমি বলছি তাদের কথা যাদের দেহের উপর কিছু দখল আছে, আগের থেকে কিছু শিখেও রেখেছে, কিন্তু প্রতিযোগিতার বেলা ভালো ফল দেখাতে পারছে না, কারণ দেহে তখন সে গ্রহিষ্ণুতা নেই, কোষগুলির মধ্যে কাঁপুনি লেগেছে, তোমার সে সম্বন্ধে কোনো চেতনা না থাকলেও তাতেই বাধা জন্মাচ্ছে। সেই কারণেই আপন শক্তিকে পুরোমাত্রাতে ফলাতে পারছে না।

প্রশ্ন যোগ করতে থাকলেও যে রোগের আক্রমণ হয়, তা কি পরীক্ষা স্বরূপ?

উত্তর: পরীক্ষা,? না, না, কখনই তা নয়।

ইচ্ছা করে তোমাকে রোগে ভোগানো, যাতে তুমি তা কাটিয়ে আরো অগ্রসর হতে পারো? নিশ্চয়ই এমন নয়। তবে এ জিনিসকে ঘুরিয়ে তুমি বলতে পারো যে যারা নিরন্তর আশ্পৃহা পোষণ করে ও সামগ্রিক ভাবের সদিচ্ছাতে যারা সর্বদাই ভরপুর তাদের বেলাতে যা কিছুই হোক তাকেই তারা উন্নতির যাচাই স্বরূপ বলে ধরে নেয়। এমন লোকদের আমি জানতাম যারা রোগ হলেই ভাবতো যে সেটা ভগবৎ কৃপার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আরো উন্নতি যাতে হয় তাই সেটা এসেছে। তারা বলতো: এ খুব একটা ভালো ইঙ্গিত, কোন দোষে রোগটা হলো তা জেনে আমি সেই দিক দিয়ে আরো

উন্নতির চেষ্টা করতে পারব। আর আমি এও জানি তারা বাস্তবিকই তাদের পথে সুন্দরভাবে অগ্রসর হতে পেরেছিল। আবার এমন লোকও আছে যারা ওতে আদৌ উপকৃত হয়না, বরং হতাশ হয়ে মাটিতে একেবারে শুয়ে পড়ে। কিন্তু রোগ আক্রমণ করলে সঠিক মনোভাব এই হওয়া উচিত: "নিশ্চয় ভিতরে কোথাও কিছু গলদ আছে, খুঁজে দেখা দরকার।" তবে একবারও এমন কথা ভেবোনা যে জগদীশ্বর ইচ্ছা করেই তোমাকে রোগ দিলেন, তাহলে সে ঈশ্বর তো হলেন বদ ঈশ্বর।

প্রশ্ন : তা হোক, কিন্তু রোগের কারণ বীজাণুরা তো থাকে জলের মধ্যে?

উত্তর : তা থাকলেও কিন্তু সে জল না পান করেও তোমাদের রোগ জন্মায়, যখন মন প্রাণ ও দেহের বিভিন্ন অংশগুলিতে নিজস্ব কোনো দোষের অবস্থা আসে। সেখানে দেখা যায় হয়েছে একটা নিরন্তর কিছু অসঙ্গতি। আমি সত্তার ভিতরের দিকের কথা বলছি না। ভিতরের দিক হয়তো ঠিকই আছে, কিন্তু সঙ্গতি সর্বত্র সত্তায় থাকলে তখন রোগ নিবারিত হবেই।

তুমি যা বললে তার উল্টো রকম ব্যাপারও আমি দেখেছি। এই দেশেই তা দেখেছি গ্রামের মানুষদের মধ্যে, তারা সেখানে যে জল খেয়ে থাকে তাকে জল বলা যায়না, একেবারে কাদা-গোলা। নিজের চোখে দেখেছি, পুকুরে হলুদবর্ণ জল, গরু ছাগল তার মধ্যে নেমে যা খুশি তাই করছে, রাহী মানুষরা তার মধ্যে ধুলো পায়ে নেমে যত কিছু আবর্জনা নিক্ষেপ করছে। আর গ্রামের লোকেরা সেই হলুদবর্ণ কাদাজলের মধ্যে নেমে যা অবশিষ্ট আছে তাই আঁজলা ভরে পান করছে। অনেকে তাকে থিতিয়ে যেতেও দেয়না। কেউ কেউ জানে কি রকমের জড়িবুটির নির্যাস দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই জলটা পরিষ্কার হয়। কিন্তু ওরা তা জানতো না, যেমন জল আছে তাই নিয়ে গিয়েই পান করতো। তারপরে শুনি যে আশপাশের গ্রামে কলেরা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "এমন জল খেয়েও এই গ্রামের লোক বেঁচে আছে?" তারা বললে: "আমাদের এদিকে কাহাকেই কলেরা হয়নি।" তারা ঐ জল খেতেই অভ্যস্ত হয়ে তাদের একটা অনাক্রম্যতা শক্তি এসে গেছে। কিন্তু ওখানে যদি দৈবাৎ কোনো একজনের কলেরা হতো, তাহলে তখন হয়তো সকলেই আক্রান্ত হয়ে মারা যেতো; কারণ তাদের মধ্যে তখন এমন ভয় ঢুকে যেতো যে সেই অনাক্রম্যতা শক্তি আর থাকতো না, গরিব বেচারারা সেই ভয়েই মারা পড়ত। তাদের দৈহিক অবস্থার চেয়ে নৈতিক অবস্থা আরো খারাপ।

এমন সব সাধু সন্ন্যাসী আছে যারা অপরিচ্ছন্ন জীবন নিয়েই দিন কাটায়। কখনো তারা স্নান করেনা, স্বাস্থ্যের নিয়ম কোনো কিছুই মানেনা। সর্বক্ষণই তারা নোংরা অবস্থায়

থাকে, অথচ তাদের কোনো রোগ নেই। হয়তো কেবল বিশ্বাসের জোরে তারা ইচ্ছা করেই ওরূপ বিশ্রীভাবে থাকে। নৈতিক বল তাদের খুবই মজবুত...আমি বলছি খাঁটি সাধুদের কথা যারা ভণ্ড সাধু তাদের কথা নয়। তাদের মধ্যে এমন বিশ্বাসের জোর আছে, নিজের দেহের কথা তারা আদৌ চিন্তাই করে না, কেবল ভাবে ভিতরের আত্মিক জীবনের কথা। অসুখের ভয় তাদের নেই। কেউ কেউ সন্ন্যাসের কোনো কঠোর আসন অভ্যাস করতে করতে পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, হাত পা কিংবা দেহের কোনো অংশ একেবারে অসাড় অকর্মণ্য হয়ে গেছে। এমন কি নড়াচড়া করতেও পারে না অন্য কেউ হলে তেমন অবস্থাতে মারাই যেতো, কিন্তু বিশ্বাসের জোরে তাতেও তারা বেঁচে থাকে, এমন কি ইচ্ছা করেই তারা দেহের ওরূপ অবস্থা নিয়ে আসে।

তাই বলছি, দৈহিক অবস্থার চেয়ে নৈতিক অবস্থা ঠিক রাখা আরো বেশি জরুরী। তুমি যদি পরিচ্ছন্ন থাকতেই অভ্যস্ত হও তাহলে তিন দিন মাত্র স্নান করা না হলেই তুমি অসুখে পড়বে। স্নান অভ্যাস কোরোনা এ কথা বলছি না! কারণ আমরা তো সাধু হতে চাই না, আমরা চাই যোগী হতে। ও দুটো এক জিনিস নয়। আর আমরা চাই যে দেহটাও আমাদের এই যোগে অংশগ্রহণ করবে। সুতরাং দেহকে সুস্থ ও মজবুত রাখার জন্য যা কিছু দরকার আমাদের তা করতে হবে। তবে কেবল ঐ কথাটি এখানে বলে রাখলাম যে দৈহিক বলের চেয়েও নৈতিক বল আরো বেশি জরুরী।

সন্ন্যাসের জীবন নিয়ে যারা ইচ্ছা করেই দেহকে ঐভাবে বিকৃত করে, নিজেদিকে পীড়ন করতে থাকে, তেমন যদি সাধারণো অন্য কেউ করতো তাহলে লোকে তার তীব্র প্রতিবাদ করতো, তাকে বলতো রাক্ষস। কিন্তু এরা ইচ্ছা করেই সেরূপ করে, এবং তাই তাদের সয়েও যায়, তারা ওতেই একরকম গৌরব বোধ করে, ভগবানকে পাবার জন্যে তারা "বিশেষ কিছু" ক্রিয়া করছে।

আর কোনো প্রশ্ন আছে?

আচ্ছা তাহলে, এবার বলব বিশেষ করে রোগের সম্বন্ধে, সেদিন যা বলতে চেয়েছিলাম; সে কথা বলব মনে করে আজ কিছু লিখেও এনেছি।...তোমরা হয়তো বলবে যে রোগের উৎপত্তির জন্যে বীজাণু রয়েছে, তাই কেউ রোগের কথা না চিন্তা করলেও রোগ এসে ধরে; কিন্তু এখানে কেবল সেটাই ভাববার কথা নয়, আরো কথা আছে। বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করি (হাতের কাগজ দেখলেন)।

প্রথমেই তোমাদের বলে রেখেছি, রোগ হওয়া মানেই সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির একটা কিছু বিচ্যুতি ঘটা—এটি নিশ্চয় হবে, বিনা ব্যতিক্রমে। তবে সে বিচ্যুতি হতে পারে অনেক রকমের।...আগে কেবল দেহের কথাই বলি, প্রাণের অনেকের স্নায়ুরোগ বা মনের রোগের কথা বাদ দিয়ে। সে কথা পরে হবে। এখন বলছি যেটারা

এই ক্ষুদ্র দেহটারই কথা। দেহের ভিতরের সকল রোগই, যাই কেন হোক (এমন কি আকস্মিক দুর্ঘটনা পর্যন্ত) তা হয়ে থাকে কোনো অসামঞ্জস্য থেকে। অর্থাৎ যতক্ষণ তোমার দেহের যাবতীয় যন্ত্রগুলি ও যাবতীয় অংশগুলি পরস্পরের মধ্যে ঠিক সঙ্গতি রেখে চলেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বেশ সুস্থই থাকবে। কিন্তু কোথাও যদি সেই সামঞ্জস্য একটু বিগুড়ে যায়, তখনই তোমার ছোটো কিংবা বড়ো রকমের কিছু অসুখ হবে, কিংবা একটা দুর্ঘটনাও হতে পারে। ভিতরকার তারসাম্য কোথাও নষ্ট হলে নিশ্চয়ই তা হয়ে থাকে।

কিন্তু কেবল দেহের সামঞ্জস্য ছাড়া প্রাণের ও মনের সামঞ্জস্যের কথাটাও যোগ করতে হবে। যদি কোনো রোগে আক্রান্ত না হয়ে সব কিছুকে এড়াতে চাও, এমন কি দুর্ঘটনা পর্যন্ত, তাহলে এই তিন রকমের সামঞ্জস্যই বজায় রাখা চাই, দৈহিক প্রাণিক ও মানসিক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন অংশে নয় কিন্তু তাদের পারস্পরিক সম্পর্কেও।...যদি কিছু অঙ্কশাস্ত্র শেখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সংখ্যাগুলির মধ্যে কত রকমের সমন্বয় হতে পারে। এবং তার অর্থ নিরূপণ করা কত কঠিন! কিন্তু ওতেই রয়েছে সমস্যার চাবিকাঠি। নানা ধরণের সংখ্যাঘটিত সমন্বয়ও যেমন অসংখ্য, রোগের ও দুর্ঘটনার কারণের সমন্বয়ও তেমনি অসংখ্য। এখন সেগুলিকে মোটামুটি বোঝবার মতো শ্রেণীবিভাগ করে দেখা যাক।

প্রথমত শুধু দেহের দিক থেকেই রয়েছে দুই প্রকারের অসামঞ্জস্য—ক্রিয়ামূলক ও যন্ত্রমূলক। এ দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা বুঝবে কিনা জানিনা। তোমার দেহেতে রয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রাদি ও অঙ্গাদি; স্নায়ু, মাংসপেশী, হাড় ইত্যাদি। যদি কোনো যন্ত্রের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটে, তাহলে বলবে অমুক যন্ত্রটা বিগুড়েছে বা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে বা সেখানে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতেই যন্ত্রটি অসুস্থ। কিন্তু আবার সে যন্ত্রটি ঠিক থাকলেও এবং সকল যন্ত্রগুলিই ঠিক থাকলেও অসুস্থতা ঘটতে পারে, যখন তার কাজ ঠিক হচ্ছেনা, তার ক্রিয়ার বেলাতে কিছু অসামঞ্জস্য ঘটেছে। তোমার পাকযন্ত্র হয়তো ঠিকই আছে, তবুও ওর ক্রিয়াতে হঠাৎ এমন কিছু বিঘ্ন হলো যাতে সে ঠিকভাবে তার কাজ করতে পারল না; কিংবা গোটা শরীরের বেলাতেও তাই হলো, সমস্ত জিনিস ঠিক থাকলেও শরীর স্বাভাবিক তার কাজগুলি করতে পারলেনা। এ স্থলে রোগটি যন্ত্রমূলক নয়, বৃত্তিমূলক বা ক্রিয়ামূলক।

সাধারণত এই ক্রিয়ামূলক ব্যাধিগুলিকে যন্ত্রমূলক ব্যাধির চেয়ে তাড়াতাড়ি আরোগ্য করা যায়। যন্ত্রমূলক ব্যাধি আরো কঠিন, কখনো বা মারাত্মকও হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এই দুই রকম জিনিসকে জানা ও স্বতন্ত্রভাবে চেনা দরকার; দেহ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকলে আর ক্রিয়াগুলিকে লক্ষ্য করা অভ্যাস থাকলে তখন জানতে পারবে যে কখন কোন রকমের অসামঞ্জস্য এসে তার ফলে রোগ হয়েছে।

তরুণ বয়সে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে থাকলে তখনকার যেসব অসামঞ্জস্য ঘটতে দেখা যায় তা প্রায়ই হয় ক্রিয়ামূলক। তবে দুর্ভাগ্যবশত কয়েকজন এমন অসঙ্গতি নিয়েই জন্মায় যে তাদের সে ত্রুটি সারানো খুবই কঠিন হয় (অসাধ্য নয় অবশ্য, কারণ অসাধ্য বলে কোনো কিছুই নেই, কিন্তু দুঃসাধ্য তো বটেই)।

যাক তাহলে এই সকল অসামঞ্জস্যের কারণ কি হতে পারে? আগেই বলেছি যে কারণ হতে পারে অসংখ্য; তার মধ্যে রয়েছে স্বভাবজ কারণ যা নিজের ভিতরকার জিনিস, আর রয়েছে আগন্তুক কারণ যা বাহির থেকে আসে। মূল বিভাগ এই দুটি।

অতঃপর স্বভাবজ আভ্যন্তরীণ কারণগুলির কথা।

আগেই বলেছি; তোমার মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্ক, দুটি ফুসফুস, একটি হৃদ্‌যন্ত্র, একটি পাকযন্ত্র, একটি যকৃৎ ইত্যাদি। এরা প্রত্যেকেই যদি স্বাভাবিক নিয়মে স্বাপন কর্তব্য পালন করতে থাকে আর পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি রেখে চলে। (কিন্তু তুমি যদি তাই নিয়ে ভাবতে বসো তাহলে সে সঙ্গতি না থাকতে পারে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের কোনো চেতন চিন্তার উপর তা নির্ভর করে না),—অর্থাৎ যদি সহৃদয় বন্ধুর মতো নিতালি বজায় রেখে পরস্পরে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মাত্রায় আপন কাজ ক'রে যেতে থাকে, তাড়াতাড়িও নয় বিলম্বেও নয়, দ্রুতগতিতেও নয় বা মন্থরগতিতেও নয়, সবাই চলছে শৃঙ্খলার সঙ্গে, তাহলে অবশ্য তুমি সুস্থই থাকবে। কিন্তু মনে করো যদি কোনো কারণে ওদের মধ্যে কেউ একটা বিকল হয়ে বা বিরূপ হয়ে পড়ল ঠিকভাবে কাজ না করে সে ধর্মঘট করে বসলো। তাহলে তখন কেবল সেই যে অসুস্থ হবে এমন কথা মনে কোরো না; গোটা শরীরটাই তাতে বিগড়ে যাবে এবং তুমি অসুস্থ বোধ করবে। আবার দুর্ভাগ্যবশত তার সঙ্গে যদি প্রাণের স্তরের অসঙ্গতি এসে জোটে, অর্থাৎ হতাশা বা অস্থিরতা বা প্রাণ-সত্তাকে উদ্‌ঘাটন করার মতো কোনো যন্ত্র যাবেগ, তাহলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। তাতে আবার যদি মনের চিন্তাক্রিয়া এসে যোগ দেয়, অর্থাৎ এলোমেলো দুর্ভাবনা ও উৎকণ্ঠা ও দুর্গতির বিভীষিকা এসে পড়ে, তাহলে তুমি মোক্ষম রকমে অসুস্থ হয়ে পড়লে।... তবেই দেখ, এখানে কতটা জটিলতা এসে পড়ছে, কারণ যদিও সামান্য হলেও তাতেই যথেষ্ট মন্দ ফল ঘটতে পারে, ভিতরের ঐ সব সংক্রামকতা একত্রে জুটে তা একটা কঠিন রোগে দাঁড় করাতে পারে। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ লাগাম টেনে ধরা দরকার। তোমাকে চেতন হয়ে থাকতে হবে চেতন হবে তোমার যন্ত্রাদির ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে, লক্ষ্য করবে যে ঠিকভাবে কোনটা চলছে না, তখনই তাকে বাধ্য করবে নিজেকে শুধরে নিতে। যেমন ক'রে ছেলেদের পড়তে শেখানো হয় তেমনিভাবে এদের শেখানো চাই (এ কথা পরে বলব)। খানখেয়ালের বশে যখন তারা কাজ করতে যাবে (এখন সেটাই বলা দরকার) তখন তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে, অমন করা চলবে না, এইভাবে চলো। যেমন মনে করো,

তোমার হৃদ্‌যন্ত্র হঠাৎ পাগলের মতো তাড়াতাড়ি ধক্‌ধক্‌ ক'রে হাতুড়ি পিটতে শুরু করলে : তখন তাকে বলবে স্থির হও, স্থির হও, অমন উতলা হয়োনা, আর (তাকে সাহায্য করতে) সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ ছন্দে খুব লম্বা শ্বাস নিতে শুরু করবে, যাতে ফুস্‌ফুস্‌ ঐভাবে কাজ দেখিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রকে ধীরে চলতে শেখায়। এমনি আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

আচ্ছা, তাহলে দেখা গেল যে সত্তার বিভিন্ন অংশে ও তাদের ক্রিয়াতে নানা অসঙ্গতি ঘটে, যেমন তোমাদের এখন বললাম। এ ছাড়াও রয়েছে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ববিরোধ, ভিতরকার বিভিন্ন অংশে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতে পারে। যেমন, কোনো যন্ত্র চাইছে বিশ্রাম (যেটা প্রায়ই হয়), আর অন্য যন্ত্র চাইছে তৎপরতা, একই কালে দুটো দুরকম চাইছে। তখন তুমি কি করবে? ওদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। একজনের কথা যদি শোনো তবে অন্যজন তাতে নারাজ হবে। তখন তোমাকে একটা নাস্তানাবুদি মীমাংসা ক'রে দুজনের মধ্যে আপস করে দিতে হবে। ওর মধ্যে যদি প্রাণ ও মনের স্তরও যোগ দেয় (মূল প্রাণসত্তা বা চিন্ময় মনের কথা বলছি না, এখানে বলছি কেবল দেহগত প্রাণ ও মনের অংশের, দেহগত মনও একটা আছে আর সেটাই সব চেয়ে গোলমেলে, তার কাজ সারাক্ষণই লেগে আছে, তাকে খানিয়ে রাখতে তোমার যথেষ্টই বেগ পেতে হয়, সে কেবল চলতেই থাকবে তার আপন পথে,)—এই দেহগত প্রাণ ও মন ও দেহের মধ্যে যদি বিরোধ বাধে, তাহলে রীতিমত একটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল, যার ফলে সকল রকমের রোগই আসতে পারে। কারণ সেখানে লড়াই চলছে, একজন চাইছে আর একজন চাইছে না, এতে তোমার মধ্যে একটা ঘূর্ণাবর্ত শুরু হয়ে যায়। এর ফলে জ্বরও আসতে পারে...যা প্রায়ই হয়—কিংবা তোমার সারা দেহ কাঁপতে থাকে, নিজের উপর কোনো আর কর্তৃত্ব থাকে না। দেহটা অস্থির হয়ে ওঠে, যা রোগ আসবার সব চেয়ে বড়ো কারণ কাঁপুনি ক্রমশ এমন বাড়তে থাকে যে মনে হয় বুঝি সামলানো আর রাখা গেল না। সেখানে তোমাকে দেখতে হবে যে আসলে ঝগড়াটা কেন এবং কিসের থেকে হচ্ছে, জানতে হবে যে কেমন ক'রে ওদের মধ্যে আপস করানো যায়।

এ সবগুলি হলো ক্রিয়ামূলক অসঙ্গতি ও অসুস্থতা সম্পর্কে।

আরো অন্য রকমের অসঙ্গতি আছে, যে কথা তোমরা এখন বললে তারই অংশস্বরূপ। তোমার মধ্যে একটা আশ্পৃহা জেগে আছে (এটা বলছি যারা যোগ করে বা যারা আধ্যাত্মিক জীবনের কথা জেনে সেই পথে চলতে শুরু করে তাদের সম্পর্কে), তোমার মন প্রাণ এবং দেহেরও কোনো অংশে রয়েছে অলক্ত আশ্পৃহা, জিনিসটা বুঝে নিয়ে ও উচ্চ শক্তির সাহায্য নিয়ে তুমি খানিকটা এগিয়ে যেতেও পারছ। কিন্তু যাবার কোনো কোনো অংশ সেই সঙ্গে তাল রেখে এগোতে পারছে না, কোনো অংশ তা হয়তো চাইছেও না (যা খুবই খারাপ কথা), আবার কোনো অংশ চাইলেও তা পারছে না, তার তেমন

সামর্থ্যও নেই আর প্রস্তুতিও নেই। অর্থাৎ সেখানে তোমার কতকগুলি অংশ উপরের দিকে উঠে চলেছে আর কতকগুলি অংশ মোটেই উঠছে না। এর ফলে এসেই পড়ে একটা অসামঞ্জস্য। তাতেও হয় কোনো রোগপীড়া, এই পারা ও না-পারার টানাটানিতে; কতক চাইছে আর কতক চাইছে না, এরই অবস্থিতি থেকে একটা রোগ জন্মে যায়।

আবার তার উল্টো রকমও হয়; অর্থাৎ যেখানে সমগ্র সত্তাই সামঞ্জস্য বজায় রেখে অগ্রসর হতে পারছে, কাজ ভালোই হচ্ছে; তুমি দেখলে যে অনুকূল অবস্থা পেয়ে নির্বিঘ্নে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ, সব কাজই ঠিক হচ্ছে, তোমার চলার পথে কোনো বাধা নেই...কিন্তু হঠাৎ যে কি হলো! তারই মধ্যে একটা রোগ এসে গেল। তুমি বললে: "এ কি হলো! বেশই তো ছিলাম, তবে রোগ হলো কেন। এ তো উচিত নয়।" কিন্তু ওর কারণ এই যে তখনো তুমি পুরো চেতন হওনি। সত্তার মধ্যে ছোটো একটু অংশ ছিল যা একটুও নড়েনি—যা প্রায়ই হয় প্রাণের কোনো অংশ, অথবা কখনো মনেরই একটা নির্দিষ্ট গঠন যা কোনোমতে বদলাতে চায়না, বা দেহেরই কোনো জড় অংশ যা আলো কিছু নড়তে চায় না, যেমন আছে তেমনই থাকতে চায়। অতি ছোটো একটুখানি জিনিস হলেও সেটাই আলাদা থেকে তোমাকে পিছন দিকে টানে, ওতেই একটা অসঙ্গতি এসে তোমাকে রোগগ্রস্ত করে। তখন তুমি বলো "এ অতি দুঃখের কথা, খুবই অন্যায় কথা, ভগবান কি এতই নির্দয়! কেমন সুন্দরভাবে এগোচ্ছিলাম, নিশ্চয় তাঁর উচিত ছিল আমাকে রোগ থেকে রক্ষা করা!" কিন্তু এইরকমই হয়ে থাকে।

আরো কথা আছে। তুমি হয়তো তোমার সাধ্যমতই যোগ করছ। তুমি এই কথাই শুধু শুনেছ "নিজেকে খুলে ধরো, উচ্চশক্তিকে যাতে গ্রহণ করতে পারো তাই করো।" তুমি আরো শুনেছ: "বিশ্বাস করো, ভালো মনে নির্ভরতা নিয়ে থাকো, ভগবৎ আশ্রয় পেয়ে যাবে।" তোমার বিশ্বাস ও উন্মীলন অনুযায়ী চেতনাতে শক্তির আশ্রয়ে তুমি রইলে, যতটা পারো গ্রহণ করে তুমি সুস্থ ও নির্বিঘ্নভাবে চলতে থাকলে, ছোটোখাটো যা কিছু বিপর্যয় আসে তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে এবং সকল আক্রমণ ও দুর্ঘটনাকে বাঁচিয়ে তুমি নিজেকে অটুট রাখতে পারলে। কিন্তু তবু যদি তোমার সত্তার কোনো অংশে, মন বা প্রাণ বা দেহে কোথাও এক বা একাধিক স্থানে অবতরণমুখী উচ্চশক্তিকে ধারণ করবার মতো গ্রহিষ্ণুতার অভাব থাকে, তবে চলন্ত কলের মধ্যে কাঁকর ঢুকে পড়ার মতো তা খিচখিচ করে বাধবে। তোমরা জানো যে কোনো মেশিন যখন চলছে তখন যদি তার মধ্যে কিছু বালুকণা ফেলে দাও (একটিমাত্র দানা ফেললেও যথেষ্ট) তাতেও তার কাজ বিগড়ে গিয়ে মেশিনটা থেমে যাবে। ঠিক তেমনি কোথাও

যদি দিব্য গ্রহিষ্ণুতার একটুখানি অভাব থাকে, বা এমন কিছু থাকে যা ভগবৎ-শক্তিকে নিতে নারাজ হয়ে নিজেকে আবদ্ধ রেখে দিয়েছে (দেখতে সেটা একটা কালো দাগের মতো, একটা কঠিন পাথরকুচির মতো যাকে সেই শক্তি ভেদ করতে পারেনা আর সেও তাকে নিতে অপারগ কিংবা নিতে চায়না) তবে এরই ফলে একটা গুরুতর অসঙ্গতি ঘটতে পারে, তোমার মধ্যে যা উপরের দিকে উঠছিল, চমৎকার ফুটে উঠছিল, সেটাই তখন অসুস্থ হয়ে পড়ে ; তুমি যখন উত্তম স্বাস্থ্য নিয়ে সুন্দরভাবে এগোচ্ছিলে, নালিশ করবার কিছুই ছিলনা, তখনও এমন হয়ে যায়। কোনো দিন হয়তো একটা নতুন ভাব, নতুন প্রেরণা নতুন আস্পৃহা এসে গেছে, নতুন শক্তি পেয়ে ও সুন্দর একটা অনুভূতি পেয়ে ভিতরের দরজা খুলে গেছে, এমন অপূর্ব জ্ঞান এসে গেছে যা আগে কখনো আসেনি, সবই চলছে বেশ ভালোভাবে...হঠাৎ পরের দিন একটা অসুখে আক্রান্ত হলে। তখন বললে : "এখনও সেই জিনিস রয়েছে! অসম্ভব কথা। এমন হওয়া তো ঠিক নয়।" কিন্তু আমি যা বললাম সেই রকমই সেখানে হয়েছে ছোট কোনো বালুকণা রয়ে গেছে। সামান্য সেটুকুই উন্নতিকে নিতে অক্ষম হয়ে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে। তাতেই অসুস্থ হলে।

তবে দেখ, কতই কারণ রয়েছে! একেবারে অসংখ্য। এমনি সব জিনিস একত্রে জড়িয়ে খুবই জটিলভাবে কাজ করে। তাই এমন ব্যাধি দূর করতে হলে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে, সেখানে কেবল বীজাণু খুঁজলে চলবে না। কারণ বীজাণু যেমন আছে, তেমনি তাকে মারবার মতো চমৎকার চমৎকার ওষুধও সব আছে। তবু তো কতকগুলো সারে, আর কতকগুলো বরং আরো বেশি বিগড়ে যায়। কেন তা হয় তা কেউ বলতে পারে না...হয়তো আমি সেটা বলতে পারি। সেখানে ঐ নিমিত্ত কারণ ছাড়া আরো কোনো কারণ ছিল, আর নিমিত্তটা ছিল তারই একরূপ বহিঃপ্রকাশ ; সেই মূল কারণটি ছুঁতে না পারলে ঐ রোগটিকে নিবারণ করতে পারবে না। আর রোগারোগ্যের সে কারণটি জানতে হলে চাই গুহ্যজ্ঞান, প্রত্যেকের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার জ্ঞান।

আপাতত সংক্ষেপে বলা হলো যাবতীয় আভ্যন্তরীণ কারণগুলির কথা। এবার বলব বাহ্য কারণগুলির কথা, যার দ্বারা নানা উপসর্গের সৃষ্টি হয়।

তুমি যদি এমন সঙ্গতিপূর্ণ অনুকূল পরিবেশের মধ্যে থাকো যেখানে সামগ্রিকভাবে সব কিছুতেই আছে শুভ ও মঙ্গলেচ্ছা, সে ক্ষেত্রে অবশ্য দোষটা তোমার নিজের উপরেই বর্তাবে। কিন্তু ভিতরে যেমন বিপত্তি থাকে বাইরেও তেমনি থাকে। নিজের তরফে তুমি সঙ্গতি রাখতে পারলেও বাইরের পরিস্থিতি যদি অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে নিজেকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে আড়াল করে রাখতে না পারলে (যা পারাও যায় না আর পারতে বলাও যায় না) তখন বাইরের থেকে যা আসে তাকে নিতে বাধ্য হতেই হয়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের

আদানপ্রদানের দ্বারা দেওয়াও হয় আর নেওয়াও হয়। এমনি বিশ্রণ ঘটে বলেই তাকে সংক্রামক বলা হয়, কারণ সেই মিশ্রিত স্পন্দনাবস্থার মধ্যেই তোমাকে থাকতে হচ্ছে। তোমার স্পন্দন তুমি দিচ্ছ, অন্যের স্পন্দন তুমি নিচ্ছ, সব মিলে হচ্ছে একটা জটিল ব্যাপার। তার মধ্যে রয়েছে (সোজা ভাষায় বলতে গেলে) মনের প্রাণের ও দৈহিকের স্পন্দন এবং আরো অনেক কিছু। দেওয়া আর নেওয়া, অনবরতই এই চলছে। মন্দ ইচ্ছা কিছু না থাকলেও পরস্পরের ছোঁয়াছুঁয়ি তো আছেই। তাই তখন সব কিছুই সংক্রামক। একটা দুর্ঘটনা ঘটতে দেখলে, তার স্পন্দন তুমি নিয়ে নিলে কিছু ; আর সেই সঙ্গে যদি তুমি খুব অনুভূতিকাতর হও, যদি ভয় আসে বা গা ঘুলিয়ে ওঠে (কারণ দুই একই জিনিস, ভয়েরই অভিব্যক্তি) তাহলে তোমার দেহেও তেমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। লোকে বলবে যে স্নায়ুর বিকৃতি থেকে অমন প্রতিক্রিয়া হয়, কিন্তু ঠিক তাই নয়। কেবল সেখানে তোমার প্রাণের অনুভূতির উত্তেজনা খুব প্রবল, এই পর্যন্ত। তাতে কিন্তু কিছু অবনতির প্রমাণ হয়না, বরং তার উল্টো কথা। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে স্নায়ুর অনুভূতির এমন প্রখরতা আসতে পারে যাতে, তৎসঙ্গে আত্মসংযম না বাড়লে অনেক কিছুই অস্বাভাবিক জিনিস ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু কেবল ঐ কথাই নয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, জগতে অশুভ ইচ্ছা যথেষ্টই আছে। তার মধ্যে রয়েছে ছোটো রকমের জিনিস যা আসে অজ্ঞতা ও মূঢ়তা থেকে, আর রয়েছে বড়ো রকমের জিনিস যা আসে দুঃশীলতা থেকে, আর মারাত্মক রকমেরও আছে যা আসে অন্দিব্য শক্তিগুলি থেকে। সবই রয়েছে আবহাওয়ার মধ্যে (তোমাদের ভয় দেখাতে এ সব কথা বলছিনা, ভয় অবশ্য কোনো কিছুকেই তোমরা করবেনা, কিন্তু আছে এই সব), আর তাও তোমাকে আক্রমণ করে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। অনিচ্ছায় আসে অন্য জনের মারফতে। তারা যে আক্রান্ত হয়েছে তাও তারা জানে না, আর তা যে সঞ্চালন করছে তাও জানে না। তারাই প্রথম বলি, পরে তারা তা আরো সঞ্চারিত করে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত আক্রমণও আছে। সেদিন বলছিলাম দুষ্টলোকের মনের ক্ষতিকারক প্রবৃত্তির কথা, ইচ্ছার দ্বারাই তারা তোমার ক্ষতি করে। কেউ কেউ আবার অন্য চেয়েও বেশি করে।

এরকম গুহ্যবিদ্যা আছে যা বিকৃত ও ক্রূর, যাকে বলা হয় কালো ম্যাজিক, সে-বিদ্যা কেউ যেন স্পর্শমাত্র না করে। তবু দুঃশীল ব্যক্তিরা কেউ কেউ তাই নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাঁটি করে। সেটা ভুল নামা বা কুসংস্কারের কথা বলে ভেবোনা, যথার্থই তা হয়। যারা অমন ম্যাজিক জানে তারা তা করে থাকে প্রয়োগ এবং তার ফল হয় অতি ঘৃণ্য।... অবশ্য এটা ঠিক কথা যে যখন তুমি নির্ভয়ে আছো আশ্রমের মধ্যে, তখন তুমি বেঁচে যাবে। কিন্তু সেই "যখন"কার অবস্থাটি সর্বদা সমানভাবে না থাকতে পারে, এবং দুর্বল মুহূর্তে

অনর্থ কিছু ঘটে যেতে পারে। যখন তুমি শক্তি নিয়ে পুরো অবস্থায় আছো—অর্থাৎ অভেদ্য হয়ে—তখন কেউ অমঙ্গল-শক্তি প্রেরণ করলে তা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে, যেমন টেনিস বল ছুটে এসে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়—কখনো-বা সমান জোরে কখনো-বা তার চেয়েও বেশি জোরে, সুতরাং যারা মন্দ করতে চেয়েছিল তাদেরই তাতে আরো বেশি রকম মন্দ হয়। কিন্তু সবই নির্ভর করে যার উপর তা প্রয়োগ করা হচ্ছে তার আভ্যন্তরীণ শক্তি ও বিশুদ্ধতার উপর।...এমন হতে আমি অনেক দেখেছি। সেরূপ অনিষ্টকে ঠেকাতে হলে প্রাণের ভিতরে যোদ্ধাস্বরূপ হয়ে থাকা চাই, অর্থাৎ প্রাণগত আধ্যাত্মিক যোদ্ধা। যারা ঐকান্তিকভাবে যোগ করে তারা তাই হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন তারা আশ্রয়ের মধ্যেই থাকে। কিন্তু তার মধ্যে একটা শর্ত এই যে তোমার নিজের ভিতরে কারো প্রতি কোনো অশুভ ইচ্ছা থাকবেনা, নতুবা তাদেরই সঙ্গে সমান স্তরে নেমে যাবে এবং তাদের কাছ থেকেই যা যাবার সম্ভাবনা এসে পড়বে।

কিন্তু অতটা পর্যন্ত না গেলেও এই পৃথিবীর আবহাওয়াতে বিস্তর সংখ্যায় এমন সব ছোটো ছোটো অদৃশ্য সত্তা রয়েছে, দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে তাদের তুমি চোখে দেখনা, কিন্তু তারা সর্বদাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেক সরল ও সুন্দর আবার অনেকে বেজায় বেজায় কুটিল। এরা প্রাণজগতের সত্তাদের অপভ্রংশ, অবাঞ্ছিত একটা দল। কেউ কেউ উপকারীও হয়। বোধ করি তোমাদের বলেছি সে গল্প, তেমনি কয়েকটি সত্তা একদিন আমার শাড়ির আঁচল ধরে টানলে, তারা বলতে চাইছিল যে, উনুনে আমার দুধটা ফুটে গেছে, তখনই সেটার ব্যবস্থা না করলে দুধ উথলে পড়ে যাবে। কিন্তু সবাই অমন নয়। কেউ কেউ আবার মজা দেখবার জন্য অনিষ্ট করে। এরাই প্রায় থাকে নানা দুর্ঘটনার পিছনে। ওতেই তারা বেশ কৌতুক বোধ করে, দুর্ঘটনার মধ্যে কত শক্তি এসে জড়ো হলো, কত লোক এসে জুটল, এই তাদের কাছে বেশ মজার কথা। এ হলো তাদের খোরাকি, মানুষের প্রাণশক্তি আবেগে উত্তেজনায় দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ছে, তাই খেয়েই ওদের পেট ভরে। তারা বলে এই সামান্য একটুখানি দুর্ঘটনা বই তো নয়, বেশ সুন্দর জিনিস হোক না আরো!

ওদের মধ্যে আবার এক দলের সঙ্গে অন্য দলের লড়াই বেধে যায়, শান্তি ওদেরও মধ্যে নেই; লড়াই বাধলে পরস্পরকে তারা দমন করতে শুরু করে। তখন ভেঙেচুরে গিয়ে তার থেকেই জন্মায় বীজাণু। তাদের ভাঙা শক্তি চলে আসে বীজাণু ও রোগবীজের মধ্যে, তাতেই বীজাণুরা জীবন্ত থাকে। অধিকাংশের পিছনেই থাকে তাদের অশুভ ইচ্ছার বীজ, সেইজন্যই ওরা এত বিপদ-জনক হয়। সেই অশুভ ইচ্ছাকে নিবৃত্ত ও তাকে দমন করতে পারার হদিশ যদি না জানা থাকে, তাহলে শতকরা নিরানব্বই স্থলে তার প্রকৃত ওষুধ খুঁজে পাওয়া যায়না। ঐ সব বীজাণু হলো সূক্ষ্ম জগতের অন্তর্গত কোনো জীবন্ত শক্তির

বাস্তব অভিব্যক্তি, তাই আমি বলেছিলাম যে বীজাণুরা সর্বদাই তোমাকে ঘিরে আছে বছরের পর বছর, অথচ তোমার কোনো অনিষ্ট তারা করছেনা, কিন্তু কোনো কারণে এক সময় হঠাৎ তুমি তাদের দ্বারা অসুস্থ হয়ে পড়ো।

আরো কারণ আছে। জীবাণুর মূল উৎস অসঙ্গতি হতে, আর তার ক্রিয়া নির্ভর করে বিরোধী শক্তিকে গ্রহণ করবার উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা গল্প বলব, আগে বলেছি কিনা জানিনা, কিন্তু আবার বলছি।

তখন ছিলাম জাপানে, ১৯১৯ সালের জানুয়ারির গোড়ার দিকে। সেই সময়টাতে সারা জাপান জুড়ে চলেছে ফ্লু রোগের মহামারীর প্রবল প্রকোপ, হাজার হাজার লোক তাতে মারা যাচ্ছে। অমন ব্যাপক মহামারী খুব কমই দেখা যায়। টোকিও শহরে শত শত লোক ওতে আক্রান্ত হচ্ছে। রোগটার এইরকম ধারা ছিল: তিন দিন মাত্র ভুগে রোগী তৃতীয় দিনে মারা যাচ্ছিল: এত বেশি মরছিল যে সকলের সময়মত সৎকার হচ্ছিলনা। তবে তৃতীয় দিনটি যার পার হয়ে গেল সে সাত দিনে সুস্থ হয়ে উঠছিল, কিছু দুর্বল হয়ে পড়লেও সম্পূর্ণই সেরে যাচ্ছিল। শহরে সকলের মধ্যে একটা আতংক দেখা দিল, কারণ মহামারীর এমন প্রকোপ জাপানে খুব কমই হয়ে থাকে। ওরা সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সংযতভাবে একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে থাকতে অভ্যস্ত, তাই রোগপীড়া ওদের কমই হয়। তেমন স্থানে মহামারীর প্রকোপ একটা বিপর্যয়ের মতো। সকলেই দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তারা রাস্তায় হাঁটতে লাগল নাকে মুখোশ এঁটে, যাতে বীজাণু কর্তৃক দূষিত বায়ু নাকের মধ্যে না ঢোকে। এইভাবে সকলেই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগল।...আমি যার বাড়িতে ছিলাম সে লোকটি ক্রমাগতই আমাকে এই বলে উত্যক্ত করতে থাকল "এ রোগটা কী। বলুন তো? এর পিছনে কী ব্যাপার রয়েছে?" আর আমি কেবল আপন শক্তি দিয়ে নিজেকে আক্রমণ থেকে আড়াল করে রাখতাম, এবং ঐ নিয়ে কিছু আর না ভেবে নিজের কাজ ক'রে যেতে থাকলাম। সে সময় কিছুই হলোনা, আর ঐ নিয়ে আমি কোনো চিন্তাও করলাম না। কিন্তু ঐ লোকটি অনবরতই আমাকে শোনাচ্ছে "এর মধ্যে আসল ব্যাপারটা কী হচ্ছে? আমি জানতে চাই এই রোগের পিছনে কী লুকিয়ে আছে। তুমি কি বলে দিতে পারোনা যে কোন রকমের জিনিস এটা, কেন এখানে এলো?" ইত্যাদি। ...একদিন এক তরুণী মেয়ে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল শহরের বিপরীত প্রান্তে, কতকগুলি জিনিস আমাকে দেখাতে আর কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে: ঠিক কী কারণে তা এখন মনে নেই। ট্রামে উঠে সারা শহরটা পার হয়ে আমাকে যেতে হলো। ট্রামে উঠেই দেখি সকলেই নাকে মুখোশ এঁটে আছে, ভয়ে সকলেই যেন সন্ত্রস্ত; তখন আমার একটু ভাবনা হলো। আমি ভাবলাম: "তাই তো, কী এমন মারাত্মক রোগ এটা?

এর পিছনে কী রয়েছে? কোন শক্তিরা এখানে কাজ করছে?"...তারপর সেই বাড়িতে পৌঁছে সেখানে এক ঘন্টা থেকে আমি ফিরলাম। ফিরলাম প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। বুঝলাম যে রোগটা ধরেছে আমাকে, হঠাৎ ধরেছে কোনো কিছু না জানিয়ে। বীজ বা বীজাণু ঘটিত রোগ আক্রমণ করে প্রকাশ পেতে সাধারণত কিছু সময় লাগে; তারা এলে প্রথমত ভিতরে খানিকটা সংগ্রাম চলে, হার বা জিত কিছু একটা হয়, তুমি হারলে তখন রোগটা তোমাকে চেপে ধরে। কিন্তু এ হলো যেন একটা চিঠি আসার মতো, খামটি যেমনি খুললে অমনি খপ্ করে জ্বরটা এসে ধরল। সন্ধ্যার মধ্যে জ্বর আরো প্রবল হয়ে উঠল। ডাক্তার ডাকা হলো (আমি ডাকিনি), সে এসে বললে: "তোমার জন্যে এই ভালো ওষুধ এনেছি, এটা খেয়ে ফেল।" জ্বরের পক্ষে উৎকৃষ্ট ওষুধ সেটা, অল্পই ছিল তার কাছে (দিয়ে দিয়ে প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল), সে বললে "এই কয়েকটা মাত্র প্যাকেট আছে, তোমাকেই দিচ্ছি।" আমি বললাম "মাপ করুন, ও আমি খাবোনা। আপনি বরং ওটা অন্যের জন্যে রাখুন, যাদের বিশ্বাস আছে তাদের দেবেন।" ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললে "তাহলে আমার আসার তো কোনো দরকার ছিলনা।" আমি বললাম "তাই হবে, দরকার কিছুই ছিল না।" সেই প্রবল জ্বর নিয়ে আমি বিছানায় পড়ে রইলাম। আপন মনে কেবল এই ভাবতে থাকলাম "কী এই রোগ? কেন এলো? কে আছে এর পিছনে?"... দ্বিতীয় দিনে যখন ঐভাবে একা শুয়ে আছি, তখন স্পষ্ট দেখলাম একটা কাউকে, তার মাথাটা আধখানা কাটা, মিলিটারি পোষাকের ছিন্ন টুকরো গায়ে জড়ানো, কাছে এসে আমার বুকের উপর ঝুঁকে রয়েছে, তার আধখানা মাথা দিয়ে আমার শক্তিকে শুষে নিতে চাইছে। তাই দেখেই বুঝলাম এবার আমাকে মরতে হবে। আমার ভিতরকার প্রাণরস সে টেনে নিচ্ছে (তাতেই সকলে তিন দিনের দিন মারা পড়ছে নিউমোনিয়া হয়ে)। আমি তখন বিছানায় পড়ে আছি অনড় অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে। নড়াচড়া মোটে করতে পারছি না, আর সে কেবল টেনেই চলেছে। ভাবলাম, এবার তো সব শেষ হয়ে যাবে। তখন আমার গুহাশক্তিকে জাগিয়ে তুলে তার সঙ্গে যুঝতে শুরু করলাম, আর শেষ পর্যন্ত তাকে পরাস্ত ক'রে ফিরিয়ে দিলাম, সে আর টিঁকতে পারল না। তারপর আমি জেগে উঠে বসলাম।

কিন্তু আমি সবই দেখতে পেলাম। এমন সব রোগের আক্রমণ আনে সেই সব সত্তারা যারা অকালে দেহবিচ্যুত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে দেখেছি, যারা ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে হঠাৎ বোমার আঘাতে মারা যেতো, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল মানুষ হঠাৎ সেকেণ্ডের মধ্যে তাদের দেহবিচ্যুতি ঘটত, জানতেও পারত না যে তারা মরেছে। হঠাৎ দেখত যে তাদের দেহ আর নেই,—জীবনকে তারা ভোগ করতে পেলেনা, তখন অন্যের জীবনে তারা সেটা ভোগ করতে চাইত। তারা অসংখ্য রক্তচোষা প্রেতযোনি হয়ে মানুষের উপর ভর

করতো। আর যারা রোগে ভুগে মরে গেল তাদের গলিত প্রাণশক্তি হতো তাদের খাদ্য। যারা অন্য প্রভাবে অসুখে পড়ত তারা সেরে উঠত, কিন্তু এই সব সত্তারা গিয়ে চেপে বসলে আর তারা বাঁচত না, নিশ্চিত মারা যেতো। ওদের প্রতিরোধ করতে কতটা জ্ঞান ও শক্তি থাকা দরকার তার পরিচয় আমি পেলাম। অশুভ শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ এই সব সত্তা অতি দুনিয়ার, এরা যাদের ধরবে তারা মরবেই। এই ধরণের সত্তারা বহু বহু সংখ্যাতে রয়েছে। সবই আমি দেখলাম এবং জানলাম।

ঐ সময়ে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমি বলতাম, আমাকে একা থাকতে দাও। দুই তিন দিন বিছানায় শুয়ে রইলাম সম্পূর্ণ নীরব থেকে চেতনাতে একাগ্র হয়ে। পরে আমার এক বিশেষ বন্ধু (প্রকৃত সুহৃদ একজন জাপানী) এসে বললে "ও তুমিই পড়েছিলে এই রোগে? তাহলে আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই।...জানো, গত দুই তিন দিন থেকে শহরে নতুন আর কেউ এ রোগে আক্রান্ত হয়নি, আর যারা ভুগছিল, তারা সবাই প্রায় সেরে উঠেছে, মৃত্যুর সংখ্যা একেবারে কমে গেছে। রোগের প্রকোপ এবার ফুরিয়ে এলো, এখন তা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে।" তখন তাকে আমার জানা সব কথাই বললাম। সে আবার সকলকে তাই বলে বেড়াল। এই নিয়ে কাগজে প্রবন্ধ পর্যন্ত লেখা হয়েছিল।

তাই বলছি, ওষুধের প্যাকেটের চেয়ে চেতনার জোর বেশি কাজ করে।...সে যা অবস্থা হয়েছিল তা সাংঘাতিক। বুঝে দেখ, গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। যেমন, জাপানের একটা দূরপাল্লার গ্রাম, শতখানেক মাত্র মানুষের বাস, ঐ গ্রামের একটি লোক ভাগ্যক্রমে দূরের পোষ্ট অফিস থেকে তার চিঠি আনতে গিয়েছিল (চিঠি থাকলে কালে ভদ্রে সেখানে পিওন যেতো) সে ফিরে গিয়ে দেখলে সারা গ্রাম মরকে ঢাকা পড়েছে সবাই মারা গেছে, জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। ঐ মহামারীর মড়কও ঠিক সেই রকমই হয়েছিল। টোকিও শহরের অবস্থাও তেমনি দাঁড়িয়েছিল, অবশ্য অত বড়ো শহরে তা বিশেষ পরিবর্তন আনেনি। কিন্তু সে মহামারী ঐভাবে থেমে গেল। এই আমার নিজের দেখা গল্প।

এখন বলি আরোগ্যের কথা। এখন আজকাল আমাদের জ্ঞান অনেক বেড়েছে, সেটা খুবই ভালো কথা। আমরা জেনেছি যে প্রথমত কেমন করে রোগ নিবারণ করতে হয়, তারপরে রোগ হলে তা কেমন করে সারানো যায়।

তাই রোগ হলে প্রথমে সাধারণ উপায়ে তা সারাতে চেষ্টা করবে এবং কতক স্থলে তাতে সফলও হতে পারবে। সাধারণত দেহেতে যদি এমন প্রত্যয় থাকে যে তার নিজের সামর্থ্য এতখানি আছে যাতে সে নিজেই ঠিক হয়ে যেতে পারবে, আর সেই প্রত্যয়কে যদি সে ধরে থাকে, তাহলে তাতেই সে সেরে যায়। কিন্তু দেহের যদি নিজের ইচ্ছার তেমন

জোর না থাকে, তাহলে কোনো চেষ্টাতেই সে সারবে না। এ কথাও আমি আপন অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। কারণ এমন লোকের কথাও জানি যাদের খুব কঠিন রোগও পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেরে গেছে, আবার এমন লোকের কথা জানি যাদের রোগ তেমন কঠিন না হলেও বহুকাল পর্যন্ত ভুগে ভুগে ক্রমে মারাত্মক হয়ে উঠল। চেষ্টা করলেও তাদের দেহকে সারাতে দৃঢ় সঙ্কল্প করানো খুব কঠিন।

এমন স্থলে খুবই সতর্ক হয়ে লক্ষ্য করা দরকার যে এমন কোনো অংশ ভিতরে লুকিয়ে আছে কিনা যেটা—কি বলব—অসুখে ভুগতেই আনন্দ পায়। ঠিক তাই, তার মধ্যে অনেক কারণ থাকে। কেউ বা মনের আক্রোশে অসুস্থ হয়, কেউ বা হয় ঘৃণাতে, কেউ বা হতাশাতে, কেউ বা...কিন্তু এগুলো খুব বড়ো জিনিস নয়, সত্তার ভিতরকার ছোটোখাটো ব্যাপার তিতিবিরক্ত হয়ে উঠে তুমি বলো "আচ্ছা রও রও, দেখো এবারে কি হয়, অমুক আমাকে যেমন করে গেল তার ফলটা কি হতে পারে! আসুক না একটা মোক্ষম রোগ! তাই ঠিক এসে পড়বে।" প্রকাশ্যভাবে না বললেও, মনে মনে তাই বলতে থাকো, ভিতরে একটা অংশ সেই কথাই ভাবে।

ছোটো কিংবা বড়ো যাই হোক, এমন কোনো অসঙ্গতি আবিষ্কার করলে দুটি জিনিস তোমাকে করতে হবে। প্রথমত, আগেই যে কথা বলা হয়েছে, ওতে একরকম কাঁপুনি আসে, দেহে অস্বস্তি হয়, একরকম ঘেন্নাও আসে না সাধারণ জ্বরের মতো না হলেও স্থানীয় রকমের জ্বর, আর কেউ বা তাতে খুব অস্থির হয়ে ওঠে। সেখানে তোমার প্রথম কাজ হবে নিজেকে ঠাণ্ডা করা, আর যথাসাধ্য শান্তি, স্থিরতা, স্থানীয় উদ্বেগের শিথিলতা, পূর্ণ আস্থা আনতে চেষ্টা করা (সমগ্র দেহে তা না পারলেও), অতঃপর খোঁজ করবে কোথায় ওর আসল কারণ রয়েছে। অনেক কারণই থাকতে পারে, কিন্তু স্থূল কারণটা তুমি খুঁজে দেখবে, আর আলো জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তির চাপ দিয়ে সঙ্গতি ও স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবে। আর যদি অসুস্থ অংশটির গ্রহিষ্ণুতা থাকে, সেখান থেকে জোর প্রতিরোধ না আসে, তবে এতে কয়েক সেকেণ্ডেই তুমি সুস্থ হবে।

কিন্তু সব সময় তা হয় না। অশুভ ইচ্ছা কখনো কখনো থেকে যায়, যেন ধর্মঘট করে রোগটাকে তুমি সফল হতে দাও। সেখানে কাজ হতে কিছু বেশি সময় লাগে। অশুভ ইচ্ছা খুব প্রবল না হলে উচ্চশক্তি সেখানে কিছুকাল পরে কাজ করে: কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টা বা অন্তত কয়েক দিনের পরে তুমি সেরে উঠতে পারো।

কিন্তু যদি হয় বিরোধী শক্তিদের বিশেষ প্রকোপ তাহলে জিনিসটা ওঠে জটিল হয়ে, কারণ সেখানে কেবল দেহের ইচ্ছার কথাই নয়, (এ কথা আমি

মানিনা যখন লোকে বলে, 'আমি তো নিজে অসুস্থ হতে চাইছি না।' কারণ সে কথা তার চেতনা বলছে না,—যারা আধপাগলা তারাই বলবে, 'আমি অসুস্থ হতে চাই,—কিন্তু কারো চেতনা তো নয়, দেহেরই অথবা প্রাণসত্তার কোনো বিকৃত অংশ তাই চেয়ে থাকে, খুব ভালো করে লক্ষ্য না করলে সে জিনিস তুমি ধরতেই পারোনা)। কিন্তু তা ছাড়া যেখানে বিরোধী শক্তিরা জুটে অনিষ্ট করবার জন্যে চাপ দিচ্ছে, সেখানে রোগের মধ্যে জটিলতা এসে পড়ে। আর আধ্যাত্মিক দিকের ভুলের থেকেও তুমি তাদের আসার জন্যে দরজা খুলে দিতে পারো; হয়তো অহংকার বা ক্রোধ বা ঘৃণা বা আঘাতের দ্বারা; ঐ সব জিনিসের আসাযাওয়ার ভিতর দিয়েও দরজা খুলে যায়। রোগ বীজাণুরা তার সুযোগের জন্য ওৎ পেতে থাকে। সেই কারণেই সর্বদা সতর্ক থাকার দরকার হয়। যে কোনো কারণেই হোক, তাদের প্রভাব যদি তোমার রক্ষাকবচের আবরণ ভেদ করে ঢুকে পড়ে আর রোগটাকে যথাসম্ভব কঠিন করে তোলে, তখন আর ঐরূপ উপায়ে কোনো কাজ হবেনা। আরো কিছু করা দরকার হবে। সেখানে আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকারক শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে, এমন গঠনমূলক সক্রিয় শক্তি যার কাছে কোনো নাশক শক্তি টিকতেই পারেনা। তেমন শক্তির অধিকার যদি থাকে কিংবা প্রার্থনার দ্বারা যদি তা লাভ করতে পারো, তাহলে সেই শক্তিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করলে বিরোধী শক্তিরা তখনই ছেড়ে যাবে, ঐ শক্তির তেজে তার বিলুপ্তি ঘটবে নাশক শক্তি সেখানে বাঁচতেই পারেনা, সুতরাং তার বিনাশ হবে। কিংবা তা গঠনকারী শক্তিতেও রূপান্তরিত হতে পারে, আবার ভস্মীভূত হয়েও যেতে পারে। তাতে কেবল রোগটাই সারে না, তার পুনরাক্রমণও নিবারিত হয়। তুমি সম্পূর্ণরূপেই আরোগ্যলাভ করতে পারো। এমন কথা।

এখন মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ জিনিসটা বলা হলো; বিশদভাবে এই নিয়ে কত বইএর পর বই লেখা চলতে পারে। আমি কেবল সাধারণভাবেই কথাগুলি বললাম।

প্রশ্ন: আপনি যত রকম কারণের কথা বললেন, ওতে তাহলে তো সর্বদাই অসুস্থ হতে হয়।

উত্তর: তাই তো সাধারণ জীবনে হয়ে থাকে অনেকেরই বেলাতে, মাত্র কয়েকজন ব্যতীত সকলেই প্রায় ভোগে, তার আবার আরো অন্যরকম কারণ থাকে যার সম্বন্ধে অন্যদিন বলব। সব সময়েই অল্পবিস্তর অসুস্থ হয়ে নেই, এমন মানুষ কমই আছে। তবে এমন কি সাধারণ জীবনেও যদি তোমার তেমন শুভবাচক আত্মপ্রত্যয় থাকে, যদি আত্মনিশ্চয়তার তেমন জোর থাকে, যেমন থাকে হয়তো ছোটো শিশুদের মধ্যে

(ঠিক বলতে পারবনা, কারণ এখানে যাদের দেখি তাদের কথা আলাদা), তাহলে তাদের জীবনের উপরেই একটা আস্থা থাকে ; যাদের জীবন নবীন, তারা দেখে যে সারা জীবনটাই পড়ে রয়েছে সম্মুখে, পিছনে যা আছে তা অল্পই। এতেই আরো বেশি আত্মপ্রত্যয় আসে, অনায়াসে বিপত্তি পার হয়ে যায়।

নতুবা বলতে গেলে, সাধারণ জীবনে এমন খুব কম লোককেই জানি যাদের মধ্যে কিছু না কিছু একটা অসুস্থতা সর্বদাই লেগে নেই...Jules Romains-র রচিত "ডকটর নক্" (Doctor Knock) নাটকটির কথা বোধ হয় জানো, তাতে বলছে যে নিজের সম্বন্ধে যে জানেনা এমন সুস্থ মানুষকে অসুস্থই বলতে হবে। সেটা ঠিক কথাই। কেবল যখন নিজের কোনো কাজে এত বেশি ব্যস্ত থাকো যে নিজের কথা ভাববার সময়ই থাকেনা, তখনই কোনো অসুস্থতা টের পাওনা, যদিও রয়েছেই সেটা। *

---

* BULLETIN OF S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গত

ডিসেম্বর ২১, ১৯৬৮

প্রশ্ন একটি প্রশ্ন এসেছে, অমনি তার মর্মটা অর্জনা করে বলি "গত অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের অনুভূতির বর্ণনা করতে গিয়ে মা বলেছিলেন, 'মন ও প্রাণের কথা এখানে বাদ দিয়ে'; কিন্তু তা কেন, দেহের ভ্রুত রকমের বাস্তব রূপান্তরের বেলাতে ওগুলির কথা বাদ দিতে হবে কেন? অতিমানস চেতনা কি সেখানেও কাজ করবেনা?"

মা নিশ্চয় করবে, এবং সে কাজ তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। কিন্তু দেহটা চলে প্রাণের ও বিশেষত মনের অধীনে, সুতরাং তার সে অভ্যাসটা ছাড়াতে হয় যাতে উচ্চতর চেতনার অধীনেই সে চলে আর সেইজন্যই সরাসরি ক্রিয়াতে কাজটা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে সকলের বেলা মন ও প্রাণের ভিতর দিয়েই তা কাজ করে, কিন্তু আমি বলেছি যে ওতে আরো সুনিশ্চিতভাবে কাজ হয় (অনুভূতির বেলাতে তার মধ্যে অনেক ঝুঁকি আছে)। কিন্তু এতে ক্রিয়ার তেজ অনেক বেড়ে যায়, কারণ যদিও সাধারণত ঐ দুইএর মাধ্যমেই তা কাজ করে দেহের উপরে, কিন্তু একেবারে দেহেরই উপর হলে কাজটা সরাসরি হয়ে যায়। এই কথা।

ওটা কিন্তু ঠিক উপদেশ নয়: অনেকবারই তা বলেছি, যখনই সুযোগ পেয়েছি। কেউ যেন না ভাবে যে আমি সেই চেষ্টাই করতে বলছি (যদিও তা কেউ করতেই পারবেনা), সে পরামর্শ আমি দিচ্ছিনা। সকলেই যেন কাজ করে যথেষ্ট সময় নিয়ে। কেবল যেহেতু অনেক বছর পার হয়ে গেছে...তাতেই অমন তাড়াতাড়ি করা।

(নীরব থেকে)

এ একটা অদ্ভুত কথা যে দেহটার যেন প্রতিপন্ন ক'রে ফেলার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে (সকলের দেহের হয়তো তা নয়, যার দেহ যেমনভাবে গড়ে ওঠা, অর্থাৎ পিতা, মাতা, প্রাক্তন ইত্যাদি নিয়ে); দেহটা চায় কিছু প্রতিপন্ন ক'রে দেখাতে। যেমন, এর একটা ধারণা আছে যা নাটকীয় (কখনো বা বিচিত্র); সব সময় সে বোধ করছে যেন সে বেঁচে আছে অনেক বিপর্যয়কে কাটিয়ে উঠে; তার এই বিশ্বাস যে বিপর্যয়কে যেন সে রূপান্তরিত করে নিচ্ছে উপলব্ধিতে—এমনি সব অদ্ভুত ধারণা। তাই কিছুকাল তাকে অমন কথা ভাবতেই ছেড়ে দেওয়া হলো (যেমন হয়েছে গত কয়েক দিন ধরে)। তারপর এই মূঢ়তা নিয়ে যখন সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন জোর প্রার্থনা শুরু করলে যাতে ও ভাব কেটে যায়। তৎক্ষণাৎ অমনি ঝপ্ ক'রে (মা একটা ভঙ্গী করলেন) একেবারে সে ঘুরে চলে গেল ধ্যানের মধ্যে—একটা অতি নিকট উপস্থিতির মধ্যে, যা সর্বত্রই বিরাজ করছে।

এর থেকে ওটা (মা দুটি আঙুলকে তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দেখালেন), তাতে কিছুমাত্র সময় লাগলনা, কোনো প্রস্তুতিও নয়, একেবারে ঝপ্ ক'রে (পুনরায় ভঙ্গী), যেন দেখিয়ে দিলে যে দেহের মূঢ়তা কতখানি। নির্বোধের মতো কাজ, দেহকে ঐভাবে ছেড়ে দিলে সে প্রমাণের দ্বারা ঐ কথাই প্রতিপন্ন করতে চায়, আর তখন অত্যাশ্চর্য চেতনা এলে সমস্তই কোথায় মিলিয়ে যায়—তার কোনো অর্থ বা বাস্তবতাই থাকেনা।...আর এটাই তার প্রমাণস্বরূপ যে এটি কেবল কল্পনারই কথা নয়, এ হলো বাস্তব ব্যাপার ; সেই শক্তিরই প্রামাণ্য এটা যে...জীবনের এই মিথ্যা স্বপ্ন (যা দেহ-চেতনাতে প্রবল হয়ে উঠেছিল) তা পরিবর্তিত হয়ে গেল এক বিস্ময়ে, কেবল চেতনার হঠাৎ অদলবদলের দ্বারা।

এ অনুভূতি সবিস্তারেই পুনঃ পুনঃ ঘটেছে সত্তার সকল অংশে, ওর সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ। আর তা রূপান্তর আনার কোনো "বিলম্বিত প্রক্রিয়া" নয়, ক্ষণেকেই একটা থেকে অপরটাতে উল্টে যাওয়া (দুটি আঙুল দ্রুত ঘুরিয়ে দেখালেন), আর অশুদ্ধি, ভোগান্তি আর মিথ্যার স্থানে তখনই তা আনন্দে উৎসে চলে গেল। অথচ অন্য সবই যেমন ছিল তেমনি রইল, কেবল ঐ চেতনাটি ছাড়া।

এখন ঐ প্রশ্নটাই থেকে যাচ্ছে (যা সামনে এসে পড়েছে) যে এ অনুভূতিকে কেমন ক'রে বাস্তবের জগতে আনা যায়।...দেহের নিজের কাছে তা বেশ প্রকট তো হয়েছেই ; এক দুই বা তিন ঘণ্টা যাবৎ নীতিমত কষ্ট ভোগ করেছে (নৈতিক নয়, স্থূল দৈহিক কষ্ট) তারপর হঠাৎ ফস্ ক'রে সব চলে গেছে ! বাইরের দিক থেকে দেহ যেমন ছিল তেমনই রইল (মা আপন হাত দুটিকে দেখালেন), কিন্তু ভিতরে যে কষ্টের পীড়ন চলছিল তা থেমে গিয়ে সব কিছু বেশ শান্ত ও সুস্থিরভাবে চলতে শুরু করল। কিন্তু সে তো কেবল এই একটি দেহে—অন্যান্যদের বেলা কি হবে ? অন্যান্য সব চেতন-সত্তাদের সম্ভাবনার কথা নিয়ে তার বিচার বিবেচনা হতে থাকল। নৈতিক তরফ থেকে দেখলে (অর্থাৎ স্বভাবের, মনোভাবের ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার) সেটা স্পষ্ট দেখা যায়। এমন কি স্থূল দৃষ্টিতে দেখলেও কখনো বা হঠাৎ এমনি ও-সব ঘুচে যেতে পারে (যেমন শ্রীঅরবিন্দ তখনই একটা যন্ত্রণাকে হটিয়ে দিয়েছিলেন—যা চলে যা, এইভাবে), (মা হাত দিয়ে কিছু তুলেই ফেলে দেবার ভঙ্গী করলেন)। কিন্তু সব সময় সকল ক্ষেত্রে তা হয় না, কেবল এইটি দেখিয়ে দেওয়া যে কোথাও কোথাও তা হতে পারে।

কথাটা এইভাবে বলা যায় : দেহ বোধ করছে যেন সে একটা বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, কিন্তু ওরই ভিতর দিয়ে সে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। দেখেও যাচ্ছে এবং কাজও করে যাচ্ছে (সীমাবদ্ধভাবে) আর জানছে যে একটা কিছুর অন্তরাল রয়েছে যা সরে যাওয়া চাই। সেই "একটা কিছু"র অন্তরালেই আনছে বন্দীভাব। কেমন ক'রে তা ঘুচবে ? এখনও ঠিক জানি না।

একটি দেহের চেতনার সঙ্গে অন্য সব দেহের চেতনার নিকট সম্বন্ধ খুঁজে বের করতে হবে। কতখানি তা পরস্পরনির্ভর আর কতটা তা নয়; অর্থাৎ দেহ তার চেতনাতে কতখানি রূপান্তরিত হতে পারে (এবং চেহারাতেও)—সকলের বেলা সেরূপ রূপান্তর না হলেও? আর এও আবিষ্কার করা চাই যে একটি দেহের রূপান্তরের জন্য কতটা দরকার হতে পারে অনেকের দেহের রূপান্তর।

(নীরব থেকে)

সব কথা বলতে চাইলে কয়েকটা ঘন্টাই লেগে যাবে...

প্রশ্ন : কিন্তু ঐ যে বাক্‌সে আবহের কথা বললেন তা কি বিশ্ব-বাক্‌স?

মা : হাঁ!

প্রশ্ন আমার প্রায়ই মনে হয় যে মানুষের গড়া এই সব আইন বা "স্বাভাবিক আইন" এগুলো কেবল কতকগুলো বিকৃত কল্পনা শিকড় গজিয়ে হয়েছে—আর তাই হলো ঐ বাক্‌স।

মা : হাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই।

প্রশ্ন তাহলে কেমন ক'রে...

মা হাঁ, কেমন ক'রে একজনের মাত্র ব্যক্তিগত আলো কতটা সেখানে কাজ করতে পারবে? সেটাই তো সমস্যা।....জানিনা আমি।

(নীরব থেকে)

একটা সামগ্রিক ভাবের উন্নতি যে এসে পড়েছে এই পৃথিবীতে তা স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছে (এ পৃথিবী আমাদের অনুভূতিরই ক্ষেত্র); কিন্তু অতীতের কালের হিসাবমত সময়ের বিবেচনা করলে সকলের মধ্যে পরিবর্তন আনতে আরো অনেক বেশি সময়ের দরকার...অথচ, এটা তো প্রায় অঙ্গীকারই করে রাখা হয়েছে যে অকস্মাৎ এসে যাবে এই পরিবর্তন (আমাদের চেতনাতে যাকে বলি "অবতরণ," যা বিশেষ একটা "সংঘটন", যা ইতিপূর্বে কখনই হয়নি আর এখন যার সূত্রপাত হয়ে গেছে—আমাদের চেতনাতে এইভাবেই সেটা ব্যক্ত হচ্ছে)।

দেখাই যাক।

দেহের নিজের তরফে উত্তরোত্তর স্পষ্ট হচ্ছে তার ভঙ্গুরতা (এমন চরম ভঙ্গুরতা যে একটুমাত্র নড়াচড়াতেই হয়তো তার বর্তমান অস্তিত্ব খেমে যেতে পারে),

অথচ তারই সঙ্গে রয়েছে তার চিরন্তনতার বোধ : এ অস্তিত্ব শাশ্বত। দুটো জিনিসই রয়েছে একসঙ্গে।

বাস্তবিক এটা ঠিক পরিবৃত্তির কাল।

(নীরব থেকে)

দু' একবার এমনও হয়...জানবার জন্যে এমন একটা উৎকণ্ঠা বাড়ে, যখন সর্বত্র সব সময়ে সম্পূর্ণই বোধ করি ভগবৎ-উপস্থিতি, ভিতরে বাইরে সর্বত্রই (না তাঁর হাত মুখ দেহ সর্বত্র স্পর্শ করলেন), তখন প্রশ্ন ওঠে যে কেমন ক'রে (কেন নয়, সে কৌতূহল নেই) এই বর্তমান অসঙ্গতি এসে পড়েছিল? দুই একবার এভাব প্রবল হয়ে উঠেছে : একবার জানলাম যে এটা অনন্ত। তখন রহস্যটা ভেদ করতে গিয়ে মনে হয়েছে যে এবার হদিশ মিলে যাবে...তারপরে ও আস্পৃহা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তখন কেবল প্রশান্তি আর প্রশান্তি...হাঁ, দুই একবার ও-ভাব এসেছিল মনে হয়েছে এবার বুঝতে পারব ("বুঝতে পারা" মানে তাতেই অবস্থান করা, কেবল চিন্তায় বোঝা নয়—স্বয়ং অবস্থিতি) আর তার পরে...(উবে যাওয়ার ভঙ্গী করলেন)। অতঃপর নেমে এলো প্রশান্তি।

তারপরে এইটি বোধ এলো আগামী কাল হয়ে যাবে। কিন্তু সে কোন দিনের কাল? সে কাল আমাদের মাপের কাল নয়। দেখাই যাক।

কিন্তু অনুভূতি আসে অসংখ্য, সকল দিক দিয়ে। ঘন্টার পর ঘন্টা বললেও মনে হবে বলার মধ্যে কিছু মিথ্যা রয়ে গেল। আর তা সহজ, সুন্দর, সুস্পষ্ট নয়। জটিল হয়ে পড়ে।

দেহের পক্ষে কতকগুলো আশ্চর্য সময় আসে ; তার আগে আসে কয়েক ঘন্টার যন্ত্রণার পীড়ন। পরে হঠাৎ আসে আশ্চর্য মুহূর্ত। সে মুহূর্তের কোনোরূপ ব্যাখ্যা করা যায়না...সময়ের অনুপাত ধরে যদি উন্নতির পরিমাণ বিচার করা যায়...সেই আশ্চর্য মুহূর্তের অবস্থাটি থাকে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, আর ঐ যন্ত্রণার অবস্থা থাকে কয়েক ঘন্টা। পীড়নও চলতে থাকে কয়েক ঘন্টা।

সেই হিসাবে দেখতে গেলে এখনও যেন আছি অনেক, অনেক দূরে...

তাহলে কি করা যাবে? এই ভাবেই চালিয়ে যেতে হবে, এই হলো কথা।

*

অতিমানব চেতনার অবতরণ

জানুয়ারি ১, ১৯৬৯

রাত্রেই তা ধীরে ধীরে এসে হাজির হয়েছে,—আর আজ প্রত্যূষে উঠেই দেখি চমৎকার এক সোনালি উষা, আবহাওয়া যথেষ্ট হাল্কা। দেহ তখনই বোধ করল :

হাঁ, এ বাস্তবিকই এক নতুন জিনিস। অমন অপূর্ব সোনালি আলো, অতি স্বচ্ছ ও মঙ্গলসূচক। মঙ্গলসূচক বলছি একটা সঙ্গতিপূর্ণ সুনিশ্চয়তা প্রকাশের অর্থে। যা একেবারে নতুন কিছু।

এটি খাঁটি কথা।

যখন কাউকে আমি বলি "Bonne Année" (শুভ নববর্ষ) তখন ঠিক ঐ জিনিসটাই আমি তাদের মধ্যে সঞ্চালন করি। আর আজ সকালে তাই আপনা হতেই বারবার ঐ কথা বলেছি, "Bonne Année, Bonne Année"। সুতরাং...

*

জানুয়ারি ৪, ১৯৬৯

পয়লা তারিখে প্রকৃতই আশ্চর্য ব্যাপার কিছু হয়েছিল।...কেবল আমিই যে তা টের পেয়েছি এমন নয়, আরো কেউ কেউ পেয়েছে। নববর্ষরাত্রির ঠিক পরেই, কিন্তু আমি তা টের পেলাম ২টার সময়, অন্যেরা পেয়েছে ভোর ৪টার সময়। তা হলো...গতবারে আমি এ বিষয়ে তোমাকে দুটি মাত্র কথাই বলেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে প্রত্যাশা যেমন ছিল (আমি নিজে কিছুই প্রত্যাশা করিনি) তার সঙ্গে বাস্তবে যা বোধ করলাম তার কিছুমাত্র মিল নেই। যা ব্যাপার হলো তা পুরোপুরি বাস্তব। অর্থাৎ নিছক তা প্রত্যক্ষ বাহ্যদৃষ্ট—সমুজ্জ্বল এক সোনালি আলো। প্রখর আলো, রীতিমত জোরালো; কিন্তু তার মধ্যে একটা মঙ্গলসূচক হাসি, একটা শান্তিপূর্ণ আনন্দ, একটা মুক্ত উন্মীলন আলো এবং আনন্দের দিকে। যেন সাদরে আপ্যায়িত করে বলছে "Bonne Année।" তাতেই আমি অত আশ্চর্য হলাম। সেই ভাবটি ছিল অন্তত তিন ঘন্টা পর্যন্ত, ততক্ষণই আমি তা বোধ করছিলাম। তারপরে কি হলো জানিনা, আমি সেদিকে আর লক্ষ্য রাখিনি। কিন্তু সে সময়ে এ কথা আমি তোমাকে এবং আরো দুই তিন জনকে বলেছি, দুই একটি মাত্র কথাতে, আর তারাও এটা নিজেরা বোধ করেছে। অর্থাৎ তা পুরোপুরি বাস্তব জিনিস নিশ্চয়। একরকম আনন্দের আভাস সকলেই পেয়েছে, যা প্রীতিপ্রদ ও শক্তিদায়ক আর খুবই কোমল, খুবই হাসিহাসি, মঙ্গলসূচক...বলতে পারিনা তা কী জিনিস। কিন্তু সে কথা না জানলেও তার মধ্যে একটা মঙ্গলের ভাব আছে সুতরাং তা মানুষেরই কাছের জিনিস। এবং তা ধোঁয়া নয়, নিরেট কিছু; এমন কি তার একটা আস্বাদও আসে, এমন নিরেট। তারপরে তখন এই নিয়ে আর কিছু ভাবিনি, কেবল দুই তিনজনকে বলেছি মাত্র, আর তারা সবাই বললে যে তারাও ঐরূপ টের পেয়েছে। জানিনা তার মধ্যে কোনো কিছুর মিশ্রণ ছিল কিনা...কিন্তু এখনও সে ভাব যায়নি; এমন বোধ হয়না যে একবার যখন এসেছে তখন আবার ফিরে চলে যাবে।

রীতিমত বাহ্য ঘটনাই বলব তাকে, সাধারণত যেমন বাহ্য জিনিস দেখে বোধ আসে তার চেয়েও বেশি...মনের ব্যাপার কিছু নয়, অর্থাৎ 'আসবে' বলে মনে ভেবে রাখা হয়নি,...তা নয়ই, বরং ধারণাতে এলো যে সে এক বিরাট ব্যক্তির উপস্থিত, যার কাছে এই পৃথিবীটা অতি ছোট, এমনি একটা ছোটো বলের মতো (হাতের মুঠোয় একটা বল ধরে দেখালেন)—যেন মঙ্গলময় কোন বিরাট পুরুষ এসে হাজির হয়েছে, এরই জন্যে...(বলটি ধীরে ধীরে উপরের দিকে তুলে ধরলেন)। হিমান্বিত কোনো মহাদেবতা যেন উপস্থিত, অথচ...বলতে পারিনা, এসেছেন নিশ্চয় তিনি সহায় হয়ে, বিপুল শক্তি নিয়ে অথচ অতি মধুর হাসিমুখে।

অথচ নিশ্চয়ই বাহ্য, কারণ দেহ তাকে সেইভাবেই সর্বত্র অনুভব করতে লাগল (যা নিজের অঙ্গের সর্বত্র স্পর্শ করলেন), কোনোখানে তা বাকী রইলনা।

এখন কী হবে ওর ফলে? তা জানিনা।

সেদিন ছিল বছরের প্রথম দিন। কেউ যেন দেবতার বিরাট আয়তন নিয়ে (অর্থাৎ বিশেষ কেউ একজন) তার সকল শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের "Bonne Année" করতে এলো। ঠিক তেমনই।

তাহলে কী বলব তাকে?...অমন নিয়েই ব্যাপার!...তা আমি জানিনা।

সে কি...সে কি কোনো ব্যক্তি হবে (কারণ আমি তার কোনো আকৃতি দেখিনি) কেবল যেমন এসেছিল তাই বলছি (আবহাওয়া দেখিয়ে)—পেয়েছি তার সংবেদন, তার অনুভব; এই দুই রকম পেয়ে তাই বললাম, এ কি সেই অতিমানস ব্যক্তির নয়?...বাস্তবের আকৃতি পরে নেবে!

তখন থেকে এই দেহ ক্রমাগতই সে ভাব বোধ করছে (কারণ তা এর মধ্যে অতি গভীরভাবে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে), তাই সর্বদাই এ খুব খুশি, কেন্দ্রনিবদ্ধ হয়ে না থেকে যেন একটা হাস্যময় খুশির বিস্তারের মধ্যে ছাড়া পেয়ে গেছে। তাই দেখনা, কত হাল্কাভাবে কথা বলছি। একটা মমতাময় সুর সব সময় লেগে রয়েছে। স্নিগ্ধ একটা স্নেহময় হাসি, অথচ তার মধ্যে রয়েছে এতখানি জোর...কে জানে।

ভক্ত সেদিন সারাদিন ধরে আমিও বেশ একটা তৃপ্তি বোধ করেছি।

মা: হাঁ, ঐ তাই বটে। ঠিকই তাই।

তাহলে সে কি অতিমানস ব্যক্তির?...যারা অতিমানস দেহ অর্জন করেছে তাদের মধ্যে কি তার অবতরণ হবে...

সে জিনিস জ্যোতির্ময়, হাস্যময়, মঙ্গলময়, আর অসীম শক্তিগত; তার মানে মানুষদের যে মঙ্গলময়তা তা কিছু দুর্বল হয়, লড়তে চায়না, লড়াই পছন্দ করেনা;

কিন্তু এর ধরণ তা মোটেই নয়। এ তোমাকে নিতান্ত বাধ্য করে দেবে (মা চেয়ারের হাতলের উপর ঘুষি মারলেন)।

সে জিনিস নতুন রকমের বলেই আমার এত কৌতূহল। আর এতই নিরেট (চেয়ারের হাতল দেখিয়ে)। দেহচেতনা যাতে জোর করে বলে "এই একটা জিনিস" তেমনি নিরেট। অর্থাৎ তা আভ্যন্তরীণ সত্তা বা চৈত্য সত্তার ভিতর দিয়ে বলা নয়, সরাসরি দেহই তাকে প্রত্যক্ষ করল।

কী সে জিনিস?...হাঁ, নিশ্চয় তাই...দেহ তাকে সুনিশ্চিত বলে জেনেছে... এতই সে নিশ্চিত যে কিছুমাত্র তার দ্বিধা বা জানবার উদ্বেগ আর নেই। "অতিমানস না জানি কেমন জিনিস হবে, স্থূল দৃষ্টিতে তা কেমন দেখাবে?" এই সব প্রশ্ন সে আগে করতো। এখন তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়না, পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে।

ভক্ত: তাহলে এখন তা কি প্রবেশ করবে সেই সব দেহে যারা প্রস্তুত হয়েছে?

মা: হাঁ, তাই মনে হয়। প্রবেশ ক'রে এবার সে নিজেকে প্রকাশ করবে—প্রকাশের জন্যই দেহগুলিতে প্রবিষ্ট হবে—সে দেহ তখন হবে অতিমানস দেহ।

কিংবা হয়তো...হয়তো অতিমানবই হবে, ঠিক জানিনা। দুইএর মাঝামাঝি কিছু। হয়তো অতিমানবই নিতান্ত মানুষেরই মতো, কিন্তু দেবতার আয়তন নিয়ে। এমন মানুষ যার কোনো দুর্বলতা নেই, ছায়া নেই। শুধু আলো, হাসি...আর মাধুর্য। হাঁ, সে অতিমানবই হবে।

(নীরব হলেন)

ভক্ত কেন জানি না এই কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে: যারা কিছু জানবেনা যে কিসের থেকে কি হচ্ছে, পৃথিবীতে অতিমানস শক্তি আবহাওয়ার মধ্যে নেমে যখন তাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন তারা বলবে, "দেখ দেখ আমাদের, আমরাই এত কিছু করেছি!"

মা: (হেসে) হাঁ, তাই সম্ভবত হবে।

ভক্ত: আমরাই যেন নিজেরা নিজেদের এ মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তুলেছি।

মা হাঁ, সেই তো বরাবরই হয়।

তাই তো আমি বলি, এখানে এসে আমরা সকলেই সকল রকমের দুঃখ ভোগ করি, কিন্তু তা যে ভগবৎ-কৃপা, সে কথা নিজের তরফ থেকেও জানব, যখন দেখব যে অস্তিত্ব আমাদের লুপ্ত হয়নি, নয় কি? তখন জানবো যে কেমন ক'রে ঠিক হলো।

জানুয়ারি ৮, ১৯৬৯

মা : তোমাকে বলেছি কি যে ঐ চেতনাকে আমি জেনেছি ?

ভক্ত : হাঁ, গতবারে তাই তো বলেছিলেন যে তাকে আপনি চিনেছেন।

মা হাঁ, কিন্তু আমি বলেছিলাম "অতিমানস চেতনা।"

ভক্ত তার পরে বলেছিলেন, "হয়তো অতিমানব।"

মা : হাঁ, তাই। অতিমানব চেতনার অবতরণ। সে বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় পেয়েছি।

পয়লা জানুয়ারিতে, মধ্যরাত্রির পরে। ২টার সময় আমার ঘুম ভাঙল, দেখি একটা চেতনা আমাকে ঘিরে আছে, তা এমন নতুন ও নিরেট যা ইতিপূর্বে কোনোকালেই বোধ করিনি। সেই নিরেট অবস্থাতেই তা রয়ে গেল দুই তিন ঘন্টা পর্যন্ত, পরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, যারা গ্রহিষ্ণু তাদের খুঁজে বের করতে।...আমি জানলাম যে তা অতি-মানবের চেতনা, অর্থাৎ মানব সত্তা ও অতিমানস সত্তার মাঝামাঝি।

ওর থেকেই দেহ পেয়েছে একটা আস্থা ও দৃঢ়প্রত্যয়। এ অনুভূতি দেহের মধ্যে স্থায়িত্ব নিয়েছে, এবং তা বজায় থাকলে তাকে সমর্থন করতে সকল রকম সাহায্যই মিলবে।

জানুয়ারি ১৮, ১৯৬৯

অতিমানব চেতনার অবতরণ সম্বন্ধে :

সেদিন যখন অনুক এসে ঢুকল (ঐখানে এসে দাঁড়াল), সঙ্গে সঙ্গে এই আবহাওয়াটা এসে দেয়ালচেয়ার মতো আমাকে ঘিরে ফেললে এখান থেকে ওখান পর্যন্ত (হাত দিয়ে দেখালেন)। সে আবহাওয়া যেমন ঘন তেমনি আলোকোজ্জ্বল আর তেমনি সতেজ। আমার কাছে তা দৃষ্ট হলো একেবারে বাস্তবের মতো, যেন দুর্গের বেষ্টনীর মতো এতখানি পুরু (হাত দিয়ে দেখালেন প্রায় দেড় ফুটের মতো), অনুক যতক্ষণ ছিল সেটা রয়ে গেল।

আর তা সক্রিয় চেতনভাবেই। যেন শক্তি প্রক্ষেপের মতো। এখন তা স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

তার চেতনা রয়ে গেছে ভিতরে—খুব দুর্বল্য সেটা—দেহকে শেখাচ্ছে যে কখন কি করতে হবে, অর্থাৎ কোন ভাব নিয়ে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে হবে...আমি অনেকবারই তা বলেছি যে এই রূপান্তরের সব প্রক্রিয়া বোঝা অতি কঠিন, যখন তার লক্ষণগুলি বুঝিয়ে বলে দেবার মতো কেউ নেই। যেন এ কথার জবাবেই দেহকে

সে বললে, "এমনি ভাব নিয়ে এই করো, তাই করো," আর দেহ তাতে খুশি হয়ে কৃতনিশ্চয় হয়ে রইল, ভুল কাজ কিছুই সে করবে না।

এ বড়ো চমৎকার কথা।

এলো যেন "উপদেষ্টা"র মতো, সম্পূর্ণ কাজের লোক, বললে "ওটা বাদ দাও; এটা নিয়ে নাও. অমুকটা সাধারণভাবে ক'রে যাও; এটা এমনি... এইরকম সব আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া। আর তা খুবই বাস্তবগত, রীতিমত স্পন্দনযুক্ত: কোনোটির বেলা "এটা চলুক"; অন্যগুলির বেলা "কেন্দ্রীভূত করা হোক" আরো কিছুর বেলা, "ও ঘুচিয়ে দাও"।... এমনি ছোটো ছোটো সব ইঙ্গিত।

(নীরব থেকে)

পূর্বে একবার প্রশ্নোত্তরের সময় (খেলার মাঠে) আমি বলেছিলাম (ডিসেম্বর ১৮, ১৯৫৭) "প্রথম অতিমানব হবে নিজেকে রক্ষা করার মতো শক্তিমান"। ঠিক তাই বলো, তেমনি অনুভূতিই এলো। তাই এখন মনে পড়ল যে এমনি কথাই আমি বলেছি।

ভক্ত হাঁ, আপনি বলছিলেন যে তা প্রথমে আসবে শক্তিরূপে।

মা হাঁ, শক্তিই প্রথম কথা।

ভক্ত নিশ্চয়, কারণ তাদের রক্ষা হওয়া চাই।

মা ঠিক তাই। তেমনি অনুভূতি এলো দেহের কাছে, শক্তির প্রাকারের মতো। প্রবল শক্তি! ক্রিয়ার তুলনায় অনেক প্রবল। খুবই আশ্চর্য। আর তাই আমি দেখছি যে তার ফল অতি সুনির্দিষ্ট, নিরেট, কারণ মন প্রাণের কিছু কাজ সেখানে নেই। তার জায়গা সেই নিয়েছে। আর তা জানার সঙ্গে সঙ্গে একটা যে দৃঢ়প্রত্যয় এসেছে তাও আশ্চর্য। (নীরব থেকে) আর কিছু বলবে?

ভক্ত: ভাবছিলাম যে ঐ চেতনা ব্যক্তির মধ্যে কেমনভাবে কাজ করবে, অবশ্য আপনার মধ্যে ছাড়া?

মা একইভাবে। তবে যারা আত্মপর্যবেক্ষণে অনভ্যস্ত তারা তা বুঝবে না। এই পর্যন্ত। তুলোর বস্তার মধ্যে চোকার মতো করে ঐ চেতনা বেমালুম ঢুকে যাবে। নতুবা তার প্রণালী একই রকম।

ভক্ত : জানতে চাইছিলাম যে এই চেতনা দেহে যতটা কাজ করবে, মনে ততটা নয়।

মা আশা করি যে তার দ্বারা সঠিক রকমে ভাবতে পারার ক্ষমতাও আসবে।

ভক্ত : অর্থাৎ তাহলে তা গাইড বা পথপ্রদর্শকের মতো কাজ করবে।

মা : হাঁ, গাইড তো বটেই, যেহেতু তা চেতনা। আমার কাছে তা অধিতীয় রকমের চেতনা, যা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কাজেতেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেখানে তা অনন্য চেতনা; মানব-চেতনার বেলাতে তেমন হয় না, কেবল কোনো কোনো অবস্থাতে কার্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে তাকে সফল করে; কিন্তু এটাই আমি নিতান্তভাবে চেয়েছিলাম, "প্রতি মিনিটে যেন পরিচালিত হই," তাতে যথেষ্ট সময় বাঁচে, ভেবে বুঝে লক্ষ্য ও বিচার করে কিছু করতে হয় না, তাই নয় কি?...এখন সেই রকমই হয়ে গেছে। (নীরব হয়ে)

প্রথম স্পর্শ যারা পেয়েছে তাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে, বিশেষত চিন্তার মধ্যে একটা নিশ্চয়তা।

(ভক্ত প্রণাম ক'রে বিদায় নেবার আগে মা আবার বললেন) ছিল তখন এইখানে (আপন বুকের দিকে চেয়ে)। আশ্চর্য, আমাকে যেন তার দেওয়া হয়েছিল, যারা আমার কাছে আসবে তাদের মধ্যে ওর স্পর্শ চালান ক'রে দিতে। *

---

* BULLETIN OF S.A.I.C.E থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পথের কথা

নভেম্বর ২৩, ১৯৬৮

চমৎকার এক অনুভূতি পেলাম...কালকে নয়, তার আগের রাত্রে এলো একজন, তার নাম করব না, সে এসে আমাকে বললে: "আমি একজন নেমে গেছি নিচে দেহচেতনার মধ্যে: ধ্যান করা আর চলছে না, ভগবান আমার পক্ষে এখন বহু উপরে, অনেক দূরে...।" কিন্তু ও কথা বলতে বলতেই দেখি যে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল ভগবৎ-উপস্থিতিতে। আমি তাই তাকে বললাম: "না না, বহু উপরে নয়, এখানেই, এইখানেই তিনি আছেন।" আর মুহূর্তমধ্যেই দেখি যে এখানকার সমগ্র আবহাওয়া সকল কিছুই তাতে ভরপুর...বাতাসটাও সেই উপস্থিতিস্বরূপ হয়ে সব কিছুকে স্পর্শ করছে, সর্বত্র ঢুকে পড়েছে (আপন হাত, মুখ, দেহ স্পর্শ করে দেখালেন)...কিন্তু সে উপস্থিতি এক সমুজ্জ্বল বিরাট আলো, প্রকাণ্ড রকমের একটা প্রশান্তি (না বড়ো করে হাত ঘুরিয়ে দেখালেন), অথচ বিশেষ এক শক্তি, সেই সঙ্গে একটা সুস্পষ্ট মাধুর্য...এমনই কিছু...যা অনায়াসে পাহাড় গলাতে পারে।

সে জিনিস কিন্তু আর গেলনা। রয়ে গেল। ঐভাবে এসে থেকেই গেল।

সারা রাত ছিল, সব কিছুর মধ্যে। এখনও তা আছে, দুটো জিনিসই রয়েছে কলের মতো জিনিসটা রয়েছে যা সাধারণ চেতনা, কিন্তু কিছুক্ষণ স্থির বা নিবিষ্ট হয়ে থাকলেই তার মধ্যে ঐটি এসে হাজির হচ্ছে। এ বলছি দেহেরই অনুভূতি, বুঝতে পারলে, বাস্তব এই দেহেরই অনুভূতি সর্বত্রই, সব কিছুর মধ্যেই তা ভরে আছে, কেবল তাইই যেন রয়েছে, আর আমরা যেন...যেন চুপসে গেছি, মরা গাছের ছালের মতো শুকিয়ে গুটিয়ে গেছি সর্বত্রই একটা কাঠিন্য, সংকোচন (পুরোপুরি তা নয়, উপরে উপরে) আর তাঁর মধ্যে কোনো বোধ নেই। তাই বাইরে তাঁকে বোধ করছি না, কিন্তু সর্বত্রই তিনি, সমস্তই তিনি, তা ছাড়া কোনো কিছু নেই। শ্বাস নিতে গেলেও তাঁকেই টেনে নিতে হবে, নড়তে গেলেও তাঁর মধ্যেই নড়তে হবে: শুধু তুমি কেন...সব, সব, সমগ্র বিশ্বই তাঁর মধ্যে—কিন্তু বাস্তবরূপে, একেবারে স্থূলভাবেই।

এই "শুকিয়ে যাওয়া" অবস্থাটা আমি সারাতে চাইছি।

এ জিনিসটা যেন অকল্পনীয়, বুঝতে পারলে?

যখন শুনতে চাই, তখন তিনিই বলেন কথা। আমি তাঁকে বলি: "তাহলে কারোই বা উপরে ওঠার কি দরকার?" তিনি আশ্চর্যভাবে পরিহাসের ছলে বলেন: "কারণ তারাই যে চায় যাতে আমি তাদের চেতনা থেকে অনেকখানি তফাতে থাকি।" এই

রকমই ব্যাপার, কিন্তু লাইন কেটে দেওয়া নেই, কেবল ভাবে মাত্রই তা। অনেকবার, অনেকবারই বলতে শুনেছি : "দূরে কেন খুঁজতে যাও তাকে যা সর্বত্রই রয়েছে...?" (অবশ্য শাস্ত্রগুলিতেও সেই কথা বলেছে যে তোমার মধ্যেই তা আছে)।

কিন্তু এত কথা আমি ঐ লোকটিকে বলিনি, এমন নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতি তখন হয়নি।

তারপরে বিশেষ ক'রে এই কথা বলা এ নিয়ে কোনো নতুন ধর্ম নয়, কোনো ধর্মমত গড়া নয়, কোনো নির্দিষ্ট অনুশাসন দেওয়া নয়। ঐ সমস্তকে একেবারে পরিহার করতে হবে—কিছুতেই তা যেন আবার একটা নতুন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়। যেমনি তা হতে যাবে...যেমনি তার অঙ্কুর সতেজে গজিয়ে উঠবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সব ভেঙ্গে যাবে।

শুধু অনুভবে তাই হয়ে থাকে যে সর্বত্র সবখানেই কেবল তাই ভরে আছে, তা ছাড়া আর কোনো কিছু নেই। কিন্তু আমরা তা জানি না, কারণ আমরা চুপসে আছি, কি বলব, অর্থাৎ কিনা শুকিয়ে থাকা। এর থেকে আলাদাভাবে পূর্ণ হয়ে থাকতে চেষ্টা করেছি বিস্তর—(হেসে) সফল তো হয়েছি! কিন্তু সফল হয়েছি কেবল চেতনাতে, বাস্তব সংঘটন তাইই আছে, যেমন ছিল তেমনিই আছে। যা কিছু আমরা জানি, দেখি, স্পর্শ করি, সবই যেন অন্তরালের মতো, জলের উপর ভাসার মতো আর ও-জিনিস কিন্তু ভেদ করে যায়। পার্থক্য কেবল মনে (মা কপাল দেখালেন)।

হয়তো তার জন্যেই অনুভূতিটা এলো যেহেতু কিছুদিন যাবৎ প্রবল একাগ্রতা হয়েছিল জিনিসটা জানতে, কেন বা কেমন ক'রে নয়, শুধু তাকেই জানতে, যা কিছু মূঢ় ও কুৎসিত তার থেকে পৃথক হয়ে। তখন যত কিছু স্মৃতি এলো ভিড় ক'রে, কত সব অভিজ্ঞতার স্মৃতি (বই থেকে, ছবি থেকে, সিনেমা থেকে, জীবনের ও মানুষের ও বস্তুর কাছ থেকে), এই দেহেরই স্মৃতি, যাকে "অদিব্য" বলা যায় তার স্মৃতি, দেহে যত কিছু ঘৃণ্য সংবেদনাদি বোধ হয়েছে তার স্মৃতি, সমস্তই যা ভগবৎ-উপস্থিতির বিপরীত। কাজটা শুরু হলো এই ভাবে, দিন দুয়েক এই নিয়ে এমন অবস্থা হলো যে দেহ হতাশাতে ডুবে গেল। তার পরে এলো এই অনুভূতি যা আর কিন্তু নড়ল না। তবে এইভাবে কেবল আসে আর সরে যায়, একটানা চলতে থাকে না। মুহূর্তের জন্য আসে, দেহ চায় তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে (হাত নেড়ে দেখালেন), গলে যেতে; সে অনুভব করে জিনিসটা কী, সে সেটাও করে কিন্তু পারে না (নিজের হাত দুটি দেখলেন), কিন্তু তার চেতনা ঠিক জানে।

এ অনুভূতির কিন্তু ফল আছে, হঠাৎ একটা বেশ মুক্তিবোধ করা যায়; দুই একজন তার ফলে আরোগ্যই হয়ে যায়। দেহ বিগড়ালে তা নিয়ে ভাবতে হয়না; আপনি ঠিক হয়ে যায়।

ওতে কিন্তু দেহকে নিষ্কর্মা করে না, সব কিছু ছেড়েছুড়ে ওতেই একান্ত নিমগ্ন হয়ে থাকতে বলে না ; না, তেমন ইচ্ছা তো আদৌ হয়নি। কেবল সেই জ্যোতির্ময় বিশালতায় অবগাহিত থাকা...কেবল বাইরে নয়, ভিতরেও (হাত দিয়ে দুটি পৃথক করে দেখালেন। সে অনুভব এমন...বলা যাচ্ছে না, সহজ মানব-চেতনাতে তো নয়, বিচলিত চেতনাতেই তা বাস্তব কিছু একটা ঘটে গেছে চেতনার মধ্যে...(মাথা নেড়ে) বোঝা যাচ্ছে না।

(নীরব থেকে)

প্রত্যেক বর্ষেরই ভিত্তিতে যা কিছু মতবৈশিষ্ট্য ও ব্যাখ্যা ও কাহিনী আছে, সবই মনে হয়...আমোদ-উদ্দীপক। তখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে হয়...একটা কথা বলব ? ভগবান নিজের কাছে নিজে একটা হাস্যকর অভিনয় করেননি তো ?

বলা কঠিন। এমন দিন গেছে যখন আমি সৃষ্টির বীভৎসতার মধ্যে দিন কাটিয়েছি (এবং তার চেতনাতেও), তার থেকেই অনুভূতি পেয়েছি, আর...বীভৎসতা সব মিলিয়ে গেছে।

কেবল নৈতিক নয়, বিশেষ করে দৈহিক যন্ত্রণা, হাঁ, দৈহিক দুর্ভোগ। দেখেছি সে দৈহিক কষ্ট কেমনভাবে লেগে থাকে, দিবারাত্র অবিরাম চলতে থাকে। তারপরে তেমন অবস্থার পরিবর্তে হঠাৎ এসে পড়লাম ভগবৎ-উপস্থিতির মধ্যে। আর সব কষ্ট তখন চলে গেল। তা ছিল দৈহিক কষ্ট, দেহেরই কারণে। ডাক্তাররা বলবে, "এর জন্যে ঐ, ওর জন্যে তাই" স্থূল দেহেরই ব্যাপার ; কিন্তু হঠাৎ এমনি চলে যায় চেতনা যেমনি বদ্‌লে যায় অমনি অন্যরূপ এসে পড়ে।

সত্য চেতনার মধ্যে যদি বেশিক্ষণ থাকা যায় তাহলে আমরা যাকে বলি "দেহের ঘটনা" তা অদৃশ্য হয়ে যায়, কেবল ব্যথাপীড়াই নয়...তখন বোধ করি যেন আমি কেন্দ্রস্থ অনুভূতিকে স্পর্শ করলাম (মন যদিও তা বুঝতে পারেনা তাই রক্ষা :)

আর এ কেবল আরম্ভই মাত্র। দেহের রূপান্তর হয়ে গেলে এই অনুভব আসবে যে আমি পরমতম রহস্যকে স্পর্শ করেছি।...সে অনুভূতি (সামান্য কিছু বিশদভাবে) ঠিক এই রকমই হবে। তারপর একটি দেহে সে চেতনা এলে তখন সকল দেহেই কি তেমন রূপান্তর আসবে ?...এ কেবল চেতনারই প্রক্রিয়া। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরেট রকমের ব্যাপার তো নিশ্চয়ই।

(নীরব থেকে)

তবে সে চেতনা এখনও রয়েছে।...আজও অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি : প্রত্যেকে সামনে এলেই তার দিকে চেয়েছি (সে কিন্তু এই "আমি"টা নয়, যদিও সে ভেবেছে যে আমিই চাইছি), চোখ বুঁজে চেয়ে আর ভিতরে একটা বোধ ও দৃষ্টি (চোখের দৃষ্টি নয়,

চেতনার ক্রিয়া), ভগবৎ-উপস্থিতির সে চেতনা, যা উপরকার শক্ত খোলস ভেদ করে সর্বত্র ঢুকে যায় ; আর চোখ স্থির হয়ে থেকে তাতেই নিবিষ্ট হয়...কিন্তু তা সাময়িক মধ্যবর্তী অবস্থা, কারণ অন্য চেতনাটিও সেখানে আছে (যা সব কিছু দেখে ও তদনুযায়ী কাজ করে, কেবল ব্যক্তিবোধ রয়েছে আর কি ভাবছে তাও মানছে—তত্টা কিছু ভাবা নয় কেবল বোধ করা যে ঐ লোকটি কেমন)। অবশ্য এরও দরকার আছে মানব-সংস্পর্শ বজায় রাখতে, কিন্তু...

তথাপি এও অনুভূতি, নির্বিশেষ ঘটনা নয়। তাকেই বলি "নির্বিশেষ ঘটনা" যা ছাড়া কিছুই আর থাকবেনা, কেবল তাই থাকবে ? তেমন এখনও হয়নি।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে) আর তুমি : তোমার কি বলবার আছে ?

ভক্ত আমিও আবহাওয়ার মধ্যে একটা পরিবর্তন বোধ করছি।

মা ও।

ভক্ত হাঁ, পাঁচ ছয়দিন যাবৎ একটা কিছু অসাধারণ জিনিস বোধ করছি (মা হাসলেন) যা খুবই অসাধারণ। আর গত রাত্রে হঠাৎ এক সময় দেখি যে আপনি মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম, মাথায় একটা বালিশ দেবো ? আপনি বললেন, না। তেমনি রইলেন।...এর মানে কি ?

(মা তার কোনো জবাব না দিয়ে বহুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন) এই যে অতিমানসের নামা, উপরের চেতনা এসে ঢোকা, এগুলো আমাদেরই কর্মনা...অনুভূতি জাগে শাশ্বত জিনিসের মতো কিছু যে দূর থেকে এসে ঢুকল এমন নয়। কেবল চেতনার অবস্থান্তরের ব্যাপার। উপরে কিছু আছে কিনা জানিনা, কিন্তু ওটা আমার বাস্তব অনুভূতি। চেতনারই ক্রিয়া। কেন, কেমন করে ? তা জানিনা...কেবল অন্য দিকে দেখি যে পার্থিব জগতের কোনো কিছু চেতন হয়ে উঠল, তাতেই বোঝা যায় যে একটা কিছু ঘটেছে...বোঝাতে পারলাম কি না জানিনা...অর্থাৎ এই দেহ পৃথিবীর অন্য সব বস্তুর সঙ্গেই সমান, কিন্তু কোনো কারণে এটা অন্য রকমে চেতন হয়ে উঠেছে ; তাকেই বলা যেতে পারে যে পার্থিব চেতনাতে কিছু একটা "এসেছে" বা "নেমেছে" বা "শুরু হয়েছে"...কিন্তু শুরুই কি হয়েছে ? "এসেছে" সে কোন জিনিস ?...বুঝে দেখ, পরম প্রভু ছাড়া তো কোনো কিছু নেই (আমি তাকে "প্রভু" বলি শুধু ভাষাতে বলার কারণে, নতুবা...), তা ছাড়া কোনো কিছু থাকতে পারেনা। সবই চেতনভাবে হচ্ছে তাঁরই মধ্যে। আর আমরা তো...সেই অসীমেতে তুচ্ছ বালুকণা ; কেবল তাঁরই শক্তিতে তাঁরই চেতনা থেকে চেতনা পেয়ে তাই হয়েই থাকি।

(নীরব থেকে)

এ অনুভূতি আসার আগে যখন ছিলাম যন্ত্রণার অবস্থাতে, পার্থিব জীবনের বিভীষিকার মধ্যে, তখন এলো একটা বিশেষ কিছু (সে যে কিছু "বললে" এমন নয় ; কথাতে তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু যা হলো তা ভিতরে, বিনা চিন্তাতে), তার তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়, "তুমি কি পাগল হয়ে যাবার ভয় করোনা ?" বুঝেছ ? (তর্জমায় বলছি) সেহ তখন জবাব দিলে "আমরা সবাই তো পাগল, এর চেয়ে আর বেশি কি পাগল হবো ?" আর অমনি সব ঠাণ্ডা।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

চেতনাটা রয়েছে এইখানে (বুকে হাত দিলেন), আর ওখানে রয়েছে (উপরের দিকে দেখিয়ে) কেবল আলো আর আলো...(ব্যাপকতার ভঙ্গী)। কিন্তু দেহের মধ্যে আছে চেতনা (বুকে হাত দিয়ে) অর্থাৎ ঐ চেতনা...তাকেই বলছি সেই প্রভু।

জানি যে সেই চেতনা জানছে এগুলো সব ছেলেমানুষী কথা হচ্ছে, কিন্তু সঠিকভাবে বলতে গেলেই তা মনের বলা হয়ে দাঁড়াবে, তার চেয়ে এমনি ছেলেমানুষী বলাই ভালো।

*

নভেম্বর ২৭, ১৯৬৮

তেমনি চলেছে...দেহ জানে সে বুঝতে পারছে। অবশ্য তার চিন্তা বলে কিছু নেই। কিন্তু চেতনারই অবস্থান্তর আছে, যা পরস্পরের পরিপূরক, এটার স্থানে ওটা... সে প্রশ্নও করে যে চিন্তাতে কি জানবে জানা চেনার একমাত্র উপায় তো চেতনা। এটাই উত্তরোত্তর পরিষ্কার হচ্ছে, আর সেইভাবে সে তাকে কাজে লাগাচ্ছে অর্থাৎ এমন কিছু করছে যাতে দেহের সর্বাংশই চেতন হয়, কেবল ভিতরের শক্তি-ক্রিয়ার সম্বন্ধেই নয়, ভিতরের কাজগুলির সম্বন্ধেও চেতন। ক্রমে তা সুনির্দিষ্ট হচ্ছে।

হাঁ সবার উপরে এই কথা সবই চেতনার কাজ, সে যখন যা করতে চায় তা মনের দ্বারা জানতে হয়না যে কেমন ভাবে তা করা যাবে। সে নিজেই জানে যে কি করতে হবে, শুধু নিজের সম্পর্কে নয় কিন্তু সকলেরই সম্পর্কে, সুনির্দিষ্টভাবেই...আর অন্যের কাছে জানা ! যেমন, কারো কাছে কিছু শিখে করা, কিন্তু সে নিজেই সেইভাবে শিখে নেবে। কে বা এসে বুঝিয়ে দেবে, কার বা তেমন ক্ষমতা...ও সব ভুয়ো কথা, ফাঁকা কথা। উত্তরোত্তর এইভাব দাঁড়াচ্ছে। (নীরব হলেন)

ভক্ত : মা, আমি যে কেন দেখলাম আপনাকে মাটিতে শুয়ে থাকতে, তার জবাব তো দিলেন না ?

মা : (হেসে) ওটা হয়তো পূর্ণ সমর্পণের প্রতীক, চিৎ হয়ে শোয়া বুঝি ?

ভক্ত : হাঁ, মাটিতে পিঠ রেখে।

মা : ওটি পূর্ণ সমর্পণের দ্বারা পূর্ণ গ্রহিষ্ণুতার ভঙ্গী।...কারণ, বস্তুত "টুকরো

টাকরা" বাকী আছে কিনা, কোনো যন্ত্র তথাকথিত স্বাধিকার রেখেছে কিনা, তা তো জানিনা ; কিন্তু দেহ বাস্তবেই সমর্পিত, অর্থাৎ তার নিজের ইচ্ছা কিছুই নেই—বাসনা কামনা কিছুই নেই, সে কেবল নির্দেশ "শুনতে" সারাক্ষণ উৎকর্ণ থাকে। সে জানতে পারছে যে কোন স্থানে বা কোন ক্রিয়াতে..."রূপান্তর" বলা ঠিক হবেনা, তা বড়ো কথা, কিন্তু সঙ্গতি বাকী থাকায় ক্ষতি হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে, যখনই কিছু অস্বাভাবিক বোধ হচ্ছে, তখনই চেতনা খুঁজছে যে কেন তা হলো, আর কিভাবে সেই অপূর্ণতা কাটিয়ে বৃহত্তর পূর্ণতা আনা যায়। হাঁ, এ কাজ সুরু হয়ে গেছে, দেহ আরো চেতন হচ্ছে। সে দেখে যে অন্যেদের উপরে এ চেতনা (বৃহৎ) কেমন কাজ করে ; আর প্রায়ই আপন পর ভেদ নেই (এ অনুভূতির পরের কথা), আছে শুধু অসাদৃশ্য বোধ... (যাকে বলা যায় পার্থক্য "অর্গল") যা সত্য চেতনাতে পাবে পূর্ণ সঙ্গতি, মনপ্রত্যয় নিজেই পূর্ণ হয়ে উঠবে (বৃহৎ বৃত্তের ভঙ্গী)। একটু আছে বাধা। কেন তা ?...

জানা যায়নি যে কোন কারণে এর প্রয়োজন ছিল বা হঠাৎ হয়েছে, কিন্তু কেমন করে। আপাতত যা মনে হয় (চিন্তাতে নয়) তা এই বিস্তর বেদনা ও বিপর্যয়ের মূল্যে এ চেতনা অর্জিত হয়েছিল....বোধ হয় গত কালই (মনে পড়ছেনা) প্রশ্নটা যখন প্রবল হয়ে উঠল তখন ভগবৎ-চেতনা বললে "এ সব যন্ত্রণা আমিই তো ভুগছি (বৃহৎ চেতনাই, নয় কি ?) কিন্তু তোমার মতো ভাবে নয়, অন্যভাবে।" তাতে বোধ হলো আমরা যা ভুগছি তা ভগবৎ-চেতনাতেও হচ্ছে, তার থেকেই ওর অস্তিত্ব—তবে আমাদের চেয়ে স্বতন্ত্ররূপে ; তখন জানতে চাইলাম কী সে চেতনা, যা সব কিছুরই এবং সকলেরই, পর্যায়ক্রমে ; যন্ত্রণা ও অসঙ্গতি, আর পূর্ণ সঙ্গতি ও পূর্ণ আনন্দ—দুইরকম একত্রে অনুভব হওয়া। এতে যন্ত্রণার রূপ বদলে যায়।

কিন্তু চেতনা এও জানে যে বকাই সার হচ্ছে। সঠিক তর্জমা হচ্ছেনা। আর এও বোধ করছে যে এই সব বিভিন্ন অনুভূতি একত্রে জড়ো হয়ে (আমাদের পক্ষে যেটা এই দেহ) নিজেকে তালিম দিচ্ছে যাতে সত্য চেতনাকে ধারণ করবার সামর্থ্য আসে। দরকার হচ্ছে তারই উপযুক্ত হয়ে ওঠার।

ভক্ত শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন তাঁর "Thoughts & Glimpses"তে যে, কষ্ট হলো আনন্দেরই প্রস্তুতি।

মা ঠিক তাই। শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছেন তার অনেক কিছুই এখন নতুন করে বুঝছি। (নীরব থেকে) মনে হয় কিছু একটা ছুঁই ছুঁই করছি...আর তা ফস্‌কে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ ধরা যাচ্ছেনা। এখনও অনেকটা, অনেকটা পথই বাকী। *

* BULLETIN OF S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

অমৃতের কবি

সমুদ্রের বুকে প্রলম্বিত পণ্ডিচেরীর জেটি—সন্ধ্যাসমাগমে নির্জন। কবিপ্রাণ সাধক সেখানে বসে আছেন। চিত্র আবিষ্ট হবার মতো আকাশ জল স্থলের এই পরিবেশ—

"আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে
সিন্ধু ধরায় হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে সেথা
দৃশ্য-জগত-নাথ।"

কবির দৃষ্টি চলে যায় সমুদ্র আকাশ পার হয়ে অসীমের সন্ধানে। অন্তরে কানায় কানায় ভরে ওঠে নীরবতা। হঠাৎ দূর থেকে আসে সুরের তরঙ্গ। তারা ফোটার মতো কথার মালা হয়ে ফুটে ওঠে সেই সুরবালা। কবি মন্ত্রদ্রষ্টার মতো ঘরে ফিরে এসে অবিকল স্মৃতিচিত্রণ করে লিখলেন এই পূর্ণ প্রতিমার আলেখ্য

Beauty standing motionless in meditation is beauty of form,
Beauty moving and shining in meditation is beauty of life,
Beauty thinking in meditation is beauty of thought—
The Spirit of beauty is thus standing,
moving and thinking from the far-off beyonds.
(*Visions and Voices*)

ধ্যানমগ্ন নিশ্চল সৌন্দর্য হল দেহশ্রী,
ধ্যানমগ্ন সচল ও উদ্ভাস সৌন্দর্য হল প্রাণশ্রী,
ধ্যানমগ্ন ভাবনাকুল সৌন্দর্য হল কল্পনাশ্রী
সৌন্দর্যের রহস্য তাই তো দূর ওপার থেকে আসা
কায়া গতি ও ভাবনা।

অসীমের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ কবির দৃষ্টিতে এই রকমে ধরা দিয়েছে সৌন্দর্যের রহস্য—তার নানা স্তর, নানা প্রকৃতি। তবু এ সৌন্দর্য জ্ঞানতাত্ত্বর দৃষ্টির সৌন্দর্য। ভাষা এখানে ভাবানুযায়ী ক্লাসিকাল পরিচ্ছন্নতার সৌকর্যে আলোকিত। এই কবিই আবার অনায়াসে কি রকম যাদুকর কবি হয়ে উঠলেন—

A bright circular disc of water surging with
something that it does not know, filled with ripples

অমৃত

(সেপ্টেম্বর ২১, ১৮৯৫ — জানুয়ারী ৫১, ১৯৬৮)

১৯২০ সালে শ্রীমায়ের আঁকা

"The Mother's light streamed forth from within
the vanishing little "I" and from without
light filtered in."

that break the thousand images of the Sun of Truth,
appeared suspended in mid-air. And it looked too
like a vast moon. (ঐ)

সেই সুন্দর মিস্টিকের স্বপ্ন—

নিজের অজানা কি এক উন্মাদনায় আকুল একটি জলের বলয়িত মণ্ডলী,
সূর্যসত্যের সহস্র প্রতিবিম্বকে চুরমার করে দেওয়া বুদ্বুদে ভরা,
অন্তরীক্ষে দুলতে দেখা গেল। সেটি যেন অসীম একটি চাঁদও।

মিস্টিক কী করেন? আপ্তকাম সাধক হয়ে তিনি সত্যের অঙ্গ সকল ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন, সকল আবিল প্রয়োগ থেকে মুক্ত রাখেন। কবি হয়ে রসবিদদের কাছে তিনি তাকে উপস্থাপিত করেন আরও নিকটে—আরও প্রকটভাবে সামিধ্যে—ভাষার কিছু কৌশলের আশ্রয় তাঁকে এজন্য নিতে হয়। এসব সত্য দর্শনার সংকেত আমার সহচর, অন্তর্লোকের পরিচিত অর্থবহ রূপাবলি। মিস্টিক তাই আত্মার পূজারী—অন্তরাত্মার পথের যাত্রী। শুনুন এই অন্তিম স্বর—

A Pilgrim in search
of his destined companion...his fellow traveller...
a journey predestined...
Broad everlasting day as if the day was cloaked with midnight,
with pitch darkness;
a track as wide as width could be...no beginning and no end.
My little "I" trudges on and on, I do not know since when,
through this inconscient darkness,
My little "I" is confident, believes it is the actor-in-chief,
though ignorant, though stupid,
My little "I" has no patience to note its failures, it does not know
it is all in shackles; in a triple cord,
my little "I" trudges along the track...
My little "I" observes in the dark above a star here, a star there
shooting through the sky, the dark
inconscient is split...
My little "I" trudges on...now proud of its strength, of its
wisdom, not knowing the shining stars that guide it...
My little "I" trudges on and on, not knowing whereto, not
knowing how.

Parallel to my little "I", an unknown traveller was faintly visible
in the fading starlight,
Something within the little "I" whispered, a still small voice,
"He is not a stranger, an ancient companion is he from time
sempiternal, twin traveller on the endless track..."
My little "I" trudges on, force diminished, pride broken,
bewildered, on, on and ahead on the track...
My little "I", now shapeless, shrunk in size, trudges alongside of
the new unknown companion, *an adhvaryuh*, a priest of the
journey trudges towards an unseen far-off destiny.
The new companion and my little shrunken "I" reached a way-
side mansion
on the endless way whence was heard "Dawn! Dawn!"
The vast mansion was full of seekers carrying fire and light,
overshadowed by the Mother's Presence.
My little waning "I" through this concourse came close to the
new but ancient companion, as old as old could be.
The Mother's light streamed forth from within the vanishing
little "I" and from without light filtered in.
My little vanishing "I" trudges still on, on. The moving mansion
glides on the wide, wide track towards "the Dawn"
proclaimed under the pale grey sky, the faint few stars
disappearing under the broad everlasting day.
Voices are heard singing in chorus:
Of the Mother's substance we are,
In Her Light we see, we live,
In Her Strength we act,
In Her we become.....

তীর্থযাত্রী চলেছে খুঁজে
ভবিতব্যের সঙ্গী...পথের সাথী...ভবিতব্যের যাত্রা...
প্রসারিত চিরন্তন দিন, আবৃত যেন মাঝরাত্রি দিয়ে
ঘনা অন্ধকার দিয়ে ;

পথরেখা বৃহৎ, বৃহত্তরই মাপে, নাই আদি নাই অন্ত।
ক্ষুদ্র 'আমি' চলেছে, চলেছেই অবিশ্রাম, কবে থেকে জানা নাই,
নিশ্চেতনার তমিস্রা পার হয়ে।
ক্ষুদ্র 'আমি' আত্মপ্রত্যয়ী, বিশ্বাস তার নিজে সে মুখ্য অভিনেতা—
যদিও সে নিশ্চেতন, যদিও সে মূঢ়।
ক্ষুদ্র 'আমি' ধৈর্য জানে না, ব্যর্থতার হিসাব রাখতে জানে না
আপাদমস্তক নিগড়ে আবদ্ধ,
আবদ্ধ ত্রিধা পাশ-বন্ধনে।
ক্ষুদ্র 'আমি' চলেছে শ্রান্তপদে পথরেখা বেয়ে...
ক্ষুদ্র 'আমি' চেয়ে দেখছে ঊর্ধ্বে অন্ধকারের কোলে
এখানে একটি তারা, ওখানে আর একটি
আকাশ চিরে চলে যায়, অন্ধকার তমিস্রা চিরে যায়
ক্ষুদ্র 'আমি' চলেছে পথ বেয়ে,
গর্বিত সে নিজের সামর্থ্যে, নিজের জ্ঞানে—
জানে না চেনে না তার শিল্পী ভাস্কর তারকাবৃন্দকে
ক্ষুদ্র 'আমি' চলেছে চলেছেই, জানে না কোথায়, জানেনা কেমন করে—
তার পাশাপাশি কে ও অজানা যাত্রী, অস্পষ্ট দেখা যায় নক্ষত্রালোকে।
ক্ষুদ্র 'আমি'র অন্তরে কে কথা বলে ক্ষীণস্বরে, শান্ত ক্ষীণকণ্ঠে
"অপরিচিত এ নয়, অতি প্রাচীন সঙ্গী আদিকাল হতে—
অন্তহীন পথে যুগল যাত্রী—"
ক্ষুদ্র 'আমি' চলেছে, শক্তি ক্ষয়িত, গর্ব খণ্ডিত, দিক-বিভ্রান্ত—
তবু চলেছে চলেছে চলেছে পথ বেয়ে।
ক্ষুদ্র 'আমি' রূপছায়া এখন, শীর্ণ মন তার, চলেছে ক্লান্ত পদে,
অজানিত সঙ্গীর সঙ্গে, অন্তর্যুঃ যে, পথের পুরোধা,
চলেছে ক্লান্তপদে অলক্ষিত সুদূর বিধিনির্বৃতির অভিমুখে।
ক্ষয়িত ক্ষুদ্র 'আমি' তার নবসঙ্গীসহ পৌঁছিল অন্তহীন পথের প্রসারে,
—তার কণ্ঠে গান : ঊষা, এসেছে ঊষা !
বিপুল প্রাসাদ এক পরিপূর্ণ, অগ্নিবাহী আলোবাহী অন্বেষুদের সমাগমে
—ঘিরে তাকে রয়েছে মাতৃ-সান্নিধ্য।
ক্ষুদ্র ক্ষীয়মাণ 'আমি' জনসংঘ পার হয়ে নিকট হতে নিকটে এসে উপস্থিত
সেই সঙ্গী, প্রাচীন সঙ্গী যে, প্রাচীন প্রাচীনতার মত।
নির্বাপিতপ্রায় ক্ষুদ্র 'আমি'র অন্তর হতে প্রবাহিত হয়ে এল মায়ের আলোর ধারা,
বাইরে থেকে এল আলো পরিস্রুত হয়ে।

ক্ষুদ্র ক্ষীয়মাণ 'আমি' চলেছে তবুও ক্লিন্নপদে, চলেছে চলেছেই
চলমান প্রাসাদখানিও...
চলেছে সরে সরে বিপুল বিস্তৃত পথ বেয়ে, অভিলম্বিত উষার অভিমুখে,
ক্ষীণাভ ধূসর আকাশতলে, নিষ্প্রভ কতিপয় নক্ষত্র
প্রাণমাণ যেখানে
চিরন্তন দিনের উদার আকাশে।
সমবেতকণ্ঠে শোনা গেল মন্ত্রিত সঙ্গীত :
"মায়ের সত্তায় নিহিত আমরা
মায়ের আলোকে পুষ্ট আমাদের, জীবন আমাদের,
মায়ের সামর্থ্যে আমাদের কর্ম
মায়ের অঙ্কে আমরা গড়ে উঠেছি।"

কবি এই পথের সন্ধানেই বসে ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতার সামনে। সব আলাপন ছাপিয়ে সেদিন আবার বাণীর মিছিল কোন দূরান্ত থেকে এসে পৌঁছাল তাঁর শ্রবণে। উঠে গিয়ে তা লিপিবদ্ধ করলেন। কত কথা তাঁর অপরিচিত, কত কথা দুরূহ অথচ কত নিশ্চিত পদক্ষেপে তারা এসে গেল—

> And then there came a moon movement in the darkness, there came the epicycloidal movement of mind...

আমাদের কবি নিগূঢ়ের কবি, আত্মার কবি—

> The blue tinged flame is ornate with bright gold and shining diamonds, the white flame is rich with wisdom; and the red-hued flame soars high with his thousand blazing tongues...

এই বহুধা বহুরূপী অগ্নি, এই পাবনী শক্তি, এই দুর্মনীয় লাল নীল সাদা সোনালী শিখা, এই ঊর্ধ্বারোহী অভীপ্সার আকাশ-কামনা এ-ই আত্মা—এই আত্মার আর এক নাম অমৃত। এই অমৃতের আনন্দরস, এই আত্মার সৌরভ বৈদিক হ্লাদিনী শক্তি, সোমরসের উল্লাস। অমৃতের কবি সত্তাই সার্থকনামা—অমৃত—জীবন-শিল্পীরূপেও তিনি আত্মার আনন্দকে মূর্ত করে ধরেছিলেন, দৈনন্দিন তুচ্ছ কর্মকেও আনন্দঘনরূপ প্রকাশ করে দেখাতে পেরেছিলেন তাঁর অনুপম কাব্যের মতোই।

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরী সময় মত ফিরিয়া না আসাতে স্কোয়াড্রনের সকলেই প্রায় মুসড়িয়া পড়িল। পূর্বে একবার ব্রেনহীন বিমানে আকিয়াব হইতে দরদমে ফিরিয়া আসার সময় বঙ্গোপসাগরে বিমান-ডুবি হইয়াছিল এবং স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর জন্যই সেবার তিনজন বৈমানিক কৌশলে জলমগ্ন হইয়াও মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এবারও সকলেই মনে মনে বিশ্বাস রাখিল যে তাহাদের স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার অক্ষত শরীরেই ফিরিয়া আসিবেন।

কিছুদিন পূর্বের একটা সামান্য ঘটনার কথায় ফিরিয়া যাই। করাচী ড্রিগ রোড বিমান ঘাঁটিতে ভলটি ভেনজিয়ান্স বিমানের এঞ্জিন ও বিমানের শিকানলিশীকানে স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরী একবার ড্রিগ রোডে আসিয়াছিলেন। তিনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেই সময় তাঁহার সহিত সামান্য ব্যাপার লইয়া মনো-মালিন্য হইয়াছিল। তাঁহার প্রস্তাব তখন সমীচীন মনে না হওয়াতে বেশ কড়াভাবেই বলিয়াছিলাম যে "স্কোয়াড্রনের এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের মধ্যে যাহারা ভাল, তাহাদিকে আটকাইয়া রাখিয়া যাহারা তত-ভাল-নয় তাহাদিকে যদি আরও উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য আপনি বিমানবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠান, তাহা হইলে অবিচার হইবে এবং সে কাজ অন্যায় জানিয়াও যদি আপনি তাহার প্রতিকার না করেন, তবে আপনি যে-বিমানে উড়িবেন, সে বিমান যাহাতে পড়িয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং সে ব্যবস্থা পাকা করিবার জন্য আমি নিজেই সে বিমানে আপনার সাথে যাইব।" স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরী জবাবে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যে বিমান উড়িবার উপযোগী বলিয়া সহি করিয়া দিবে, সে বিমান আমি নির্ভয়ে লইয়া উড়িয়া যাইব, যদিচ দুনিয়ার আর সমস্ত এঞ্জিনীয়ার একসাথে বলে যে সেই বিমান উড়িবার জন্য একেবারে অনুপযোগী।"

এবার তাঁহার কথাগুলি মিলাইয়া দেখিবার মত হইল। বিমানের উড়িবার উপযোগিতা পরীক্ষার পর ফরমূ ৭০০তে আমার সহি ছিল। অন্যান্য সাধারণ বিমানগুলির মত এ, এন ৭১০ নম্বর বিমানেও সাতখানা বিদ্যুৎ-চালিত পাখা ছিল। আকাশে আরোহণ করার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রথম পাম্প বিগড়ায়। তারপর নিশানার দিকে উড়িয়া যাওয়ার সময় এক একটা করিয়া সাতটা পাম্পই বিগড়াইয়া যায়। শেষেরটা বিগড়ায় নিশানায় পৌঁছাইবার একটু পূর্বে। তখন আর বিলম্ব না করিয়া বিমানের মোড় ঘুরাইয়া ঘর-মুখী হইতে হয়।

প্রত্যেক বিমানেই এক জোড়া করিয়া হস্ত-চালিত পাম্প থাকিত। এঞ্জিন চালু করার সময় নিশানার উপর তাক করিয়া সোজা নামিয়া আসার সময় এবং আকাশে আরোহণ

এবং অবতরণ করার সময় পশ্চাতের ককপিটের বৈমানিককে এই হস্ত-চালিত পাম্প চালাইয়া যাইতে হইত। অন্য সময় এই হস্ত-চালিত পাম্পের কোন কাজ থাকিত না। কারণ আরোহণ, অবতরণ, এঞ্জিন চালু করা বা বোমা বর্ষণের জন্য সোজা নামিয়া আসার সময় যদি কোন কারণে এঞ্জিন-চালিত একটা বা বিদ্যুৎ-শক্তি-চালিত সাতটা পাম্পের তখন ব্যবহৃত পাম্পটি খারাপ হইয়া গেলেও, এঞ্জিন চালু রাখার জন্য, হস্ত-চালিত পাম্প হইতেই যথেষ্ট পেট্রল এঞ্জিনে সরবরাহ হইত। হস্ত-চালিত পাম্প ব্যবহারে পেট্রল অভাবে এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দূর হইত। আরোহণ, অবতরণ বা বোমা-বর্ষণের জন্য সোজা নামিয়া আসার সময় এঞ্জিন বন্ধ হইয়া যাওয়ার মানে বিমানের নিশ্চিত পতন ও বৈমানিকের অপমৃত্যু। সেইজন্য প্রত্যেক বিমানে একটা করিয়া হস্ত-চালিত পেট্রল-পাম্প রাখা থাকে।

ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্সের মত বোমারু বিমানের এঞ্জিন সাধারণ-ভাবে চালু রাখার জন্য প্রত্যেক মিনিটে এক গ্যালন পেট্রল প্রয়োজন হইত। হস্ত-চালিত পাম্প দ্বারা এক গ্যালন পেট্রল প্রতি মিনিটে পাম্প করা কঠিন কাজ হইলেও কিছু-কালের জন্য সম্ভব।

অন্য বিমানগুলি অবতরণ করার অনেকক্ষণ পরে এ. এন ৭১০ নম্বর বিমান কুম্ভিগ্রাম বিমান-বন্দরের আকাশে আসিয়া অবতরণ করার অনুমতি চাহিতেই, বিমান-অবতরণ-পথ হইতে সমস্ত বাধা তাড়াতাড়ি অপসারণ করিয়া, তাহাদেরকে অবতরণ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হইল। এ. এন ৭১০ নম্বর বিমান অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে আসিবার পর এঞ্জিন বন্ধ হইল। তখন স্কোয়াড্রনের সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বিমানের চারিদিকে অপেক্ষা করিতেছে। একটু সময়ের পর প্রথমে স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরী সম্মুখের ককপিট হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার গায়ে পিরান ছিল না, পিরান তাঁহার হাতে ঝুলান। পশ্চাতের ককপিটের বৈমানিক দুইজন বাহির হইলে দেখা গেল, তাহাদের গায়ের জামাও হাতে ঝুলান। হাত হইতে পিরাণ খুলিবার পর দেখা গেল যে তিনজনেরই হাতের তালুতে ফোস্কা পড়িয়াছিল। কিন্তু ফোস্কা গলিয়া গিয়াছে এবং হাতের তালু হইতে কিছুটা করিয়া চামড়া উঠিয়া গিয়াছে। সাতটা পাম্প বিকল হওয়ার পর হস্ত-চালিত পাম্প চালাইয়া দেড়-হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা পেটের তলার খোলের মধ্যে লইয়া তিনজন বৈমানিক ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই বিকট যন্ত্রণাদায়ক নাটকের পরিসমাপ্তি হইল যখন ফ্লাইট-লেফটেনান্ট পিন্টো সার্জেন্ট ভাদুড়ীকে বলিলেন যে, "তুমি আমার সাথে থাকিলে, হুগলীতে আমি বিমান পড়িতে দিতাম না।" (I would not have crashed near Hooghly)

উদয়রঙ্গ-কুম্ভিগ্রামে আমরা প্রায় বৎসরকাল ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে ঘটনাবলী একটার পর একটা এমন দ্রুতভালে সংঘটিত হইতে থাকে যে, কখনও উত্তেজনা-বিহীন অবস্থা হয় নাই। প্রায় প্রত্যহই নূতন কোন কাজ বা উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইয়া সকল বৈমানিকদেরকেই সতর্ক ও কাজে ব্যস্ত রাখিয়াছিল।

প্রথম অপারেশনের কয়েকদিন পরের ঘটনা। এখন আমাদের স্কোয়াড্রন সাবালক হইয়াছে। একশত দশ নম্বর বিলাতি স্কোয়াড্রনের তাঁবেদার হইয়া বোমা-বর্ষণে যাওয়ার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। স্কোয়াড্রনের বারটি বিমান চব্বিশজন বৈমানিক লইয়া প্রত্যহই দিনে অন্ততঃ দুইবার করিয়া যাত্রা করে। কোন কোন দিন তিনবারও। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ষ্টেশন-কমাণ্ডার এবং গ্রুপ হেড্‌কোয়ার্টার বুঝিতে পারিয়াছে যে এই স্কোয়াড্রনকে যে কাজ দেওয়া যাইবে, স্কোয়াড্রন সেই কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাধা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। এদের পণ "যাক প্রাণ থাক মান।" ক্রমে ক্রমে বিলাতি একশত দশ নম্বর স্কোয়াড্রন ভারতীয় সাত নম্বরের তুলনায় শত্রু-হননে অনেক পিছাইয়া পড়িল। আমাদের স্কোয়াড্রন যেদিন বারখানা বিমান দুইবার করিয়া পাঠাইত, সেদিন হয়ত তাহারা একবারই বারখানা বিমান পাঠাইতে সক্ষম হইত। দিনে তিনবার, অর্থাৎ সর্ব্বসাকুল্যে ছত্রিশটি অভিযান তাহারা কখনও করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রায়ই আমাদের বিমানগুলি তিনবার বারখানা করিয়া উড়িয়া গিয়া দিনে ছত্রিশটি অভিযান করিয়াছে।

মনে নাই ঠিক কবে, তবে প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই এ ফ্ল্যাইটের লতিফ খান নিশানার উপর চক্কর দিতেছিলেন, কারণ ফ্ল্যাইটের অন্য বিমানগুলি একটার পর একটা বোমা-বর্ষণের জন্য তাক করিয়া সোজা অবতরণ করিতেছিলেন এবং পাইলট অফিসার লতিফ খান তাঁহার সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া উড়িতেছিলেন। হঠাৎ নিশানার চারিদিক হইতে প্রচণ্ডভাবে বিমান-ধ্বংসী বোফোর কামানগুলি গর্জিয়া উঠিল। গোলাগুলি বিমানগুলির নিকটে সোজা আসিয়া ফাটিয়া পড়িতেছিল। অনেকগুলি বোফোর কামান হইতে গোলা আসিতে থাকায় আমাদের যে বিমানগুলি তখনও তাক করিয়া সোজা অবতরণ করে নাই, সেগুলি বোফোর কামানের পাল্লার বাহিরে গিয়া অপেক্ষায় রহিল। কিন্তু পাইলট অফিসার লতিফ খান ছিলেন অন্য প্রকার বস্তুতে গঠিত। তিনি তাঁহার বিমানের পশ্চাতের ককপিটে-স্থিত নেভিগেটর-গানার ওয়ারাণ্ট-অফিসার ঘোষের সহিত পরামর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ সোজা অবতরণ করিয়া বোমা-বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হন। এদিকে ওদিকে না সরিয়া তিনি সোজা নিশানার দিকে তাক করিয়া অবতরণ করিতে থাকেন। তাঁহার অবতরণ করার সময় আমাদের অন্য বিমানগুলির বৈমানিকরা সভয়ে দেখে যে বোফোর কামানের একটা গোলা পাইলট অফিসার লতিফ খানের বিমানের একদিকের ডানার উপর ফাটিল। বোফোর কামানের গোলাগুলি চার ইঞ্চি ব্যাসের। যে কোন বিমানকে ভূপাতিত করিবার ক্ষমতা এই গোলায় আছে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু সেই প্রকার কোন অঘটন হইল না। পাইলট অফিসার লতিফ খান সোজা নামিবার পর তাঁহার বিমানটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া নিশানার উপর বোমা বর্ষণ করিলেন, এবং সমরূপতই আবার নিশানার উপর হইতে সরিয়া গেলেন। অন্য বিমানগুলি হইতে নজর করিয়া দেখা গেল তাঁহার বিমানের একদিকের ডানার

মধ্য হইতে প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হইতেছে। পাইলট অফিসার লতিফ খানের বোমা-বর্ষণের ফলে গোটা দুয়েক বোফোর কামান চুপ হইয়া গেল।

পাইলট অফিসার লতিফ খানের কাণ্ড দেখিয়া অন্য বিমানগুলির বৈমানিকরা দূরে সরিয়া না থাকিয়া সাহস করিয়া নিকটে আসিল এবং যথাসময়ে বোমা বর্ষণ করিল। বোমা-বর্ষণ সমাধা হওয়ার পর দেখা গেল যে, নিশানা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং অনেকগুলি বোফোর কামানও চুপ হইয়াছে।

বোমা বর্ষণের পর নিশানার একটু দূরে, আঁটব্যূহ তৈয়ারী করিয়া ঘরমুখী ফিরিবার জন্য আমাদের বারখানা বিমানের একত্র হওয়ার কথা ছিল। পাইলট অফিসার লতিফ খান যথাসময়ে যথাস্থানে আসিলেন, এবং যেন কিছুই হয় নাই, সেই রকম ভাব দেখাইয়া ব্যূহের মধ্যে নিজস্থান অধিকার করিলেন এবং সকলের সাথে কুম্ভিগ্রাম পর্যন্ত উড়িয়া আসিয়া সময় মত অবতরণ করিলেন। ইতিমধ্যে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের নিকট হইতে বেতারে সংক্ষিপ্ত গোপন (code) সংবাদ পাইয়া আমাদের আম্বুলেন্স এবং অগ্নি নির্বাণ-কারী গাড়ী অবতরণ-পথের পাশে পাইলট অফিসার লতিফ খানকে অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষায় ছিল।

পাইলট অফিসার লতিফ খানের বিমান সার্ভিসিং সেকসনে আনিয়া পরে খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করা গেল। দেখা গেল যে চার ইঞ্চি ব্যাসের বোফোর কামানের গোলা বিমানের ডানার মধ্যে ফাটিয়া যায় নাই। বিমানের ডানা ভেদ করিয়া আরও দূরে গিয়া তার পর ফাটিয়াছে। ডানা ভেদ করিয়া যাওয়ার সময় নিকটস্থ ধনার নিশ্চিত পেট্রল ট্যাঙ্কের একাংশ ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে। বিমানের ডানার পশ্চাৎ দিক হইতে যে ধোঁয়া কিছুক্ষণের জন্য নির্গত হইতে আমরা দেখিয়াছিলাম তাহা এই ট্যাঙ্ক হইতেই নির্গত পেট্রল। আশ্চর্য্যের কথা ট্যাঙ্ক ছিঁড়িয়া যাওয়াতে পেট্রল নির্গত হইয়াছে, কিন্তু কোন স্ফুলিঙ্গ না থাকায় সেই পেট্রলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই।

পাইলট অফিসার লতিফ খান এবং তাহার নেভিগেটর-গানার ওয়ারলেস-অফিসার ঘোষ এ যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেন। এর মাস দুয়েক পরের ঘটনায় কিন্তু ফল অন্যরূপ হইল। তখন দিন কয়েক ধরিয়া খুব বর্ষা নামিয়াছে। আর প্রত্যহই সবগুলি বিমান উড়াইবার ফলে প্রত্যেক বিমানেই সামান্য সামান্য খুঁতের আভাস পাওয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে। সার্ভিসিং সেক্সনে প্রত্যেক বিমান একবার করিয়া লইয়া যতদূর সম্ভব যত্ন সহকারে বিমানগুলি মেরামত করিয়া উড়নোপযোগী করিয়া ছাড়া হইতেছিল।

এ স্কোয়াড্রনে এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের কর্ত্তা ছিলেন স্কোয়াড্রন-সার্জেন্ট রমজান আলি। ভদ্রলোক পাঞ্জাবী মুসলমান। কর্ম্মতৎপরতায় অসম্ভব দক্ষ। তাঁহার নিজের কাজের বা পদোন্নতির জন্য অন্যের ভাল-মন্দ বা জীবনের কোন দামই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। রাত্রিদিন বৃষ্টিপাত দুর্যোগের আবহাওয়ার মধ্যে একদিন পাইলট অফিসার লতিফ খানের বিমানের এঞ্জিন হইতে ভিন্ন প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল।

সাধারণত বিমানের এঞ্জিনের আওয়াজ একটু দূর হইতে শুনিলে মধুর বলিয়াই মনে হয়। নিকটে আসিলে আওয়াজের প্রচণ্ডতার জন্য হয়ত আওয়াজে যে মাধুর্য বা সঙ্গীত আছে তাহা বোঝা যায় না। বৈমানিকের নিকট এঞ্জিনের আওয়াজ সব সময় সঙ্গীতময়। সেখানে আছে ছন্দ, আছে মাধুর্য। শোনামাত্রই প্রাণ আনচান করিয়া উঠে। একটা গল্প আছে। গল্পটা সত্য বলিয়াই এখানে উল্লেখ করি। গত যুদ্ধের প্রথম দিকে একজন ফরাসী বৈমানিক, ফরাসী-জার্মান সীমান্তের প্রায় পঁচিশ হাজার ফিট উর্দ্ধে একাকী উড়িয়া চলিয়া দিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল চারিদিকে নজর রাখা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার স্পিট্‌ফায়ার বিমানের বার সিলিণ্ডার মার্লিন এঞ্জিনের মধুর সঙ্গীতে তিনি তন্ময় হইয়া যান। এদিকে দুশমন জার্মানদের কয়েকটি বিমান তাঁহার অনেক নিম্নে ঘোরা-ফেরা করিতেছিল। এঞ্জিনের সঙ্গীতে তিনি এমন ভাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে দুশমনদের আনাগোনা নজরে আসিলেও সঙ্গীতে বিভোরতা ভেদ করিয়া তাঁহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। এদিকে ফরাসী বিমান-ঘাঁটিগুলি হইতে তাঁহাকে অনবরত বেতারে ডাকিয়া চলিয়াছে, যাহাতে দুশমন জার্মানদের বিমানের আনাগোনায় তিনি বাধা প্রদান করেন। বেতারবার্ত্তা এঞ্জিনের সঙ্গীত ভেদ করিয়া হয়ত কখন কখন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু মার্লিন এঞ্জিনের সঙ্গীত ভেদ করিয়া তাঁহার ধ্যানাবস্থা ভঙ্গ করিতে সক্ষম হয় নাই। শেষে, ঘন্টা কয়েক পরে, পেট্রল ফুরাইয়া গেলে, তাঁহার বিমানের মার্লিন এঞ্জিন বন্ধ হইয়া গিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি বন্ধ হয়। সঙ্গীত সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার দরুন, বিমানসহ তিনি বেগে ভূমির দিকে পতিত হইতে থাকেন এবং তখন তাঁহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসে। বিমান অনেক উর্দ্ধে ছিল, সেইজন্য কোন রকমে নিরাপদের সীমান্তের মধ্যেই তিনি বিমান লইয়া অবতরণ করিতে সক্ষম হন। এরপর বিমান-বাহিনীর কানুন অনুযায়ী তাঁহাকে চার্জসীট করা হয়। বিমান-বাহিনীর কর্ত্তারা তাঁহার কৈফিয়ৎ মানিয়া লন। কর্ত্তারা স্বীকার করেন যে বিমানের এঞ্জিন সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে পারে এবং সেই সঙ্গীতে মানুষের মন বিমোহন করার শক্তি সঞ্চিত আছে। এর পর হইতে বিমানে একাকী ভ্রমণ বিমান-বাহিনীর কর্ত্তারা একেবারে বন্ধ করিয়া দেন, এবং এই প্রকার কাজের জন্য সব সময় দুইটি বিমান এক সাথে উড়িয়া যাইবে এবং এক সাথেই উড়িতে থাকবে বলিয়া হুকুম জারি করেন।

এত কথা বলার প্রয়োজন আছে। কেননা সাধারণের পক্ষে বিমানের এঞ্জিনের শব্দ সঙ্গীতময় একথা বোঝা এবং মানিয়া লওয়া খুবই শক্ত। কিন্তু এমন কি দেখা যায় না, যে, অনেকের রেল গাড়ীতে ভ্রমণের সময়, রেলের উপর রেল গাড়ীর চাকার যে দ্রুত তালে চলার ছন্দ তাহাতে আবেশ আসে? আবেশে তন্দ্রা আসে? তারপর অনেকক্ষণ চলার পর অর্দ্ধরাত্রে যখন রেলগাড়ী কোন নিস্তব্ধ ষ্টেশনে থামিয়া শব্দহীন অর্থাৎ সঙ্গীতহীন হইল, তখন যাত্রীরা সঙ্গীতে মগ্নতার জন্য যে তন্দ্রা, সে-তন্দ্রা টুটিয়া গিয়া

জাগিয়া উঠিল। আবার ট্রেন চলিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই যাত্রীরাও আবার "খটাখট" শব্দের সঙ্গীতময় মধুরতার মধ্য হইয়া তন্দ্রাবস্থায় পৌঁছিল।

পাইলট অফিসার লতিফ খানের গল্প শেষ করা যাক। কর্কশ আওয়াজ কানে আসার সময়, পাইলট অফিসার লতিফ খান আকাশে আরোহণ করার পূর্বে তাঁহার বিমানের এঞ্জিন পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। কর্কশ অর্থাৎ বেসুর আওয়াজ উপলব্ধি হওয়া মাত্র, তিনি বিমানবন্দরের কর্তাদের নিকট বিমান হ্যাঙ্গারে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিমান-বন্দরের কর্তারা অনুমতি দিলে তিনি বিমান এ-হ্যাঙ্গারে ফিরাইয়া লইয়া আসেন।

বিমান-বন্দরের কর্তাদের নিকট সংবাদ পাওয়া মাত্র এ-হ্যাঙ্গারে গিয়া পাইলট অফিসার লতিফ খানের বিমানের এঞ্জিন পরীক্ষা করা হইল। পরীক্ষার পর, হ্যাঙ্গার-সার্জেন্ট রমজান আলিকে এই বিমানটি অবিলম্বে সার্ভিসিং সেক্সনে পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম এবং বিমানের এঞ্জিন-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ-পত্র সাথে করিয়া লইয়া আসা হইল। কাগজপত্র লইয়া আসার কারণ এই প্রকার কর্কশ আওয়াজ পূর্বে অন্য কোন এঞ্জিন হইতে শুনি নাই; যদি কাগজপত্রে পূর্বেকার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় যাহাতে এই কর্কশ আওয়াজের কারণ নির্ণয় হইতে পারে। আওয়াজে বোধ হইতেছিল এঞ্জিনের অভ্যন্তর-ভাগে যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। এঞ্জিনের অভ্যন্তরে অগ্নি প্রজ্বলন হয়, কিন্তু তাহা হয় এঞ্জিনের ভিতর একটি বিশেষ অংশে। কিন্তু এ আওয়াজে মনে হইতেছিল এঞ্জিনের অভ্যন্তরভাগের সমস্ত স্থানেই অগ্নি জ্বলিতেছে।

কাগজপত্রে কোন ভুলের বা ত্রুটির ইতিহাস বা আভাস পাওয়া গেল না। এখন এঞ্জিন ভাল করিয়া পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

এই ব্যবস্থা হ্যাঙ্গার সার্জেন্ট রমজান আলির মনোমত হইল না। সেদিন তিনি এ বিমান আর উড়িবার জন্য দিলেন না এবং সার্ভিসিং সেকসনেও পরীক্ষার জন্য পাঠাইলেন না। বিমান তিনি নিজেই পরীক্ষা করিলেন এবং দুই দিন পরে পাইলট অফিসার লতিফ খানকেই এই বিমান লইয়া পুনরায় বোমা বর্ষণে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সার্ভিসিং সেকসন হইতে আমাদের প্রশ্নের জবাবে জানাইলেন যে এ-হ্যাঙ্গারেই তিনি বিমানের এঞ্জিন মেরামত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সেইজন্য সার্ভিসিং সেকসনে বিমান পাঠাইবার আর কোন প্রয়োজন নাই। আমরা মানিয়া লইলাম, কিন্তু আমার মন বিশ্বাস করিল না যে বিমানের এঞ্জিন মেরামত করা সম্ভব হইয়াছে। সেইজন্য স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীকে এই বিমানের সব কথা জানাইয়া অনুরোধ করিলাম যাহাতে বিমানটি শীঘ্রই সার্ভিসিং সেকসনে পরীক্ষার জন্য আসে।

এদিকে সেদিনও পাইলট অফিসার লতিফ খান উড়নপথের কিনারে গিয়া বিমানের এঞ্জিন পরীক্ষা করিয়া দেখার সময় এঞ্জিনের আওয়াজে ছন্দহীনতা ও কর্কশতা পাইলেন। হ্যাঙ্গার-সার্জেন্ট রমজান আলি নিকটেই অপেক্ষায় ছিলেন। বিমান লইয়া পাইলট

অফিসার লতিফ খান ফিরিবার উপক্রম করিতেই ফ্লাইট-সার্জেন্ট রমজান আলি তাঁহাকে হাতের ইশারায় দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলেন। বিমান দাঁড়াইলে পর ফ্লাইট সার্জেন্ট রমজান আলি বিমানের খোলের উপর উঠিয়া বিমানের এঞ্জিনে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং পাইলট অফিসার লতিফ খানকে বলিলেন, "তুমি মুসলমান হইয়াও আর এক জন মুসলমানকে অপদস্থ করিতে চাহিতেছ? বিমানের এঞ্জিন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও সার্ভিসিং সেকসনে পাঠাইতে চাহিতেছ? মুসলমান কি কখন ভয় করে?" ইত্যাদি প্রকার ভর্ৎসনা শুনিয়া পশ্চাতের ককপিট হইতে ওয়ারান্ট-অফিসার ঘোষ কিছু বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকেও "চুপ রহ। হাম এঞ্জিন চেক কর লিয়া। সব ঠিক হ্যায়।" বলাতে ওয়ারান্ট-অফিসার ঘোষও চুপ হইয়া যান। অগত্যা পাইলট অফিসার লতিফ খান ভ্রাতৃভাইদের সম্মান বাঁচাইবার জন্য বিমান লইয়া অবতরণ-পথের উপর উপস্থিত হইয়া পুর্ণ বেগে উড়িয়া যান। এঞ্জিনের ফাঁকা আওয়াজ কাণে আসামাত্র বিমান-বন্দরের কর্তাদের কাছে টেলিফোনে সংবাদ চাহিলাম এবং যখন জানিতে পারিলাম, পাইলট অফিসার লতিফ খান দোষ-মুক্ত হওয়ার পূর্বেই ঐ বিমানে যাত্রা করিয়াছেন, তখন বিমান-বন্দরের কর্তাদের অনুরোধ করিলাম যেন তাঁহারা অবিলম্বে পাইলট অফিসার লতিফ খানকে তৎক্ষণাৎ অবতরণ করার জন্য বেতারে হুকুম পাঠান। হুকুম পাওয়ার পূর্বেই পাইলট অফিসার লতিফ খান বিমান অবতরণ করার জন্য নিজেই অনুমতি চাহিলেন। তিনি বেতারে বলিলেন যে তাঁহার বিমানের এঞ্জিন বিশেষ অসুস্থ এঞ্জিন পুরা শক্তি দিতে সমর্থ হইতেছে না। বিমান-বন্দরের কর্তারা অবতরণের জন্য অনুমতি তৎক্ষণাৎ দিলেন ও সেই সাথে আম্বুলেন্স-গাড়ী ও অগ্নি-নির্বাপকারী গাড়ীগুলিকে অবতরণ-পথের কিনারায় নিরাপদ স্থানে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে নির্দেশ করিলেন। ইতিমধ্যে সার্ভিসিং সেকসন হইতে আমরা জনদুয়েক জীপ গাড়ীতে রওনা হইলাম।

পাইলট অফিসার লতিফ খান বিমান লইয়া ধীরে ধীরে অবতরণ-পথের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন, ক্রমেই তাঁহার বিমানের উচ্চতা কমিয়া আসিতেছে, ভূমি হইতে পঞ্চাশ ফিটের মত উচ্চতা মোটে রহিয়াছে, একেবারে অবতরণ-পথের কিনারে পৌঁছিয়াছেন, এইবার ভূমি স্পর্শ করিবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিলাতি একশত দশ নম্বর স্কোয়াড্রনের একখানি বিমান অবতরণ-পথের ঠিক উপরে আসিয়া দাঁড়াইল—বিমান-বন্দরের কর্তাদের নিকট কোন প্রকার অনুমতি ত' দূরের কথা, কোন প্রকার সংবাদ পর্যন্ত না দিয়াই। এখন কোন বিমানের অবতরণ করার মানে হইবে যে, দুই বিমানে সাংঘাতিক সংঘর্ষ, এবং ফলে শুধু প্রজ্বলিত অগ্নিতে, বিমান দুইটিরই বিনাশ নয়, সাথে সাথে দুই বিমানের চারজন বৈমানিকেরও অগ্নি-সমাধি। আমাদের পক্ষে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করা ছাড়া আর কোন উপায় রহিল না। মুহূর্তের মধ্যে সকলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কারণ দেখা গেল উড়ন্ত বিমান অবতরণ-পথের উপর নিশ্চল বিমানের উপর অবতরণ না করিয়া পুনরায় আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যে বিমানবন্দরের কর্তারা একটার পর একটা

ভেরী পিস্তলের লাল রংয়ের কার্তুজ গুলি করিতে শুরু করিয়াছে দিয়াছে। ভেরী পিস্তলে

লালরংএর গুলি নিক্ষেপের অর্থ যে, বিমান যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই থাকার আদেশ। অর্থাৎ অবতরণরত বিমান অবতরণ স্থগিত রাখিয়া পুনরায় আকাশে উড়িতে রহিবে এবং আকাশে আরোহণরত বিমান, আরোহণ স্থগিত রাখিয়া ভূমিতে অপেক্ষায় থাকিবে। লাল রংয়ের গুলি বিপদের সাংকেত। পাইলট অফিসার রতিকান্ত সেনের বিমান অবতরণ স্থগিত করায় আশ্বস্থ হওয়া গেল কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যই শুধু। অবতরণ-পথটুকুই শুধু কোন মতে আকাশে পার হইয়া বিমান এবার অবতরণ-পথের শেষে, যেখানে পাহাড় ক্রমে ক্রমে সমতলের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেখানে পতিত হইয়া প্রচণ্ড ঝাওয়াজ করিল। আমাদের জীপ, আম্বুলেন্স গাড়ী, অগ্নি-নির্বাপক গাড়ী সব একসঙ্গে পূর্ণ বেগে সেই দিকে ধাবমান হইল। আমরা যখন প্রায় শত গজের মত নিকটে পৌঁছিয়াছি, সে সময় আরও প্রচণ্ড ঝাওয়াজে ভূপতিত বিমানের এঞ্জিন ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। শত গজ দূরেও এঞ্জিনের ভগ্ন টুকরাগুলি বৃষ্টির ফোঁটার মত পড়িল। পতিত বিমানে তখনও অগ্নি প্রজ্বলন হয় নাই। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে অগ্নি প্রজ্বলন হইতে পারে। নিকটে যাওয়া সমীচীন হইবে কিনা একথা মনে আনাও বিপজ্জনক, কেননা বিমানের পেটের খোলে তখন দেড় হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা রহিয়াছে—সেই বোমাগুলি কখন ফাটা সুরু হইবে কে বলিতে পারে?

হঠাৎ দেখা গেল পতিত বিমান হইতে সামান্য দূরে দুইজন বৈমানিক ভূমিতে শায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। আর বিলম্ব না করিয়া আম্বুলেন্স এবং অগ্নি-নির্বাপক গাড়ীর আরোহীদের বাধা না শুনিয়া জীপ লইয়া সোজা ঐদিকে ছুটিলাম। নিকটে যাইতেই

কুন্তিগ্রাম ষ্টেশনের প্রধান এঞ্জিনীয়ার-অফিসার স্কোয়াড্রন-লীডার ভর্মাকে চিনিতে পারা গেল। বিমান পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেখানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন, এক লাফে ডানার উপর উঠিয়া প্রথমে পাইলট অফিসার লতিফ খানকে উদ্ধার করিয়া বিমানের বাহিনীতে আনিতে যান। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারেন যে পাইলট অফিসার লতিফ খান সকল ব্যবস্থার পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। আর বিলম্ব না করিয়া পশ্চাতের ককপিটে গিয়া দেখেন ওয়ারান্ট অফিসার ঘোষ ককপিটের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘুণিপাক খাইতেছেন, হঠাৎ পতিত হওয়ার ফলে বুদ্ধি-বিভ্রম অবস্থা হইয়াছে। স্কোয়াড্রন-লীডার ভর্মা তৎক্ষণাৎ ওয়ারান্ট অফিসার ঘোষকে ককপিট হইতে বাহির করিয়া বিমান হইতে সামান্য দূরে আসিয়াই মাটির উপর নিজে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং ওয়ারান্ট অফিসার ঘোষকে শোয়াইলেন। সেই মুহূর্তে পতিত বিমানের এঞ্জিন ফাটিয়া যায়। উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ায় এঞ্জিনের ভগ্নাংশগুলি মাথার উপর উড়িয়া গেল এবং দুইজনেই অক্ষত রহিলেন। তারপর তাহাদের দুইজনকে বিমানের নিকট হইতে সরাইতে সময় লাগিল না।

এই ঘটনার ফলে স্কোয়াড্রন-লীডার ভর্মা তাঁহার সাহসের জন্য বিমান-বাহিনীর হেড্-কোয়ার্টার হইতে অভিনন্দন পাইলেন, ফ্লাইট সার্জেন্ট রমজান আলি স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর নিকট হইতে গোপনে তিরস্কার ও শাস্তি পাইলেন। গোপনে কেননা একথা তখন প্রকাশ হইলে সমস্ত ভারতীয় স্কোয়াড্রনগুলির মনোবল নষ্ট হইয়া দুর্নাম রটিত। আর ওয়ারান্ট অফিসার ঘোষ মাস কয়েক হাসপাতালে কাটাইবার পর একদিন তাঁহার হাসিমুখ লইয়া আবার বিমানে উড়িবার জন্য স্কোয়াড্রনে আসিয়া পৌঁছাইলেন।

Statement about ownership and other particulars about Newspaper Vartika) to be published in the first issue every year after last day of February

FORM IV (*See Rule.* 8

1.	Place of Publication	Pondicherry
2.	Periodicity of its publication:	Quarterly
3.	Printer's Name:	Amiyo Ranjan Ganguli
	Nationality	Indian
	Address	Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2.
4.	Publisher's Name:	H. K. Niyogi
	Nationality	Indian
	Address	Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2
5.	Editor's Name:	Nolini Kanta Gupta
	Nationality	Indian
	Address	Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	Sri Aurobindo Ashram Trust Pondicherry-2

I, H. K. Niyogi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date: 24th April, 1966

H. K. Niyogi
Signature of Publisher

Evidently the reasoning mind finds it difficult to reach the Divine but a simple heart can enter into contact with Him almost without effort.

—The Mother

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Telegram : BIDYASEVA **Phone : 22-1532-33**

Planning a new project ?

IT PAYS TO AVAIL OF INDIAN CONSULTANCY SERVICES

What should be the best process for the plant ? Will the plant be economically viable? Does the market justify the plant capacity ? Is the site selected ideal for the plant ? Is the production cost realistic ? How and where to obtain the best possible plant and equipment ? All this and many other project problems may confront you Why not leave these to competent Indian Consulting Engineers ? Indian Consultants have no interest other than yours It is they who know the Indian conditions best

RANGE OF SERVICES

FEASIBILITY AND PROJECT REPORTS ☐ MARKET STUDY AND ECONOMIC INVESTIGATION ☐ SITE SELECTION AND SURVEY ☐ BASIC AND PROCESS ENGINEERING ☐ TENDER EVALUATION AND APPRAISAL ☐ DETAIL DESIGN ENGINEERING ☐ CONSTRUCTION SUPERVISION AND MANAGEMENT ☐ COMPLETE PLANT ERECTION ☐ START-UP AND COMMISSIONING ☐ INITIAL OPERATION ☐ TRAINING OF PERSONNEL ☐ POST-OPERATION CONSULTATION.

Indian consultancy helps the nation attain self-sufficiency in technical know-how

*

Issued in the interest of consultancy services by

THE KULJIAN CORPORATION (INDIA) PVT LTD.

24-B, Park Street, Calcutta-16

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

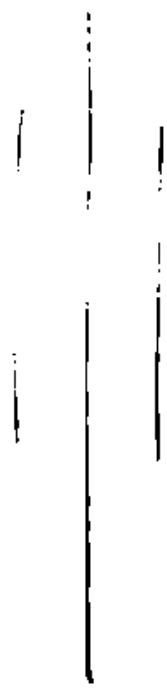

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	দাম—২·০০
প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	দাম—২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	দাম—২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণীবহ

—বাংলায় আধ্যাত্মিক মাসিকপত্র—

শৃণ্বন্তু

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

নিয়মিত লেখকদের মধ্যে আছেন : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, অমৃত, অনির্বাণ, নীরদবরণ, ঋষভচাঁদ, হিমাংশু নিয়োগী, নিখিলকান্ত গুপ্ত এবং আরও অনেকে।

বর্ণাঢ্য চিত্র ও রচনায় শোভিত হয়ে 'শৃণ্বন্তু' বাংলা মাসের প্রতি ৭ তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক সাত টাকা। বৎসরের যে-কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। দশ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।

শৃণ্বন্তু কার্যালয়

৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-১৩৫১

Reg. No. 13773/66

6 MAY 1969

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির প্রকাশনা

যোগ সাধনার ভিত্তি		শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ		অনির্বাণ	১৫·০০
স্মৃতির পাতা	(১ম পর্যায়)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪·৫০
ঐ	(২য় ,,)	ঐ	৪·০০
কবির্মনীষী	(১ম খণ্ড)	ঐ	৩·০৫
ঐ	(২য়)	ঐ	৪·৫০
রবীন্দ্রনাথ		ঐ	৩.৫০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও কর্ম		পশুপতি ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক)	৫·০০
Talks with Sri Aurobindo		by Nirodbaran	৮·০০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ		অমিলবরণ রায়	২·০০
সাধনার জীবন		সমীরকান্ত গুপ্ত	১·০০

আশ্রম প্রকাশনা

বিবিধ রচনা	শ্রীঅরবিন্দ	১·০০	উত্তর রহস্য	শ্রীমা	১·০০
ভারতের নবজন্ম		১·৫০	ছোটদের গল্প		১·৫০
কর্মযোগী		১·৫০	পুরাণো লেখা		১·৫০
জগন্নাথের রথ		১·০০	শিক্ষা		১·৫০
গীতার ভূমিকা		২.০০	মায়ের আলাপ		২·৫০
শ্রীঅরবিন্দের পত্র		১·০০	সর্বোত্তম আবিষ্কার		০·৩৭

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

ক লি কা তা—১২

ফোন—৩৪-২৩৭৬

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

১৫ই আগস্ট, ১৯৬৯

বর্ষ—২১ সংখ্যা—৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৬৪)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মাতৃবাণী		৫
সাবিত্রী	...	৭
ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে	শ্রীঅরবিন্দ	১১
অচেতনার ধারা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৫
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	২৯
মায়ের সাথে কথা	শ্রীমা	৪০
প্রসঙ্গত		৬১
চিঠিপত্রে কথা	...	৬৪
কঠিন ভালবাসা	বীরবাহু	৬৭
শ্রীঅরবিন্দ ও	শ্রীসবীরকান্ত গুপ্ত	৭৭

পত্রিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০.০০	বার্ষিক	৩০০.০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০.০০		২০০.০০
ভিতরের মলাট	১৫০.০০		৫২০.০০
বাহিরের মলাট	২০০.০০		৬০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Edited By : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2
PRINTED IN INDIA

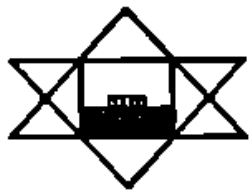

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৯

আমাদের মনকে একাগ্র করে ধরতে হবে পৃথিবীর উপর, কারণ আমাদের কাজ হ'ল এখানেই। তাছাড়া অন্য সকল জগতের সারসংগ্রহ হ'ল পৃথিবী; তাদের প্রত্যেকের অনুরূপ কিছু রয়েছে পার্থিব পরিবেশের মধ্যে—একেই স্পর্শ করতে পারলে তাদেরও স্পর্শ করা যায়।

—শ্রীঅরবিন্দ

১৩-১-৩৪

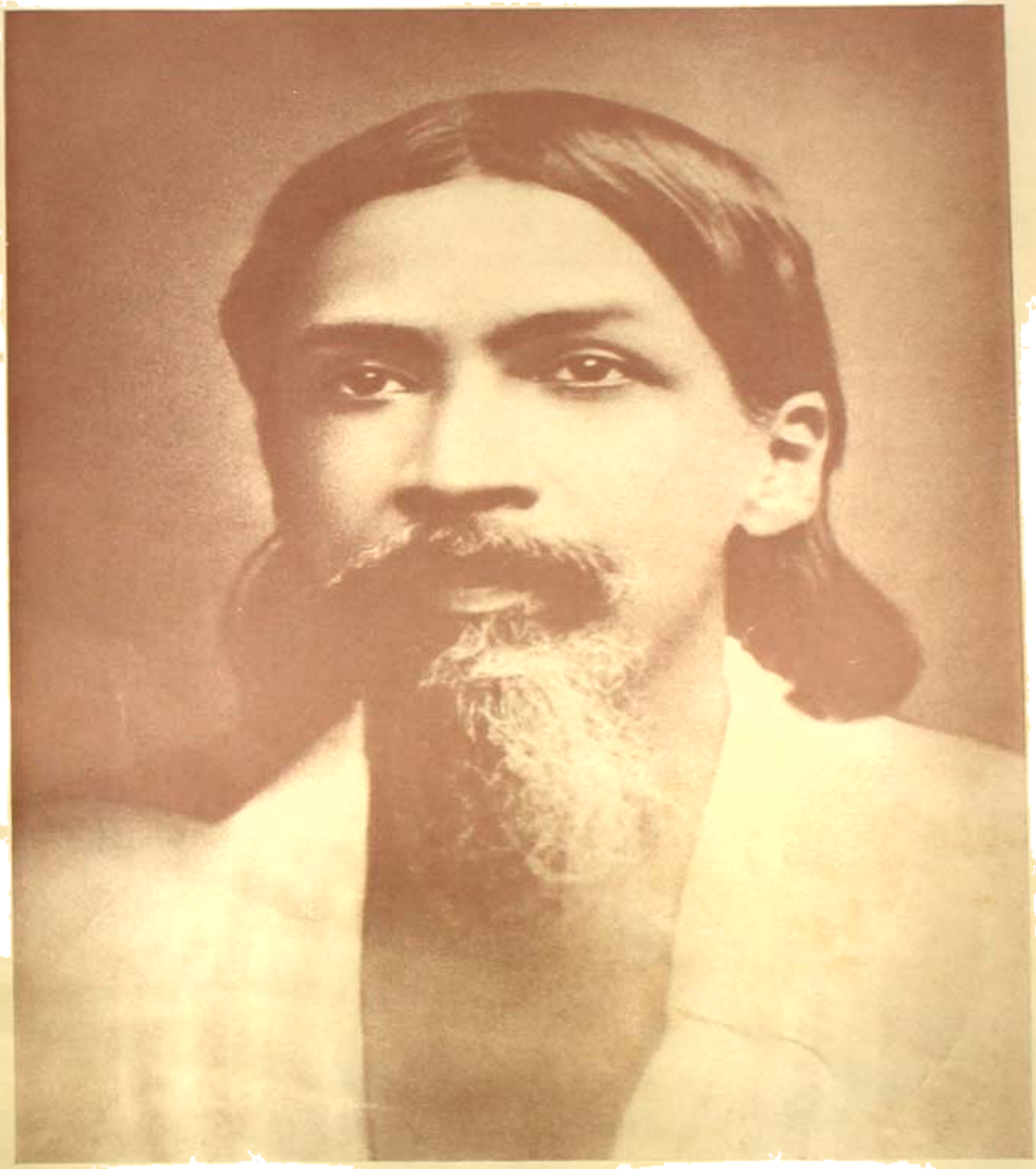

শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

প্রশ্ন : নিম্নপ্রকৃতির পরিবর্তন আমাদের নিজেদের দ্বারা সম্ভব নয়, তোমাকেই তা করতে হবে। আমরা তাহ'লে কি করতে পারি?

উত্তর : (১) এই স্থির বিশ্বাস রাখা যে তোমার পরিবর্তন হতে পারে।
(২) পরিবর্তনের সঙ্কল্প করা নিম্নপ্রকৃতির কোন অভ্যুহাত না স্বীকার করে।
(৩) সঙ্কল্পে স্থির থাকা সকল বিফলতা সত্ত্বেও।
(৪) যে সাহায্য তুমি পেয়ে থাক তার উপর অচঞ্চল নিষ্ঠা রাখা।

*

পৃথিবীতে একটিমাত্র দেশ আছে যে জানে সেই একমাত্র সত্যকে যার দিকে আর সব জিনিষকেই ফিরে দাঁড়াতে হবে, সে হল ভারতবর্ষ। অন্যান্য দেশ এ কথা ভুলে গিয়েছে কিন্তু ভারতে ভারতবাসীর অণু-পরমাণুতে তা সংগ্রথিত, একদিন তা প্রকাশ পাবে।

এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে, এরই জন্যে কাজ করতে হবে। ভারতবর্ষ হ'ল সত্যের জন্মস্থান, জগৎকে নিয়ে যাবে সত্যের দিকে। ভারতবর্ষের যখন এই উপলব্ধি হবে তখনই সে গ্রহণ করবে জগতে নিজস্ব স্থান।

*

ভাগবতী বিধানের কাছে আসুরী বিধান দাঁড়াতে পারে না। পরিণামে ভাগবতী বিধানই জয়ী হবে।

*

সত্যের সত্যকার সেবক হতে হলে নিজের ব্যক্তিগত কামনা পছন্দ সব ভুলে যেতে হবে, একমাত্র চিন্তা হবে সত্যের সেবা।

*

সত্যের সেবায় যে শক্তিলাভ হয় তার ব্যবহার জানে একমাত্র মেয়েরা।

*

তুমি পৃথিবীতে এসেছ নিজেকে কি করে জানতে হয় তা শিক্ষা করবার জন্য।

শ্রীঅরবিন্দের বই পড়বে আর নিজের ভিতরে দৃষ্টি দেবে একাগ্র হয়ে, যত গভীরে পার চলে যাবে।

*

নূতন চেতনাকে কোন রকমে বিকৃত না করে ধারণ করতে যদি চাও তাহ'লে পরাচেতনার আলোকের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে হবে কোন ছায়া না ফেলে।

*

ভুলবে না কখনও সবচেয়ে ভাল তুমি সাহায্য করতে পার তখনি যখন নিজে তুমি শান্ত ও সুখী, কোন রকম নাটকীয় অভিনয় না করে।

*

অরোভিল অর্থই হল সম্মেলন স্থান। সেখানে সম্মেলনের পরিবেশ স্থাপন করতে হলে প্রথম সোপানই হল প্রত্যেককে নিজের অন্তরে দেখতে হবে কোথায় রয়েছে সংঘর্ষের ও মনান্তরের হেতু।

হেতু সর্ব্বদা রয়েছে দু'পক্ষেই, প্রত্যেকের চেষ্টা হওয়া উচিত নিজের মধ্যে সে সব আগে পরিষ্কার করা, অপরের সংশোধন করবার চেষ্টা না করে। *

---

* অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সাবিত্রী

[সাবিত্রী এখন এক হয়ে গিয়েছে (সাযুজ্যে), ঐক্যলাভ করেছে (সারূপ্যে), সৃষ্টি-কর্ত্তা ভগবানের সঙ্গে—এক হয়ে গিয়েছে তার আপন মূল সত্তায়, ঐক্যলাভ করেছে তার বাহাকর্মে। সাবিত্রীকে এখন দেখান হল, সৃষ্টি অর্থ লীলা,—প্রেমলীলা, রাসলীলা, তার আর ভগবানের সঙ্গে, ঈশ্বর-ঈশ্বরীভাবে। দেখান হ'ল সকল বস্তুর ভিতর দিয়ে, সকল সত্তা, সকল জীবের ভিতর দিয়ে তারা যুগলে কি রকমে তাদের আনন্দ, তাদের চিন্ময়শক্তি ব্যক্ত করে ধরে আর কি রকমে পরিপূর্ণ সিদ্ধির ফলে নূতন মানুষ প্রকট ক'রে জীবন্ত ক'রে ধরবে এই পরম সত্যকে।

অতঃপরে বলা হ'ল সাবিত্রী, মানুষী সাবিত্রী কে ও কি; আর সত্যবান, মানুষী সত্যবানই বা কে ও কি? ভগবান রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করে বলছেন, সাবিত্রী হ'ল ভগবানের নিজেরই সত্তা বা আত্মা আর সত্যবান হ'ল তাঁর হৃদাত্মা, অন্তরাত্মা। সাবিত্রী হ'ল ভগবৎ করুণা পৃথিবীর উপরে মূর্ত্ত হয়ে নেমে এসেছে, পৃথিবীকে তার দিব্য-সার্থকতার দিকে নিয়ে চলবার জন্যে। সত্যবান হ'ল পার্থিব সত্তায় ভগবানের প্রতিরূপ, পার্থিব অজ্ঞানের মধ্যে গুপ্ত অবগুণ্ঠিত, সেখান থেকে ঊর্দ্ধে ক্রমে নিয়ে চলেছে, ঊর্দ্ধের সত্তা সব ক্রমে অভিব্যক্ত ক'রে। দুজনে মিলে, সত্তার এবং চেতনার এই উভয় ধারার সম্মিলনে—এক নিম্নতন চেতনার ক্রম-ঊর্দ্ধায়ন আর ঊর্দ্ধতন চেতনার ক্রম-অবতরণ, এই যুগলের সম্মেলনে পার্থিব লীলা সংসাধিত হয় এবং পূর্ণ লক্ষ্যের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে।]

১২

আমার জ্ঞানের, আমার অজ্ঞানের জগতে,
ভগবান যেখানে অদৃশ্য, শোনা যায় শুধু একটা নাম,
জ্ঞান সেখানে আবদ্ধ মানস গীমানার ফাঁদে,
জীবনকে টেনে দেওয়া হয় বাসনার বেড়াজালে,
জড়সত্তা অন্তঃপুরুষকে লুকিয়ে রাখে আপনার দৃষ্টি থেকে;
সেখানে তুমি হলে আমার সক্রিয় শক্তি
পৃথিবীর ভাগ্য তুলে ধরবার জন্যে,
তুমি হলে আমারই আপন সত্তা উঠে চলেছে যে
বিশাল অবতরণ-পথ বেয়ে,
দুই দিকে দুই প্রান্তের মাঝ দিয়ে—আমার রাত্রি আর দিন।
আর সে হ'ল আমার অন্তরাত্মা হৃদাত্মা,
নির্জ্ঞানের রাত্রি হতে উঠে,

প্রাণ আর মন আর পরাপ্রকৃতির
বিশাল প্রসার অতিক্রম করে,
কালাতীতের পরমজ্যোতি লক্ষ্য করে,
কালাবর্তের অন্তরে নিগূঢ় আত্মার শাশ্বতের অভিমুখে চলেছে,
আকাশের বক্রতায় বিদ্বিত আত্মার অসীমার দিকে।
উঠে চলে সে পিছনে ফেলে আসা মহিমার দিকে,
সেই সৌন্দর্য্যের, সেই আনন্দের দিকে
যেখান থেকে সে অধঃপতিত হয়েছে,
সেই সামীপ্যের, সেই মাধুর্য্যের দিকে
যা লভা যাবতীয় স্বর্গীয় বস্তুর মধ্যে,
সেই সীমানাহীন জ্যোতির দিকে, সীমাহীন জীবনের দিকে
অনির্বচনীয় আনন্দের গভীরতম সে আস্বাদ,
অমরের অনন্তের স্পর্শ।

সে হ'ল আমার অন্তরাত্মা, পঞ্জর ভিতর থেকে
হাতড়িয়ে বের হয়েছে,
মানুষের জ্যোতির্ময় চিন্তারাজির শিখরে উত্তীর্ণ হতে,
পরম সত্যের সমুচ্চ সান্নিধ্যে।
সে হ'ল যাবতীয় মানুষী জীবনে, পার্থিব সত্তার রূপায়িত দেহে,
ক্রমবর্দ্ধমান দেবত্ব,
ভগবানের কাছে উঠে চলেছে যে মানুষের অন্তরাত্মা,
পৃথিবীর অজ্ঞান ভেদ করে প্রকৃতির প্রবেশ আশ্রয় করে।
সাবিত্রী, তুমি হ'লে আমার চিন্ময় সত্তার শক্তি,
আমার অমর বাক্য স্ফুট স্ফূর্ত্ত তোমার কণ্ঠে,
কালের পথে পথে সত্যের মুখমণ্ডল তুমি,
মানবজীবকে ভগবানের দিকে চলবার
দিক নির্ণয় করে দেয়।
অন্তরিত আত্মার শিখর হতে স্তিমিত আলো
এসে পড়ে যখন জড়ের ঘোর অচেতন শক্তির পরে,
গাঢ় বনবীথির পরে নিষ্প্রভ জ্যোৎস্নার মত,
মন চলে যখন অর্দ্ধআলোকে অর্দ্ধসত্যের মাঝে,
মানুষী হৃদয় যখন জানে শুধুই মানুষী প্রেম,
জীবন অর্থ যখন বিস্রান্ত অপূর্ণ শক্তি এক ;
আর দেহ গুণে চলে তার অনিশ্চিত দিনগুলি,

তখন তুমি জন্মগ্রহণ করবে মানুষের অনিশ্চিত
সন্দেহাকুল নিমেষের ধারায়,
এমন রূপ সব ধারণ করে যা অন্তঃপুরুষের দেবত্বকে ঢেকে রেখে,
পৃথিবীর সংশয়ী বাতাসের আবরণ ভেদ ক'রে দেখাবে তুমি
আমার মহিমা-প্রভা, সূর্য্য যেন মেঘমালা ভেদ করে চলে,
অথবা জ্বলে যেন ক্ষণদৃষ্ট অন্তর-অগ্নি ;
আমার অনাবৃত-প্রভাবে সে ভরে দেবে মানুষের জীবন।
তবে তারা দৃষ্টি দেবে ঊর্দ্ধে যেন ভগবানের তুঙ্গ স্থিতির দিকে,
ভগবানকে অনুভব করবে যেন বাতাস ঘিরে আছে চারিদিকে,
ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকবে যেন অচল প্রতিষ্ঠার উপরে।
জ্বলবে তবে সেখানে মনের উপরে চন্দ্রকলার মত
চিন্ময়ের জ্যোতির্লেখা, নিষ্প্রভ আকাশের কোলে,
মানুষের জীবনকে আলোকিত করবে
তার ভগবৎ-মুখী পথযাত্রায়।
কিন্তু আরো কি লুকিয়ে রয়েছে ভগবানের পারাম্ভরে,
একদিন খুলে ধরবে তার আবৃত মুখমণ্ডল।
এখন মনই সব, মন আর তার অনিশ্চিত কিরণ
মনই হ'ল দেহের প্রাণের নেতা,
মনই অন্তরাত্মার চিন্তাচালিত রথ,
রাত্রির ভিতর দিয়ে জ্যোতির্ম্ময় পথিককে বয়ে নিয়ে চলেছে,
সুদূর অনিশ্চিত এক উষার দৃষ্টিপথরাজি অভিমুখে,
চিন্ময় আত্মার অতল বাসনার শেষ অবধি,
অদ্বিতীয় সত্তা পরম আনন্দের স্বপ্ন অভিমুখে।
রয়েছে মহত্তর নিয়তির ধাত্রী, মনের ধারণার অতীত।
ঊর্দ্ধগামী পথের চূড়ায় স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়ে
পথিক পদযাত্রায় চলেছে এখন অজ্ঞানের ভিতর দিয়ে
জানে না পরবর্ত্তী পদক্ষেপ, জানে না লক্ষ্য তার ;
তার অশ্রান্ত আরোহণ কেবল মন অবধি নয়,
রয়েছে এক জ্বলে জগৎ সকলের শিখরে,
গৃহ রয়েছে শাশ্বত জ্যোতির আবাস,
অনন্ত সত্তা আছে এক, আছে অদ্বিতীয়া শক্তি :
আপন পরাক্রমে আত্মা দূরে ফেলে দেবে তার মুখাবরণ,
তারই মহত্ত্ব জগতের ক্রমগতি রূপায়িত করে চলেছে,
অনুভব করবে সকলে।

দেখা যাবে তাকে তার আপন অনাবৃত রশ্মিমালায়,
তারকার উদয় যেন অজ্ঞানের রাত্রি হতে,
সূর্য যেন উঠে চলে পরাপ্রকৃতির শিখরে,
সংশয়গ্রস্ত মধ্যপথ পরিহার করে
দেখবে কেউ কেউ ক্ষণিক দৃষ্টিতে অদ্ভুত উৎস সে,
অনুভব করবে কেউ তোমার মধ্যে সেই নিভৃত মহাশক্তিকে
ফিরে চলবে তারা অনাদ্যা পদচিহ্ন লক্ষ্য করে,
মহত্তর দিবসের অভিযানব্রতী তারা।
মনের সীমাকর প্রসার সব ভেদ করে উঠে যাবে তারা,
আবিষ্কার করবে সৃষ্টির বিপুল গঠন আলেখ্য,
প্রবেশ করবে গিয়ে সত্যের, ঋতের, বৃহতের মধ্যে।
তুমি তাদের কাছে ব্যক্ত করে ধরবে গুপ্ত চিরন্তনী সব,
যত অসীমতার প্রাণবায়ু এখনও প্রকট হয়নি,
জগৎ সৃষ্টিকারী এক আনন্দ রভস,
ভাগবত সর্বশক্তিময় প্রবেগ এক,
আর সর্বজ্ঞানময় রহস্য প্রভা এক।
কিন্তু ভগবানের কাল পূর্ণ হয়ে আসবে যখন
তখন জননী পরাশক্তি জন্মগ্রহণ করবেন কালের মধ্যে,
মানুষী মায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন ভগবান
যত রূপে রূপে তোমরা তৈরী করে তুলেছ
তোমাদের মানুষী জন্মসব দিয়ে।
তখনই মানুষকে দেওয়া হবে পরমোত্তম সত্যকে।

অচেতনার ধারা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

চেতনার ক্রম আছে আমরা সকলেই জানি। ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর স্তরে উঠে যায় সে, লাভ করে বৃহৎ হতে বৃহত্তর শক্তি। একেবারে সাধারণ স্তরে চেতনা হল ইন্দ্রিয়ের অধীনে, আবদ্ধ তাদের সীমার মধ্যে; তার পরে কিছু মুক্তি পেলে হয় সে বুদ্ধিগত চেতনা; তারও উপরে দৃষ্টিগত বা সাক্ষাৎ চেতনা, সকলের উপরে হবে শুদ্ধ চেতনা, সচ্চিদানন্দের চেতনা।

তবে চেতনা শুধু উপরেই উঠে চলে না, নীচের দিকেও নেবে যায়, অর্থাৎ তখন আর সে চেতনা থাকে না, হয়ে পড়ে অচেতনা। ঠিক চেতনার মতনই অচেতনারও আবার রয়েছে ক্রমাবলী, যতই সে নেবে যায় ততই সে গভীর হতে গভীরতর অচৈতন্যে নিমগ্ন হয়। অচেতনার প্রথম ধাপ অর্থাৎ চেতনা যখন সবেমাত্র অচেতন হয়েছে তখন তার নাম দিতে পারা যায় বিস্মৃতি। অর্থাৎ কেবল বিমনা বা অমনোযোগী হওয়া। চেতনার অভাব যখন হয় তখন এই হল তার প্রথম রূপ—এখানে চেতনার অভাব অর্থ চেতনার বিনাশ নয়, চেতনা রয়েছে তবে কিছু সরে দাঁড়িয়েছে, একটা পর্দ্দার পিছনে যেন, সহজেই একে ফিরিয়ে আনা যায়। এই বিস্মরণের পরের ধাপ, অচেতনা যখন আরও গাঢ়তর হয়েছে, তখন তার নাম দেওয়া যেতে পারে অজ্ঞান। অজ্ঞানের দুই রূপ—এক হল জ্ঞানের অভাব, বোধ বা চেতনা যেখানে নেই আর অজ্ঞান হতে পারে ভুল জ্ঞান, ভ্রান্ত জ্ঞান। ভ্রান্তজ্ঞানে আসল বোধ চলে গিয়েছে, তার পরিবর্ত্তে এসেছে ভুলবোধ, ভুলবোধটাই চেতনার আবরণ। যখন কোন বোধ নেই, যেমন সাধারণ ভাষায় যখন আমরা বলি অজ্ঞান হয়ে পড়া, অচৈতন্য হয়ে পড়া, তখন চেতনা অপসৃত হয়ে গিয়েছে সরে তলিয়ে গিয়েছে। সাধারণভাবে এই হল অচেতনার স্বকীয় রূপ। জ্ঞান অর্থ বিশেষ রূপকে জানা, আর বিশেষ রূপ বা বিষয়বস্তু যখন জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসে না তখনই আসে অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের পর্য্যায়কেই সচরাচর বলে থাকি অচেতনা, যেখানে বিশেষ বোধ নেই এবং যেখানে বোধ পর্য্যন্ত নেই তা হল গাঢ়তর অচেতনা। যা হোক, এ পর্য্যন্ত মানস চেতনার কথাই বলা হয়েছে, বিস্মরণ বা অজ্ঞান এবং অচেতনাও হ'ল মানস চেতনার অভাব, অভাবের ক্রম-বৃদ্ধির ফলে। এ সব ক্ষেত্রেই চেতনা একেবারে লোপ পায়নি, ক্রমে ক্রমে পিছনে সরে গিয়েছে তবু রয়েছে অন্তরালে কোথাও। এর পরের স্তরে যখন নেবে যাই তখন মানস-চেতনার বাইরে যেন চলে আসি, সেখানেও অচেতনা বাহ্য চেতনায় প্রকাশ নেই, তবে অন্তরালে কর্ম্মপর; এ হ'ল অচেতনার আর এক রূপভেদ, তাকে বলা যায় অবচেতনা। অবচেতনা চেতনার একটা অবস্থামাত্র নয়—এ একটা জগৎই। চেতনা এখানে বাহ্যতঃ

সম্পূর্ণ স্তব্ধ তবু আপনা-আপনি সক্রিয়, এ হল যেন স্বপ্নের জগৎ। চেতনা এখানে সুপ্ত হয়ে পড়েনি, লোপও পায়নি, রয়েছে গুপ্ত—সুপ্ত চেতনা হ'ল পরের স্তরে, যাকে নাম দেওয়া হয় নিশ্চেতন (Inconscient)। স্থূল জগতে তিনটি পদার্থ-পর্য্যায়ের কথা আমরা জানি, তারা চেতনারই পর্য্যায়ে—ভাবে হোক, অভাবে হোক। প্রাণীজগৎ—চেতনা যেখানে জাগ্রত, উদ্ভিদ জগৎ—চেতনা যেখানে অন্তঃজ্ঞ, আর স্থূল জড়জগৎ—চেতনা যেখানে সুপ্ত, গুপ্ত লুপ্তপ্রায়। প্রাণীকে যদি অজ্ঞানের বা অচেতনার জগৎ বলি—কারণ সত্যকার চেতনা সেখানে নেই,—তবে উদ্ভিদকে বলব অবচেতনার জগৎ আর জড় হবে নিশ্চেতনার জগৎ। প্রাণী পর্য্যন্ত আমরা মানস-সীমানার মধ্যে রয়েছি, তার বাইরে আর মনোময় চেতনা নেই, সেখানে ভিন্ন প্রকৃতির চেতনা—যে চেতনা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা রয়েছে, তা নিরীক্ষণের বাহিরে, তা গণনার বাহিরে।

চেতনার পরম সৃষ্টি বা একান্ত লুপ্তিও হয়েছে কি কোথাও? চেতনার শুধু চেতনার অভাব নয় অনুপস্থিতিও নয়, একান্ত নাস্তি হয় কি? এইরকম নেতি-চেতনাকে শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন Nescience—নির্জ্ঞান। এই হল তবে সেই শূন্য যেখানে সব শেষ, সেখানে সম্ভবের বা সম্ভাবনার কোন প্রশ্নই নেই, তা হ'ল অন্তিম ইতি—বৌদ্ধদের শূন্য, বেদান্তীদের অসৎ এই জিনিষটিকে লক্ষ্য করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন তবুও ওঠে, শেষই কি সব শেষ? অন্তই কি অন্তিম কথা? কারণ আমরা জানি শূন্য সংখ্যার শেষ নয়, শূন্যের আগে অর্থাৎ নীচে রয়েছে বিয়োগচিহ্ন, গণিতে এই বিয়োগ শুধু যে অভাব তা নয়, এরও আছে একটি সত্তা, বিয়োগী সত্তার সত্তা যোগসত্তার মতই সত্য। চেতনায় এই বিয়োগী সত্তার যে সত্য দেখা দেয় তা মূর্ত্ত জীবন্ত, তারই নাম—অপনাম—শমন বা মৃত্যু। মৃত্যু যে কেবল জিনিষের শেষ তা নয়, জিনিষকে নিয়ে যায় নির্জ্ঞানের শেষ অন্তরালে; মৃত্যুর রাজ্য অর্থাৎ এই বিয়োগী চেতনার প্রসার নিশ্চেতনার বা নির্জ্ঞানের অতলে চলে গিয়েছে, ক্রমে ক্রমে এক অপরিসীন অন্ধকারের রাজ্যে, যেখানে অন্ধকার আরও ঘনতর অন্ধকারে ক্রমে আবৃত হয়ে চলেছে—উপনিষদ যাকে বলেছে অন্ধং তমঃ, বৈদিক ঋষি যাকে এঁকেছেন এই চিত্রে—তমো নদীৎ তমসা গূঢ়ম্—জীবনের বা চেতনার মহীরুহ যেমন মাটির উপর থেকে উর্দ্ধে উঠে চলে যায়, তেমনি আবার নীচেও চলে যায় সমানভাবে, প্রসারিত করে ধরে গভীরতাবে অন্ধকারে, অন্ধকারের বা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তার শিকড়ের শাখাপ্রশাখা।

কিন্তু আরও গভীরতর রহস্য, এই মৃত্যু অর্থাৎ বিয়োগ শক্তি যদি কেবল মায়া নয়, সত্যই হয় তবে সে চলতে চলতে ক্রমে নিয়ে চলে বিপরীত দিক দিয়ে ঘুরে আদি পূর্ণ সত্যের ও শক্তিরই সান্নীপ্যে। নির্জ্ঞান ক্রমে ডুবে চলে যায় সৃষ্টির গহ্বর ভেদ করে অপর দিকে, সেখানে মিলে যায় তার পুরাতন পূর্ণতার আলোয়। মৃত্যু কেবল মৃত্যু নয়, অমৃতত্বের ছায়া, বিপরীত দিক। নির্জ্ঞান তার পূর্ণ পরিক্রমা যখন শেষ করে, তখন সে পৌঁছয় গিয়ে ভগবানের স্পর্শের মধ্যে, যেন পিছন দিক হতে। অমরত্ব যখন ঘুরে দাঁড়ায়, মুখ ফিরায় তখনই সে হয় মৃত্যু, মৃত্যু যখন আবার ঘুরে দাঁড়ায়,

যখন দেখায় তার দক্ষিণ মুখ, অন্যরূপ। যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন পাহি নিত্য। আলো ও অন্ধকারের অভিন্নতা হল পরম সে গুপ্তরহস্য। আলো ও অন্ধকারের তত্ত্ব একই প্রকারের, শুধু তারা বিভিন্ন-মুখী, প্রয়োজন কেবল তাদের একমুখ করে ধরা।

আধুনিক বিজ্ঞান নূতন অভিনব একটা বস্তু আবিষ্কার করেছে। এতদিন জড় জড়কণাই ছিল সর্বেসর্বা, এখন জড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী বিপরীত-জড় বলে একটা বস্তুর সন্ধান পেয়েছে, তা বস্তু বা পদার্থ জড়েরই মত। জড়ের বিপরীত অর্থ আত্মা নয়, এ জড়েরই উল্টো দিক। বিপরীত ধর্ম্মের জড় সহজ স্বাভাবিক জড়ের মধ্যে ওতপ্রোত বিশ্রিত। জড় সাধারণতঃ যে ধ্বংসমুখী, কারণ তার মধ্যে বিশ্রিত রয়েছে এই বিপরীত গুণের উপাদান। জীবনের সঙ্গে মৃত্যু রয়েছে আলিঙ্গনবদ্ধ। সৃষ্টি চলেছে সৃষ্টি ও ধ্বংসক্রিয়ার সংযোগফলে। তবে আরও কথা আছে ধ্বংস ও সৃষ্টি যে কেবল একটি চিরন্তন পুনঃপৌনিক ব্যাপার তা নয়, ধ্বংস ও সৃষ্টির ভিতর দিয়ে একটা বৃহত্তর সৃষ্টি গড়ে উঠছে।

তবে দেখছি আমরা, চেতনার এই যে অবতরণ চলেছে, ক্রমে অবলুপ্তি ঘটেছে পৌঁছেছে গিয়ে শেষে শূন্যের মধ্যে, মহাশূন্যের অন্ধকারে— মৃত্যুর কবলে, তার পরেও সে ঘুরে আবার চলেছে, উঠেছে যেন তার আদি পুরাতন সত্তার কাছে, শূন্যের পরে গিয়ে সে পেয়েছে যেন নূতন সত্তা, নূতন সত্তা যদিও প্রথমতঃ বিপরীত সত্তা ও সত্তা। এই ক্রম-ঘনীভূত অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চেতনার পরিক্রমা চেতনার মধ্যে এনে দিয়েছে নূতন অভিজ্ঞতা, অভিনব সংবেদন, ঘুরে পৌঁছেছে গিয়ে যখন ফিরে আবার তার ঊর্দ্ধতন জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপে, তার মধ্যে এনে দিয়েছে এক নব অবদান—পার্থিব রসের স্বর্গীয় আস্বাদ। যেখানে ছিল অবিভক্ত অবিভাজ্য এক অদ্বৈত সেখানে দেখা দিয়েছে দ্বৈতের সম্মেলন ও ঐক্য, ব্রহ্মস্থিতিকে ঘিরে রেখেছে ঈশ্বর-ঈশ্বরীর লীলা।

এই প্রসঙ্গে উপনিষদের একটি গল্প অর্থাৎ রূপক-কাহিনী বিবৃত করি এখানে। উপনিষদ বলছেন—আদিতে এখানে কিছুই ছিল না। এ সবই মৃত্যু দিয়ে ঢাকা ছিল, নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ, মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ, তার মধ্যে ভাবনা জাগল আত্মবান হব আমি— আত্মন্বী স্যামিতি। এই আত্মাই তবে সর্ব্বপ্রথম সত্তা, এই আত্মাকেই বলা যায় পুরুষ। এই আত্মা তবে ভেবে দেখে স্থির করলে আমিই সেই—সোঽহম্ অস্মি।

এর পরে কিন্তু ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এই যে আত্মা-পুরুষ তাকে ধরল ভয়ে। কিন্তু তবুও সে ভাবতে শুরু করলে—কেন ভয় করছি? কিসের ভয় আমার? আমি ত' একাই রয়েছি। ভয়ের কথা যখন দুজনে থাকে। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় ত কেউ নেই। এই বিবেচনার ফলে আত্মা-পুরুষের ভয় দূরে সরে গেল, সে হল নির্ভয়।

এর পরের ধাপে কিন্তু উপস্থিত আর এক বিপদ, নির্ভয় হ'ল বটে কিন্তু এল

নিরানন্দ। একা কি আনন্দভোগ করা যায়?—একাকী ন রমতে। সুতরাং সে কামনা করলে দ্বিতীয় একজন। এইভাবে এক হতে দ্বিতীয় আর এক বের হয়ে এলো, এক হল দ্বিধা-বিভক্ত, প্রথমে যুক্তভাবে পরে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম অর্দ্ধ যদি হয় পুরুষ তবে দ্বিতীয় অর্দ্ধ দেখা দিল প্রকৃতি বা স্ত্রীরূপে। প্রকৃতি পুরুষ থেকে বিভক্ত হয়ে এত দূরে সরে গেল যে তখন তার মনে উদয় হল, "পুরুষের সঙ্গে আর আমি সম্মিলিত হতে পারি না" তাই সে আপনাকে অবগুণ্ঠনে আবৃত করল অর্থাৎ চিন্ময়ী হয়ে পড়ল অচিৎ জড়সৃষ্টি। এইভাবে বাহ্যজগৎ যে সৃষ্টি হল চৈতন্য তাতে হারিয়ে গেল, দেখা দিল নিশ্চেতন অনুব্রহ্ম। এই অচেতন জড় কি রকমে ফিরে পেল তার আদি সত্তা, আদি জ্যোতির্ম্ময় সত্তা—পাষাণী অহল্যা কি রকমে ভগবানের পাদস্পর্শে নবজীবন ও নবযৌবন লাভ করলে তা আর এক ইতিহাস—তোমরা সে ইতিহাস জান কিছু কিছু।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জনৈক যুক্তিবাদী সমালোচক

শ্রীঅরবিন্দ

(৪)

ভারতীয় ধর্মের জীবন-মূল্য সঠিক বিচারের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের জীবন-মূল্যের সঠিক বিচার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; এই সংস্কৃতির মধ্যে ধর্ম ও দর্শন এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা যে একের থেকে অন্যকে পৃথক করা যায় না। বেশির ভাগ য়ুরোপীয় দর্শনের ভাব-বয়ন বা বাক-বয়নের অতিসূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার মতো ভারতীয় দর্শন তো আদৌ শূন্যে কাল্পনিক ন্যায়ের নিছক যুক্তির কসরত নয়, ভারতীয় ধর্মের যা অন্তরাত্মা, ভাবনা, সক্রিয় সত্তা, অনুভব ও শক্তির কেন্দ্র তারই সুশৃঙ্খল বুদ্ধিজাত তত্ত্বসূত্র কিম্বা বোধিগত নিয়ামক জ্ঞান। ভারতীয় ধর্ম কর্মে ও অভিজ্ঞতায় এনে ধরা ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন। বিশাল সমৃদ্ধ বহুধা অশেষ নমনীয় অথচ বিশেষ সুগঠিত এই যে কাঠামোকে আমরা বলি 'হিন্দুধর্ম' তার ধর্মীয় চিন্তায় ও আচারে যা-কিছু জানত এই বর্ণনার মধ্যে পড়েনি,—প্রয়োগে তা যা-ই হোক না কেন—তা হয় সামাজিক কাঠামো, কিম্বা আনুষ্ঠানিক ঠেকার সম্প্রসারণ, নয়ত পুরানো খুঁটি ও সংযোজনার ধ্বংসাবশেষ। অথবা এ একটা দুর্নীতির অলঙ্কীর্তি ও কুফল, লোকমানসে এর সত্য ও তাৎপর্যের অবনতি, সব ধর্মীয় ভাবনা ও আচারকে ছেয়ে ফেলে যে একটা অপকৃষ্ট নিষ্প্রাণ তারই অংশ। অথবা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, এ যেন শিলীভূত হবার কালে অঙ্কিত মৃত অভ্যাস কিম্বা এই বিরাট দেহে বাহির থেকে সংগ্রহ করে আনা কোনো-রকমে উদরস্থ বস্তুভার। সকল ধর্মের সেবা সহিষ্ণু ও গ্রহিষ্ণু এই হিন্দুধর্মের মূল সূত্র খ্রীষ্টীয় বা ইসলামের মতো আত্মসর্বস্ব নয়, ততদূর যতদূর হওয়া যায় নিজের প্রকৃতি ও সত্তার ধর্মটি না হারিয়ে সহনশীল, গ্রহিষ্ণু, আত্মকরণী। চিরকাল সে চারদিক থেকে নিয়েছে, আত্মা ছিল আধ্যাত্মিক হৃদয়ে অনুভব যে স্বীকরণ-শক্তি তার ওপর, সেই শিখাময় কেন্দ্রে যে শুভ্র তাপ সব তুচ্ছতম বস্তুকে পর্যন্ত রূপায়িত করে আত্মার নানা রূপে তার ওপর।

ভারতীয় ধর্ম দর্শনের ঠিক কোন জিনিসটি আমাদের বিরোধী পাশ্চাত্য সমালোচকটিকে এমন দারুণ বিরূপ করে তুলেছে তা দেখার আগে বিবেচনা করা যাক এই প্রাচীন, তারিখের সীমামুক্ত এবং এখনো সবলে জীবন্ত, বর্ধিষ্ণু, সর্বগ্রাহী হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কী তার বলার আছে। কারণ বলার আছে তার অনেক কিছু

এবং সেখানে বাধা-বাঁধনের বালাই নেই। সেখানে নেই গালিগালাজের বদবেজাজী মাতলামি এবং জাল সাক্ষী, বিদ্বেষ, কার্পণ্য ও অবনতিকর অনাত্মিক ও নোংরা সব জিনিস—আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্কে এক ধরণের 'খ্রীষ্টানী সাহিত্যের' যা পরিচয়—দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্যার জন উড্রফ যে মিঃ হ্যাভেল্ড বেগবীর পৃষ্ঠা থেকে দুর্গন্ধ মদিরার চমৎকার নমুনা দিয়েছেন—'সবল' বোধহয়, যদি বলাৎকারের নাম বল বলা চলে, কিন্তু কিছুতেই সুন্দর নয়। তবু সবটাই অকুণ্ঠ নিন্দা, একটু ভিত্তি যেখানে আছে সেখানে অতিশয়োক্তি, এবং স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির খেয়ালী খুশিতে নিরুত্তাপ অযৌক্তিক। অপিচ এই ময়লা রাশির থেকেই যা মুখ্য ও বিশেষ বিতরাগের তা আলাদা করে তোলা যায়—এ সব অসমালোচক মনের এবং অনেক সমালোচক মনের সামনে ধরা হয়েছে, শুধু এগুলি আবিষ্কার করাই শুভঙ্কর।

আক্রমণের মূলকথাই হল হিন্দুধর্মের সর্বৈব অযৌক্তিকতা। মিঃ আর্চার ক্বচিৎ-কখনো মানবেন ভারতীয় ধর্মে একটা দার্শনিক এবং সম্ভবত সেইজন্য একটা যৌক্তিক কিছু, কিন্তু এই ধর্ম দর্শন যেমন তিনি বোঝেন বা মনে করেন বোঝেন তার নিয়ামক ভাবগুলি মিথ্যা ও নিশ্চিত ক্ষতিকর বলে নিন্দা ও নস্যাৎ করেন। ভারতীয় ধর্মের ব্যাপক অযৌক্তিক প্রকৃতির ব্যাখ্যায় তাঁর অভিযোগ হল ভারতীয়রা চিরকাল অন্তঃসারের চেয়ে আকৃতির দিকে বেশি ছুটেছে, অর্থের চেয়ে অক্ষরের দিকে। একথা বোধহয় ধরে নেওয়া চলে যে শুধু ধর্মে কেন, সমাজে রাজনীতিতে চারুকলায় সাহিত্যে এবং বিজ্ঞানে পর্যন্ত এই দিকে ঝোঁক মানবমনেরই একটা ব্যাপক বৈশিষ্ট্য। চীন থেকে পেরুতে সব রকম সম্ভাব্য মানবকর্মে আকৃতিপূজা এবং আত্মবিস্মৃতির রীতি, চিরাচরিত বহিরাঙ্গিক এবং চিন্তালেশহীন নীতির দিকে ঝোঁক একটা পরিচিত ধারা, য়ুরোপকেও তা এড়িয়ে যায়নি। আর য়ুরোপ যেখানে মানুষ যতরকম সম্ভাব্য মানুষী নৃশংসতা এবং নিষ্ঠুরতার লক্ষণ একটানা লড়াই চালিয়েছে, খুন করেছে, পুড়িয়েছে, নির্যাতন করেছে, জেলে পুরেছে, অত্যাচার করেছে শুধু গীর্জা-শাসনের কতকগুলি বিশ্বাস বাক্য, আচার ও অনুষ্ঠানের জন্য, য়ুরোপ যেখানে এসব জিনিস আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের আসন নিয়েছে, তার এমন চাপরাশ নেই যে প্রাচ্যের মুখের ওপর এ-তিরস্কার ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু বলতে শুনলাম এই মাধ্যাকর্ষণ অন্য কোনো মতের চেয়ে হিন্দুধর্মকেই নাকি বেশি পীড়িত করে। উন্নততর হিন্দুধর্ম বা গুটিকয়েক শোধনকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাড়া কোথাও প্রায় নেই বললেই চলে, আর চলিত হিন্দুধর্ম জানপদ ধর্ম হল কল্পনাবিনাশী ও অবশকারী একটা বীভৎস পল্লীগাথার রীতিপদ্ধতি,—অবশ্য এখানেও কথাটা মনে হয় যে ভারতীয় মনের নিরুদ্ধে সৃজননীল কল্পনার পঙ্গুতা আনার পরিবর্তে মাত্রাতিশয্যের অভিযোগই বেশি যুক্তিযুক্ত কি না। জীবনব্যাপ্তি ও ইন্দ্রজালই সর্বজয়ী লক্ষণ। ভারত-বর্ষীয়রা যুক্তিকে ধোঁয়াটে এবং ধর্মকে আচারবদ্ধ, স্থূলাবৃত এবং অবনত করার এক প্রতিভা দেখিয়েছে। ভারতবর্ষ যদি পেয়ে থাকে তার মহামনীষীদের, তবে তাদের মনীষা থেকে সে একটা যুক্তিসার উন্নয়নকারী ধর্ম ছকে তুলতে পারেনি : স্পেনীয় বা রুশ কৃষকের ভক্তি

অপেক্ষাকৃত ঢের বেশি যুক্তিবদ্ধ এবং আলোকিত। অযৌক্তিকতা এবং যুক্তি-বিরুদ্ধতা —কষ্টকল্পিত এবং দারুণ অভিযোগের এই-ই পরিত্রাহি চিৎকার; নিঃ আর্চারের গানের মূল সুর।

আমাদের সমালোচকটি যাতে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছেন তা হল ভারতবর্ষে পুরাতন ধর্মপ্রবৃত্তির আজো অমর অস্তিত্ব এবং আধুনিকতা ও তার মারাত্মক কার্যকরী অবাধ চিন্তার প্লাবন কাটিয়েও টিঁকে থাকা। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষ তাকেই ধরে আছে যাকে শুধু পশ্চিম জগৎই নয় চীন জাপান পর্যন্ত কবে ত্যাগ করেছে। ধর্ম আধুনিক মানুষের স্বাধীন আলোকদীপ্ত জড়াশ্রিত মনের কাছে ভক্তিনিবেদনে ভরা কুসংস্কার মাত্র। নিত্যাকার তার এই আচার তাকে সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে ফেলেছে। বোধ হয় শুধু সে যদি নিষ্ঠাভরে পালন করত রবিবারে গীর্জায় হাজির হওয়া আর জন্মযাত্রা ও শবানুগমনের রীতিটি এবং মাংস ভোজনের সঙ্গে কৃপা প্রার্থনা তাহলে তাকে মনুষ্যোচিত এবং সহাকর বলে ধরা যেত! তা যখন নয়, তখন আধুনিক যুগের একটা দারুণ অবাস্তব বস্তু সে; তিরিশ শতাব্দীর ধোয়াতেও তার নাগাল পায়নি; এ বহুদেবপূজা, নিতান্ত নির্জলা বহুদেবপূজা সংশোধনের দিকে না হয়ে দূষিতের দিকে প্রবণতা হওয়াতে বিশ্বধর্মসভায় এর স্থান নিঃসন্দেহে সকলের নীচে। একটা চমকপ্রদ উদ্ধারের পন্থা বাতলান হয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম য়ুরোপে বহুদেবপূজা নিশ্চিহ্ন করেছে; অতএব, যখন সন্দেহবাদী স্বাধীন চিন্তার হঠাৎ বা দ্রুত বিকাশে রাতারাতি পৌঁছান একটা বেশ লোভনীয় সম্ভাবনা, তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, দূষিত, অপবিত্র হিন্দু আমাদের উপদেশ দেওয়া হল কিছুকালের জন্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে, এমন যে হতশ্রী অযৌক্তিক খ্রীষ্টধর্ম, যা জড়বাদী যুক্তির অবাধ আলোতে মনে হয় মলিন ও বিকলাঙ্গ, কারণ খ্রীষ্টধর্ম,—বিশেষত প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টধর্ম—অজ্ঞাবাদ এবং নিরীশ্বরবাদের মহান মুক্তি নির্মল শুচিতার পথে অন্তত প্রথম পদক্ষেপ বেশ হতে পারবে। অশেষ দুর্ভিক্ষের চাপে ধর্মান্তরেও যদি এ ফলটুকু লাভ না হয় তাহলে যে-কোনো প্রকারে হিন্দুধর্মের পরিশোধন চাই, আর যতক্ষণ না এই স্বাস্থ্যকর ক্রিয়াটি সাধিত হচ্ছে ততক্ষণ সভ্য জগৎসভায় ভারতের সকলের সঙ্গে সমান আসনে বসা চলবে না।

প্রসঙ্গত অযৌক্তিকতা ও সংশ্লিষ্ট বহুদেবপূজার অভিযোগের সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এখন দেখছি আরো মারাত্মক তৃতীয় একটা অভিযোগ আনা হয়েছে, সকল নৈতিক মূল্য ও ব্যবহারিক মর্যাদার অভাব। য়ুরোপে পর্যন্ত আজকাল এই বোধ জাগতে শুরু করেছে যে যুক্তিই মানবমনের শেষ কথা নয়, সত্যের পথে এই একমাত্র নিরঙ্কুশ পন্থা নয়,-এবং ধর্ম ও অন্যান্য সত্যের ব্যাপারে তো অন্বিতীয় বিচারক নয়ই। বহুদেবপূজার অভিযোগটিও সমস্যা সরল করে না, কারণ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বেশ বুঝতে পেরেছেন খ্রীষ্টীয় মূলদের ওই দয়োনাদে ডাকা

প্রাচীনের নানা ধর্মে কত বহুৎ স্বতন্ত্রতা শ্রীময় জিনিস ছিল। এসব অযোগ্য প্রাচীন অনুষ্ঠান ও বৃত্তি হারিয়ে জগৎ যে ঘোলো আনা লাভবান হয়েছে তা-ও নয়। তবে কার্যত যাই তারা করুক না,—আর একেত্রে সাধারণ মানুষ হল আন্তরিক অথচ বেশ অকেজো, বেশ ভদ্র, ভব্য সদাচারী এবং আত্মপ্রবঞ্চক বা আধা-ভণ্ড ফারিসির (pharisee) সংমিশ্রণ,—নীতিবাগীশ পক্ষপাতিত্বের কাছে সর্বদা বেশ মনকাড়া আখি তোলা যায়। সব ধর্মই নৈতিকের ধ্বজা উড়িয়ে চলে, এবং ধার্মিকই হোক আর অ-ধার্মিকই হোক, শুধু উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী ও বিষাদবিলাসী ছাড়া সকলেই নিজের জীবনে এই বাণীটি মানতে চায় বা অন্তত স্বীকার করে নেয়। এই নালিশ তাহলে সেই চরম পক্ষপাতদুষ্ট অভিযোগ নিয়ে যা সব ধর্মের বিরুদ্ধেই করা চলে। যে স্বয়ং-নিযুক্ত অভিযোগকারী বিচারকের নিন্দাবাদ বিচারে বসেছি তিনি ওটি অসঙ্কোচে অপর্যাপ্ত পরিবেশন করেছেন। তাঁর আবিষ্কার এই যে হিন্দুধর্ম উন্নতিকর নয়, নৈতিকভাবেও সাহায্যকর ধর্ম নয়; এতে যদি ন্যায়ের কথা বিস্তর থেকেও থাকে, নৈতিক শিক্ষাকে সে তার কাজ বলে কখনো দাবিও করেনি। কোনো ধর্মের পক্ষে নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব পালন না করে ন্যায়ের কথা প্রচার করা, এ যেন এক বর্গক্ষেত্র যার চতুর্ভুজ হবার উপায় নেই কিন্তু যাক ওকথা। একজন প্রতীচ্যবাসীর স্থূল দৃষ্টির থেকে একজন ভারতীয় অপেক্ষাকৃত মুক্ত—আজ পর্যন্ত, অন্তত যতক্ষণ না খৃষ্টধর্মের 'সভ্যতা-মণ্ডলে' সে ঢুকছে বা অন্য পন্থা ধরছে—কারণ তার নিজের চরিত্রে রয়েছে নৈতিকের ধারা কারণ, এসব দুষ্প্রবৃত্তি তার অপরিচিত। তার সমাজ-সৌধের ভিত্তি ধর্মের, মানবীয় ও দৈবের, বিশ্বগত ও ব্যক্তিগতের, নৈতিক ও সামাজিক নীতির এক বর্ষর পরিকল্পনা; প্রতি পদে তারই উপর নির্ভর করা, এতে য়ুরোপের মতো উদার পাশ্চাত্য সভ্যতার ধরণে সে পায়নি ঘোলো আনা অধঃপতনের সুযোগ! আর এই হিন্দু-ধর্মের আদ্যন্ত বৈশিষ্ট্য, যা তার অন্তর্ভুক্ত জনতার চরিত্রেরই নামান্তর, এখন মিঠে গলায় বলতে শুনলাম সব বীভৎসতা অস্বাস্থ্যকরের দিকেই নাকি দুঃখার্ত প্রবণতা। মিঃ আর্চারের বীভৎস ও অস্বাস্থ্যকর এই গালিনৃত্যকে তার চড়া সপ্তকেই ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক তাঁর এমন অরুচি ও রোষের মনোগত উৎসটি কোথায়।

প্রকৃতির য়ুরোপীয় মনের দুটি বৈশিষ্ট্য,—ছেড়ে দেওয়া যাক অবশ্য ওটি কয়েক মহাত্মা, জন কয়েক মনীষী এবং অস্বাভাবিক ধর্মপ্রবণতার কয়েক মুহূর্ত বা যুগ, দেখা যাক প্রধান ধারাটি। বৈশিষ্ট্য দুটি হল অন্বেষু বিশ্লেষণী ফলপ্রদ বাস্তব বুদ্ধি এবং প্রাণধর্ম। য়ুরোপীয় সভ্যতার সাগরে উত্তাল বান ডেকেছে যখনই, গ্রীক সংস্কৃতি, কনষ্টানটাইনের আগে রোম সাম্রাজ্য, রেনেসাঁস, যন্ত্রশিল্প ও জড় বিজ্ঞানের দুই অতিকায় দেবতা বয়ে আধুনিক যুগ, পাশ্চাত্যে এসবই এসেছে ওই দ্বৈত শক্তির প্রবল উজান ধারায়। যখনই এদের স্রোতে ভাটা পড়েছে তখনই য়ুরোপীয় মন নেমে গিয়েছে বিশৃঙ্খলা অন্ধকার ও দুর্বলতায়। খ্রীষ্টধর্ম য়ুরোপকে আধ্যাত্মিক করতে পারেনি, তাকে কোনো কোনো নৈতিক ক্ষেত্রে মান-

বীর করতে পারা সত্ত্বেও, কারণ তা ওই বৈতশক্তির বিপক্ষে ; তা যুক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য অস্বীকার করেছে এবং পরিতৃপ্ত অথবা শঙ্কাকুল সমৃদ্ধ জীবন নিন্দা করেছে। কিন্তু এশিয়াতে বুদ্ধি ও প্রাণধর্মের এই দৌরাত্ম্য ছিলনা, ছিল না ধর্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে এই দুয়ের দ্বন্দ্ব। এশিয়ার সব স্বর্ণযুগ, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের চূড়া,—ভারতবর্ষে মহান বৈদিক প্রারম্ভ, উপনিষদের সমুচ্চ আধ্যাত্মিক আন্দোলন, বৌদ্ধ বৈদান্তিক সাংখ্য পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের দিকপ্রসারী প্লাবন, দক্ষিণের নানা রাজ্যে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের বিকাশ—এসেছে আধ্যাত্মিক জ্যোতির এক মহাতরঙ্গ বেয়ে, একটা ধার্মিক বা ধর্ম-দার্শনিক মনের আপন শিখরে উঠে যাওয়ায়, তার মহত্তম সত্যে পৌঁছানয়, তার দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য প্রাপ্তিতে। এই সব যুগেই পাণ্ডিত্য মনীষা কাব্য শিল্পকলা, বাস্তব-জীবন সহস্রদলে ফুটে উঠেছিল। সর্বদা বিপরীত ধারার আধ্যাত্মিকতার হ্রাস এনেছে এই সব শক্তির দুর্বলতা, অচলায়তনের যুগ কিম্বা অন্ততপক্ষে জীবনীশক্তির হানি, অবনতির পথ, এমন কি ক্ষয়ের সূচনা পর্যন্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান রহস্যগুলি যদি বুঝতে চাই তবে ইঙ্গিতটি ধরা নেওয়া ভালো।

একেবারে অধ্যাত্মে যদি না-ই হয়, অন্তত অধ্যাত্মের দিকে মানুষকে উঠে যেতেই হবে, নতুবা উর্ধ্বগতির শক্তি তার অনায়ত্ত থাকে ; তবে নানা পথে যাওয়া চলে তার গোপন সব শক্তির কাছে। য়ুরোপকে, মনে হয় যেন, যেতেই হবে প্রাণ ও যুক্তির ভিতর দিয়ে এবং তাদেরই উপায় হিসাবে নিয়ে চূড়ান্ত করে প্রকাশ করে পেতে হবে আধ্যাত্মিক সত্য খ্রীষ্ট যেমন মানুষকে করতে বলেছেন সে-রকমভাবে সে ঝড়ের মতো গিয়ে স্বর্গ জয় করতে পারে না। সে-চেষ্টায় বুদ্ধি তার আবিল আচ্ছন্ন হয়, সংঘর্ষ বাধে তার প্রাণবৃত্তির সঙ্গে, পরিণামে বিদ্রোহ, অস্বীকার, স্বধর্মে পুনরাবর্তন। কিন্তু এশিয়ায়, অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষে, ঊর্ধ্বাগত অধ্যাত্মের প্লাবন-ধারায় জীবন সহজে অনায়াস ; তাতেই তার মন ও প্রাণের সমুন্নত শক্তিতে অধ্যাত্মের বোধন। মানবতার পূর্ণ বৃত্তের দুটি দিক হল দুই মহাদেশ, আর যতদিন না মিলছে মিশছে ততদিন তারা চলছে মানুষের মধ্যে আত্মার কাম্য সেই প্রগতি ও পরিণতির দিকে—নিজের নিয়ম অনুসরণ করে, স্বীয় ধর্ম পালন করে। একপক্ষ জগৎ তার একক সংস্কৃতির একনয়তা ও একতানতা নিয়ে গর্বিতই থাকবে, তাই প্রয়োজন বিচিত্র পথে এগিয়ে শেষে আত্মের আনন্দ্যে মাথা তুলে দাঁড়ান—সেখানে যে উদার আলো তার মধ্যে মিলিয়ে মৈত্রীবদ্ধ করে ধরা যায় সব, চিন্তা বোধ ও প্রাণের উচ্চতম সব ধারা। এই সত্যটি জড়বাদী য়ুরোপের দুর্দান্ত ভারতীয় সমালোচক কিম্বা এশিয়াব্যাপী অথবা ভারতীয় সংস্কৃতির অবজ্ঞাপূর্ণ শত্রু বা নিরুত্তাপ নির্মুক উভয়েই সমান এড়িয়ে গিয়েছে। সত্যই বর্বরতা আর সভ্যতার কোনো সমস্যা নেই, কারণ সব জনতাই নিজেদের বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উন্নতির পথে তুলবার প্রয়াসে রত। রয়েছে শুধু একটা সক্রিয় পার্থক্য যার প্রয়োজন মানব-সংস্কৃতির বর্ধিষ্ণু বৃত্তের পূর্ণতার জন্য।

ইতিমধ্যে এই বিভেদ ধর্ম এবং অন্যান্য প্রায় সব বিষয়ে একটা নিরন্তর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী এনেছে, আর এই বিরুদ্ধতা দিয়েছে পরস্পরে সৌবনস্যে একটা অসামর্থ্য কিম্বা নিছক শত্রুতা বা অপছন্দের অক্ষমতা। পাশ্চাত্য মন জোর দিয়েছে প্রাণে, সকলের আগে বাহ্য-প্রাণে, যে-জিনিস ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তারই উপর। আন্তর জীবন ধরা হয় শুধু বহির্জীবনের কাল্পনিক প্রতিবিম্ব হিসাবে, বুদ্ধি সেখানে আকার দিয়েছে বস্তুভাবের, হয়েছে চতুর সমালোচক, নির্বাচক, প্রকৃতিলব্ধ বাহ্য উপাদানের সংশোধক। জীবনের বর্তমান ব্যবহার, এ জীবনে এবং এই জীবনের জন্যই ব্যাপৃত থাকা, এ-ই হল য়ুরোপের সকল চিন্তা। ব্যক্তির বর্তমান জীবন, জড়জীবনের প্রবহমাণতা এবং মানুষের মন ও বুদ্ধির সমৃদ্ধি—একমাত্র এতেই নিমগ্ন সে। ধর্মের কাছেও পাশ্চাত্যের দাবি যে তার ফলাফল বা আদর্শকে যেন সে এই কাছের দৃশ্য-জগতের উপকারিতার অধীনে রাখে। গ্রীক ও রোমানরা ধর্ম ব্যাপারটাকে Polis-এর আশুর স্বপক্ষে অনুমোদন হিসাবে, রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্বের জন্য একটা বল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টীয় ভাবধারা যে মধ্যযুগে চরমে উঠেছিল তা তো একটা ব্যতিক্রম; সে এমনই একটা সময় যখন পাশ্চাত্য মন তার আবেগ ও বুদ্ধিতে একটা প্রাচ্য আদর্শ গ্রহণ করতে প্রয়াসী। কিন্তু জীবনে তাকে সে একান্ত করে ফলিয়ে তুলতে পারেনি, শেষে সরিয়েই দিয়েছে কিম্বা রেখেছে শুধু মৌখিক স্বীকৃতির জন্য। তেমনিভাবে এশিয়ারও এই একটা ক্ষণবিরতি যখন বিদ্রোহী অন্তরাত্মা ও মেজাজ নিয়ে নিজের বুদ্ধি ও জীবনে এই পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার মূল্যের আদর্শ গ্রহণের প্রয়াস পেয়েও। তবে নিঃসন্দেহে এও ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে যে এশিয়াও তার জীবনে এই পরধর্ম নিবিড়ভাবে বা দীর্ঘকাল রাখতে পারবেনা। কিন্তু য়ুরোপে খ্রীষ্টীয় আদর্শ পর্যন্ত, আত্মসমীক্ষার প্রবণতা এবং পারলৌকিকতার শুচিতা তার লক্ষণ, আপস করেছে পাশ্চাত্য মতিগতির দাবির সঙ্গে আর ফলত হারিয়েছে নিজের আন্তর সাম্রাজ্য। প্রতীচ্যের নির্ভেজাল মেজাজটিই জয়ী হল এবং ধর্মপ্রবৃত্তিকে ক্রমেই আরো যুক্তিবদ্ধ পার্থিব এবং মৃতপ্রায় করে ফেলল। ধর্ম হয়ে দাঁড়াল নির্বাসনের অথবা মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় জীবনের এক তুচ্ছ প্রান্তে এবং প্রকৃতির তুচ্ছতর এক প্রান্তে ফেলে রাখা বিবর্ণ কৃশকায় ছায়া, আর পরাজিত চার্চের দরজার বাইরে বহির্জীবন, জড়বাদী যুক্তি এবং জড়বিজ্ঞান অস্ত্রের নিচ্ছিল নিয়ে কাড়া-নাকড়া বাজিয়ে চলল।

অন্তর্মুখী দৃষ্টি থেকে নিযুক্ত প্রাণ ও যুক্তির পূজার ফলস্বরূপ প্রবণতাই হল এই ধর্মহীনতার দিকে চলে যাওয়া। প্রাচীন য়ুরোপ ধর্ম আর প্রাণে পার্থক্য করেনি; তার কারণ অবশ্য এই পার্থক্যের প্রয়োজনও ছিল না তার কাছে। তার ধর্ম, একবার প্রাচ্য রহস্যবস্তুর মায়া কাটিয়ে উঠেছে যখন, হয়ে উঠেছে একটা ধর্মহীন প্রতিষ্ঠান, তখন এই প্রাণধারণের ব্যাপারে অলৌকিক কিছুর সমর্থন বা সুবিধাজনক সাহায্যের বেশি সে চায়নি। আর তখনো সে চেয়েছে যুক্তি দিয়ে তত্ত্ব দিয়ে আদি ধর্মপ্রবৃত্তির অবশেষটুকু ব্যাখ্যা করে

ফেলতে, যুক্তিপাত্রের রহস্যাধারের বিস্তৃত ছায়ায় যে একটু কণা ছিল তাকেও নির্বাসিত করতে এবং যুক্তিগত ব্যবহারিক বুদ্ধির সূর্যালোকে উত্তীর্ণ হতে। আধুনিক য়ুরোপ কিন্তু আরো এগিয়ে এ-পথের শেষে উঠেছে। খ্রীষ্টীয় ভাবের প্রতি অনুরাগ আরো ষোলো আনা ঝেড়ে ফেলে, সে-তো প্রাচ্য ধর্মচিন্তার মতোই সমান ধরে নিয়েছিল জীবন ও ধর্ম- যতোই তার বিরুদ্ধে থাক পাশব মানুষের বলিন জৈব প্রকৃতির বাধা—চেয়েছিল সমগ্র সত্তা ও তার ক্রিয়াকে অধ্যাত্মপর করে তুলতে, আধুনিক য়ুরোপ ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে জীবন থেকে, দর্শন শিল্প বিজ্ঞান রাজনীতি থেকে, সামাজিক কর্ম এবং অস্তিত্বের বৃহদংশ থেকে। নৈতিকের দাবিকেও সে ধর্মলেশহীন এবং যুক্তিগত করে নিয়েছে যাতে আর কোনো ধর্মীয় অনুমোদন বা লোকোত্তর চাপের প্রয়োজন না হয়। এ-পথের চরম হল নিয়ম-বিরোধী প্রবণতা, তা-তো বার বার দেখা গেছে য়ুরোপের জীবন-ইতিহাসে, আজও আবার দেখতে পাচ্ছি। এই শক্তি নীতিবোধকেও নিঃশেষ করতে চায়, তবে রহস্য-বিদ্‌দের মতো এর উপরে উঠে আত্মার পরম পবিত্রতায় পৌঁছে নয়, নীচে তার সব সীমা-বাধা ভেঙে দিয়ে একটা প্রাণলীলার নির্বাধ উল্লাসে গিয়ে। এই বিবর্তনে ধর্ম ফেলে রাখা হয়েছিল একপাশে, শ্রুত ও বিশ্বাসের যেন একটা মুমূর্ষু ছক রেখে যাতে আত্মনিয়োগ না করলে মানব মন ও জীবনের কিছু যায় আসে না। এর মর্মভেদী বর্ণদাত্রী শক্তি এসে পৌঁছাল নির্জীবতার শেষ সীমায়; আচার, উচ্ছ্বাস, আবেগের বাহ্যিক রঙচং, এই হল সেই দারুণ প্রক্রিয়ার উদ্‌বৃত্ত পরিণাম।

দুর্ভাগা বস্তুটার যা-ও বা একটু কণিকা স্বীকৃত হয়েছিল তাও আবার বুদ্ধি এসে বলল যুক্তির ছটায় যথাসম্ভব ডুবিয়ে দিতে। গতি দেখা যাচ্ছে শুধু অযৌক্তিককেই ক্ষুণ্ণ করা নয়, সেই সঙ্গে ধর্মপ্রবৃত্তির অতিযৌক্তিক আশ্রয়টুকুও খর্ব করা। প্রাচীন পৌত্তলিক বহু-দেবসেবী প্রতীকবাদ নানান শোভন রূপকের মধ্যে ধরেছিল জীবন ও জড়ের প্রতি অণুকে, পশুজীবনের সর্বত্র এবং মানবের সকল মানসক্রিয়াতে এক ভাগবত উপস্থিতি ও জড়াতীত প্রাণ ও শক্তিকে, কিন্তু এই ভাবটি, জড়বুদ্ধির কাছে যা কাল্পনিক প্রাণব্যাপ্তি মাত্র, ইতি-মধ্যেই নির্মমভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। ভগবান বেচারা পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে দূরে একান্তে লোকান্তরে আশ্রয় নিয়েছেন, সে আকাশস্বর্গ সাধু অমর-আত্মাদের। তবে এই অন্য জগৎই বা থাকবে কেন? আপত্তি চলেনা, প্রগতিশীল বুদ্ধি চেঁচিয়ে বলছে, আমাদের যুক্তি ও ইন্দ্রিয়ের কাছে গ্রাহ্য এই জড়জগৎটা মাত্র। জীবন্ত-বাস্তবহীন, কোনো প্রাণবন্ত নৈকট্য-সূত্র ছাড়া এমন আবছায়া উপর আত্মিক অস্তিত্বের কল্পনাটি পড়ে থাকল পুরানো অধ্যাত্মবোধ ও জীর্ণ যাদুকরী মায়ার তুষ্টির জন্য। থাকল একটা শূন্য কবোষ্ণ ঈশ্বরবাদ কিম্বা খ্রীষ্টের নামশূন্য বা সান্নিধ্যশূন্য একটা যুক্তিসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম। কিন্তু বুদ্ধির তর্কালোক সেটুকুই বা থাকতে দেবে কেন? যুক্তি বা শক্তি—ভালো নামের অভাবে যাকে ডাকা হয়েছিল ভগবান—জড় বিশ্বে যে প্রকৃতি নৈতিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে, যুক্তিপ্রিয় মনের কাছে তা-ই

যথেষ্ট ; এই রকমেই পাওয়া গেল দেববাদ, একটা অন্তঃসারশূন্য কাল্পনিক সূত্র। তবে তাই বা কেন, ভগবানের আদৌ প্রয়োজন কি? যুক্তি ও ইন্দ্রিয়দল ভগবানের কোনো প্রমাণ দেয় না ; তারা বড় জোর তাঁকে একটা সম্ভাব্য প্রকল্প হিসাবে খাড়া করে। কিন্তু নিরর্থক প্রকল্পের কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু প্রকৃতিই যথেষ্ট এবং তার সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিফহাল। এভাবে অনিবার্যক্রমে আমরা পৌঁছালাম নিরীশ্বরবাদী অজ্ঞাবাদী ধর্মহীনতায়, অস্বীকারের শিখরে, জড়বাদী বুদ্ধির চূড়ায়। এখানে অতঃপর বুদ্ধি ও প্রাণ তাদের প্রতিষ্ঠা পেয়ে বিজিত বিশ্বের ওপর বেশ সন্তুষ্ট রাজত্ব চালাতে পারে,—যদি না আড়ালের সেই অস্বস্তিকর প্রচ্ছন্ন অকায় অসীম 'কিছু' তাকে ভবিষ্যতেও নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়!

এমন মতিগতির, এ-ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর বস্তুত অসীমের ও যুক্তিপারের আন্তরিকভাবে কোনো সন্ধান নেওয়ার ধৈর্য নেই। এসব সূক্ষ্ম স্বপ্নবিভ্রমের আংশিক খেলা সে বরদাস্ত করতে পারে কল্পনাবিলাসী মন ও শিল্পী ভাবনার নির্দোষ লীলা হিসাবে, অবশ্য যতক্ষণ না তা গুরুতর কিছু হয়ে জীবন জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সন্ন্যাস ও পরলোকপ্রিয়তা এ-বেজাজের কাছে জঘন্য ও এ-দৃষ্টির পক্ষে মারাত্মক। এমন জিনিস যে জীবন তাকে যুক্তি দিয়ে অথবা সাধ্যমত সবলে ভোগ করতে হবে, কিন্তু এই পার্থিব জীবন, একমাত্র যাকে জানি, আমাদের সবেধন রাজা। বড়জোর একটা বুদ্ধিগত ও নৈতিক কৃচ্ছ্রাচার চলতে পারে, সহজ জীবন, বহৎ চিন্তা। কিন্তু আনন্দময় একটা আধ্যাত্মিক তপশ্চর্যা, তা হল যুক্তির কাছে অন্যায়, প্রায় একটা অপরাধ। তেমন আবেগের একটা নিরাশাবাদও সময় বিশেষে চলতে পারে ; কারণ তার স্বীকৃতি এই যে, জীবনটা নচ্ছার হলেও ধারণ করতে হবে এবং তার গোড়ায় হাত দেবার দরকার নেই। অথচ স্পষ্ট সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী হবে জীবন ঠিক যেমনটি তেমনভাবেই তাকে গ্রহণ এবং তার চরম সদ্ব্যবহার করা, কার্যত তার ভালো-মন্দের মিশ্রণটা সুশৃঙ্খল করে তোলবার জন্যই হোক অথবা আদর্শত কোনো একটা বৃহত্তর পূর্ণতার আশায়ই হোক। আধ্যাত্মিকতার যদি থাকে কোনো অর্থ, সেটি তবে নির্দেশ করবে তার লক্ষ্য অথবা একটা সমুচ্চ মনীষার মহাপ্রয়াস, যুক্তিবদ্ধ ইচ্ছা, একটা সীমিত সৌন্দর্য ও নৈতিক কল্যাণ যা এই বর্তমানের জীবন নিয়ে যথাসাধ্য করবে, তবে বৃথা দূরান্তে কোনো অমর্ত্য, অনভ্য, অসীম ও পরম সার্থকতার দিকে দৃষ্টি ফেলবে না। ধর্মকে যদি টিঁকতে হয় তাহলে তার কাজ হবে এই রকম আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের সেবায়েত হওয়া, ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা, জীবনে সৌন্দর্য ও শুচিতা আনা, তবে পূজা করা এই সুস্থ সবল আধ্যাত্মিকতাকে, থাকা ব্যবহারিক বুদ্ধি ও পার্থিব বুদ্ধির সীমানার মধ্যে। এই ব্যাখ্যা অবশ্য মূল ধারাগুলি বিচ্ছিন্ন করে ধরে এবং এ-পাশে ও-পাশে বিচরণ নজরে আনে না ; অথচ মানব স্বভাবে সর্বত্র দেখা যায় এই পঞ্চাস্তর চারণা, প্রায়শ চরম ধরণের। আমার মনে হয় না পাশ্চাত্য বেজাজ, তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার বুদ্ধির স্বাভাবিক অবস্থার এটা কোনো অনুচিত বা অত্যুক্তিকর ব্যাখ্যা।

এই হল তার স্বয়ংসিদ্ধ নিশ্চল স্থিতি যার পরে সম্ভব সেই পথান্তর বা আত্ম-অতিক্রমণ, স্বাভাবিক প্রকৃতির চূড়ায় পৌঁছে গেলে যেদিকে অনিবার্যভাবে চলে মানুষ। মানুষই যে-প্রকৃতিতে এই শক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, যে হয় স্ফূর্তি লাভ করবে নয়ত খেয়ে নাস্তি হয়ে ধ্বংস পাবে, আর যতক্ষণ না মানুষ পেয়েছে তার এই পূর্ণ আমিকে ততক্ষণ তার অন্তরাত্মার নিত্য স্থির অচল আবাস নেই।

এবার পাশ্চাত্য মন যখন দেখতে পায় ভারতীয় ধর্ম চিন্তা সংস্কৃতির শক্তি এখনো অটুট তখন বোঝে যে তার নিজস্ব আদর্শ সব নাস্তি, পিছনে, তুচ্ছ ; তার সম্মানীয় সবের আসন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, তার প্রত্যাখ্যাত সবের এখনো আদর। এই এখানে এমন এক দর্শন যার ভিত্তি অনন্তের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, পরমের নিরবচ্ছিন্ন আহ্বান। আর এসব শুধু কল্পনার বিষয় নয়, একটা জাগ্রত সান্নিধ্য ও চিরন্তন শক্তি যার দাবি আর আহ্বান নিত্য মানুষকে উতলা করছে। এখানে পাই এমন একটা মনোভাব যা ঈশ্বরকে দেখে প্রকৃতি মানুষ পশু ও নিষ্প্রাণ বস্তুতে, ঈশ্বর আদিতে, ঈশ্বর মধ্যে, ঈশ্বর অন্তে, ঈশ্বর সর্বত্র। আর এসব জীবনে গভীরভাবে নেবার অনুপযোগী শুধু একটা কৃপার পাত্র কল্পনার কাব্য-বিলাস নয়, বলা হয়েছে—এ জিনিস ফুটিয়ে তুলতে হবে জীবনে, সার্থক করতে হবে, বাহ্য কর্মেরও মূলে রাখতে হবে, চিন্তা অনুভব ও আচরণের উপাদানে পরিণত করতে হবে ! সমস্ত সাধনাই সুনিয়মিত এই লক্ষ্যে, যে সাধনা আজও লোকে অনুসরণ করছে। আর গোটা জীবনটাই উৎসর্গ করা হয় এই পরম পুরুষের, এই বিশ্বদেবতার, এই একনের, এই অদ্বিতীয়ের, এই অনন্তের সন্ধানে ! অধিকন্তু, আজও এমন লোক দেখা যায় যারা এই অপার্থিব লক্ষ্যের জন্য বহির্জীবন সমাজ সংসার, প্রিয়তম পেশা, মুক্তিদার মনের কাছে প্রতীয়মান বাস্তব ও মূল্যবান সবকিছু হেলায় ত্যাগ করে। এই দেশ, এ দেশের চোখে সন্ন্যাসীর গৈরিক রঙের ঘোর এখনো গাঢ়, এখানে পরপারের সত্যতা এখনো স্বীকৃত, মানুষের অনন্ত বিশ্বাস এখনো লোকান্তরে জন্মান্তরে, এখনো অটুট অসংখ্য কিম্ভূত ভাবনা যাদের সত্যতা ঠিক জড়বিজ্ঞানের যন্ত্রে ধরা পড়েনা। এখানে যোগের অভিজ্ঞতাকে গবেষণাগারের বীক্ষণার সমান বা বেশি সত্য বলে ধরা হয়। এ কি অভাবনীয় জিনিস নিয়ে ভাবা নয়, যেহেতু পশ্চিমী মন এ ভাবনা করা ছেড়ে দিয়েছে ? এ কি স্পষ্ট অজ্ঞেয় জিনিস সব জানার চেষ্টা নয়, যেহেতু আধুনিক মন এদের জানার সব চেষ্টা ত্যাগ করেছে ? এই যুক্তিহীন অর্ধবর্বরদের মধ্যে এখনো চেষ্টা চলে এমন অবাস্তব জিনিসকে জীবনের সেরা, একমাত্র লক্ষ্য, শিল্প সংস্কৃতি আচারে-ব্যবহারে রূপদা নিয়ন্তা শক্তি বলে ভাবতে। কিন্তু এই যুক্তি-শীল ব্যক্তিটি বলছেন, শিল্প সংস্কৃতি আচার-ব্যবহার এমনই একটা জিনিস যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের তা ছোঁয়া উচিত নয় ; কারণ এসব তো সসীম জগতের বস্তু, এদের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে বুদ্ধিগত যুক্তি ও ব্যবহারিক পরিবেশ এবং জড় প্রকৃতির সত্তা ও ব্যঞ্জনা। এই তো আদি রূপে প্রকট দুই মতিগতির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য এবং মনে

হয় তা অনতিক্রম্য। কিম্বা বলা যায়, বিরুদ্ধ মত হলেও ভারতীয় মন পাশ্চাত্য বুদ্ধির জড়বাদ-প্রবণতা বেশ বুঝতে পারে; কিন্তু সে নিজে শেষোক্ত বস্তুটির কাছে একেবারে ধরাবাদ না হলেও অপ্রকৃতিস্থ ও অবোধ্য।

জীবনের উপর ভারতীয় ধর্ম-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পাশ্চাত্য সমালোচকের কাছে আরো অসহ্য। এই অতিযৌক্তিক, এবং তার কাছে যুক্তিবিরুদ্ধ, প্রেরণা যদি তার তর্কবুদ্ধিকে আগে অসন্তুষ্ট করে থাকে তাহলে এখন তার মেজাজের প্রখর প্রবৃত্তিগুলি তাদের বিপরীতের ও বিরুদ্ধের সামনে দারুণ মুহ্যমান। যে-জীবনের উপর সে দিয়েছে সর্বগ্রাসী এবং অপ্রতিহত মূল্য তারই যাচাই হচ্ছে এখানে। ভারতীয় দৃষ্টির বা অন্তর্দৃষ্টির একদিকের চরম ফলাফল তাকে তুচ্ছ গৌণ দেখাচ্ছে এবং জীবনের জন্যই জীবন কোথাও আর স্বীকৃতি পায় না। কৃচ্ছ্রসাধনেরই সর্বত্র জয়জয়কার, সর্বাগ্রে তারই স্থান, প্রাণপ্রবৃত্তির উপর তারই ছায়া, মানুষের কাছে তার বাণী দৈহিক জীবন ছেড়ে যাওয়া এবং মানস এষণা এবং বুদ্ধির জীবন পর্যন্ত ছেড়ে যাওয়া। পাশ্চাত্য মন ব্যক্তিত্ব প্রতিভার উপর, ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর, প্রত্যক্ষ মানুষটা এবং তার প্রকৃতির বাসনা ও দাবির উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করে। এবার এখানে দেখছি বিপরীত একটা ঝোঁক সমুচ্চ সমৃদ্ধি নির্ব্যক্তিকতার দিকে, ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বিশ্বগত ইচ্ছার মধ্যে প্রসারিত করার দিকে, প্রত্যক্ষ মানুষটা ও তার সব বাঁধন ভেঙ্গে ছাড়িয়ে সুদূরের দিকে। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আদর্শ হল মানসিক এবং প্রাণিক অহংয়ের বিকাশ কিম্বা বড় জোর সমাজ অহংয়ের কাছে তার অধীনতা। কিন্তু এখানে অহংকে আত্মার পরিস্ফুটনের প্রধান পরিপন্থী বলে ধরা হয় এবং এর স্থানে বাস্তবিক গোটার অহংকে বসাবার কথা ওঠে না, ওঠে অন্য কিছু অন্তর্যামীকে, সূক্ষ্মকে, তুরীয়কে, এমন কিছুকে যা অতিমানসিক, দেহাতীত একান্ত বাস্তব। প্রতীচ্যের মেজাজ রাজসিক, ব্যস্তসমস্ত, ব্যবহারিক, সক্রিয়; চিন্তা এলেই তার কর্মের কথা মনে পড়ে এবং কর্ম ছাড়া তার মূল্য সামান্যই কিম্বা তা শুধু মনের বিলাস ও বীর্যের একটা সুকুমার তৃপ্তি। কিন্তু এখানে যাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ বলছি তিনি আত্মস্থ সাত্ত্বিক ব্যক্তি, যাঁর কাছে ধীর চিন্তা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আন্তর জীবনই সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস, কর্ম যাঁর কাছে কিছু মূল্যবান শুধু কর্মের জন্যই নয়, তার ফল ও পুরস্কার দানের জন্য নয়, কর্মের গহন প্রকৃতির পুষ্টি ঘটাতে পারার জন্য। এখানেও একটা অস্বস্তিকর স্নায়ুত্ব যার লক্ষ্য চলে যায় একটা আলো ও শান্তির মধ্যে, সব চিন্তা সব কাজের শেষ বা নির্বাণের দিকে। তাই তো অবাক হবার কিছু নেই যে একজন সমালোচক বশী প্রতীচ্যের মন নিয়ে এসব বিপরীত জিনিস দেখবে অতৃপ্তি নিয়ে, বিরাগের বিতৃষ্ণা নিয়ে, হিংস্রপ্রায় একটা বৈরিতা নিয়ে।

সে যাই হোক, তার বুদ্ধির নাগালের যতদূরেই থাক এসব জিনিস, এদের মধ্যেই রয়েছে একটা মহান উদার কিছু। এগুলিকে সে মিথ্যা যুক্তিবিরোধী হতাশাকর বলে নিন্দিত করতে পারে, তবে পাপাশক্ত হীন বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। কিম্বা তা পারে শুধু এমন বিকৃতি-

বর্ণনার জোরেই যার সাক্ষাৎ মিলল মিঃ আর্চারের অধিকতর লাগিবজ্ঞানহীন ফরমানে। এসব বস্তু প্রাচীন বা পুরানো মনের পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু একটা বর্বর সংস্কৃতির ফল কিছুতেই না। এদের দ্বারা অলৌকিক অনুপ্রাণিত সেই ধর্মের নানা রূপের যখন তিনি আলোচনায় বসেছেন তখন নির্ঘাৎ তাঁর বোধ হয়েছে যে তাঁর সামনে একটা নির্ভেজাল বর্বরতা, একটা জংলী অজ্ঞান অগাধিচুড়ি। কারণ এখানে তো সে-সবেরই প্রাচুর্য যা সে এতদিন ধরে তার সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ধর্ম থেকে উৎখাত করে এসেছে, যে নিষ্কাশনকে পরিতৃপ্তি-ভরে বলে এসেছে সমার্জন, জ্ঞানার্জন, বস্তুর যুক্তিগত সত্য। তার চোখে এখানে প্রকট বহুদেবপূজা, যা তার বুদ্ধির কাছে নিছক কুসংস্কার তারই প্রতুলতা, যেসব জিনিস তার কাছে নিরর্থক বা অবিশ্বাস্য তাতেই অগাধ বিশ্বাস। সবাই জানে হিন্দুর বিশ্বাস তেত্রিশ কোটি বা ততোধিক দেবতার উপর, এই এক জাগ্রত উপদ্বীপ ভারতবর্ষে যত লোক তার সমান অন্তরীক্ষলোকের অগণিত অধিবাসীদের উপর, এই দেবতার ভীড়ে আরো যোগ করলেও তার আপত্তি নেই। এখানে মন্দির, মূর্তি, পূজারী, অবোধ্য আচার অনুষ্ঠানের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ, সংস্কৃত মন্ত্রের ও স্তোত্রের নিত্য আবৃত্তি—তার মধ্যে কারো জন্ম প্রাগৈতিহাসিক কালে, নানারকম অলৌকিক জীব ও শক্তিতে বিশ্বাস, গুরু, শুভদিন, ব্রত, নিবেদন, যজ্ঞ, যে একমাত্র প্রাকৃত নিয়ম মরণশীল জীবের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করে তার উপর যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নির্ভরতার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ-প্রমাণহীন বহুধা শক্তি ও প্রভাবের নিত্য সম্পর্কে জীবনকে দেখা। তার কাছে এ একটা দুর্বোধ্য বিশৃঙ্খলা; একটা প্রাণবিস্তারবাদ; একটা বীভৎস লোকগাথা। এসব জিনিসের, এদের আধ্যাত্মিক অর্থ যা ভারতীয় চিন্তা নির্দেশ করেছে সেসব তার বুদ্ধিতে ঢোকে না, অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিম্বা বোধ হয় নিরর্থক উন্মত্ত একটা প্রতীকবাদ, সূক্ষ্ম, নিষ্প্রয়োজন ও ব্যর্থ। আর শুধু যে এ-দেশের এই ব্রত ও বিশ্বাস পুরানো ও মধ্যযুগীয় প্রকৃতির তা-ই নয়, তাকে যথোচিত স্থানেও রাখা হয়নি। ধর্মটাকে কোনো অলঙ্কার ও নিষ্কর্মা কোণে ফেলে না রেখে ভারতীয় মন দুঃসাহসী হয়েছে—যুক্তিশীল মানুষের যে দুঃসাহসের ঘোর চিরতরে কেটে গিয়েছে—তাকে দিয়ে সমস্ত জীবনটা ভরে তুলতে।

যে গড়পড়তা জড়বাদী য়ুরোপীয় মন এভাবে ধর্মকে 'ছাড়িয়ে' উঠেছে কিম্বা যুক্তি-সার জড়বাদের দেউলিয়া ভয়াড়ুবি পুরো না হতেই আবার তাতেই ফিরতে উদ্যোগী তাকে বোঝানো মুস্কিল যে এসব ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠানে কোনো গভীর সত্য ও অর্থ আছে। বলা হয়েছে এরা হল আত্মার ছন্দ; অবশ্য যিনি আত্মাকে ধরতে পারবেন না তিনি আত্মা ও ছন্দের সম্পর্কটাও ধরতে পারবেন না। প্রত্যেক ভারতীয় জানে এই উপাস্য দেবতারা শক্তিগর্ভ নাম, দৈব রূপ, সক্রিয় ব্যক্তিত্ব, এক অনন্তের জীবন্ত অঙ্গ। প্রত্যেক দেবতা সেই পরম ত্রিমূর্তিরই একটি মূর্তি বা ধ্যানরূপ বা অধীনস্থ শক্তি, প্রত্যেক দেবী বিশ্ববীর্যের চিৎ-তপসের বা শক্তির এক রূপ। কিন্তু যুক্তিসার

য়ুরোপীয় মনের কাছে একেশ্বরবাদ, বহুইশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ মিলনবিরূপ কলহপর সূত্র মাত্র ; একত্ব বহুত্ব সর্বত্ব সেই শাশ্বত অনন্তেরই পৃথক অনুসারী দিক ছাড়া আর স্বতন্ত্র কিছু নয় বা হতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বে থেকেও যিনি এই গোটা ব্রহ্মাণ্ড এবং নানা দেবমূর্তিতে জাগ্রত তাতে বিশ্বাস ভাবের একটা জগাখিচুড়ি, পিণ্ড, বিশৃঙ্খলা ; কারণ সমন্বয়, বোধির দৃষ্টি, আন্তর অভিজ্ঞতা এই নিদারুণ বহির্মুখী, বিশ্লেষণাত্মক এবং তার্কিক মনের সাধ্য আদৌ নয়। হিন্দুর কাছে জড় মূর্তি জড়াতীতেরই বাহন ও প্রতীক ; যে জড়াতীত বল, শক্তি বা সান্নিধ্যকে সে পূজা করে এবং যার সঙ্গে যোগাযোগ তার বাসনা, আর কায়াবদ্ধ মন ও মানবেন্দ্রিয়, উভয়ের সংযোগের এই সেতু। তবে গড়পড়তা য়ুরোপীয়ের অকায় বস্তুতে বিশ্বাস নেই, আর যদিই বা থাকে তাহলে সেসবকে সে সরিয়ে রেখেছে একটা বিশেষ শ্রেণী বলে, একটা বিচ্ছিন্ন জগৎ বলে, একটা পৃথক অস্তিত্ব বলেই। জড় এবং জড়াতীতের মধ্যে একটা সংযোগ তার মতে এমন এক নিরর্থক সূক্ষ্ম ব্যাপার যার স্থান শুধু কাল্পনিক কাব্যে ও স্বপ্নশিহরণে।

হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান ব্রত পূজাপদ্ধতি বুঝব যদি তার মূল প্রকৃতি স্মরণে রাখি। প্রথমত এটা একটা বিধিবন্ধনহীন উদার ধর্ম এবং, অসম্ভব না হলে, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামকেও গ্রহণ করে ফেলত। যাকে পথে সে পেয়েছে তাকেই নিয়েছে, একমাত্র লক্ষ্য তার এসব রূপকে জড় জগতের এবং অন্তরের সত্যের সঙ্গে এক সার্থক আত্মীয়তায় বেঁধে দেওয়া। চিরকাল তার এই বোধ ছিল যে ধর্মকে যদি কয়েকজন সাধু বা মনীষীর জন্য না রেখে জনতার কাছে বাস্তব করে তুলতে হয় তাহলে মানুষের সর্বাঙ্গে তার আবেদন পৌঁছান চাই, শুধু যুক্তির ইন্দ্রিয়ে বা যুক্তিপারের অংশে নয়, সকল ইন্দ্রিয়ে। কল্পনা, আবেগ, রূপরুচিবোধ এবং অর্ধ-অবচেতন অংশের সহজাত বৃত্তি পর্যন্ত এর প্রভাবে আনতে হবে। ধর্ম মানুষকে নিয়ে যাবে যুক্তিপারের দিকে, অধ্যাত্ম সত্যের দিকে, সে-পথে আলোকিত যুক্তির সাহায্য সে নেবেই, কিন্তু তা বলে আমাদের জটিল প্রকৃতির অন্যান্য অংশকে ভগবানের দিকে ডেকে আনাতে অবহেলা করবে না। আর প্রত্যেককে ঠিক যেমনটি তেমনটিই সে গ্রহণ করবে, তার যোগ্য অনুভূতির মধ্যে দিয়েই অধ্যাত্মমুখী করে তুলবে, হঠাৎ এমন কিছু জোর করে তার ওপর চাপিয়ে দেবেনা যাকে সে এখনো সত্য ও জীবন্ত শক্তি হিসাবে চিনতে শেখেনি। বাস্তববাদী বুদ্ধি যার বিশেষ দুর্নাম দিয়েছে অযৌক্তিক ও যুক্তিবিরোধী বলে এসব হিন্দুধর্মের সেই অংশগুলিরই মর্ম ও উদ্দেশ্য। কিন্তু য়ুরোপীয় মন এই সহজ প্রয়োজনটি বুঝতে পারেনি অথবা ঘৃণা করেছে। বারনা সে ধরেছে ধর্মের 'শুদ্ধি'—যুক্তি দিয়ে কিন্তু আত্মা দিয়ে নয়, ধর্মের 'সংস্কার'—যুক্তি দিয়ে কিন্তু আত্মা দিয়ে নয়। আমরা তো দেখেছি য়ুরোপে এরকম শুদ্ধি ও সংস্কারের পরিণামটা

কী। এই ধরণের হাতুড়ে চিকিৎসার অনিবার্য ফলাফল হয়েছে প্রথমে ধর্মের দারিদ্র্য আনা এবং পরে তাকে খুন করা; চিকিৎসার বলি হয়েছে রোগী, যখন রোগ থেকে সেরে উঠবারই আশা ছিল তার।

সদাচারের অভাবের অভিযোগটা প্রায় একটা বারান্তক মিথ্যা, সত্যের তা একেবারে বিপরীত; তবে তার যেতু খুঁজব কোনো প্রকারের একটি ভুল-বোঝাবুঝির মধ্যে; কারণ এ তো কিছু নতুন নয়। হিন্দু চিন্তা ও সাহিত্য এই ধর্মাচারের দুর্দান্ত সর্বব্যাপ্তি, প্রায় এমন অভিযোগই করা চলে; সর্বত্র বারংবার এই ধর্মাচারের বাণী। অনন্তের ধারণার পর ধর্মের ধারণাই তার মূল সুর অধ্যাত্মের পরে ধর্মই তার জীবনের প্রতিষ্ঠা। এমন কোনো ধর্মাচার নেই যার ওপর সে জোর দেয়নি, আদর্শ এবং পালনীয় রূপ দেয়নি, শিক্ষা অনুশাসনে রূপক শিল্পসৃষ্টি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত দিয়ে চালু করেনি; সত্য, সম্মান, আনুগত্য, অনুরাগ, সাহস, নিষ্কলঙ্কতা, প্রেম, দীর্ঘ কষ্টভোগ, আত্মত্যাগ, নিরাঘাত, ক্ষমা, দয়া, ঔদার্য, পরপোকার তো সুলভ বিষয়, এ-দৃষ্টিতে সৎ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মানবধর্মের সার বস্তু। বৌদ্ধধর্ম তার সমুচ্চ মহান সদাচার নিয়ে, জৈনধর্ম তার কঠোর আত্ম-জয়ের আদর্শ নিয়ে, হিন্দুধর্ম তার সর্বদিকের অনুপম দৃষ্টান্ত নিয়ে সদাচার শিক্ষায় বা আচরণে কোনো মত বা ধর্মের কাছেই খাটো নয়, বরং তাদের আসন সর্বোচ্চ এবং তাদের ফলপ্রদ শক্তি সর্বক্ষম। প্রাচীন কালে এসব গুণের চর্চা যে ছিল তার প্রচুর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক অধঃপতনের মধ্যেও এখনো তার বিস্তর চিহ্ন রয়েছে, যদিও পুরুষালী গুণের কিছু হ্রাস পেয়েছে—আর এরা তো পূর্ণ ঐশ্বর্যে বিকশিত হতে পারে স্বাধীনতার জমিতে। উল্টো কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে খ্রীষ্টীয় পক্ষপাতদুষ্ট য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মনে, ভারতীয় দর্শন যে মুক্তির উপায় হিসাবে কর্মের চেয়ে জ্ঞানের ওপর বেশি জোর দিয়েছে তাতে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসুদের কাছে সুপরিচিত সেই নিয়মটি তারা ধরতে বা বুঝতে পারেনি যে ভগবৎ-জ্ঞানের দিকে প্রথম সোপান হল শুদ্ধ সাত্ত্বিক মন ও প্রাণ—অনিষ্ট কর্ম যে করে সে আমাকে পায় না, বলেছে গীতা। একথাও তারা বুঝতে পারেনি যে ভারতীয় চিন্তায় সত্যের জ্ঞান অর্থ বুদ্ধির সম্মতি বা স্বীকৃতি নয়, আত্মার সত্যের অনুযায়ী একটা নূতন চেতনা ও নূতন জীবন। পাশ্চাত্য মনের কাছে নৈতিকতা একটা বাহ্য আচারের ব্যাপার; কিন্তু ভারতীয় মনের কাছে আচার হল আন্তরিক স্থিতির একটি ইঙ্গিত ও প্রকাশধারা। হিন্দুধর্ম নিতান্ত গৌণভাবে কতকগুলি অনুশাসন পালনীয় বলে দিয়েছে, নৈতিক নিয়মের তালিকা; তবে আরো গভীরভাবে চেয়েছে মনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শুদ্ধি, কর্ম সেখানে এক প্রকট নির্দেশক। সজোরে, প্রায় সর্বাধিক জোরে, সে বলছে, "হত্যা করো না," কিন্তু আরো সে বলেছে এই আদেশ, "দ্বেষ রেখো না, লোভ ক্রোধ অসূয়ার বশবর্তী হয়োনা", কারণ, নিধনের কারণ এখানে। হিন্দুধর্মে স্বীকৃত হয়েছে আপেক্ষিক নানা আদর্শ, য়ুরোপীয় বুদ্ধি সে-জ্ঞানের তল পায় না।

অনাঘাত এখানে একেবারে সর্বোচ্চ নীতি—অহিংসা পরমো ধর্মঃ ; অথচ যোদ্ধার জন্য একে সে অলঙ্ঘ্য বিধি বলে ধরেনি, তবে তার কাছে নিরবচ্ছিন্ন দাবি ক্ষমা, ঔদার্য, অযোদ্ধা দুর্বল অশস্ত্র পরাজিত বন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং এই রকমে একটা অবাস্তব দারুণ নিগূঢ়-নিয়মের পাশ থেকে মুক্তি। এই অন্তর্মুখিতা আর এই প্রাজ্ঞ আপেক্ষিকতাকে ভুল-বোঝা থেকেই বোধহয় অনেক ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি। পাশ্চাত্য সদাচারী চান পূর্ণতার উপদেশ হিসাবে একটা উঁচু আদর্শ এবং তাকে পালনের চেয়ে লঙ্ঘনের দ্বারা বেশি মর্যাদা দিলে তাঁর কিছু যায় আসেনা ; ভারতীয় সদাচারী ধরেছে সমানই এবং প্রায়শ তদোধিক উঁচু আদর্শ ; কিন্তু জীবনের সত্যের চেয়ে বড় আস্ফালনের বুলিতে তার স্পৃহা কম, সে মেনে নিয়েছে প্রগতির নানা স্তর এবং নিম্নতর স্তরে তার সন্তুষ্টি যদি সে সেখানে যথাসাধ্য নৈতিকমুখী করে তুলতে পারে তাদের যারা এখনো উচ্চতম নৈতিকতার ধারণা ও প্রয়োগের উপযুক্ত নয়।

সুতরাং হিন্দুধর্মের এই সব সমালোচনা হয় বস্তুত মিথ্যা কিম্বা স্বভাবত ব্যর্থ। বিবেচনার জন্য শুধু থাকল যে আরো সুলভ অভিযোগটি পুরোপুরি বা অংশত সঙ্গত কিনা,—ক্ষতিকর এই অভিযোগ যে ভারতীয় সংস্কৃতি শক্তিকে নির্বীর্য করে, মনোবলকে পঙ্গু করে, মানব জীবনকে দেয় না কোনো মহৎ ও প্রবল বল, কোনো সমুচ্চ উৎসাহ, কোনো সামর্থ্যকর মহত্ত্বকর প্রেরণা।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

কর্মযোগের প্রসঙ্গে দেখলাম, দিব্যসঙ্কল্পকে জীবনের কর্মে ধরতে হবে এবং তা থেকে দিব্যকর্ম সংঘটিত হবে আর সাধকের হবে দিব্যজন্ম। কিন্তু সেই বৃহৎ-সঙ্কল্পকে জীবনের কর্মে ধরা তো সহজ কথা নয়। নিষ্কাম কর্ম আরম্ভ করে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়েও পদে পদে ধরা পড়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার (Supreme Will) সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরোধ কতখানি। কত অনুতাপ ক্ষোভ বিবেক-দংশন ইত্যাদিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েও এই মলিন আমির আবরণটি খসতে চায়না। তাই গীতার উপদেশ মত অকর্তার ভাব নিয়ে চলতে পারলে ইচ্ছার দ্বৈতবোধ থেকে মুক্তি ঘটে। আমার আমিকে সমূলে বিনষ্ট করে কর্মে অকর্ম আর অকর্মে কর্ম, এই রকম করে যে দেখতে শিখেছে, সেই হল কৃৎস্নকর্মকৃৎ। আর এই হল কর্মের মূলে কর্মকর্তার যে সমগ্রবোধ (total view)—তাই। গীতায় এই কর্মের পরিণত ভাবটি নিজের মধ্যে দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন...ইত্যাদি। তিনলোকে আমার কর্তব্য বা করার মত কিছু নেই। তবুও কর্ম করছি, না হলে কর্ম লোপ পেয়ে জীব উৎসন্নে যাবে—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ। ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।..." কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত থেকে ভগবান তাই অকর্তার কর্ম করে দেখালেন। যাতে যুদ্ধ না ঘটে, সে চেষ্টাও করলেন তারপর যুদ্ধ ঘটিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করলেন। এ থেকে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাভ করা যায়। তিনি অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন যে প্রকৃতিই সব কিছু করে চলেছেন, তোমার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে যে বিপুল কর্মতরঙ্গ, তা দিয়েই প্রকৃতি কর্ম করিয়ে নেবেন। এই ভাবে দেখতে শিখলে ও পরে অহংকে সরাতে পারলে নিষ্কাম কর্মের অভ্যাস সহজ হয়। কর্তাও যেমন আমি নই, কর্মও তেমন আমার নয়। যে কর্ম এসে পড়েছে, তাকে গ্রহণ করেছি, করে চলেছি। এ থেকে কর্মে উল্লাস আসে। কর্মযোগের প্রথম ভাগে অহং কর্ম করছে, এ ভাব থাকে, কিন্তু গভীরে পুরুষপ্রকৃতির ক্রিয়া ধরতে হবে। সেখানে পুরুষের দৃষ্টিতে বা ইচ্ছায় প্রকৃতির কর্মস্রোত তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে, প্রাণের তটে ভেঙে ভেঙে আছড়ে পড়ছে। এই বোধের পর আরও গভীরে গেলে ওই নিমিত্ত অহংটিই তাঁর প্রকৃতি এই বোধে বোধ হবে। তখন তাঁরই শক্তি "পাকা আমি"কে পেয়ে, তিনিই আমার উদ্দেশ্য ও কর্মের প্রেরয়িতা, এই ভাবে আবিষ্ট হতে পারলে তিনিই সাক্ষাৎভাবে কর্ম করে চলেছেন, এই দিব্য ভাবের আবেশে দিব্য কর্ম অভিসম্পন্ন হবে। তখন অহং নিমিত্ত প্রকৃতি শক্তি সবই তাঁর সঙ্গে অদ্বৈতবোধে পর্যবসিত হবে। এই দিব্য কর্ম কর্মযোগের সাধকের আধারে

বিদ্যুৎ ঝলকের মত সহসা আবির্ভূত হয়ে সম্ভূত হয়, তখনই সাধক যেন দিব্যজন্মে ভূমিষ্ঠ হয়। এই জ্ঞান লাভ করলে সাধক কর্মের গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করে, অথচ দিব্যজন্মের দিব্য কর্ম সে উপলব্ধি করে, যেমন করে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অর্জুনের দিব্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম প্রতিভাত হয়েছিল। আর তখনই ভগবানের উক্তি "সম্ভবামি যুগে যুগে" কি অর্থ বহন করে, সেটা ধরা পড়ে। এই দিব্য শক্তিসম্পাত (Divine Intervention) ঘটলেই নিশ্চিতভাবে প্রত্যয়ে আসে ব্রহ্মসংকল্পের পরিচালনা। তা না হলে দিব্যজন্ম বা দিব্য কর্ম ধরতে পারা সম্ভব নয়। তন্ত্র এই শক্তিসম্পাতকে বলেন অনুগ্রহ-শক্তি, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন Grace—ভগবৎ-প্রসাদ। দিব্য সংকল্পই (Supreme Will) ভগবৎ-প্রসাদ বা দিব্য করুণা (Supreme Grace)-রূপে অবতরণ করেন। সে এক অনির্বচনীয় তত্ত্ব, কোন নিয়মের ধারা ধরে একে ধরা যায়না, অথচ এর চেয়ে পরম সত্যও আর কিছু নেই।

সাধারণত অহঙ্কার বা মনের সংকল্প (egoistic will) নিয়েই মানুষ কাজ করে। যোগকর্ম শুরু করে সাধক দেখতে পেয়ে যে অহং সরে যায়, তাকে সরে যেতেই হয়। গভীরে তার সর্বাবগাহী দৃষ্টির নির্দেশে কর্ম হয়ে চলে—অকর্তার কর্ম। তা থেকে সহসা ভগবৎপ্রসাদ বা তাঁর অনুগ্রহশক্তির অবতরণে দিব্যকর্ম সম্ভাবিত হয়। কাঁচা আমিটি সমূলে বিনষ্ট হওয়া সহজ হয় না, অগণিত তার সংস্কার অভ্যাস ও ধর্মাধর্মবোধের নিগড়, কত সূক্ষ্মভাবেই যে তার মঙ্গলব ভগবৎ-ইচ্ছার রূপ ধরে তাকে নিড়ম্বিত করে, তা আর বলার নয়। ওই বিদ্যুৎ ঝলকের মত অনুগ্রহশক্তি বা ভগবৎ-প্রসাদের অবতরণ যখন যন্ত্রাদির ধাতুবদল পর্যন্ত করে দেয়, তখনই আত্মসহিবার বোধ আসে, না হলে কিছুতেই কিছু হয় না। তখন নিজের ওই কাঁচা অহংটিকে নিজেই আর সহ্য করা যায় না। কবির ভাষায়—

"এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহঙ্কার।
দিনের কাজে ধূলা লাগি
অনেক দাগে হল দাগি
এমন তপ্ত হয়ে আছে
সহ্য করা ভার।
আমার এই মলিন অহঙ্কার।

আমার সব কর্মের মাঝে ওই মলিন প্রতপ্ত অহঙ্কার এসে যে তাপ সৃষ্টি করে, তাতে তাঁর সঙ্গে আমার আড়াল আর ঘুচতে চায় না। যখন আমি নিজেই তাকে সইতে পারি না, আর তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার জন্য অন্তরের ব্যাকুলতা উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখনই

সত্যকার সমর্পণ শুরু হয়। প্রাণে আশা জাগে যে তাঁর আসার সময় হল, এবার তাঁর সঙ্গে মিলনের লগ্নে মলিন বস্ত্রটি পরিত্যাগ করে স্নান করে প্রেমের বসন পরে শুচি শুদ্ধ হতে হবে। তাঁর প্রসাদই যে আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে, সেটা প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর ওই অনুগ্রহ-শক্তির অবতরণেই (Divine Intervention)।

কিন্তু ওই মলিন ও প্রতপ্ত অহংটিকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারা সহজসাধ্য নয়। কর্ম সিদ্ধ হলে কর্মফলের ক্রিয়ায় সূক্ষ্ম অহংবোধ এমনভাবে গর্বে ফুলে থাকে যে সেটা ধরতে পারা সহজ হয় না, সেজন্য গীতা বলেছেন সুখেও বিগতস্পৃহ হওয়ার কথা। অহং ফুলতে ফুলতে অতিকায় হয়ে বেলুনের মত ফেটে পড়ে বা চুপসে যায়, সে ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু তাতে জীবনে ও সাধনে অনেক দেরী হয়ে যায়। আবার কর্মফলে যদি সিদ্ধি না আসে, তাতে ঐ মলিন অহঙ্কারকে আর জমতে দিলাম না, সার্থকতা থেকে দূরেই আছি। তবুও মনের মধ্যে গভীরে আছে প্রশান্তি—"প্রসাদমধিগচ্ছতি"। চিত্ত প্রসন্ন থাকলে এই ভাবের পরিপাকে সত্যকার প্রেমের আবির্ভাব হয়। শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে দেখিয়েছেন যে সত্য (Truth) আর প্রেম (Love) মূলত একই বস্তু। পুরুষসত্তা শান্ত আকাশবৎ, তাতেই প্রেমরূপে তাঁর প্রকৃতি ফুটে উঠছেন, আবার তাতেই মিলিয়ে যাচ্ছেন। তাই কর্ম করার ফলে যে চিত্তের প্রসন্নতা, সেটা দিনের বেলাকার প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্ম সম্পন্ন করে কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় কোন দাগ বা মলিন ছাপ রেখে গেল না। যখন মিলনের লগ্ন এল তখন সব ভার হাল্কা হয়ে গিয়ে চিত্ত ভরে উঠল প্রসাদে, তাঁর প্রেমে। এ তো তাঁরই শক্তি হয়ে যাবার (নিমিত্ত) পরিণাম। মীরাবাঈ গেয়ে উঠেছিলেন "যহাঁনে চাকর রাখো জী।" অষ্টপ্রহর তাঁর দাস হয়ে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, দেহ প্রাণ মন সব ভেঙে মথিত হয়ে যেন নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। তবুও সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজকে একেবারে রিক্ত করে শূন্য করে দিচ্ছি তাঁরই কর্মে, কেন না এ তো তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর সর্বনাশা দৃষ্টিই এই রকম করে নিঃশেষে শূন্য করে উজাড় করে নেবে আমার সব শক্তিকে তাঁর সর্বশক্তিমত্তায়, আর তখনই সেই মহাশূন্যবৎ পরমব্যোমে হবে চৈতন্যের সূর্যোদয়। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে শিষ্যের এই রকম চরম ত্যাগের ও পরম প্রাপ্তির স্থান ছিল। উপনিষদে আমরা এরকম বহু আখ্যান শুনেছি। শিষ্যের ভাব হল ভালবেসে নিজেকে পূর্ণভাবে দিয়ে দেওয়া। "গুরু। তোমার জন্যই তো আমার সব কর্ম, তোমার আলোই যে দেখি সবার মাঝে, আমি যে তোমারই।" এই ভাবের কর্মের ফলে চিত্তে প্রথমে আসে প্রসন্নতা, তার পরেই আসে প্রেম। তাতেই সত্যের ঝলকে ঝলকে অবতরণ সম্ভব হয়। এ-ই হল সিদ্ধির ক্রম। নিজেকে রিক্ত করে করে নিঃশেষে তাঁর কাছে হারিয়ে যাই, আর তাঁর যে সৌম্য প্রসাদ আমার চিত্তের লাবণ্য, তা আবার তাঁকেই বাড়িয়ে দিই। এই ভাবে বিদ্যুৎ ঝলকের মত ছিল যে শক্তিপাত, সেটা ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধে হয় স্থির

সৌদামিনী। আর তখনই বোঝা যায় পৃথিবীতে এই জীবনে আসার অর্থ। তিনিই এই আধারে উন্মেষিত হবেন—এই তাঁর সঙ্কল্প। অপরের সঙ্গে ব্যবধানও তখন ঘুচে যাবে। যে ভাবেই কর্ম করি না কেন, এই হল সেবাকর্ম।

চাতুর্বর্ণ সৃষ্টির মূলে ছিল এই সেবাকর্মেরই বিভাগ। বিবেকানন্দ সবস্তরকে সেবা-কর্মের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন—"জীবে সেবা করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এই বোধে সেবাকর্ম হয় বৃহতের কর্ম। সে কর্ম এমনভাবে হবে যেন আলো ঢেলে চলেছি, এই রকম নিজকে স্বচ্ছন্দ করতে হবে। কোন রকমেই আমার মধ্যে তাঁকে আর আড়াল করতে না পারি। এই ভাবে কর্ম চলতে থাকলে তবেই সত্যসঙ্কল্পের শক্তিতে অতিমানসের পরমতায় পৌঁছানো যাবে তাঁর দিব্যকর্মের শরিক হয়ে। বৈষ্ণবেরা বলেছেন শ্রীভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন তাঁর দিব্যকর্মের সঙ্গী হয়ে আসেন তাঁর পার্ষদগণ। সেই রকম ভাবে বিজ্ঞানঘন পুরুষ ও তাঁর দিব্যসঙ্ঘের অন্তর্গত হবেন পূর্ণযোগের কর্মী সাধক, দিব্যগুরুসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হবেন। উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ঋষিসঙ্ঘসৃষ্ট গুরুসঙ্ঘের পথ ধরতে দেখিয়ে গেছেন। তন্ত্রে তাকে বলে "ওঘ"। যেমন আছে দিব্যৌঘ তেমনি আছে মানবৌঘ। শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন colony of souls। বিষ্ণুবক্ষে কৌস্তুভ রূপে তাঁর হৃদয়াকাশে এই জীবঘন দিব্যসঙ্ঘ শতসহস্র সূর্যের মত দেদীপ্যমান। তাঁর সঙ্গে সেখানে এক বাঁধনে বাঁধা পড়লে কর্মের সার্থকতা সেখানেই লাভ হয়। কর্মের সেই কৌশলই হল যোগশক্তির ফল। বেদে তাকে বলা হয়েছে ক্রতু —ঈপ্সিতার্থের দক্ষতা। দিব্যকর্ম সম্পাদন করতে তাঁরই কর্মের সঙ্গী হয়ে পূর্ণযোগী ঐ দক্ষতা লাভ করেন।

কর্মে নিজের দক্ষতা লাভ করলে জীবনের নিজস্ব যেটা স্থিতি, সেই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তখন সে ভূমিতে থেকে কর্ম করা সহজ হয়, তা সে যে কোন রকমের কর্ম হক না কেন। পরমপুরুষের ইচ্ছা বা সেই সত্যসঙ্কল্পের বাহন হয়ে শুধু চলা কাজেই তাঁর সালোক্য থেকে পতিত করবে, এমন দুরাগ্রহ আর কারও কোথাও থাকতে পারে না। তখন বাহিরের রূপটা হয়ে যায় গৌণ, কিন্তু তা প্রতিফলিত করে অন্তরের সত্যধর্মবোধকে। কবীরের সহজ সমাধির কথা আমরা জানি। সেই কবীর তাঁর জীবনে জীবন-ধারণের কাজ করে গেছেন তাঁত বুনে। তিনি যেমন জোলা (তন্তুবায়) হয়ে এসেছিলেন, তেমনি জীবনভর জোলার কাজ করতে তাঁর দ্বিধা ঘটে নি। তাঁর পুত্রসন্তানের জন্মলগ্নে তিনি বলেছিলেন :—"অহদ্ মুসাফির পল্লনা আয়া, ঘরো নজরধার"—"ও যে অনন্তের মুসাফির, এবার আমার ঘরে এসেছে। ওকে আরতি কর, বরণ কর।" তার নাম রাখলেন কামাল, যার অর্থ হল পূর্ণ। তেমনি কবীরের কন্যাসন্তানও ছিল, তাকে নাম দিলেন কামালী। এই ভাবে তাঁর সাংসারিক জীবনও অতি সাধারণ ভাবে সহজে কাটিয়ে তিনি যখন দেহত্যাগ করেন,

তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কথা হল যে এবার তাঁর আসনে বসবে কে? তাঁর পুত্র কামাল? কিন্তু কবীরপুত্র তাতে রাজী হলেন না। তিনি তাঁর পিতার মতই সহজ উত্তর দিলেন:—আগুনকে কি কেউ কাপড়ে বেঁধে রাখতে পারে? আগুন নিবে ছাই হলে তবেই তা দিয়ে পুটুলি বাঁধা চলে।" এই আগুন হয়ে জ্বলাই হল পরিপূর্ণ জীবন; সিদ্ধের বা কামালের জীবন। জীবনের যেটা স্থিতি বা আসন, তার বাহিরের দিক ভিতরের সত্যকে বহন ও লালন করে বলেই তার সার্থকতা। তাই সত্যকে লাভ করলে যে অবস্থায় যে ভাবেই থাকা যায়, তাই হল জীবনের সহজ স্থিতি—তাঁরই সঙ্গে তাঁর লোকে সর্বদা অবস্থান করা। আর যে কর্মই তখন আসে, তাকে সহজে গ্রহণ করে স্বধর্ম পালন করা যায়। বর্ণাধর্ম রক্ষা করা বা সদাচার পালন করা, সে সবের মধ্যেই আছে তপস্যার যোগ। কিন্তু সে সব সহজ ও ভাস্বর হয়ে উঠবে পূর্ণযোগের সিদ্ধ সাধকের জীবনে, আর সেই জীবন হবে ব্রহ্মসঙ্কল্পের মূর্তিমান বিগ্রহ। সে যোগী যে ভাবেই বাস করুন বা যে কর্মই করুন তিনি পরম সত্যেই স্থিত থাকেন, এই কথা শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—"সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে।"

এখন প্রশ্ন ওঠে, ব্রহ্মসঙ্কল্পকে জীবনে ধরা যাবে কেমন করে? সেই সত্যে বর্তমান থাকার অর্থ কি? প্রথমে দেখতে হবে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তাঁর ইচ্ছা অনুস্যূত হয়ে আছে বলে কর্মে রূপ ধরছে সেই সত্যসঙ্কল্প। সেই ইচ্ছার সঙ্গে যোগ রেখে চললে বুঝতে পারব, তাঁর কর্মই সম্পাদিত হয়ে চলেছে, কর্ম আমার নয়। তাই সমতা ও অহং-বর্জনকে (**annihilation of ego**) কর্মযোগের প্রাথমিক ও প্রধান ভূমিকা রূপে আমরা গ্রহণ করেছি। ঐ কাঁচা আমিটা না থাকলেই বেশ একটা শূন্যতার বোধ আসে, চিত্তে এক ফাঁকা ভাব। শূন্য ডালির মত সত্তাটা শুধু তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে; আর তখন তাঁর ইচ্ছার প্রকাশই শুধু পারে সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে আবার বহিয়ে দিতে। তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হবে আমার কর্তব্য কি এবং যজ্ঞভাবনায় কর্ম করা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও আবার ভালমন্দের বিচার আসে। কেননা যজ্ঞভাবনা তাঁরই উদ্দেশ্যে, সেটা শুধু নিজের জন্যও নয় আবার শুধু পরের জন্যও নয়। তিনিই আমার যজ্ঞেশ্বর প্রভু কর্মাধ্যক্ষ। তিনি বৃহৎচৈতন্য, আর আমার চেতনা তাতে ব্যাপ্ত করতে পারলে হবে আকাশের মত বিস্তারের বোধ, আর সেই সঙ্গে থাকবে রিক্ততার মধ্যেও পরম প্রশান্তির ভাব। এই রকম আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যে আত্ম-চৈতন্য স্থিত হয় আকাশভাবনার পরিণামে।

কিন্তু তখন আবার এ প্রশ্নও উঠতে পারে যে কর্ম করবে কে? মননের দ্বারা আকাশভাবনাকে ধরতে গেলে এই চিন্তাই আসা স্বাভাবিক যে সেই ধ্যান-চেতনার কর্ম থাকে না। কিন্তু ওই ভাবনার পরিপাকে স্থিতি দৃঢ় হলে দেখা যায় যে,

চৈতন্যের একদিকে যেমন প্রশান্তি অচল অটল সুমেরুবৎ স্থির নিঃশব্দ ভিত্তি, আবার তা থেকেই প্রাণ উৎসারিত হয়ে পর্বে পর্বে কর্ম ঘটিয়ে চলেছে। বৈদিক ঋষি আকাশ-প্রাণের দিব্য মিথুন দেখিয়ে এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করেছেন। শ্রীঅরবিন্দদর্শনে ঈশ্বর-শক্তির যুগলতত্ত্বে উপনিষদের আকাশ-প্রাণের ভাবনা ভরা আছে। ব্রহ্ম-মায়া পুরুষ-প্রকৃতি এসব যুগল ভাবের পূর্ণতা ঈশ্বর ও তাঁর শক্তির দিব্য-মিথুন তত্ত্বে তা আমরা দেখেছি। প্রকৃতির বশে অবশ হয়ে তাড়নার চোটে বাধ্য হয়ে যদি কর্ম করতে হয়, তাহলে সে কর্মে রস পাওয়া যায় না। কিন্তু দিব্য-প্রেরণার শক্তিতে সেই কর্ম যখন স্বতঃ উৎসারিত হয়, তখন তা হয় রসনিবিড়। সেজন্য সত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে যে তেজ যোগকর্মে সেটা থাকা চাই। আর তাই হল ঈশ্বরের শক্তির প্রেরণার উৎস বা তাঁর প্রচোদনা। তাই কি রকম প্রেরণা কর্মের উৎস হবে, এ সব কার্যকরী সমস্যা তুলে গীতা জীবনের কর্ম-সঙ্কটের পর্বগুলি দেখিয়ে দিয়েছেন। যোগস্থ হয়ে কর্ম করার নির্দেশ প্রথম সঙ্কট-মুহূর্তেই ভগবানের মুখ থেকে শোনা গেল। প্রকৃতির বশীভূত হয়ে যান্ত্রিক কর্মস্রোতে পড়ে নিস্তার নেই, শান্তি নেই। কিন্তু তার মধ্যে যোগদৃষ্টি খুলে গেলে দেখা যায় যে শরীর-যাত্রার যে সার্বভৌম জৈব কর্ম, সেটা বাধ্যতামূলকভাবে সম্পাদিত করার পরও মানুষের নিজস্ব শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে। পশুর মধ্যে তো তা থাকে না। তাই মানুষ দশের জন্য কাজ করতে চায়, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে—এ হল সমাজনীতির গোড়ার কথা। এ থেকে লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করার কথা আসে। আমরা পূর্বে কর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি যে লোকসংগ্রহার্থে কর্মও বৃহত্তর সমাজ থেকে বৃহতের বোধে নিয়ে যেতে পারে, তখন সেটা হয় যোগকর্ম। আবার সামাজিক এক বৃহতের বোধ এলেও সে কর্ম প্রাকৃত চেতনারই থেকে যেতে পারে। লোকসংগ্রহার্থে কর্মে অনেক বিক্ষোভ এসে উপস্থিত হয়। তখন আদর্শের একটা যান্ত্রিক ছাঁচ বজায় রাখতে গিয়ে যখন সমস্যার সমাধান করতে হয়, তখন মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ থেকে কর্মের প্রেরণা অনেক সময় এত নীচে নেমে যায় যে, তা থেকে উদ্ধার লাভ করতে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এজন্য গীতা সেখানে যোগকর্মের প্রেরণা ধরিয়ে দিয়ে বলছেন অকর্তা হয়ে কর্ম করতে হবে। কর্ম থেকে নিজেকে একটু আলাদা করে রেখে অর্থাৎ তটস্থ উদাসীন থেকে কর্ম করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ ওই অকর্তার ভাব ধরতেই নির্দেশ দিয়েছেন। ওই ভাবের মূলে আছে কিন্তু ত্যাগ। কেননা কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না বলে নৈষ্কর্ম্যের সাধনা করা চলবে না। যোগদৃষ্টিতে ফলের দিকে নজর রেখেই যতটুকু সাধ্য কর্ম করতে হবে, কিন্তু বোকার মত বা অবুঝের মত নয়। তাই নিষ্ফল বোধ হলেও অবিচল থাকতে হবে আবার ফল সিদ্ধ হলেও উল্লাসে মত্ত হওয়া চলবে না। সিদ্ধি অসিদ্ধি জয় পরাভব দুরকমেই সমান প্রতিক্রিয়া হলে পরে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের

সাধনা সার্থক হয়। এর পরে কর্ম সম্বন্ধেও ত্যাগের বুদ্ধি আনতে হবে। স্বভাব ও স্বধর্ম অনুযায়ী কর্মে একটা তুষ্টির ভাব থাকে। সাধারণত মানুষ স্বভাবের অনুকূলে তার নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম করে থাকে। বর্ণাশ্রম বিভাগে প্রাচীন ভারতে সেইরকম ব্যবস্থা ছিল। সমাজ যখন সুস্থ ও বলিষ্ঠ তখন বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর প্রয়োজন বুঝে স্বভাবকর্ম ও নিয়তকর্ম বেঁধে দিয়ে এক প্রাণের সুরে সনাতন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ রকম স্বভাবানুযায়ী নিয়ত কর্ম পেলে কর্মে ছন্দ থাকে, মানব সমাজের স্বাস্থ্য বজায় থাকে।

কিন্তু তা থেকেও বিকার এসেছে। এখন প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তি তার কর্মের প্রেরণা পেয়েও কর্ম বেছে নিতে গিয়ে স্বভাবের অনুকূল কর্ম যদি না পায় তাহলে সে কি করবে? আশ্রম-জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। এ অবস্থায় সে যে কর্ম পায়, সেই কর্মের মধ্যেও এক ত্যাগ-বুদ্ধি (renunciation of work itself) তাকে নিয়ে আসতে হবে। কেননা সেখানে তো বাছাই করার কিছু আর রইল না, যা সামনে আসে সেই কর্মই করে যাবে। কর্মের প্রকারে ও প্রকাশে সমত্ব এনে সিদ্ধি যদি নাই হল, তাতেও ক্ষতি নেই। আমাকে যে কর্মের দায়িত্ব তিনি দিলেন, তাতে আমার রুচি আছে কিনা, আমার স্বভাবে সেটা খাপ খাবে কিনা, এ সব বিচার অনাবশ্যক-বোধে তুলে রেখে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে সে কর্ম গ্রহণ করতে হবে। যাই ঘটুক না কেন, সে ঘটনায় আমি উদাসীন থাকতে পারব। এই রকম করে ঘটনার ওপরেও যখন সমত্ব এসে যায়, সে অবস্থা লাভ করা অনেক বড় কথা। সমস্ত শক্তি দিয়ে ঐ রকম প্রতিকূল অবস্থায় কর্ম করাটা বড় কঠিন। আবার যাদের কর্ম করতে হয়, তাদের প্রতি সেক্ষেত্রে সমত্ব আনতে পারা (equality towards all beings) আরও কঠিন। কিন্তু তা পারলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্তে আলো জ্বলে ওঠে ও পূর্ণতার ভাব আসে, যা কিনা সেই প্রসাদের লক্ষণ—"প্রসাদমধিগচ্ছতি"। সে কর্ম তো আর ভূতের ব্যাগার খাটাও নয় আবার নিছক চাকরী রাখতে কর্ম করাও নয়। "সমনস্ক সদাতচি" থেকে প্রতিটি বিষয়ে সচেতন হয়ে কর্ম করা চাই। দেখা যায় যে ঘটনা সম্বন্ধে যদি বা অভ্যাস করে সমতা আনা যায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষের বিরুদ্ধ ভাবের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা ও নির্লেপের ভাব কিছুতেই যেন আনা যায় না। আমরা তাদের বিচার করে ন্যায়মতের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ নিজের বিরুদ্ধ ভাব আঁকড়ে থাকতে চাই। কিন্তু কর্মযোগে কর্ম যাদের নিয়ে, তাদের প্রতি বিরূপ থাকলে চলে কি করে? সমত্বের ভাব তো আনতেই হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, এই অবস্থায় সমত্বের ভাব রেখে চলতে পারলে এক উদাসীন ভাব দেখা দেবে। প্রথমে সেটা তটস্থ ভাব থাকে, কিন্তু সেই তটস্থ ভাবের পরিপাকে দিব্য উদাসীন দ্রষ্টার ভাবে (Supramental Indifference) চেতনার প্রতিষ্ঠা হয়।

সহিষ্ণুতার প্রসঙ্গে গ্রীকদেশের ষ্টোয়িক দর্শনের (Stoic) সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তে এক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য" পরিত্যাগ করার শিক্ষা লাভ করা যায়। ভাগ্য বা অদৃষ্ট জীবনে যে আঘাতই নিয়ে আসুক, যে বিপর্যয় ঘটুক না কেন, সেটা বীরের মত বুক পেতে নিয়ে সহ্য করতে হবে। তা থেকে আসে তিতিক্ষা, যখন স্থির ও অটল থেকে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা ও সুখে বিগতস্পৃহ হবার সাধনায় অবিক্ষুব্ধ যেন পাথরের মত এক সহ্যশক্তি লাভ হয়। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে দৃঢ় সঙ্কল্প ও শক্তি নিয়ে সহ্য করার অভ্যাস করতে উপদেশ দিতে বলেছেন—"তিতিক্ষস্ব"। তিতিক্ষার শক্তিতে অভ্যস্ত হলে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উপেক্ষার ভাব নিয়ে যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত কর্মের গতি হয়, কাউকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলা যায়না। উপেক্ষা সহযোগে এ ভাবে চলতে পারলে অন্তরের অবর্ণ সমতায় এক রংছুট অবস্থা আসে, যাতে চিত্ত স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং তা থেকে বীর্য লাভ হয়। সেই কারণে বৌদ্ধেরা এই সাধনাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন। এ থেকে আশেপাশের মানুষের প্রতিক্রিয়ায় ও সবরকম ঘটনায় পাথরের মত দৃঢ় এক বজ্রশক্তি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বলভাবে আধারে আহিত হয়। যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাকে বলা হয়েছে যতমান বৈরাগ্য। প্রযত্নসহকারে এই বৈরাগ্যের সাধনে স্থিতি লাভ করতে হলে কৃচ্ছ্রসাধনের এক পর্ব আসে। তাই একে চরম বলে সাধনায় গ্রহণ করলে সেটা আবার নৈষ্কর্ম্যে নিয়ে যেতে পারে। অন্তরে সচেতন থাকলে সর্বত্র এবং সর্বথা চেতনার অনিবার্য বৈপুল্যে আত্মদৃষ্টি খুলে যায়। সে আত্মার কেন্দ্র বিশ্বকেন্দ্রে স্থিত, তাই সমগ্র বিশ্বে সেই আত্মজ্যোতি ব্যাপ্ত। "আত্মদীপো ভব" বলে এই ভূমির নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্তরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অধ্যাত্ম জ্যোতির যে দীপটি প্রজ্বলিত, সেই দিকে চেতনার মোড় ফিরে যায়। সে অবস্থায় শান্তির প্রবাহ যেমন সচেতন হয়ে অনুভব করা যায়, তেমনি সেই শান্তির অচল অনড় দৃঢ় শান্ত ভিত্তিটি ধরা চাই। সে সম্বন্ধে সর্বদা হুঁশে থাকা চাই। এই কারণে আকাশভাবনা শ্রীঅরবিন্দযোগের বড় কথা। Silence, Void, Nothingness, এই ভাবগুলির অনুশীলন সুদৃঢ় না হলে যোগে রূপান্তর আসেনা, ব্যামোহ সৃষ্টি হয়। আকাশের মত ভূমার একরসপ্রত্যয়ের বোধ এই পাথরের মত সুদৃঢ় আধারেই সম্ভব। ওই পাথরেই পরে প্রাণ জাগে। সূর্যের আলো পড়ে বজ্রমণিতে যেমন রংএর ফুলঝুরি দেখা দেয়, তেমনি সেই বজ্রনিধর আধারে নানারকম দিব্য ভাবের উদয় হয়। সত্তা থেকে এক কল্যাণের প্রবাহ আলোর ধারার মত বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এর পর পর অবস্থাগুলি গীতায় বর্ণিত উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর, এই পাঁচ রকম ভাবে কর্মযোগীর সিদ্ধিতে ক্রমগুলি দেখা দেয়। উপদ্রষ্টা শূন্যবৎ শুধু দেখে যান, কিন্তু সেই সাক্ষীপুরুষের দৃষ্টির সম্মতি না পেলে প্রকৃতিতে কর্ম হবে কি করে? তাই অনুমন্তাও তিনি। সে সাক্ষীপুরুষ প্রকৃতিতে জড়িয়ে থাকেন না, তফাতে থেকে তাঁর দর্শন ও সম্মতি দিয়ে যান। তখন প্রকৃতির 'পরে যে নিয়ত কর্ম এসে পড়ছে, তা যদি স্বভাবের অনুকূল নাও হয় তবুও তা করে যাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে আকাশভাবনা ও আত্মতুষ্টি দুই-ই

একসঙ্গে যোগের বনিয়াদরূপে পেতে হবে, আর তা হতেই যোগের উপায়-কৌশল খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি যা কর্ম দিলেন, তার উপকরণ নেই, যন্ত্রগুলি সব কাণা খোঁড়া; তবুও তাই নিয়েই যতটা সম্ভব স্বভাবের অনুকূল করে প্রাণ দিয়ে তাঁরই কর্ম করে যেতে হবে। এই রকম করে চলতে পারলে অন্তর থেকে শুভ প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে প্রথম দিকে যে আকাশবৎ উদাসীনতা, সেটা দার্শনিকসুলভ জীবনদর্শন। কিন্তু ঐ ভাবনার অভ্যাসে চিত্ত ফাঁকা হয়ে গেলে তাতে রসচেতনা স্ফুরিত হয়। গীতা যেমন বলেছেন যে সাধারণ লোকে আসক্তি নিয়ে কর্ম করে, কিন্তু যোগযুক্ত বিদ্বান তাদের সঙ্গে কর্ম করে তাঁর নিজের যুক্তকর্ম হতে তাদের কর্মেও রসের প্রবাহ বহিয়ে দেন। অনেক ক্ষেত্রে এ রকম দেখা যায় যে, কারও কোন বিষয়ে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তার জীবনে সেদিক থেকে কিছু করবার সুযোগই যেন এল না, ইচ্ছাসত্ত্ব কিছুতেই সেটা করা গেল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জীবনের অন্য দিক দিয়ে যে ধরণের কর্ম এসে পড়ল, সেটা সে প্রাণপণ করে যথাসাধ্য সম্পন্ন করে রসের সন্ধান পেয়ে নিজেকে সার্থক মনে করল—এ রকমও হয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দেখা যায় যে, তিনি কি না করেছেন! মহাযোগেশ্বর যোগযুক্ত না হলে কি এরকম হতে পারে? তিনি নিজে কর্ম করেছেন বৃন্দাবনে আর সেই সঙ্গে সকলের কর্ম হয়ে উঠেছে মধুর। তেমনি আবার মহাভারতের পটভূমিকায় তাঁর ঐশ্বর্যের মাধুরী! সেখানে তাঁর কর্ম ঘোর যুদ্ধকর্মেও তাঁর সহকর্মীদের রসের জোগান দিয়েছে। এই ভাবের অনুশীলন করে গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে স্বয়ং গৃহকর্তা যদি ওই আদর্শের অনুসরণে সকলকে নিয়ে রসে বশে চলে কর্ম করেন, তাহলে গৃহকর্মের খুঁটিনাটি পর্যন্ত সব ছন্দে সাধিত হয়। সকলেই সেই পথ ধরে চলতে পারলে দেখবে চেতনার আনন্দীপই বিকীর্ণ হয়ে চলেছে। কর্ম হয়ে চলেছে, কিন্তু অকর্তার ভাব। এই অকর্তার কর্মই নিয়ে যায় নিমিত্ত কর্মে: সেখানে উদাসীনতার দর্শনই নিয়ে যাবে অতিমানস চেতনার দিব্য উদাসীন দ্রষ্টার ভূমিকায়—আর সেটাই তো চরম ভাব।

গীতার শ্লোকগুলি আবার মিলিয়ে নিলে দেখতে পাব, প্রথমে প্রকৃতির বশ হয়ে চলাটা দেখতে শিখতে হবে। সেটা দেখতে পারলে তা থেকে আসবে বিবেক-জ্ঞান। তখন দেখা যাবে প্রকৃতিই কর্ম করে চলেছে, দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান করছি, শুধু দেখে যাই। আমারই ভিতরে প্রকৃতির কর্ম ও প্রতিক্রিয়া কি ভাবে হয়, তারও সাক্ষী হয়ে আছি। চৈতন্য কেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে, আর কর্মের প্রবাহ আসা যাওয়া করছে। তখন অকর্মেও কর্ম আর কর্মে অকর্ম দর্শন করতে পারলে হয় অকর্তার কর্ম বা কৃৎস্নকর্মকৃৎ, আর তা হতেই সর্বকর্মবিশারদ হওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থা খুব ভাল করে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। যেমন—কর্ম তুমি কর না, তবুও তোমাদের দিয়ে কর্ম করিয়ে নেওয়া হয়, বা কর্ম হয়ে যায়। শান্ত স্তব্ধ আকাশের বুকে যেমন বয়ে চলে

প্রাণের মুক্ত ধারা, ঠিক তেমনি করেই সত্যসঙ্কল্প "একোঽহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" কর্মের মধ্যেই সম্পদ্যমান হয়ে চলে—সকলের জন্য নিজেকে দিয়ে কর্ম হয়ে বয়ে চলব, এই হল আত্মোৎসর্গের মূল ভাব। শ্রীঅরবিন্দ শক্তির ওই অফীয়মাণ ধারা ও তার উৎস যে নীরবতা (Silence) ও শূন্যতা (Void) সেই ধ্যানচিত্র কতবার কত ভাবেই তাঁর বাণীতে তুলে ধরেছেন। এ থেকে সাধকের প্রতি উপদেশ হল, প্রকৃতিতে উৎসারিত কর্মস্রোত দেখে, সে ধারা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে অকর্তা হয়ে অন্তরের কেন্দ্রস্থলে গভীরে তাঁরই সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত হও। অর্জুন নিজের বুদ্ধি বিচার অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে নেবে সদাচার ও সৎসঙ্কল্পের দোহাই দিয়ে পশ্চাৎপদ হতে চাইলেন, তিনি নৈষ্কর্ম্যের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর টুঁটি চেপে ধরে তার স্বভাবজ ক্ষাত্রধর্ম দেখিয়ে দিলেন যে যুদ্ধ তাকে করতেই হবে, প্রকৃতি তার আপন শক্তিতেই যুদ্ধকর্ম করিয়ে নেবে। কেননা এ কর্ম অবতারের আপন কর্ম—তাঁর কল্যাণ কর্ম। "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—আমার শক্তিতে মায়ার বিকার উৎপন্ন হলে, তা থেকে আসে ধর্মের গ্লানি, আর তখনই নতুন করে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি নিজেই আবির্ভূত হই"। এই হল ভগবানের নিজের মুখের কথা। আমরাও জীবনে সেই কল্যাণকর্মকেই খুঁজে বেড়াই। আমরা যে শিবকে শিবত্বকে চেয়ে চলেছি, এও সেই ভগবানেরই কর্ম। তা না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না, সে প্রৈতি, সে তো কেবল এগিয়ে চলতে চায়। সে যা হয়ে আছে, তার উর্ধ্বে উঠে যেতে চায়; সে-ই তার এষণা, সে-ই তার সনাতন কর্ম।

কিন্তু এগিয়ে চলতে গিয়েও মানুষের চলা দুভাবে সিদ্ধ হয়, যেমন একদিকে নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সেপথে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন যে কর্ম না করেই নৈষ্কর্ম্যের পথে গেলে অনেক সময় ঘোর তমে ডুবে যেতে হয়। সেটা কিন্তু সিদ্ধি নয়—পরাভব। আবার অপর দিকে যজ্ঞ দান তপস্যা এ সব সৎকর্ম করলেও সে সব কোন কর্মই ব্যক্তিগত ফল লাভের জন্য নয়, তাই মূলে চাই ত্যাগ। যদি শিবের পথে কল্যাণের পথে শ্রেয়োলাভের জন্য চলতে চাও, এক সার্বভৌম কল্যাণের আদর্শ ফুটিয়ে চলতে হবে। তাতে সর্বজনেরও কল্যাণ। যোগীই জানেন তাঁর দিব্য প্রেরণায় তিনি যে লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করেন, নিমিত্ত হয়ে কর্ম করেন, সে সব তাঁর যোগযুক্ত কর্ম—ঈশ্বরশক্তিরই কর্ম। তাই তিনিও তখন হয়ে যান ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রবৎ চৈতন্য, আর তার মধ্যে প্রাণ আন্দোলিত—সেই হয় তাঁর দিব্য কর্ম। "আমি" তাঁর নিমিত্ত, যাদের নিয়ে কর্ম যাদের সঙ্গে কর্ম আর কর্মের ফলাফল, সব সম্বন্ধেই এক উদাসীন ভাব। এক দিকে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে তাঁর হাতের যন্ত্র হয়ে তাঁর দিব্যকর্মের শরিক হতে পারলে, ঐ পাথরে খেলে যায় রামধনু রং। তখন সে আর সাধারণ পাথর

নয়, বস্তুমণি হয়ে বিশ্বপ্রকৃতিকে সে দেখে বুঝে নিয়েছে। তার আর কারও সঙ্গে বিচারের সম্পর্ক নেই, সে ঘটনাতেও (happening) যেমন, ঘটিত ও ঘটকেও (beings) তেমন চরম উদাসীন। তা থেকে অহং সমূলে উৎখাত (annihilation of ego) হয়ে যায়, আর তাঁর নিমিত্ত হতে পেরে বা হবার জন্য বিশুদ্ধ রসবোধ জাগে। এ সব গভীর অনুভূতির বিষয়, শুধু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার বস্তু (logical) নয়।

কূটস্থ আত্মা (Self) ও চৈত্যপুরুষ (Psychic being) একই সঙ্গে আছেন ঈশ্বরশক্তির সম্বন্ধের মত। তাই তাঁর কর্মের জন্য বিপদের মধ্যেও আনন্দ পাওয়া যায়। তাতে চৈত্যপুরুষ উন্মেষিত হতে থাকেন, আর তারও ভিতরে শক্তির নিমেষের মধ্যে সাক্ষী আত্মা শূন্যবৎ হয়ে আছেন। ঐ চৈত্যপুরুষই জীবনরসের রসিক, আগ্রতে মনধদ পুরুষ। স্বয়ং ঈশ্বরই সাক্ষী হয়ে আছেন—আত্মা পুরুষ। তাঁরই শক্তিতে চৈত্য-সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে জীবন সহজ হয়ে এল, কোন ক্ষোভ সঞ্চিত রইল না, এই জীবন-দর্শন কর্মে প্রতিফলিত হয়। চৈত্যপুরুষেরই কর্ম, তাই রসের সঙ্গেই কাজ করে চলেছি। মীরাবাঈ সিদ্ধ হয়ে গান করেছিলেন "আমাকে তোমার চাকর করে রাখো"—এই হল সিদ্ধের কর্মযোগ। আবার সেই সঙ্গে সাক্ষী চৈতন্য নিয়ে প্রকৃতিতে সকলের মধ্যে সুখ-দুঃখ ভালমন্দ, এই রকম সব কিছু অপূর্ণতা বা দ্বৈতও দেখা হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে কর্মযোগের পূর্ণতা আসে। *

(ক্রমশ)

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

জুলাই ২৯, ১৯৫৩

প্রশ্ন মা, আপনি একদিন আমাদের বলেছিলেন যে আমাদের যখন যা কিছু ঘটে তা আগের থেকেই নির্ধারিত থাকে। এ কথার মানে কি?

উত্তর : ঐভাবেই তো আগে পরে বলতে হয়, একটা কোনো বিষয় বলতে গেলে তার সব জিনিসটাই তো এককালে বলতে পারিনা,—তা কি পারি? আমাকে বাধ্য হয়ে একটার পর একটা বলতেই হয়। সব কথাগুলো যদি এককালে বলতে যাই তাহলে শুধু একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ করাই হবে, অথচ কেউ কিছু বুঝবেনা! গোটা বিশ্বটার কথা যদি বোঝাতে চেষ্টা করো তাহলেও তোমাকে ঐ ভাবেই বলতে হবে। শুধু একটার পর একটা করেই বলে যাবে, অথচ সমগ্র সত্যটা একত্রে জানাতে হলে তা এককালেই বলা উচিত। কিন্তু তা কেমন ক'রে হতে পারে বলো?...আর ঐ যে আমার কথাটি এখন উদ্ধৃত করছ তা হয়তো কোথাও আমি বলেছিলাম...তেমনি আবার ওর বিপরীত কথাও নিশ্চয় বলেছি কিন্তু ঐভাবে যদি বলাই হয়, "যা কিছু ঘটে তা আগের থেকে নির্ধারিত থাকে" তাহলে বর্তমান সময়টিকে ধরেই তা বলা হবে, অর্থাৎ যেন তুমি বলছ আজ যেটা হলো তা গতকাল থেকে নির্ধারিত ছিল, আর এ বছরে যা নির্ধারিত হয়েছে তা আগামী বছরে সাধিত হবে। স্বভাবত এই ভাবেই জিনিসটা তোমার চেতনাতে তর্জমা হয়ে যায়, কারণ এমনি ভাবেই আমরা সব কিছু দেখি, বুঝি ও প্রকাশ করি। কিন্তু বস্তুত তা নয়।

এমন মানুষ আছে যারা ওর অবাস্তবতা এতই স্পষ্ট দেখতে পায় যে এগিয়ে যাওয়ার বদলে পিছিয়েও তারা যেতে পারে, কারণ আগে এবং পরে এবং বর্তমানে ভেবে আমরা যা কিছু বলে থাকি তা বস্তুত একত্রেই রয়েছে। কেবল তা বিভিন্ন থাকের মাত্র। যদি বলি, "তোমার যা হচ্ছে তা পূর্বনির্ধারিত", তাহলে সে কথা যেমন সত্য হবে তেমনি মিথ্যাও হবে, কারণ ভাষাতে আসল অবস্থা ব্যক্ত করা অসম্ভব।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে এ কথা বুঝবে। ঠিক কোন সময়ে বলতে পারছিনা, সম্ভবত ১৯২০ সালে (কিংবা তার আগে ১৯১৪।১৫ সালেও হতে পারে, তবে বোধহয় ১৯২০তেই হবে) তখন আমি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একত্রে ধ্যানে বসতাম; বারান্দার টেবিলে তিনি বসতেন এক দিকে, আমি বসতাম অন্য দিকে: একদিন এইভাবে ধ্যানে থাকতে থাকতে (কি ক'রে বোঝাই?...) আমি উঠে গেছি অনেক উচ্চে, বা ঢুকে গেছি অতি গভীরে

যা বেরিয়ে চলে গেছি নিজের ভিতর থেকে (বেটাই কেন বলি, প্রকৃত যা হয়েছিল তা সঠিক ব্যক্ত করা যাবেনা), অর্থাৎ এমন জায়গাতে বা চেতনার এমন অবস্থাতে গিয়ে পড়লাম, যেখান থেকে অতি সহজেই শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে পারলাম, "ভারত স্বাধীন হয়ে গেছে"। এটা ১৯২০ সালেই হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন ক'রে?" আমি বললাম "বিনা ঝগড়াতে, বিনা যুদ্ধে, বিনা বিপ্লবে। ইংরেজেরা নিজেরাই ছেড়ে চলে যাবে; জগতের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াবে যখন আর চলে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।"

ওটা হয়েই গিয়েছিল। পরে যখন তিনি এই নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন আমি বলেছিলাম, আমি দেখতে পেলাম ভারত স্বাধীন, তা প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু বাস্তবে ভারত তখনও স্বাধীন হয়নি, কারণ ওটা ১৯২০ সালের কথা। অথচ জিনিসটা তখনই হয়ে গেছে। সেটা বাস্তবে হলো ১৯৪৭ সালে, অর্থাৎ তোমাদের বাহ্য হিসাবে আমি ২৭ বছর আগেই তা জানলাম। কিন্তু প্রকৃত কাজ তখনই হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঐ সঙ্গে আপনি কি পাকিস্তান হওয়াও দেখেছিলেন?

উত্তর: না, পাকিস্তান না হয়েও ভারত স্বাধীন হতে পারত। বস্তুত তখন শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছিলেন তা যদি ওরা শুনতো তাহলে পাকিস্তান হতে পারত না।

সব কাজ এই ভাবেই হয়, কেবল বাইরে প্রকাশ পেতে সময় লাগে।

প্রশ্ন কিন্তু মা, আপনি যদি আগের থেকেই দেখেন যে কোনো বিপদ আসছে, তাহলে কি চেষ্টা করলে তাকে রুখে দিতে পারেন না?

উত্তর ওটা নির্ভর করে ঘটনার প্রকৃতির উপর। এর মধ্যে অনেক কিছু জিনিস আছে...কোন স্তর থেকে দেখা যাচ্ছে তাই নিয়েও কথা। এমন স্তর আছে যেখানে সকল রকমের সম্ভাবনাই রয়েছে, অতএব সে স্থলে একটা কিছুকে বদ্‌লে দিতে পারার সম্ভাবনাও রয়েছে। বিপদ আপদের সম্ভাবনা আগের থেকে সেই স্তরে দেখতে পেলে তাকে নিবারণ করার শক্তিও সেখানে কাজ করে। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে আগের থেকে জেনেও সে ঘটনাকে ঠেকানো যায় না। আবার তার বেলাতেও তুমি তাকে কোন স্তর থেকে দেখছ তার উপরেও নির্ভর করে।

একটা ঘটনার কথা জানি যাতে এই ভাবে দেখতে পেয়ে বিপদ নিবারিত হয়েছে। একজন আমেরিকান ভদ্রলোক কোনো আমেরিকান হোটেলে গিয়ে উঠেছিল যেখানে উপর নিচে ওঠানামা করবার জন্য লিফ্‌ট ব্যবহার করা হয় (সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা না করে);

সেই হোটেলে রাত্রে থেকে সকালে ঘুম ভাঙার আগে ভদ্রলোক এক স্বপ্ন দেখলে যা জেগে উঠেও স্পষ্ট স্মরণ হলো। লিফ্‌ট-চালক নির্দিষ্ট রকমের পোষাক পরা এক ছোকরা যেন লিফ্‌টের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে ভিতরে ঢুকতে আহ্বান করছে; কিন্তু যার ভিতরে ঢুকতে বলছে তা প্রকৃত লিফ্‌ট নয়, একটা শবাধার গাড়ি!...ও, তোমরা নিশ্চয় দেখে থাকবে তেমন গাড়ি যাতে ক'রে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় গোরস্থানে, যাদের পোড়ানো হয়না তাদের মৃতদেহকে সেই গাড়িতে কালো ঝালর প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠিক তেমনি একটি গাড়ি রয়েছে, ছোকরাটি তার মধ্যেই ওকে ঢুকতে আহ্বান করছে। তার পরে সকালে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে লিফ্‌টের কাছে গেল তখন দেখলে স্বপ্নে দেখা ঠিক সেই ছেলেটি, তার মতো মুখ আর তারই মতো পোষাক, ঠিক তেমনি ক'রে ওকে লিফ্‌টের মধ্যে ঢুকতে বলছে। এই দেখেই তার সে স্বপ্নে দেখা শবাধার গাড়ির কথা স্মরণ হলো, তখনই সে "না, না" বলে সিঁড়ি দিয়েই হেঁটে নিচে নামতে চলল। নিচের তলায় গিয়ে পৌঁছবার আগেই একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হলো, সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল যে সেই লিফ্‌ট উপর থেকে ছিঁড়ে গিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে তলায় পড়ে গেল, যারা ওর মধ্যে ছিল তারা সকলেই মারা গেল। স্বপ্নে আগের থেকে এটা জানাতেই সে বেঁচে গেল।

এই সব ক্ষেত্রে আগের থেকে দেখে আসন্ন বিপদকে ঠেকানো যেতে পারে।

আরো এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে আগের থেকে তোমাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়। অর্থাৎ আসন্ন কোনো কিছুর জন্য তোমাকে ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত করা হয়, যাতে তুমি তার সম্মুখীন হতে আভ্যন্তরীণভাবে তৈরি হয়ে যাও। যেন শিক্ষা দেবারই জন্য তোমাকে বলা হয়: "এর দ্বারা তুমি কিছু শিক্ষা পাবে।" তাকে তুমি বদলাতে পারোনা, কিন্তু আপন মনোভাব ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াকে বদলাতে পারো। মন্দ প্রতিক্রিয়া ও বিপরীত মনোভাবের পরিবর্তে যে অভিজ্ঞতা আসে তাকে ভালো মনোভাব ও সমুচিত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারো, ওর থেকে যথাসম্ভব উপকার পেতে পারো।

যাই কেন হোক, তুমি কোন স্তর থেকে দেখছ তারই উপর সমস্ত নির্ভর করে। রাত্রে ঘুমের সময় যদি নিজের উপর দখল থাকে, তাহলে স্বপ্নে যা কিছু দেখ বা অন্তর্দৃষ্টিতে কিছু পাও, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি তা বুঝে নিতে পারো যা কিছু তোমাকে সতর্কতা জানাচ্ছে, তার দ্বারা আগের থেকে জেনে সমুচিত মনোভাব নিয়ে যা আসন্ন তার জন্য প্রস্তুত হতে পারো। এও একটা শিক্ষা, কিন্তু সব সময় একই রকম শিক্ষা হয়না। সে ক্ষেত্রে কখনো বা ইচ্ছার দ্বারা কাজ করতে হয়; আর কখনো বা ঘটনার দ্বারা বা আভ্যন্তরীণ শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হয়ে তার ক্রিয়াকলাপকে অনুকূল ক'রে নিতে হয়। ঐরূপ দৃষ্টি পাওয়া ও স্বপ্ন দেখার মধ্যে শত রকমের বিচিত্রতা আছে এবং তার শিক্ষাও বিভিন্ন রূপ।

যেমন, কেউ যখন রোগে বা দুর্ঘটনায় পড়ে, আর সেটা যখন আমি নিজেই দেখি কিংবা বাহির থেকে কেউ জানায়, সেখানে তার জন্য আমার কাজ সব সময় ঠিক একই রকম হয় না। খবর পেয়ে কখনো দেখি যে সেই আক্রমণকে থামাতে হবে এবং আমার তাকে আরোগ্য করার মতো পুরো শক্তি রয়েছে। আবার কোথাও বা দেখি যে সেখানে আমার হস্তক্ষেপ চলবে না। যেমন, কারো হয়তো দেহত্যাগের সময় হয়েছে, তাকে যেতেই হবে। সেখানে আমি কেবল এমন আবহাওয়া আনতে পারি যাতে তার সর্বাপেক্ষা কল্যাণের কাজ হয়, বিরুদ্ধ ক্রিয়াকে যথাসাধ্য কমিয়ে,—সব নির্ভর করে ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরে।

যেখানে বিশ্বগত প্রয়োজনে কিছু ঘটছে সেখানে তার কিছুই বদলানো যাবেনা। আবার এমন ঘটনা আছে যা ঝুলে থাকার মতো, এদিক বা ওদিক দুই-ই হতে পারে। সবই কেবল যে স্পষ্ট ভাবে দেখে নেওয়া দরকার তাই নয়, পুরো নিরপেক্ষ ও নির্বাক্তিক হতে হবে, কিছুমাত্র পক্ষপাত না থাকে। এমনি সম্পূর্ণরূপ নিরপেক্ষ অবস্থা—এমন চেতনার অবস্থা যা দর্পণের মতো নিখর—তবেই দেখা যাবে যে ভিতরে কি হচ্ছে, বদলানো যায় কিনা বা যা আসছে তাকে ফেরানো যায় কিনা।

বস্তুত প্রত্যেক ঘটনারই অবস্থাপার্থক্য আছে। কোনোটির-বা আদ্যন্ত সমস্তই পাল্টানো যায়; কোনোটির-বা অনেকখানি বদলানো যায়; কোনোটির-বা অল্পমাত্র বদলানো যায়—কিন্তু তাতেই যথেষ্ট কাজ হয়, আবার এমন কতকগুলি আছে যা কোনোমতে বদলাবার বা এড়াবার নয়,—তাকে ঠেকাতে গেলে দেয়ালে তোমার মাথা ঠুকে যাবে অথচ কাজ কিছু হবে না। প্রতি ক্ষেত্রেই তোমাকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে হবে যে তা কোনরকম স্তরের ঘটনা, এবং যা হবেই হবে তার বিরুদ্ধে অন্যরূপ ইচ্ছা করতে না যাওয়া।

এমনি ঘটনার বিভিন্নতা সম্বন্ধে আমি শত শত দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

একটা জিনিস সম্পূর্ণ অবধারিত হয়ে আছে। কিন্তু তোমার ভিতরকার প্রবল ইচ্ছাশক্তি আগুনের মতো জ্বলে উঠল, এমন একটা প্রবল আস্পৃহা যা উচ্চশক্তির ইচ্ছার সঙ্গে সমান, সেই ইচ্ছাকে তুমি প্রয়োগ করলে উক্ত ঘটনার উপরে। এতে একরকম মিলমিশ ঘটে যায়; যেটা হবার সেটা হয়ই, তবু তার সঙ্গে এমন একটা কিছু আসে যাতে সেই ঘটনার প্রকৃতিটা বদ্‌লে যায়। পার্থিব ব্যাপারে যেগুলি ঘটে তাতে প্রায়ই এমন হয়ে থাকে। যেমন, নানা অবস্থাবৈগুণ্য ঘটনাচক্র ও মিলিত শক্তিক্রিয়ার ফলে হয়তো একটা যুদ্ধ বাধা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল, সেখানে তুমি তোমার অন্য ধরণের তীব্রশক্তির প্রয়োগের ফলে তার গুরুত্ব ও সর্বনাশকে অনেকটা কমিয়ে আনতে পারো, এমন কি যুদ্ধকে ঠেকানো না গেলেও তার ক্রূর হিংস্র প্রকৃতিকে পাল্টে দিতে পারো। এর দৃষ্টান্ত সাধারণভাবে আমি তোমাদের দেখাতে পারি।

মৃত্যু সম্বন্ধে সেদিন তোমাদের বলেছি যে আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার দ্বারা কতটা কি করা যায়, আগতপ্রায় মৃত্যুকে একটা নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে পড়তে না দিলে সে সরে গিয়ে অন্য কোনো ঘরে ঢোকে। মৃত্যুর পাওনাটা সে নেবেই, তাকে ঠেকাতে পারোনা। এমন সব ক্ষেত্র আছে যেখানে তুমি ছেলেমানুষের মতো জিদ্ করো "এখনো মৃত্যুর এখানে সময় হয়নি", সেখানে তুমি বিনা ক্ষতিতে তার শিকার কেড়ে নিতে পারো। কিন্তু সব স্থলে তা হয় না। যেখানে হয় সেখানে তা যেন ছেলেদের রূপকথার মতো শোনায়। কিন্তু তাও নির্ভর করে অবস্থা বিশেষের উপর, ঘটনার গতি অনুসারে।

আমি তোমাদের বোঝাতে চাই যে জিনিসটা খুবই জটিল ও সূক্ষ্ম; ঘটনার দ্বারা কোথাও বা একটুমাত্র আর কোথাও বা সমস্তটাই পাল্টানো যায়: কোথাও বা কেবল তার ফলাফলকে ও তার সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ মনোভাবকে মাত্র পাল্টানো যায়। লোকে অবশ্য এ সব জিনিস নিতান্ত সরলভাবেই দেখে, আর মনে করে যে ভগবানের কাছে তাদের প্রার্থনারই ফল হয়েছে; কোথাও বলে, "আমি যা চেয়েছি তাই ভগবান দিয়েছেন", আর কোথাও বলে, "ভগবান দিলেন না।" এতেই শেষ, এবং তারা মূঢ়তা হেতু এই রকমই বোঝে। কিন্তু কোনটা কেমন করে হলো তা বুঝতে অন্ততপক্ষে একটা জগৎজোড়া রকমের সামগ্রিক চেতনা থাকা চাই। ঠিক ভাবে বুঝতে হলে চাই একটা বিশ্বচেতনা। তার কারণ আজই তোমাদের পড়াতে পড়াতে বলছিলাম যে সমস্ত কিছুই পরস্পর-নির্ভর গাঁথা হয়ে চলছে, তার মধ্যে 'গোড়া' বা 'শেষ' বলে কিছু নেই। শুরু বলে কোথায় ধরতে পারবে?.. তা বুঝতে হলে পৃথিবীর গণ্ডী ছেড়ে যেতে হবে বিশ্বচেতনাতে, তবেই বুঝবে।

কিন্তু আগে বলেছি—আবারও বলছি—যে আমরা বাধ্য হই একটার পরে একটা ক'রে বলতে। তাই এই ভাবে বলি "বিশ্ব যখন শুরু হলো...সৃষ্টি যখন আরম্ভ হলো... প্রথমে এই হলো...তার ফলে এই হলো এবং তার থেকে তাই হলো, তাতেই ঘটল এমন যার অমন..."। এমনি ক'রে পরে পরে বললেও বস্তুত তা এমন তো নয়! এক দিক থেকে দেখলে এটা বোকামি, কিন্তু তা ছাড়া উপায় নেই। একত্রে সমস্তটা বলা যায়না। আমাদের চেতনার মাত্রা ও প্রকাশশক্তি অনুযায়ী এই রকমই বলতে হয় যা পূর্ণ চেতনার দিক থেকে মূঢ়তা। কিন্তু জিনিসটা ঐ ভাবে মানিয়ে নিতে হয়, এবং যখন জানি যে ও ছাড়া উপায় নেই তখন আর তাকে অতটা মূঢ়তা বলা যায়না। সমগ্রকে আমাদের পর্যায়ক্রমে বলতে হয়।

অধিকাংশ লোকের কাছে এ কেবল বলার প্রশ্ন নয়, তারা জেনেও রাখে ঐভাবে পর্যায়ক্রমে, অনুভবও করে তাই, আর সেই মতোই তারা কাজ করে। কিন্তু এমন চেতনাও আছে যার দ্বারা তুমি সমগ্র ভাবেই জানো, একত্র ভাবেই বোঝো এবং তাকে প্রকাশ করা আর কাজও করা হয় সেইভাবে। কিন্তু কেমন ক'রে সেটা হয়? এখানে তা তো হয়না।

অতএব সেখানে দুই রকম চেতনার মধ্যে আপস এনে পরস্পরকে যথাসম্ভব কাছাকাছি ক'রে নিতে হয়, যাতে বাহ্য জীবনে বাহ্য চেতনাতে থাকতে বাধ্য হলেও (কারণ স্থূল জগৎ যেমন স্থূল চেতনাও তেমন) অন্যভাবে ঐ অন্যরূপ চেতনার এতটা কাছে যেতে পারি যাতে বাস্তবের আইনমত বাস্তবের কাজগুলি করেও ভিতরের চেতনাতে এ কথা ভুলিনা যে সেটা কেবল আপস করা হচ্ছে, আসল জিনিস যা এ তার তর্জমা মাত্র।

প্রশ্ন মা, আপনার এই "কথাবার্তার" মধ্যে (মে ২৬, ১৯২৯) এই প্রশ্নটির অর্থ বুঝতে পারিনি "আমাদের ইচ্ছা যদি হয় বিশ্বইচ্ছার অভিব্যক্তি মাত্র, তাহলে ব্যক্তিগত প্রবর্তনার স্থান রইল কোথায়? ব্যক্তি কি কেবল বিশ্বক্রিয়ারই প্রকাশের যন্ত্র মাত্র? তার কি কোনো নিজস্ব মৌলিকত্ব বা সৃষ্টিশক্তি নেই?"

উত্তর ও! ওর উত্তর আমিও বুঝিনি। আমাকে যখন ঐ প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন আমিও মুশকিলে পড়েছিলাম, কারণ ওর মীমাংসা ছিল আমার বোধশক্তির বাইরে। এখন কিন্তু ঐ প্রশ্ন দেখে আমার বলতে ইচ্ছা হচ্ছে "দুঃখের বিষয়, ঐ প্রশ্নটি যে তুলেছিল, তার চিন্তা ও চেতনা এমন জট পাকিয়েছিল যে সমস্তই সে একত্রে মিশিয়ে ফেলেছিল।" কারণ এখানে তিনটি বিভিন্ন জিনিস একত্রে জড়িয়ে আছে।

প্রথমত, জানিনা কে তাকে বলেছে যে আমাদের ইচ্ছা বিশ্বইচ্ছার প্রতিধ্বনি মাত্র...হয়তো ওর পূর্বে আমি বলে থাকবো যে মূল ইচ্ছা একটাই, জনে জনে ব্যক্তি চেতনার মধ্যে তা ঢুকে বদলানো রূপ নিয়ে তা নিজের ইচ্ছা হয়ে দাঁড়ায়। আরো বলে থাকব যে ব্যক্তি-ইচ্ছা যখন মূল থেকে পৃথক হয়ে এমন এঁকে বেঁকে যায় যে মূলের সঙ্গে তার কোনো মিল থাকেনা, তখন তাকেই বলি আমার ইচ্ছা। এটাই বোধ হয় প্রশ্নকর্তার মাথার মধ্যে কাজ করেছে, তাই সে প্রশ্ন করেছে যে আমাদের ইচ্ছা মাত্রই বিশ্বইচ্ছার প্রতিধ্বনি কি না।

সেখানে ব্যক্তিগত প্রবর্তনার স্থান কি রইল?...ব্যক্তি তবে কী করতে পারে? সে কি বলতে পারে "আমি, আমিই ওটা করতে চেয়েছি"? আর দ্বিতীয় কথা, যেটা আমি বুঝিনা "ব্যক্তির ক্রিয়াযন্ত্র কি কেবল বিশ্বক্রিয়াতে প্রতিফলনের যন্ত্র"? কথার মানে ঠিক বুঝলাম না। প্রতিফলনের যন্ত্র? তাহলে তাকে হয়তো গ্রামোফোন বলা যেতে পারে।...প্রথম কথা, এমন মানুষ কমই আছে যারা প্রকৃতই বিশ্বইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে পারে। সাধারণত সকলে আপন আপন ক্ষুদ্র পরিস্থিতির ভিতরকার জিনিসকেই প্রকাশ করে। ওর পরেও আবার বলা হয়েছে: "তার কি কোনো নিজস্ব সৃষ্টিশক্তি নেই?" সে আবার আলাদা কথা হলো। কিন্তু আমার জবাবে আমি বলেছিলাম (হয়তো তার প্রশ্ন এখনকার চেয়ে তখন ভালো বুঝেছিলাম) যে কথা, তা পরে পরে

তিনটি ব্যাপারকে নিয়ে। বলেছিলাম, ব্যক্তি যখন সাধারণ চেতনা থেকে উচ্চতর মূলগত চেতনাতে উঠে যায় তখন সে হয় স্রষ্টা। অর্থাৎ সে তখন স্রষ্টা-চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। একাত্ম হয়ে গেলে তখন তো একই কথা হলো। এতে মুশকিল কি? কোনটা তুমি বোঝোনি?

প্রশ্ন: সমগ্র প্রশ্নটাই বুঝিনি।

উত্তর: সমগ্র প্রশ্নটা? এখন তাহলে বুঝেছ? পুরোপুরি নয়? তাইতো বলছি একসঙ্গে সব জড়িয়ে ফেলছ, তাই বোঝোনি; ওর মধ্যে তিনটি আলাদা আলাদা কথা রয়েছে। জড়ালেই গোলমাল ঠেকবে, কিন্তু স্বতন্ত্র ক'রে দেখলে পরিষ্কার হবে, যেমন বললাম: অর্থাৎ অজ্ঞান ও খর্ব চেতনাতে দেখাচ্ছে যে কার্য-কারণ সব কেবল নিজেরই; সকলের থেকে আলাদাভাবে আপন সীমাবদ্ধ শক্তিতে যা করছ তাই হচ্ছে, আর যাদের শক্তি তোমার চেয়ে একটু বেশি তাদের প্রভাবেই তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে। সাধারণ লোকে তাই ভাবে, নয় কি? তুমি নিজে কি ভাবো? কিসের প্রভাবে চলো? তুমি? তুমি?

কেউ কখনো তা ভেবে দেখনি? নিজের ভিতরে কখনো চেয়ে দেখনি যে কিসের প্রভাব সেখানে কাজ করছে? কেউ বলতে পারোনা ভেবে? আচ্ছা তুমি বলো। এটা বুঝতে কখনো চেষ্টা করোনি? হাঁ, কি না? আশ্চর্য! তোমার মধ্যে কোনটা কিসের দ্বারা সংকল্পিত হচ্ছে তা ভেবে দেখবে না? সেটা তবে আসছে কোথা থেকে? এটা না করে ওটা করি, তা কেমন ক'রে স্থির করো? তোমার সংকল্প ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে কিসের? একটা ছেড়ে অন্যটাকে বেছে নিতে তোমার স্বাধীনতা কতখানি? এটা করব বা ওটা করব, কিংবা কিছুই করব না, তা স্থির করতে তোমার ক্ষমতা কতখানি? এইসব জিনিস নিয়ে ভেবেছ? তোমাদের মধ্যে কেউ ভাবোনি? কেউ না? তুমি? তুমি?...

প্রশ্ন কেউ ভেবে থাকলেও বলতে পারবে না।

উত্তর কেউ না?

প্রশ্ন: না।

উত্তর: এতই কঠিন তা বলা? এই সামান্য কথা, তোমার চেতনার কোথায় বাইরের অন্যের ইচ্ছা এসে তোমার ইচ্ছাতে মিশে যাচ্ছে (অর্থাৎ যাকে বলো আমার নিজের ইচ্ছা), কোথায় বাইরেরটা ভিতরের উপর আর ভিতরেরটা বাইরের উপর কাজ করছে? তা দেখতে চেষ্টা করোনি? বাইরের ইচ্ছা ভিতরের ইচ্ছার উপরে চড়াও হওয়াতে অসহ্য ঠেকছে, এমনও কখনও হয়নি? কখনই না?

প্রশ্ন সে কথা জানিনা।

উত্তর : ও, আমি বুঝি খুব শক্ত প্রশ্ন করলাম? কিন্তু শোনো আমার ছেলেমেয়েরা, আমি নিজে মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই তা ভেবেছি!...তাই মনে করলাম যে তোমরাও অনেক দিন থেকেই তা ভেবে থাকবে।

প্রশ্ন : তবে নিজেরই ইচ্ছার মধ্যে অনেক কাটাকাটি হয় জানি।

উত্তর হাঁ, তা অনেক হয়। এ একটা প্রথম আবিষ্কার। একটা অংশ যেতে চাইছে এই রাস্তায়, অন্য অংশ যেতে চাইছে অন্য রাস্তায়, আবার কখনো চলে যাচ্ছে এক তৃতীয় রাস্তায়। এক অংশ যা চায় অন্য অংশ তা চায় না। তবেই দেখ! কিন্তু নিজেকে ঠিক ভাবে চালাতে হলে ঠিক রাস্তাটি খুঁজে নিতে হবে। ঠিক সিনেমার মতো নিজেকে একটা ভিতরকার পর্দার উপর ফেলে দেখনা কেন যে তোমার ইচ্ছাগুলো কোন দিকে কি ভাবে নড়াচড়া করছে? এ তো খুবই কৌতূহলের জিনিস!

নিজেকে এইরূপ পর্দার উপর ফেলে লক্ষ্য করবে যে ভিতরে কি কি হচ্ছে ও কি ভাবে চিন্তা চলাফেরা করছে। এর যদি একটা নক্‌সা এঁকে ফেল তো আরো চমৎকার কথা। এই ভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তখন আরো এক ধাপ এগিয়ে আপন মতামত ঠিক ক'রে নেবে। কিংবা আরো একটু এগিয়ে প্রত্যেকটি কথাকে তার যথাস্থানে স্থাপন করবে, এমন নিপুণভাবে যাতে তার মধ্য দিয়ে তোমার ভিতরকার আসল উদ্দেশ্য ধরে একটা সোজা পথে যেতে পারো। নিজের গতিপথ ঠিক ক'রে নিয়ে বলতে পারো : "তবে এই রাস্তাই হোক, আমার জীবনে দরকার এই ভাবেই বিকাশ পাওয়া, আমার সত্তার তাই সঠিক ধারা। আমি এখন সব দিক গুছিয়ে রেখে আপন রাস্তা ঠিক ক'রে নিলাম, আর এই কেন্দ্রস্থ পথ ধরেই যদি চলব। কিছু এগোলেই বুঝতে পারব যে অতঃপর কি হবে, কারণ আমি জেনেশুনেই রাস্তা বেছে নিয়েছি..."। এ কথা তোমাদের বলে দিলাম, জানিনা কিভাবে নেবে; আমার নিজের বেলাতে এই রকমই অন্তত ছিল সব চেয়ে সুন্দর উপায়। এর চেয়ে ভালো আমি কিছুই জানতাম না।

তাই আমার এমন হলো...মাত্র পাঁচ বা সাত বছর বয়সে (সাত বছরে এর গুরুত্ব আরো বাড়ল)—তখন আমার বাবা, তিনি সার্কাস দেখতে ভালবাসতেন, তিনি বললেন : "চল এই রবিবারে আমরা সার্কাস দেখে আসি।" আমি বললাম "না, তার চেয়ে আরো সুন্দর জিনিস নিয়ে আমি আছি।" বন্ধুরা এসে বললে "চল সকলে মিলে খেলা করব"। আমি বললাম : "না, এখানেই আমার বিশেষ একটা কাজ আছে"।...মিছে কথা বলিনি, বাস্তবিকই তাই ছিল। যা আমি করছিলাম তার চেয়ে বেশি ভালো কাজ কিছুই আমার পক্ষে ছিল না।

আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সকলেই এইরকম নিয়মে চলতে পারে। এতে খুবই ফূর্তি আসে আর বেশ উৎসাহদায়ক ফল পাওয়া যায়।...নিজের মনের চোখের সামনে পর্দার উপর সব কিছু ফেলে দেখে নাও যে কোথায় কি ব্যাপার হচ্ছে। সমস্তই স্পষ্ট ঠাহর ক'রে দেখবে, অসঙ্গত কোনো কিছু রয়েছে দেখলেও চোখ বন্ধ করবে না। দৃষ্টি খুলে রেখে প্রত্যেক জিনিসকে তার যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করবে। তখন একটা কিছু আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার হবে। আর তুমি বলবে "এগুলো সবই যখন আমার মধ্যে হচ্ছে তখন এটাকে এখানে আর ওটাকে ঐখানে সরিয়ে রেখে সমুচিত ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে চলিনা কেন। যে ইচ্ছাগুলো অনুচিত তাদের হটিয়ে দিইনা কেন? যা ক্ষতিকারক হবে তা থাকবে কেন?" ইত্যাদি।

এতে তুমি ক্রমশ অল্পে অল্পে দেখতে পাবে যে কেন তোমাকে ঠিক যখন তাবেই তৈরি করা হয়েছে, কোন কাজ তোমায় করতে হবে—কি জন্যে তুমি জন্মেছ। আর ঐভাবে গুছিয়ে দেখতে থাকলে, কোনটা তোমার পক্ষে সোজা পথ তা দেখতে পেয়ে বলবে: "আমার কাজগুলো এই পথেই হবে", আর বাইরের থেকে অন্য কিছু এসে বাধা দিতে চাইলে বলতে পারবে "না, আমি এটাই বেছে নিয়েছি, এতেই আমার সুবিধা ওসব আমার দরকার নেই কারণ ওতে আমার ক্ষতি হবে।" কয়েক বছর কাটলে তখন নিজেকে লাগাম দিয়ে ঘোড়ার মতো সংযত রেখে নিজের পছন্দমত কাজ করবে, যেদিকে খুশি সেইদিকে যাবে।

আমার মনে হয় এমন চেষ্টার দাম আছে। এ এক সুন্দর উপায়ে চলা।

প্রশ্ন: না, সে পর্দা হবে কোন জিনিসের?

উত্তর: ঐ পর্দা? ও হলো চৈত্য চেতনার।

প্রশ্ন: আর যে লীলার কথা আপনি বলছিলেন?

উত্তর: লীলা? এ হলো কেন্দ্র-চেতনার। চৈত্য সত্তার মূলে ঐ চেতনা। আর আরো এক ধাপ এগোতে পারলে দেখবে ঐ চেতনা কেমন ক'রে সেই পরম চেতনাকে প্রতিফলিত করছে। সেখানেই চরম, তারপর শেষের ধাপ খুব সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু আসল গুহ্য রহস্যটা জানা যাবে শেষে। আর যখন তা আবিষ্কৃত হবে তখন আর কোনো বিরোধ নেই, কারণ সকল বিরোধ শেষ হয়ে প্রত্যেকটি জিনিস যথাস্থানে স্থাপিত হয়েছে: তখন কেবল একটাই পথ, একই গতি, সহজ সরল ও সোজা, স্বভাবত সব কিছুই হতে থাকবে বিনা প্রতিক্রিয়ায়।

আমার মনে হয় প্রাচীন ঋষিরা এই কথাই বলতেন : নিজেকে জানো, আর কিছু না। কিন্তু সে জানা চোখে ফেটটা বেঁধে জানা নয়, নাকটা বা কপালটাতে শক্ত দেয়ালে কিংবা রুদ্ধ দরজাতে বারে বারে ধাক্কা খেয়ে নয়, নানারূপ বাধাবিঘ্নের কিংবা বদ ইচ্ছার আঘাত পেয়ে পেয়ে ঠেকে জানা নয়। ওতে বহু বছরের অভিজ্ঞতা ও বহু দুর্ভাগ্য ও অপ্রিয় ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করার দরকার হয় না, ঐভাবে নিজেকে জানতে : শান্ত সুধীর থেকে নীরব কাজের ভিতর দিয়েই তা জানা যায়।

যখন আমি ঐ জিনিসটি করতাম তখন কোনো সিনেমা ছিল না, সুতরাং সিনেমার পর্দার সঙ্গে তুলনার কথা মনেই হয়নি—কিন্তু নিজের ভিতরকার পর্দাতে ঠিক তেমনি কাজই করেছিলাম। সে পর্দা একেবারে সাদা ও মসৃণ, কিছুমাত্র এবড়োখেবড়ো নয়। তা না হলে তার উপরকার প্রতিবিম্ব বিকৃত ঝাপ্সা হয়ে যেতো, স্পষ্ট কিছু দেখা যেতো না। অতএব তোমাদের পর্দাও হওয়া চাই তেমনি সাদা, স্বচ্ছ, পরিষ্কার, নির্মল। তবেই স্পষ্ট করে দেখতে পাবে।

আর থাকা চাই যথেষ্ট ঐকান্তিকতা, কিছু সাহস ও অধ্যবসায়, আর মানসিক ঔৎসুক্য, জানবার ইচ্ছা, শেখবার আগ্রহ। প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষানাভের আনন্দ পাকা চাই। ঝাপ্সা ঘোলাটে জিনিসের সামনে কেন দাঁড়াতে হবে, যাতে ভালো করে কিছু দেখা যায়না, অস্বস্তি বোধ হতে থাকে, যেখানে তুমি জানোনা যে কোথায় শুরু আর কোথায় বা শেষ, কোনটা বা নিজের আর কোনটা নিজের নয়, কোনটা ঠিক বেঠিক—জানোনা যে তুমি নামক এই বস্তুপিণ্ড কী জিনিস যার মধ্যে তোমার অজান্তে কত কিছু জট পাকাচ্ছে? নিজেকেই কত প্রশ্ন করো "এটা আমি কেন করলাম?" তা বলতে পারোনা। "কেন এমন বোধ করছি?" তাও জানোনা। এই অবস্থাতে তুমি ক্ষিপ্ত হও বাইরে জগতের কুহেলিকার মধ্যে, আর আভ্যন্তর জগতের আরো অন্যরকম দুর্ভেদ্য ধোঁয়ার মধ্যে, সেখানে তোমাকে ভেসে বেড়াতে হয় জলে ভাসা মোলার মতো, স্রোতের মুখে আর বায়ুর তাড়নাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে। সে অবস্থা আমার ধারণাতে খুবই অপ্রীতিকর।

নিজের রাস্তা স্পষ্ট ক'রে দেখে নেওয়া, কোথায় কেন আর কেমন ক'রে যাবো তা সঠিক ভাবে জানা, আমার কি করতে হবে আর সকলের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তা বুঝে নেওয়া...এতো খুব আগ্রহের জিনিস, আর প্রতি মিনিটেই এর থেকে কিছু নতুন আবিষ্কার হতে পারে। এর কাজ কখনই ফুরোবার নয়।

একটা সময়ে চেতনার এমন অবস্থা আসে যখন মনে হয় বুঝি জগতের সব কিছু ভার তোমার স্কন্ধে চেপে আছে, অথচ তোমার চোখে ঠুলি আঁটা, কোথায় কোন দিকে যাচ্ছ জানোনা, কিসে যেন তোমায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। আবার এমনও সময় আসে যখন তুমি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পাও যে উপরে কি রয়েছে এবং

তারই সঙ্গে এক হয়ে যাও ; পৃথিবীর দিকে দেখ যেন বহু উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে, দেখতে পাচ্ছো সেখানে কি হচ্ছে ; তারপর নিজের পথ ধরে সেই পথে চলতে থাকো। এ বেশ প্রীতিদায়ক অবস্থা। তখন জানতে পারো যে এটাই সত্য, এর জন্যেই তুমি জগতে এসেছ। প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তা, কেন্দ্রীভূত চেতনার ক্ষুদ্রতম প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গ এই কাজ করতেই সৃষ্ট হয়েছে। অস্তিত্বের কারণই তাই : নানা স্পন্দনকে একজোটে নিয়ে তোমার যে এক ব্যক্তিসত্তা তাতেই পূর্ণ চেতনা এনে ওর একটা শৃঙ্খলা ঘটাতে সমর্থ হতে হবে আর আপন রাস্তা চিনে সেই রাস্তায় চলতে হবে।

কিন্তু যেহেতু মানুষ সেটা জানেনা আর সে চেষ্টাও করেনা, তাই জীবন যখন গুঁতো মেরে তাদের এখানে ওখানে আঘাত করে, তখন বলে : "ওঃ! এ যে বড়ো লাগছে!" এবং তার পরেই আবার এক গুঁতো, তখন : "ওঃ। এ যে দারুণ কষ্ট!" এই রকমই চলতে থাকে সর্বক্ষণ, আর ব্যথা ভোগ করতে হয় সর্বক্ষণই। নিত্যই তারা ভোগে আর কাঁদে আর কাতরায়। কিন্তু তার ভিতরকার কারণটি ওই, ঐ সহজ কাজটুকু তারা করেনা। অল্প বয়স থেকেই কেউ যদি তাদের এটা শিখিয়ে দিতো আর সময় নষ্ট না করে তখন থেকেই তারা যদি এটা অভ্যাস করত, তাহলে জীবন হতো ব্যথাশূন্য, আপন নিয়তির প্রভু হতে পারত।

তাই বলে সবই যে সুখের ব্যাপার হতো এমন কথা নয়। আদৌ তা নয়। কেবল এই হতো যে প্রতিক্রিয়াগুলি হতো খাঁটি, আর ব্যথা এলে ব্যথা না পেয়ে তুমি তাতে শিক্ষা পেতে, ক্লিষ্ট ও কাতর হয়ে না পড়ে তুমি বরং এক ধাপ এগিয়ে যেতে।

অন্তত আমি মনে করি যে ঐজন্যই তোমাদের এখানে আসা ; আর কেউ যেন এমন থাকে যে তোমাদের বলে দিতে পারে : "আচ্ছা, এইরকম চেষ্টা করে দেখ, এতেই ভালো হবে।" ছেলেবেলাতেই তা শেখানো উচিত। তবে চেতনার মধ্যে জিনিসটা না জাগলে সে কথা তারা বুঝবেনা। কিন্তু ছোটো মস্তিষ্কেই তা জাগানো যায়, এমন কি পাঁচ বছরের শিশুর মস্তিষ্কে, বেশি বড়ো মস্তিষ্কের দরকার হয়না। সেই মস্তিষ্কের মধ্যে অনেক ফাঁকা জায়গা থাকে যা ভরাট হয়নি, অনেক জিনিস জানা হয়নি, মাপাটা পুরো তৈরি হয়নি। তবে চেতনা তো রয়েছে, সুস্পষ্ট চেতনা, যা সব কিছুকেই স্পষ্ট দেখতে পায়, কেবল অনেক ফাঁক থাকে বলে সাড়া আনতে চাইলেও সাড়া আসেনা। ছোটোদের মস্তিষ্ক এমনি। সেখানে ধীরে ধীরে একটু একটু চেষ্টা করতে থাকলে ক্রমশ ভাবগুলো আকার নিয়ে গড়ে ওঠে, তখন একটা ঘোলাটে জিনিসের বদলে সঙ্গত রকমের একটা সুস্পষ্ট ভাব তৈরি হয়ে ওঠে। সেখানে এটাই বড় সুবিধার কথা।

তোমরা এখনও বেশ ছোটোই আছো, তোমরা এটা চেষ্টা করতে পারো। প্রত্যহ কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য নিজের ভিতরের দিকে চেয়ে দেখবে—তার চেয়ে বেশির দরকার নেই—দেখে নেবে যে সেখানে কি ব্যাপার হচ্ছে। সেটা খুবই ভালো লাগবে।

অগষ্ট ৫, ১৯৫৩

প্রশ্ন : চৈত্যের উন্নতি কি সর্বদাই হতে থাকে?

উত্তর : চৈত্যসত্তার উন্নতি হয় দুই বিভিন্ন দিক দিয়ে। একরকম হলো তার নিজের ক্রমিক গঠন নেওয়া, সমুচিত কার্যকরী ভাবে তৈরি হয়ে ওঠা। দিব্যের এক অতি ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ থেকে সত্তার মধ্যে এর সূত্রপাত, সেই স্ফুলিঙ্গ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পরিণত হবে এক চেতনাপূর্ণ স্বাধীন সত্তার, যা তার ইচ্ছানত ক্রিয়া করতে পারবে। মূলতঃ তা দিব্য চেতনারই স্ফুলিঙ্গ, এবং জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে পূর্ণ বিকাশ পাবে তার এক চেতন ব্যক্তিত্ব। ঠিক যেন শিশুদের ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠার মতো। অধিকাংশ মানুষের চৈত্য এই ভাবে বহু যুগ ধরে ক্রমশ তৈরি হয়ে উঠছে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব এখনও পায়নি, নিজের সম্বন্ধে পুরো চেতন হয়নি বা আত্মকর্তৃত্ব বেলেনি, জন্মের পর জন্ম অতিক্রম করতে করতে অল্পে অল্পে প্রস্তুত হয়ে শেষে চেতন হয়ে উঠবে। এই একরকম উন্নতি।

এমন উন্নতির শেষ আছে। একটা সময় আসে যখন পূর্ণ পরিণতি ও ব্যক্তিত্ব পেয়ে সত্তাটি আপন নিয়তির প্রভু হতে পারে। তেমন একটি পূর্ণ পরিণত সত্তা যখন আবার মানবদেহে জন্ম নেয়, তখন তার সাধারণ থেকে মস্ত প্রভেদ থাকে, অর্থাৎ সে জন্ম নেয় মুক্ত হয়ে। সাধারণ লোকের মতো সে ঘটনাবলীর বা পরিবেশের বা পূর্বানুগতির কোনো বন্ধনে বাঁধা পড়েনা। সে জগতে আসে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষ কোনো কাজ করতে। ওদিক থেকে দেখলে তার উন্নতির পালা শেষ হয়ে গেছে, আর সে দেহধারণ করতে বাধ্য হয়ে নেই, যেমন পূর্বে তাকে বাধ্য হয়ে অবশ্যম্ভাবীরূপে জন্মগ্রহণ করতেই হতো, কারণ কেবল দেহধারণের ভিতর দিয়েই অল্পে অল্পে আরো উন্নতি হতে পারত। কিন্তু পরিণতি লাভের পরে সে মুক্ত, ইচ্ছানত জন্মগ্রহণ সে করতে পারে বা নাও করতে পারে। কিন্তু উন্নতি আর হবার নেই।

কিন্তু সেই পরিণত সত্তা যদি চৈত্যলোকের আনন্দেই চিরমগ্ন না থেকে অন্য দিক দিয়ে পৃথিবীতে এসে ভগবৎ ক্রিয়ার যন্ত্রস্বরূপ হতে চায়, এখানে ভগবানের কাজে সাহায্য করতে চায়, তাহলে তখন তাকে আরো এক রকমের উন্নতি করতে হবে, তার তেমনি কর্মপটুতা বাড়াতে হবে, সেই কাজটিকে সফল করতে ভগবৎ-ইচ্ছাকে অভিব্যক্ত করার সমুচিত শক্তি তাকে অর্জন করতে হবে। সুতরাং এ সময়ে তার মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন আসবে, তাই যতদিন জগতে থেকে সে ঐ কাজ করবে ততদিন অন্য এক রকম ধরণের উন্নতিও তার হবে। আর যদি চৈত্যরাজ্যে ফিরে গিয়ে পনরায় আসতে না চায় তাহলে বিনা উন্নতিতে সে একভাবেই থাকবে, কারণ আগেই

বলেছি যে উন্নতি যা কিছু হবার তা কেবল এই পার্থিব জগতেই, অন্য কোথাও না। চৈত্যের জগতে কেবল আনন্দ ও বিশ্রাম, কোনো অদলবদল না করে যেমন ছিল তেমনি থেকে যাওয়া।

প্রশ্ন : কিন্তু যারা চৈত্য সম্বন্ধে চেতন নয় তাদের বেলা কি হবে?

উত্তর : উন্নতির দিকে এগোতে তাদের হবেই, তা কেউ চায় কিংবা না চায়। ভিতরকার চৈত্যসত্তায় এই ভাবে এগোতে থাকে, যদিও তারা জানেনা। অগ্রসর হতে তারা বাধ্য। গতির বাঁকে তাদের চলতেই হয়, জীবনে নানাভাবে উপরদিকে উঠতেই হয়। এ সেই একই কথা, ছোটো শিশুদের যেমনভাবে ক্রমশ বাড়তেই হয়। একটা সময় আসে যখন বাড় হওয়া থেমে গেছে যদি উন্নতির ধারার বদল না হয়, অর্থাৎ দৈহিক থেকে মানসিক, চৈত্যিক ও আধ্যাত্মিক দিকে না ফেরে—তাহলে তখন বাঁকের উপর দিকে না গিয়ে নিচের দিকে নামতে নামতে শেষে ভাঙন ধরে অস্তিত্ব লোপ পাবে।

পার্থিব জগতে একটানা উন্নতি হতে পারেনা বলেই প্রথমে আসে বাড় হওয়া, তারপর বিরতি, তারপর অবনতি, শেষে ভাঙন। যা আর এগোচ্ছেনা তাকে পিছোতেই হবে, যা উন্নতির দিকে যাচ্ছেনা তা যাবে অবনতির দিকে।

দৈহিকের বেলাতেও তাই। দৈহিকের জগৎ জানেনা একটানা অগ্রগতি; এক জায়গাতে গিয়ে থামে, অগ্রগতিতে অবসাদ আসে কিংবা অতিরিক্ত গঠনের সামর্থ্য থাকেনা, উন্নতি তাই থেমে যায়, তার পরেই ভাঙন। যারা নিছক দৈহিক জীবন নিয়েই থাকে তারা তার চূড়ান্ত পর্যন্ত গিয়ে ওঠে, পরে পা দুই নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এখনকার দিনে সমবেতভাবে মানবজাতির সামগ্রিক উন্নতি হওয়াতে দৈহিকের পিছনে রয়েছে প্রাণের ও মনেরই দিকেরও উন্নতি, তাই দৈহিকের উন্নতি থেমে যাবার পরেও মনের উন্নতি অনেক কাল পর্যন্ত চলে, তারই কারণে দৈহিকের উন্নতি থামলেও তারা অনেক কাল টিকে থাকে।

যারা যারা যোগ করে, আপন চৈত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তারই সঙ্গে চৈত্য জীবন যাপন করতে থাকে, তারা অবশ্য টিঁকে থাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আর মৃত্যুর পরেও তারা পায়ে না, দেহত্যাগ হয়েছে বলেই যে উন্নতি থেমে যাবে এমন নয়।

দেহ তার রূপান্তর ঘটাতে অক্ষম হয় বলেই উন্নতি থেমে যাওয়াতে সে অবনতির দিকে যায়, শেষে আভ্যন্তরীণ অসাম্যের ফলে এমন দিন আসে যখন সকল ভারসাম্য নষ্ট হওয়াতে স্বাস্থ্য আর ফেরে না। এমন কি পর সপ্তাহেই তা দেখা যায়। শুধু খাঁটি আধ্যাত্মিক জীবনের বেলাতে—যা দৈহিক ও মানসিক অস্তিত্বেরও বাইরে—ঐরূপ ঘটনের উন্নতির ক্রিয়া আর থাকে না, তখন তুমি তার বাইরে চলে যাও। সেই সঙ্গে অভিব্যক্তির জগতেরও বাইরে গিয়ে পড়ো। উন্নতির কাজ এবং অভিব্যক্তির জগতেরও বাইরে, কারণ দুটোই এক জিনিস। অভিব্যক্তি মানেই অগ্রগতি, আর অগ্রগতি মানেই অভিব্যক্তি।

প্রশ্ন অনেকেই শুনি চিন্তা করে এবং লেখে কিন্তু প্রেরণা পেয়ে। সে প্রেরণা আসে কোথা হতে?

উত্তর : অনেকেই তাই করে। এ তো আশ্চর্য কথা। আমি জানতাম না... তার পরে?

প্রশ্ন : কবিরা যখন কাব্য রচনা করে...

উত্তর : ও! তাদের প্রেরণা আসে নানা স্থান হতে। নিছক বাস্তব প্রেরণাও হতে পারে, প্রাণগত প্রেরণাও হতে পারে, নানারূপ মনের স্তরের প্রেরণাও হতে পারে, আবার উপরের রাজ্যের থেকে আসা বিরল প্রেরণাও হতে পারে। সব প্রেরণা এক জায়গা থেকেই আসে না। সুতরাং প্রেরণা পেলেই যে কেউ উচ্চ সত্তা হলো এমন নয়...নির্বোধের মতো কথা বলা বা বোকামির কাজের প্রেরণাও হয়।

প্রশ্ন প্রেরণা পাওয়া জিনিসটার অর্থ কি?

উত্তর এমন কিছু আসা যা তোমার নিজের ক্ষমতার চেয়েও বেশি, যে জিনিস তোমার নিজের মধ্যে নেই তোমার ব্যক্তি-চেতনার বাইরের প্রভাবের দিকে খোলা থাকলে তা আসে।

আবার তেমনি খুন করবার প্রেরণাও তো আসতে পারে! যে সব দেশে খুনীদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়, ঐরূপ নৃশংস হত্যার ফলে তাদের প্রাণসত্তা স্বাভাবিক ভাবে বিলীন হবার সুযোগ না পেয়ে হঠাৎ ঐভাবে তিক্ততার আবেগাদি সমেত দেহচ্যুত হওয়াতে সেখানে যারা থাকে এবং দেখতে এসে ভয় পেয়ে যায় তাদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সহজে তাদের মধ্যে ঢোকার তারা ফাঁক পেয়ে যায়। অনেক তরুণ বয়সের খুনীরা এ কথা স্বীকার করেছে যে তাদের মধ্যে খুন করার ঝোঁক এসেছে অন্য খুনীর মৃত্যুদণ্ড দেখে। এও "প্রেরণা", যদিও খুব ঘৃণিত ধরনের।

তলে তলে হয়তো তোমার মধ্যে এমন এক উন্মীলনের মুহূর্ত আসে যখন তোমার ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে যা নেই এমন কিছু বাইরের থেকে খোলা রাস্তা পেয়ে তোমার মধ্যে হঠাৎ ঢুকে এসে তোমাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেয়। মোটামুটি এইরকম ভাবেই প্রেরণার সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।

সাধারণ লোকে যখন বলে: "ইনি একজন উপরের প্রেরণাপ্রাপ্ত কবি", তার মানে তিনি উপর থেকে কিছু পেয়ে নিপুণভাবে তাকে প্রকাশ করেন। তেমন প্রেরণাকে অবশ্য উঁচুদরেরই বলতে হবে।

প্রশ্ন না, তেমন প্রেরণা কি তারা যখন ইচ্ছা করে তখনই আসে না ?

উত্তর যখন ইচ্ছা ? না, সাধারণত তা আসে না, কারণ ভিতরের কলকব্জার ব্যাপার তুমি জানোনা, নিজের ইচ্ছামত ভিতরকার দরজা খুলে দিতে পারোনা।

তেমন সহজে করা যায় না। যোগের মধ্যে সেই কাজই প্রথম শেখানো হয়, যখনই চাও তখনই ভিতরের দরজা খুলে দিতে পারবে। ধ্যান বা একাগ্রতা বা আত্মগুহার ফলে তা আসে ; ঐ সকল উপায়েই ভিতরের দরজা খোলে।

আর চেষ্টা করতে হয় যাতে কেবল সর্বোচ্চের দিকেই দরজা খুলে যায়, অন্য রকম নিম্নতর দিকে নয়। অন্য সব বিষয়ে গ্রহিষ্ণুতা অনায়াসেই আসতে পারে।...তবে গজদন্তের কৌটার মতো সৌধশিখরে নিজেকে সব কিছু থেকে বন্ধ রাখাও সম্ভব নয়, আর তা সুখেরও নয়, সে ভাবে নিজেকে আগ্‌লে থাকলে উন্নতি কিছু হয় না। তাতে কেবল নিজের মধ্যে যেটুকু রইল তাই নিয়েই ওলটপালট। নিজেকে কল্পনা করো একটা সব-দিক-আঁটা গোলকের মধ্যে যার বাইরে কোনো যোগ নেই আর ভিতর থেকেও কিছু বেরোয় না—আপনার যেটুকু চেতনার উপাদান আছে ও স্পন্দনাদি আছে (তার যাই নাম দাও), সবই রয়ে গেছে সেই গোলকের মধ্যে। বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক কিছু নেই, আছো কেবল আপন চেতনাটি নিয়ে। তেমন স্থলে তুমি কি করতে পারো ? ভিতরকার জিনিস নিয়ে অনেক ওলটপালট করতে পারো, কিন্তু এই পর্যন্ত। ভিতরের দিকেরই কিছু উন্নতি হয়, কিন্তু বাইরে কত শক্তি রয়েছে তার থেকে পাওয়া উন্নতি কিছু হয় না। ঐ একভাবে বন্ধ থাকতে থাকতে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ো ভিতরের সেই একই জিনিস নিয়ে ঘোরাফেরা —তা আর ভালো লাগে না।

কিন্তু তার বদলে নিজেকে যখন বাইরে ছড়িয়ে দাও তখন সেই সঙ্গে বাইরের থেকে তুমি কিছু ফিরেও পাও , চালুনির ছিদ্রের মতো, যার ভিতর দিয়ে শক্তি কিছু বেরিয়েও যায় আবার কিছু ফিরেও আসে। এতে নাড়ির প্রবাহের মধ্যে চলাচল হতে থাকে। সেই জন্যই এমন পরিস্থিতি বেছে নেওয়া দরকার যেখানে থাকাতে নিত্য লেনদেনের কিছু সুযোগ পাবে। যারা নিজেকে যত বেশি বাইরে প্রক্ষেপ করে তারা তত বেশি ফিরে পায়। কিন্তু সেটা হয় তৎপরতার একই স্তরে। যেমন ছোটোদের বেলাতে, তারা নিত্য লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে চেঁচাচ্ছে (কেবল ঘুমের সময় ছাড়া কখনই শান্ত থাকে না), এতে তারা যেমন শক্তি খরচ করে তেমনি পায়ও বেশি, এবং তা কেবল দেহশক্তি ও প্রাণশক্তি, তারই জমাখরচ। যা খরচ করে তার অনেকটাই ফিরে পায়। তাই তাদের পক্ষে এমন পরিবেশ চাই যেখানে তারা যেমন দামী জিনিস খরচ করবে তেমনি দামী জিনিসই ফিরে পাবে, তার চেয়ে কোনো খেলো জিনিস না হয়।

তোমার খরচের দিকটা যদি তেমন দরাজ না হয় তাহলে সেখানে পাওয়াও হয় অনেক কম—আর দৈহিক উন্নতি থেমে যাবার প্রধান কারণটাই হল তুমি তখন কৃপণ

হয়ে পড়ো, যাতে অপচয় বেশি করা না হয়; মন তখন বলে: "সাবধান, নিজেকে বেশি খাটিও না, বেশি কিছু কোরোনা, ইত্যাদি"। এতে দেহের গ্রহিষ্ণুতাও অনেক কমে যায়। শেষ পর্যন্ত কোনো বৃদ্ধি হতে পারে না—কেবল বৃদ্ধির দিকে বাড়তে গিয়ে সকল বাড়ই থেমে যায়।

কিন্তু গ্রহিষ্ণুতা অন্য স্তর থেকেও খুলতে পারে। যারা প্রধানত কামনা ও আবেগের রাজ্যেই বাস করছে, তাদের সেদিকে গ্রহিষ্ণুতা এত বাড়ে যে শেষে নিজেদের কাছেই তা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। আর যারা মনশ্চেতনা নিয়ে থাকে তাদের মানসিক গ্রহিষ্ণুতাও খুব বাড়ে। যারা মনের তরঙ্গের সৃষ্টি এবং অনুশীলন এবং মনের কাজ নিয়েই নিত্য থাকে তাদের মনের দিকের অগ্রগতিও সেইভাবে চলতে থাকে। দেহযন্ত্রের অবনতি ঘটলেও মনের যন্ত্রের কাজ করা তখনও থামে না। মস্তিষ্কের মধ্যে অবনতি ঘটলে অবশ্য তখন বুদ্ধির ক্রিয়া আর বাইরে প্রকাশ পায় না, কিন্তু তবুও মন সেখানে না থেমে স্বাধীনভাবে আপন উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দেহসত্তার চেয়ে মনঃসত্তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে, তাই তোমার দেহ যখন বুড়ো হয়ে গেছে, মন তখনও রয়েছে নবীন। তবে যদি মস্তিষ্কের যত্ন না নাও, নানা আঘাতাদি থেকে তাকে বাঁচিয়ে না রাখো, তাহলে তার তরফ থেকে অভিব্যক্তি কিছু ঘটবে না। কিন্তু মন ঠিক এগোতে থাকবে। যারা দেহসত্তা অনেকটা ঠিক রেখে চলে, অর্থাৎ অত্যাচারাদি কিছু করে না, অযত্ন অবহেলা কিছু করে না, অধিকাংশের মতো তামাক মদ প্রভৃতি বিষের নেশা অভ্যাস করা থেকে বিরত থাকে, তারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উন্নতি ও বিকাশ ক'রে যেতে থাকে তবে যদি শেষের দিকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় তাহলে বিকাশের ক্ষমতা চলে যায়, কিন্তু মন তবু এগিয়ে চলে।

প্রাণসত্তা স্বভাবত মরু নয়, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা পায়না, সাধারণ অবস্থায় নানা পরস্পর-বিরোধী আবেগাদির ঘাত-প্রতিঘাতে নিত্য অত্যধিক উত্তেজিত হতে থাকার ফলে তা নিজের বিনাশ আনে। কারণ প্রাণসত্তার উপাদানগুলি স্থায়ী। কামনা ও আবেগ অতি জীবন্ত বস্তু, এগুলি বহুকাল পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে বাহক সত্তাটির উপর নির্ভরশীল না হয়ে...সত্তা তাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়, কারণ তা বাহির থেকে ঝড়ের মতো এসে তোমাকে অভিভূত ক'রে তোমাকে সঙ্গে টেনে নেয়; সেখানে তুমি যদি স্থির অবিচল থেকে নিজেকে সম্বরণ করতে না পারো তাহলে তোমাকে কোনো শক্ত খুঁটিতে আশ্রয় ক'রে অটল হয়ে থাকতে হবে, ঝড় এলেও তাকে পার হয়ে যেতে দেবে একটুও না কেঁপে; তুমি জানবে যে ঝড়টা এলেও নিশ্চয় পার হয়ে যাবে। তারপরে তুমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আপন ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারবে; তাতে সেই ঝড় তোমার সামান্যই ক্ষতি করবে। আর শেষ পর্যন্ত এর ফল ভালোই হবে।

কিন্তু যারা স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে লোলখণ্ডের মতো ইতস্তত ছুটতে থাকে, আপন স্থায়িত্ব ঠিক রাখতে পারে না, তাদের বেলা অনেক কিছু ঘটতে পারে। আর ঘূর্ণীপাকে পড়ে গেলে তাদের প্রাণান্ত হয়। কিছুই আর টিকে থাকে না।

সব জানা হলো তো?

প্রশ্ন : অনেকে কিছু বোকার মতো কাজ করে...

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন : তারা জানে যে বোকামির কাজ করছে, মন তাতে সায় দিচ্ছে না, কোনো ন্যায্য যুক্তি বা সমর্থনও পাচ্ছে না, তবুও তারা সেই কাজ করে। এ কেমন অবস্থা?

উত্তর : কেমন অবস্থা? তারা চেতনভাবেই জানছে যে বোকামি করছে, আর মন তাতে সায় না দিলেও মনের এমন জোর নেই যে তাদের নিবৃত্ত করতে পারে?

মনের জোর তাদের কোনো কালেই ছিল না। কারণ মন হলো এমন যন্ত্র যাকে সকল দিকই দেখতে হয়। মন যখন তেমনিভাবে সকল রকমের দিকই দেখছে তখন সেখানে আবেগকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছা তার আসবে কেমন করে? মন বলবে, "এমনও হতে পারে, আর অমনও তো হতে পারে?" সেখানে ইচ্ছা কোথায় রইল?...তাই তো আমি বলছি যে মন সকল কাজেরই কৈফিয়ৎ দিতে পারে, চমৎকার যুক্তি দেখিয়ে সব কিছুকেই সমর্থন করতে পারে।

কিন্তু জোর করতে পারে কেবল চৈত্য সত্তা। মন যদি চৈত্যের প্রভাবে তার সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে মনের মধ্যেও তখন প্রতিরোধের জোর আসে। কারণ চৈত্য জানছে যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা; তাই সে সঠিক ভালো ইচ্ছার দ্বারা প্রতিরোধ-সংগ্রাম এনে জয়লাভ করিয়ে দেয়। এই হলো একমাত্র উপায়; চৈত্যের সঙ্গে মনের যোগ চাই।

নতুবা এমন কি ভালো ভালো জ্ঞানের কথা ও পিওরি মনের জানা থাকা সত্ত্বেও, আর ভালো ভালো নীতি মেনে চলতে থাকা সত্ত্বেও, এমন শক্তি তোমার হবেনা যাতে কোনো একটা ঝোঁক এলে তার বিরুদ্ধে তোমার ইচ্ছাকে দিয়ে তার প্রতিরোধ করতে পারো। এক সময় হয়তো দৃঢ়সংকল্প করলে যে অমুক জিনিসটা তুমি কিছুতেই করবেনা: এটা স্থির সাব্যস্ত করেই রেখেছ—তবু এমন কেন হয় যে সেই সংকল্প আর তেমন জোরালো নেই দেখলে (কেমন ক'রে বা কেন এমন হলো তা নিজেই জানোনা)! অমনি তখন তুমি সেই কাজটা করবার যুক্তিযুক্ততাও খুঁজে পাও...ওর মধ্যে এই যুক্তিটি প্রায়ই থাকে: "বেশ তো, এইবারটি করেই দেখিনা, যদি বুঝি যে খারাপ কাজ হলো তাহলে আর তা করবনা, এই ঘরে শেষ বার।" এ এক চমৎকার যুক্তি "এই শেষের বার করছি।

ভালো করে জেনে নিই যে কাজটা খুবই খারাপ, তাহলে আর কখনো করতে যাবনা। এই যা হয়ে গেল তা শেষ বারের মতো।" কিন্তু প্রতিবারেই এমনি শেষ বার হয়। পরে যেন তাই করো।

আবার কেউ কেউ আছে যাদের মনোভাব অতটা সুস্পষ্ট নয়। তারা বলে: "এ কাজ করতে চাইব নাই বা কেন? ও সব আদর্শ আর থিওরি সঠিক নাও হতে পারে। আমার মধ্যে যখন ওবিষয়ে একটা ঝোঁক এসেছে তখন সেটাই সত্য না থিওরি সত্য তা কে জানে?"...তাদের পক্ষে তা শেষবারের ব্যাপার নয়। ওকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়।

এই দুটি বিপরীত ভাবের মধ্যে আবার অন্যান্য বিবিধ সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক হলো এমন কথা বলা "আচ্ছা, আর একটি বার করি, যাতে ঝোঁকটা কেটে যায়, তাহলে আর হবেনা।" কিন্তু সে দোষ কোনো বারেই কাটেনা।

কেবল যখন তুমি দৃঢ়চিত্তে বলো: "না না, আর একবারও না, কিছুতেই ওটা করবনা, আমার সকল শক্তি দিয়ে ওকে আটকাবো,—এতে হয়তো অল্প সাফল্য মেলে, পুরোপুরি না হয়ে আংশিক সাফল্য, যতটা ইচ্ছা করেছিলে ততটা পারলে না,—কিন্তু তবু ইচ্ছাটা আর আগ্রহটা রয়ে গেল, ভিতরে তা আলোড়ন তুলতে থাকল, আর বাইরে বলতে থাকল, "করব না, যাবো না"। আংশিক সাফল্য হলেও এতে যথেষ্ট জয়লাভ, কারণ পরের বারে তুমি বেশি কিছু করবে। অর্থাৎ প্রবল কামনার ঝোঁককে ভিতরে চেপে না রেখে তুমি তাকে অনেকটা ঠাণ্ডা করে আনবে। প্রথমে সে কাজ হবে ধীরে, কষ্ট সহকারে। অনেকদিন পর্যন্ত ঝোঁকটা থাকবে, বারে বারে এসে বিরক্ত করবে, তুমি হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, তবু বলবে "না, আমি ওকে মানতে চাই না, শক্ত হয়ে পাথরের মতো রইলাম।" এতে অল্প অল্প তার তেজ পাতলা হয়ে আসবে, তারপরে আসবে দ্বিতীয় রকমের মনোভাব "আমার চেতনা এই সব জিনিসের উর্ধ্বে উঠে যাক। সংগ্রাম আসবে আরো অনেক, কিন্তু চেতনা যদি উপরে ওঠে তাহলে এমন সময় আসবে যখন ওগুলো আর ফিরে আসবেই না।" তারপরে আরো একটা সময় আসবে যখন দেখবে যে তুমি মুক্ত হয়ে গেছ, ও ঝোঁক আর আসে হবে না। এতে অনেক সময় লাগতে পারে আবার শীঘ্রও হয়ে যেতে পারে; সেটা নির্ভর করে আপন চরিত্রের উপর এবং ইচ্ছা ও আস্পৃহার তীব্রতার উপর। কিন্তু যাদের কিছুমাত্র ঐকান্তিকতা আছে তারা ঐভাবে চেষ্টা করলে নিশ্চয় সফল হবে। এতে সময় লাগে। প্রথমে তারা সফল হবে: ঝোঁকটাকে কাজে প্রকাশ না করতে। পৃথিবীতে সকল শক্তিই চায় কাজে প্রকাশিত হতে। ঐ সকল শক্তিরাও তাই চায় প্রকাশ ও অভিব্যক্তি, আর তুমি যদি সেইখানেই তাদের আটকে কাজে প্রকাশিত হতে না দাও, তখন তারা প্রাণপণে চেষ্টা করবে বেড়া ভাঙতে, কিন্তু তা না পারলে শেষে নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে অপ্রকাশে সরে যাবে।

সুতরাং এমন কথা বলবেনা "আগে চিত্তাকে শুদ্ধ করি, দেহ প্রাণকে শুদ্ধ করি, তখন আবার কাজও বিশুদ্ধ হবে।" সাধারণত লোকে তাই করে কিন্তু তাতে ফল হয়না। ফল পেতে হলে বাইরের থেকেই শুরু করবে : "আগে দেখব যে কাজটাই যেন না করা হয়, তারপর দেখব যে ইচ্ছাও যেন না করি, শেষে সকল ঝোঁকের বিরুদ্ধে, দরজা এঁটে দেব ; তাহলে ওগুলো আর থাকবেই না, আমি ওর বাইরে চলে গেলাম।" এইভাবে পরে পরে চেষ্টা করলে ফল হবে। প্রথমে তেমন কাজটাই করবে না। তাহলে তার পরে তেমন কামনাও আর করবে না, অতঃপর সে জিনিস চেতনার ভিতর থেকেও চলে যাবে।

প্রশ্ন যখন কোনো চৈত্য সত্তা জগতে এসে জন্ম নিতে উদ্যত হয়, তখন সে কেমনতরো আকার নেবে তা কি আগের থেকে বেছে ঠিক করে নেয়?

উত্তর এ বেশ চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন। এর মধ্যে অনেক কথা আছে। এই মাত্র তোমাদের বললাম চৈত্য সত্তাদের কথা, যারা ক্রমে তৈরি হয়ে উঠছে ; প্রথম অবস্থাতে যখন আসে তখন অবশ্য বেছে নেবার প্রশ্নই থাকেনা, কিন্তু উন্নতি পেয়ে যখন চেতনাতে কতক বেড়ে উঠেছে (সাধারণত দেহধারণ কালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরে), তখন তারা বেছে নিতে পারে যে এর পরবর্তী অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্র কেমনতরো হবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি, যদিও তা হবে বাহ্য রকমের। মনে করো কোনো চৈত্যসত্তার দরকার হলো অধিনায়ক হয়ে শক্তি লাভ ও প্রভুত্ব করা সম্বন্ধে অবগত হতে, যাতে তার ফলাফলকে ভগবানের দিকে ফেরাবার উপায় করা যায়, আর শক্তি ও সম্পদের জীবনের ভিতর দিয়ে কতটা কি শেখা যায়। এমন চৈত্যসত্তারা প্রায়ই আসে রাজা বা রাণী হয়ে। সেই জীবনে থেকে যখন তার সম্বন্ধে পুরো অভিজ্ঞতা নিলে গেল, যা কিছু জানবার ছিল তা জানা হয়ে গেল, অতঃপর সময় হলো অকেজো দেহটাকে পরিত্যাগ করে যাবার, এর পরের বারে অন্যরূপ অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সেই কালে দেহের মধ্যে থাকতে থাকতেই পরবর্তী জন্মের জন্য তারা ক্ষেত্র নির্বাচন করে। তখন প্রায়ই চলে এক রকমের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ একরূপ ক্ষেত্রের শিক্ষা পেয়ে নিয়ে তার চেয়ে উল্টো রকম ক্ষেত্রে যেতে চাওয়া,—সুতরাং অতঃপর প্রায়ই বিপরীত রকমের জীবন তারা বেছে নেয়। দেহত্যাগের পূর্বে সংকল্প করে "এবার অমুক স্তরে যাবো।"....এখন মনে করো চৈত্যসত্তা এতটা উন্নত হয়েছে যখন তার ইচ্ছা হবে যাতে এবারকার দেহে গিয়ে ভগবানের চেতন সংস্পর্শ পেয়ে সম্যক রূপান্তরের অবস্থা লাভ করা যায় ; তার তখন শক্তি সম্পদ প্রভুত্ব কর্মদক্ষতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে গেছে, তাই সে বলে : "এবার জন্ম নেবো নিশ্চিন্ত নির্বিরোধ পরিবেশে, যে জীবন খুব নিচুও নয় আর উঁচুও নয়, যেখানে কেবল বাহ্যজীবন নিয়ে (তা ছাড়া কি বলি?) লিপ্ত থাকতে হবে না, শক্তি সম্পদও নয় কিংবা দারিদ্র্যও নয়, নিরপেক্ষ নির্ঝঞ্ঝাট সহজ রকমের একটা মাঝামাঝি জীবন।"

সুতরাং তেমনি জীবন সে নির্ধারণ করে নেয়। মৃত্যুর পরে ফিরে যায় চৈত্য ধামে, সেখানে থেকে বিশ্রাম নিতে ও প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে জীর্ণ করে পরবর্তীর জন্য প্রস্তুত হতে। বিশ্রাম শেষ হলে যখন আবার পৃথিবীতে নেমে আসার সময় হয় তখন সে আপন সংকল্পের কথা স্মরণ করে, কিন্তু সেখান থেকে এখানে এই বস্তুজগৎকে আমাদের মতো চোখে দেখতে পায়না, দেখে অন্যরূপে। তথাপি পরিবেশের পার্থক্য ও কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য তারা স্পষ্টই বুঝতে পারে। এবং সে দুটি সামগ্রিক ও ব্যাপক হওয়াতে স্থান বেছে নিতে পারে। কোন দেশে জন্ম নেবে, কেমন ধরনের শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা ও প্রভাবের মধ্যে আসবে, কখনো বা কিরূপ পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মধ্যে স্থান নেবে তা মনোনীত ক'রে নেয়। নেমে আসবার আগে দেখে নেয় যে কিরূপ ভাবের স্পন্দনের মধ্যে নামা চাই, সেই মতো জায়গা ঠিক ক'রে নেয়। তথাপি তা কেবল মোটামুটি ভাবেই হতে পারে, কারণ এখানে কেবল তারই পছন্দমত এক তরফা কাজ হয় না, নিচের দিকেও চাই তাকে নেবার মতো আস্পৃহা ও গ্রহিষ্ণুতা। সেই চৈত্যসত্তার পক্ষে বেছে নিতে হবে এমন পরিবেশকে, বিশেষত তার জন্মদাত্রী মাকে (কখনো বাপ বা দুজনকেই, তবে সাধারণত মাকে বেছে নেওয়া অপরিহার্য) যে মায়ের থাকবে অনুরূপ আস্পৃহা ও গ্রহিষ্ণুতা, সেও চাইবে নিজেকে খুলে ধরে চেতনভাবে কোনো উচ্চ সত্তাকে। এমন হলে সেখান থেকে ঐ চৈত্যসত্তার জন্য একরূপ আলো জ্বলে ওঠে। জন্ম নিতে উন্মুখ সেই চৈত্য তার নির্বাচিত পরিবেশের মধ্যে ঐরূপ আলো জ্বলতে দেখলেই জানতে পারে যে ঐখানেই তার স্থান।

সেটা দরকার, নতুবা ওর অভাবে দিনের বা মাসের বা বছরের অনেক তফাৎ হয়ে যায়; কারণ একটা অনিশ্চয়তা থাকাতে সে ঠিক ক'রে বলতে পারে না "আমি অমুক দিন অমুক সময়ে জন্ম নিচ্ছি।" কে তাকে গ্রহণ করবে তা তখন খুঁজে দেখতে হয়। ঠিক পেলে তখন নেমে আসে। হুবহু যে এমনই হয়ে থাকে তা নয়, একটা নমুনা মাত্র; কিন্তু এই ধরনেরই ব্যাপার হয়ে থাকে। আর সে তখন এসে নিক্ষিপ্ত হয় অচেতনার মধ্যে, কারণ বস্তু-জগতে মানব চেতনা যেমনই কেন হোক, চৈত্য চেতনার কাছে তা অচেতনা। সে যেন গোপ্তা খেয়ে মাথা গুঁজে তার মধ্যে ঢুকে অবশ হয়ে যায়। পরে অনেক কাল পর্যন্ত সে কিছুই টের পায়না, বিরল দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। কোথায় রয়েছে, কেন এসেছে, কি করছে, কিছুই সে জানেনা। নিজেকে প্রকাশ করতেই পারে না, বিশেষত শৈশবের অপরিণত মস্তিষ্ক দিয়ে; মস্তিষ্ক তখন ভ্রূণের অবস্থায়, প্রকাশযন্ত্র তৈরি নয়। সুতরাং যে বিশিষ্ট সত্তা সেখানে এসেছে তার তেমন কোনো আভাস দিতে পারে না।....এই রকমই আমরা প্রায় শুনেছি। কিন্তু সময় তার লাগেই নিজে প্রকাশ হতে। আড়ষ্টতা কাটবার পর ধীরে ধীরে সে জানতে পারে যে কোন কারণে জেনেশুনেই তার আসা। কিন্তু ঐ সময়ে সাধারণত নিত্যকার মানসিক শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতির

চাপে তার চৈত্য চেতনা ঢাকা পড়ে আড়াল হয়ে যায়। তখন দরকার হয় এমন কোনো ঘটনাচক্র এসে পড়া, কোনো তীব্র আবেগাদির ধাক্কা খাওয়া যাতে ভিতরের দরজা খুলে দেবে, যাতে তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে কোনো বিশেষ কাজে সে অন্য জগৎ থেকে এখানে এসেছে।

কিন্তু এমন না হয়ে যদি কাজটা স্বাভাবিকভাবে হয়, অর্থাৎ ঘোর অজ্ঞানতার মধ্যে না গিয়ে কোনো জ্ঞানী লোকের হাতে গিয়ে পড়ে, তবে অল্পজ্ঞানী হলেও তার সংস্পর্শে থেকে ওটা সহজে তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু এই চৈত্য বিকাশের সঙ্গে সাধারণ নৈতিক বিচার বা তথাকথিত শাস্তি ও পুরস্কারের সম্পর্ক মাত্র নেই। নানা ধর্মে ও দর্শনে গল্প আছে যা মানুষেরই ন্যায়ান্যায় বিচারের আবৃত্তি, সে সবই বোকামি। মানুষের বুদ্ধি ও-সম্বন্ধে একেবারে ভ্রান্ত, অদৃশ্য জগতের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া অন্যরকম। আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করলেই দেখবে যে ও-সব ভুল কথা, সত্য অন্য নয়।

অনেকে এসে বলে: "পূর্বজন্মে কি দোষ করেছি যে এ জন্মে এমন দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে?" আমি তাদের বলি: "কিন্তু তুমি কি দেখছ না যে ওটাই আশীর্বাদ, কৃপা! হয়তো পূর্বজন্মে এমনই চেয়েছিলে যাতে উন্নতির পথে তাড়াতাড়ি এগোতে পারো!" ও সবস্তই হলো লোকের প্রচলিত মনোভাব "ওঃ! আমি একটুও সুস্থ নই। ওঃ! আমার দেহের অবস্থা খুব খারাপ কেন, আমি কি দোষ করেছি? পূর্বজন্মের কোন অপরাধে এ জন্মে এমন, ইত্যাদি"...এ সব নিতান্ত ছেলেমানুষি কথা।

—শ্রীমা

---

* BULLETIN OF S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গত

ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৬৯

মায়ের ২১শে ফেব্রুয়ারির বাণী থেকে—

"অচলা শান্তিই কেবল সম্ভব করতে পারে চিরন্তন অস্তিত্ব।"

এখন মনে হচ্ছে ওটি আমি লিখেছিলাম অনড় অচেতনার অনুভূতি থেকে, যে অবস্থা সৃষ্টির গোড়াতে হয়েছিল ('প্রক্ষিপ্ত' হয়ে আসেনি, কিন্তু) কিন্তু তা অজীব অচেতন শাশ্বতের ও অনন্তরূপের প্রতীক হয়ে—"অনড়" কথাটা ঠিক হলোনা, শব্দের কোনো দাম নেই,—অনড়তা ও স্থিরতার মাঝামাঝি অবস্থা। আর বলেছি "শান্তি", কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি "একটা-কিছু" (এমন কি "শাশ্বত" বললেও তা সীমায়িত হয়ে যায়), যার সম্বন্ধে ভাষাতে বলা অসম্ভব, যে একটা কিছু সকল কিছুরই আদিতে, আর এই অভিব্যক্তি—যা বিবর্তন হতে শুরু করে ঘুরে যাবে তার আদিতে (মা দুদিক থেকে দুটি বাঁক ঘুরিয়ে মিলিয়ে দেবার ইঙ্গিত করলেন)।

মনে পড়ছে ওটা ঘটেছিল "খেলার মাঠে", যেন এক অনড় অচেতনা—অচেতনার জড়বৎ অনড়তা...যার থেকে বিবর্তনের সূত্রপাত, যেন তারই সেটা তর্জমা—কেমন করে বোঝাই? (এটিও তেমনি অনড়তা কিন্তু তার মধ্যে সকল গতিই আছে),—মূলে এই অনড়তা, পূর্ণ স্থিরতা, এবং সমস্ত বিবর্তনটাই হচ্ছে তাতেই আবার ফিরে যেতে সকল পথকে ঘুরিয়ে নিয়ে (মা বৃত্তাকার ইঙ্গিত করলেন); এ জিনিস সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিতে এলো, তাই লিখেছিলাম ঐ কথা। আর সেই লেখা পড়ে যাবার সেই অনুভূতি ফিরে এলো। আমরা প্রায়ই বলে থাকি "পতনের" কথা—কিন্তু আদৌ তা নয়। পতন হতে পারে কেবল তখন যখন প্রাণসত্তা ইচ্ছা করেছিল স্বাধীন হতে: প্রথমে তা হয়নি, হয়েছিল পথিমধ্যে...প্রাচীন কিংবদন্তি বলে যে চেতনাই হলো অচেতনা যখন সে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হলো—এ যেন ছেলেভোলানো গল্পের মতো মনে হয়।

আশ্চর্য এই, নীরবতার ভিতর ঐ দৃষ্টি (যা পেলাম) তা খুবই স্পষ্ট স্বচ্ছ, জ্যোতির্ময়, সম্পূর্ণ বোধগম্য; কিন্তু ভাষাতে বলতে গেলেই হবে বোকার মতো।

কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে এখনও যেমন রয়েছে তাতে এটাই সত্য, যাকে "শান্তি" বললে অনেকটা কাছাকাছি হয় (যদিও ঠিক তা নয়, কারণ তার তুলনায় খুবই সংকীর্ণ)। যখনই কোনো কিছু বিগড়ায় তখনই এটা (এই শান্তি) ভিতরে এসে সমস্ত সারিয়ে দেয়।

(নীরব থেকে)

হাঁ, কথার তো কোনো দাম নেই, জানিনা কেমন ক'রে বলব,—হয়তো আমার

নিজেরই তেমন যথেষ্ট বাক্যের সঞ্চয় নেই, কিংবা তা প্রকৃতপক্ষে...আসলে মনের বলা সবই কৃত্রিম। যেন নিষ্প্রাণ পর্দার মতো, আর ভাষা হলো ঐ পর্দারাজ্যের অন্তর্গত। এই অনুভূতির কথা যখন বলতে চাই...কয়েক জনের সঙ্গে আলাপটা ভালোই জমে, সহজেও নীরব থেকে আমি তাদের এমন অনেক কিছুই বলতে পারি যা ভাষাতে বলা যায়না ; এবং সেগুলো হয় যেমন নিখুঁত তেমনি কোমল ও গভীর...কিন্তু বলা কথা আর লেখা কথা যেন সাধারণত একটা দ্বিমাত্রিক ছবির মতো হয়ে দাঁড়ায় ; আর ওদের সঙ্গে যখন নির্বাক সংস্পর্শ ঘটে তখন তাতে গভীরতা আরো বেড়ে যায়, জিনিসটা আরো সত্য হয়ে ওঠে (পুরো সত্য না হলেও অনেক বেশিরকম সত্য) এবং তার গভীরতা তো আছেই।

(নীরব থেকে)

অতএব এ সব অনুভূতির কথা বলতে পারা খুব কঠিন। এতো আলাদা ভাবে আসা একটার পর একটা জিনিস নয়, এ হলো একত্রে একই বৃত্তগত ক্রিয়া (মা বৃত্তাকার ইঙ্গিত করলেন), রূপান্তরের ব্যাপার যা অত্যন্ত নিগূঢ়।

সাধারণ জীবনের বৃত্তিগুলির মধ্যে এই বোধটা আসে "বেশ তো আছি, অল্ রাইট", তার মানে তখন স্বাস্থ্যটি ভালো আছে, যার সেই ভারসাম্য নষ্ট হলেই তখন আসে বিশৃঙ্খলা এই যে বৈপরীত্য এটা নিতান্ত কৃত্রিম। অন্য কিছুই নয়, একই ক্রমিক ক্রিয়াপ্রবাহের মধ্যে একরূপ স্পন্দন থেকে অন্যরূপ স্পন্দনে প্রবেশ, কিন্তু যার মূল যা তা (কেমন ক'রে বলি ? তা গভীরতা নয়, উচ্চতাও নয়, অধিকতর সত্য বললে এক দিক মাত্রই বলা হয়)—তা হলো উপরের—কথায় বলতে গেলে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু এ ক্রিয়াপ্রবাহ ক্রমিকভাবে অবিচ্ছেদ চলেছে। কেবল তুমি সরে সরে যাচ্ছো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। আমাদের কাছে কেবল চেতনার খেলা, কিন্তু যে চেতনা সামগ্রিকভাবে দেখে তার কাছে অবিচ্ছেদ ক্রিয়া, একটা সব-জড়ানো ক্রিয়াধারা... হাঁ তাই, যাতে জড় অচেতনা হয়ে ওঠে পুরোপুরি চেতনা।...বলতে পারিনা কিন্তু আভাসে মনে হয় যে এই সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে (এখানে এই পৃথিবীতে) যে গতি খুবই বেগবান হলে (যাকে বলে "খুবই দ্রুত গতি") সেখানে তখন এমনি দেখায় যে তা গতিহীন, স্থির। এই রকমই শুনেছি। কিন্তু ওর সঙ্গে একটা কিছুর সাদৃশ্য রয়েছে। উপরোক্ত উক্তিতে যখন বলেছি "শান্তি", তখন তা বোধ হয়েছে অতি দ্রুতগতির ভিতরকার শান্তি, কিন্তু তা স্বাভাবিক, সাধারণ এবং সুসঙ্গত।

তবে এ সব কথা বলতে গেলেই মনে হবে যেন বাজকথা।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

শেষ পর্যন্ত আমি নীরব হয়েই থাকব।

ভক্ত : তা যেন না হয়।

মা : (হেসে) কিন্তু এ সব-কিছুই যে কত তুচ্ছ।

ভক্ত : এর পরে হয়তো কথা বলা হবে কেবল রঙের মাধ্যমে।

মা : আঃ। সে খুব চমৎকার হবে

এমনই হয়ে যায় যে কেউ এসে যখন আমাকে এমন কিছু বলে যে কথা আমি নিজেই বলেছি তারই পুনরুক্তি, কিন্তু আমি তা আর তখন বুঝতে পারিনা...খুবই চেষ্টা করি, কিন্তু চেতনার যে বেগ নিজেকে যথাসাধ্য প্রকাশ করবার জন্য সেই কথা বলেছিল সে বেগ এখন আর নেই, কাজেই সে কথার এখন অর্থ হয়না।

উপরোক্ত বাণীটাই যখন আমাকে পড়ে শোনানো হলো, সঙ্গে সঙ্গে তখনকার অনুভূতিও এসে গেল, তাতেই জানলাম ঐ "শান্তি" কথাটির মধ্যে কতখানি কি জিনিস ছিল।...কিন্তু এখন তা নেই।...কী বলেছি তখন?

ভক্ত : হাঁ, শান্তিই বলেছেন।

মা অচলা?

ভক্ত হাঁ, "অচলা শান্তি"।

মা "হাঁ, আর অনুভূতি হয়েছিল যে সেই অচলা শান্তি (যা "শান্তি"ও নয় আর "অচলা"ও নয়, কিন্তু সে "একটা-কিছু"), সেই জিনিসই আছে জড় অচেতনার মধ্যে। এবং তা নিরেট।...আর রয়েছে সমগ্র সৃষ্টির এই গতিবাঁক যাত্রা যাতে এই এবং সেই শেষে এক হয়ে মিশবে (এবং প্রকৃতই তা একই—অভিন্ন)। বলা যেতে পারে (যদিও কেবল কথার বলা) যে আপন ঐক্য সম্বন্ধে আবার চেতনা পাওয়া। এ কেবল কথাই বলা হলো।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

এ অনুভূতি এমনই জমাট যে আমি যেমনি তা কথায় বলতে যাবো অমনি তা খসে নিচে নেমে যাবে। অথচ উপরের (উপরের দিকে ইঙ্গিত) চেতনা একেবারে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, আর তার পরে... *

---

* BULLETIN OF S.A.I.C.E থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পথের কথা

ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৬৯

এই আবহাওয়া এই চেতনা (অতিমানবের) খুবই সক্রিয়, পরিচালকরূপে, সে কথা আগেই বলেছি। সেই রকমই চলেছে। তার পর এই কয়েকদিনের মধ্যে একদিন ভোর থেকে কয়েক ঘন্টার জন্য যা মনে হলো...এত বেশি সুখী দেহটা আর কখনো হয়নি; পূর্ণ উপস্থিতি, পূর্ণ মুক্তি, পাকা সুনিশ্চয়তা—এ সব তো ছিল, তার গুরুত্ব তত বেশি নয়! কিন্তু এই সকল জীবকোষ, এখানে ওখানে (সর্বত্র ইঙ্গিত ক'রে) সবই দেখি প্রাণময়, সর্বত্রই চেতনাময়। অতি আশ্চর্যজনক। এ অনুভূতি আপনিই এলো আপনিই গেল, কারণ...আমি ছিলাম ব্যস্ত। এমন জিনিস কারো ইচ্ছামত আসেনা—ইচ্ছা ক'রে যা আসে তাকে বলে "মেকি"। দেখতে তেমনি হলেও জিনিসটা ঠিক তাই নয়। যা আসল জিনিস...তা এমন কিছু যা আমাদের ইচ্ছা, আস্পৃহা বা প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করেনা...একেবারেই না। আর তা পুরো সর্বশক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ তখন আর দেহের বাধাবিপত্তি বলতে কিছুই থাকে না। সে সময়ে সকল ত্রুটি লোপ পেয়ে যায়। আর আস্পৃহা একাগ্রতা, সাধনা...তার কোনো কাজই তখন নেই। এ অবস্থাকে বলা যায় দিব্যানুভব, দিব্যবোধ। পূর্বোক্ত কয়েকটি ঘন্টার মধ্যে (তিন বা চার ঘন্টা) আমি পুরোপুরিভাবেই জেনে গেলাম যে দেহের মধ্যে দিব্যের চেতনা এলে কেবলতরো হয়। এবং তখন আর এই দেহ, ওই দেহ, সেই দেহ (চতুর্দিকে ইঙ্গিত) এ প্রশ্ন নিয়ে কিছুই আসে যায় না। এক দেহ থেকে অন্য দেহে চলে যাচ্ছো অতি অনায়াসে মুক্তভাবে, অথচ সকল দেহেরই সীমা ও সম্ভাবনার কথা জানা হলে—এ অতি অপরূপ ও অত্যাশ্চর্য, এ ধরনের অনুভূতি আমি কখনো পাইনি। বড়ই বিস্ময়জনক। কিন্তু তা চলে গেল, আমি ব্যস্ত ছিলাম বলে···সে যে কেবল একবার জানান দিতেই এসেছিল তা নয়...জীবন ও জীবনের কাজ জড়ানোতেই তা চলে গেল।

আমি জানি যে তা এইখানেই রয়েছে (পশ্চাৎদিকে নির্দেশ), কিন্তু...আমি বুঝি যে তা রূপান্তর। অস্পষ্ট কিছু নয়, স্পষ্টই জানি যে কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে এর ওর তার মধ্যে (আঙুল দিয়ে এদিক ওদিকে নির্দেশ) তা প্রকাশ হতে পারতো, সম্পূর্ণরূপেই, দিব্য হাসি হাসি মুখে।

তার পর দেহকোষগুলিও বললে তাদের রূপান্তর প্রয়াসের কথা, শেষে একটা তার নিশ্চল স্থিরতা।...কেমন ক'রে তা বোঝাই? দেহ বললে তার তীব্র আস্পৃহার কথা এবং প্রস্তুতির ইচ্ছার বেগ, কোনোরকম যাচঞা না ক'রে যেমন হওয়া দরকার সেই ভাবে প্রয়াস

করতে থাকল ; সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটা রইল (দেহের নয়, জগৎ পরিস্থিতির প্রশ্ন, যেন জগৎটাই জানতে চাইছে) : এ কি থাকবে না লোপ পাবে ? সে নিজে এইরূপভাবে আত্মত্যাগের ভঙ্গীতে নিজেকে উন্নীলিত ক'রে বলছে (মা হাতের মুঠো শিথিল করে দেখালেন) : "প্রভু, যেমন তোমার ইচ্ছা", কিন্তু সে জানে সে আগেই তা স্থির হয়ে গেছে, আর দেহকে সে কথা বলা হবে না। সে মাথা পেতে নিচ্ছে, অধৈর্য না হয়ে শুধু বলছে : "তাই হোক, যেমন তোমার ইচ্ছা," যদিও সে জানে এবং বলতে চায়না...আর তা বলাও যায় না। তবে হাঁ—যা আছে একটিমাত্র শব্দ যার দ্বারা সে-অনুভূতিকে প্রকাশ করা যায়,—পূর্ণ। যিনি পূর্ণ, যা পূর্ণ। মাত্র এই অনুভূতি, আমি পূর্ণের সম্মুখে। পূর্ণ প্রজ্ঞা, পূর্ণ ইচ্ছা, পূর্ণ শক্তি...কোনো কিছুই যাকে প্রতিরোধ করতে পারে না। অথচ সে এমনই পূর্ণ যে পরম করুণাতেও পূর্ণ (আর এ অনুভূতি নিরেট)। ওর পাশে আমরা যতই কেন দয়া মায়া ও মমতার কথা ভাবি, সে সব কিছুই না, কিছুই না। পূর্ণ শক্তির সঙ্গে এই পূর্ণ করুণা...এ কোনো জ্ঞানের কথা নয়...আমাদের তরফের কাজগুলির সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। আর সে, সেই জিনিস রয়েছে সর্বত্র ছেয়ে। সব খানেই তাই। আর এ অনুভূতি হলো স্থূল দেহের ; দেহ রয়েছে তাতেই সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত, উৎসর্গিত, প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। কেন একমাত্র আশ্বাস (হাতের মুঠো এলিয়ে দিয়ে) সম্পূর্ণ তাইই হয়ে যাওয়া, সে যেমন চায় তাই হওয়া—শুধু তার কাজ করা নয়, তাতেই পরিণত হওয়া।

যে কয়েকটি ঘন্টা ঐ অবস্থাতে কেটেছিল, তার মতো সুখ এই দেহটা দীর্ঘ একানব্বই বছর এই পৃথিবীতে অবস্থানের মধ্যে কখনই আর পায়নি, সীমাহারা মুক্তি ও শক্তি (চারিদিকে ইঙ্গিত) যার কোনো অবধি নেই, যাতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।...অন্য সব দেহও তাই, তফাৎ কিছু নেই, কেবল চলেছে চেতনার লীলাছন্দ (অনুরূপ ভঙ্গী)।

এই হলো মোট কথা।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

তবে কাজটা কিন্তু উত্তরোত্তর "কঠিন" হয়ে উঠছে। আমি বোধ করছি (অর্থাৎ এই দেহ বোধ করছে) যে, এও শিক্ষার একটা অঙ্গ।

সেই রকমই দেখা যাচ্ছে ; এই দেহ, এর চিঁকে থাকা দরকার, নতুবা বারান্তরে এগুলো করতে হবে, যা আরো খারাপ।

মানুষের যা কিছু ব্যাখ্যা সবই যেন নিতান্ত ছেলেমানুষী।

আশ্চর্যের কথা বলেই মনে হয় যে মানুষের দিকের যা কিছু গুণাগুণ সবই ছেলেমানুষী জিনিস দেখায়। এটাই আশ্চর্য। এ কেবল চিন্তার আসাই নয়, প্রকৃত নিরেট অনুভূতি ; সব যেন নিষ্প্রাণ বস্তু : সাধারণ জিনিস সব কিছুই তাই—সত্যিকার প্রাণবর্জিত। মেকি আর মিথ্যা। খুবই অদ্ভুত কথা।

অন্য ক্ষেত্রগুলিতে যতটা নয় সেখানে আভ্যন্তরীণ শিক্ষার ব্যাপার। আর এই সত্যচেতনা, তার সত্য ভাবটি, যা অতি প্রবল, পরাক্রান্ত অথচ এমনই সুস্মিত শান্তিপূর্ণ: সে হাসি এমন মধুময় যে সেখানে বিষণ্ণ হওয়া অসম্ভব...হাসছে, হাসছে...আর চেয়ে দেখছে।

(নীরব থেকে)

এই নব চেতনার বিশিষ্ট প্রকৃতি হলো কোনো কাজই আধাআধি করা নয়, গোঁজামিল নিষ্পত্তি করা নয়। এই ওর ধারা। এমন কিছু বলা নয়: "আচ্ছা হবে হবে, অল্পে অল্পে, তাই আমরা দেখছি...", না না, ঐরকম একেবারেই না। আর আছে কেবল "হাঁ" কিংবা "না", তুমি পারবে কি পারবে না।

(নীরব থেকে)

খাঁটি ভগবৎ-কৃপা, তারই মতো। বাজে সময় নষ্ট করা নয়, সময় নষ্ট হতে দেওয়া নয়, যা করবার তা করতেই হবে, অথবা...

কিন্তু এই মহাপ্রবল শক্তি, যা সবারই উপরে: অথচ তা কতই করুণাময়ী, কতই মোলায়েম:...না, এমন কোনো শব্দ নেই যার দ্বারা তার বর্ণনা চলে...আর কিছুনা, কেবল সেই দিকে একাগ্র থাকা, আর...তাতেই আনন্দ। কেবল সেই দিকে মনকে নিযুক্ত রাখলেই মিলবে সেই আনন্দ। এখন বুঝি (ওতেই আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়েছে), যাদের কথা বলা হয়ে থাকে যে মারাত্মক বেদনার মধ্যেও তারা কেমন আনন্দ ভোগ করেছে। তাকে বলে দিব্যানন্দ।

এই দেখ, এটি হলো তাই (মা একটি সাদা জবাফুল দেখালেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন "কৃপা")।

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

পূর্বে বলা হইয়াছে, আমাদের বিমান প্রায়ই দিনে তিনবার করিয়া বোমা বর্ষণের জন্য উড়িয়া যাইত। নিশানার দূরত্ব কখনও দুই ঘন্টার পথের চেয়ে বেশী থাকিত না। যাওয়া-আসা ও বোমা বর্ষণের কাজ সমস্তই প্রায় চার হইতে সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যেই সম্পন্ন হইত। বিমান ছিল ষোলখানা। তার মধ্যে প্রত্যেকবার বারখানা বিমান এক সঙ্গে উড়িয়া যাইত, অর্থাৎ বারখানা বিমান একসঙ্গে চারঘন্টা করিয়া আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় থাকিলে প্রত্যেক অভিযানে আটচল্লিশ ঘন্টা অভিযান হয়। প্রত্যেক বিমান চারঘন্টা করিয়া দুইবার উড়িলে সর্বসাকুল্যে দিনে প্রায় শত ঘন্টা অভিযান হয়। প্রথম মাসে যে কয়দিন বাকী ছিল, সেই কয়দিনেই, আমাদের স্কোয়াড্রন এক হাজার ঘন্টার বেশী অভিযান সম্পন্ন করিল। প্রথম মাস হইতেই কাজে এত দড় দেখিয়া গ্রুপ হেড্-কোয়ার্টার হইতে প্রচার হইল যে আমাদের স্কোয়াড্রন কোন কাজেই পিছপা নয়। যে-কোন কাজ হউক না কেন, যত কঠিনই হউক না কেন, এই স্কোয়াড্রন সেই কাজ সুসম্পন্ন না করিয়া ফিরিয়া আসিবেনা, অভিযান-রত দেশী ও বিলাতি স্কোয়াড্রনগুলির মধ্যে, এই স্কোয়াড্রনটি বেশ সুনাম অর্জন করিল।

এইবার ফ্লাইট লেফ্‌টেনেন্ট রহমানের গল্পে আসা যাক। তিনি ছিলেন বি-ফ্লাইটে এবং সিনিয়রিটিতে বেশ উপরেই ছিলেন। ফ্লাইট কমাণ্ডারের দুই একজন পরেই তাঁহার স্থান ছিল।

একদিন ভোরে অন্য এগারখানা বিমানের সাথে তিনিও বোমাবর্ষণে গিয়াছেন। ফিরিবার পথে সকলেই জমাট ব্যূহ বাঁধিয়া ফিরিতেছেন। হঠাৎ অন্য বিমানগুলির বৈমানিকদের নজরে আসিল যে তাঁহার বিমানের ইঞ্জিন হইতে প্রচুর পরিমাণে নীলবর্ণের ধূম নির্গত হইতেছে এবং একটু পরেই ধূম নির্গমনের পরিমাণ অনেক কমিয়া গেল। প্রথমে প্রচুর পরিমাণে ধূম নির্গত হওয়া ও কিছুক্ষণ পরে কমিয়া যাওয়া বা ধূম নির্গমন বন্ধ হইয়া যাওয়ার কারণ কাহারও অজ্ঞাত ছিলনা। ইঞ্জিনের অভ্যন্তরের তৈল কিছুটা পোড়া অবস্থায় আর কিছুটা, ইঞ্জিনের মধ্যে অত্যধিক তাপ সৃষ্টির জন্য, বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যাওয়ার সময় নীলবর্ণের হয়। তৈল বাহির হইয়া যাওয়ার নানা কারণ হইতে পারে। ইহার একটি প্রধান কারণ, যদি ইঞ্জিনের কোন অংশ ভাঙ্গিয়া যায় বা ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে সেই ভাঙ্গা পথে বা ফাটা পথে তৈল বাহির হইয়া যাইবে—আর এইরূপে তৈল বাহির হইয়া যাইতে থাকিলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সব তৈল বাহির হইয়া যাইবে। ইঞ্জিনের তৈলাভাব ঘটিলেই, ততই অত্যধিক মাত্রায় তাপের সৃষ্টি হইবে। ফলে, ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া

যাইবে এবং তখনই যদি অবতরণ করা সম্ভব না হয় তবে বিমানসহ বৈমানিকদের ভূমিতে পতন অনিবার্য। সুতরাং সকলেই উদগ্রীব হইয়া কুন্তিগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে অঞ্চলের উপর দিয়া স্কোয়াড্রন ফিরিয়া আসিতেছিল সেখানে শুধু পাহাড়, খাত আর বন জঙ্গল। আর পূর্ব আসামের বন জঙ্গলে যত প্রকার জন্তু জানোয়ার সম্ভব সবই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বিপদের সময় তাড়াতাড়ি অবতরণ করার মত কোনও রকম সমতল ক্ষেত্রই ছিলনা। এইরূপ অঞ্চলে ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া যাওয়ার অর্থ বিমানের পতন অনিবার্য এবং সেই সঙ্গে বিমান-চালক ও তাঁহার সাথী নেভিগেটর-গানার বেতারবার্তা-পরিবেশন-কারীর নিশ্চিত অপমৃত্যু।

কুন্তিগ্রাম বিমানবন্দরের অবতরণ-পথের উপর আসা পর্যন্ত ফ্লাইং অফিসার রহমন তাঁহার বিমানের ইঞ্জিনের তৈলের চাপের দিকে নজর রাখিয়াছিলেন। অবতরণ-পথের নিকটে আসিবার পর তিনি সরাসরি অবতরণ করিলেন, কিন্তু অবতরণ-পথের উপরে নয়। অবতরণ-পথের পাশে একফালি জমি ছিল—অসমতল জমি, কিন্তু দৈর্ঘ্যে অবতরণ করার প্রায় উপযুক্ত। তিনি সেইখানেই বিমান অবতরণ করাইলেন। ইঞ্জিনের শক্তি ব্যতীত বিমান অবতরণ করিতে গেলে অনেক সময় বিমান উলটাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবতরণ-পথের উপর হইতে উলটাইয়া যাওয়া বিমান অপসরণ না করা পর্যন্ত অন্য বিমান-গুলির অবতরণ-পথের উপর অবতরণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্যই নিজের সাংঘাতিক বিপদ জানিয়াও তিনি ধীর স্থির হইয়া অন্য এগারখানা বিমান যাহাতে বিপদে না পড়ে সেইদিকে খেয়াল করিলেন এবং নিজে আরও সঙ্কটের কাজ করিলেন। বিমান ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতেই ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া গেল। অবিলম্বে, বিমানের গতি বন্ধ হইয়া যাওয়ার পূর্বেই জীপ গাড়ীতে বিমানের নিকটে পৌঁছাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আশ্চর্য শুধু নয়, বাকহারা হইয়া গেলাম। ইঞ্জিনের পশ্চাৎ দিক্ ফাটিয়া গিয়াছে, সেই পথ দিয়া ইঞ্জিনের মধ্যে যে চৌদ্দ গ্যালন তৈল থাকে সমস্তই বাহির হইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে তাঁহার অন্য বৈমানিক সাথীরা নীলবর্ণের ধূম ইঞ্জিন হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া, বেতারবার্তায় আমাদের জানাইয়া সতর্ক করিয়া দেন। ঐ সময়ই ইঞ্জিনের তৈল সমস্তই ধূমের আকারে বাহির হইয়া গিয়াছে। ফলে ইঞ্জিনের তৈলাধার একেবারে শুষ্ক—অথচ বিমান এই শেষ পথটুকু কেমন করিয়া ইঞ্জিনের শক্তিতে উড়িয়া আসিল—ইঞ্জিন তো বহু পূর্বেই তৈলাভাবে বন্ধ হইয়া যাইবার কথা। আশ্চর্য হইয়া ভাবিলাম একি অঘটন না আর কিছু। সাধারণ বুদ্ধিতে বোধহয় এ প্রকার ঘটনার তাৎপর্য বোঝা যায় না।

এরপর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বিমানে নূতন ইঞ্জিন বসান হইল এবং টেষ্ট ফ্লাইটের পর সার্ভিসিং সেক্‌শন হইতে বিমানটি আবার বি-ফ্লাইটে পাঠান হইল।

মাসকয়েক অতিবাহিত হইয়াছে। প্রত্যহ বারখানা বিমান দিনে দুইবার—কখনও দিনে তিনবার করিয়া অভযানে যাইয়া বোমা বর্ষণ করিয়া আসে। খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশে

এখন আবার জমা হইতেছে। একদিন, সন্ধ্যার প্রাককালে আকাশের কিছু অংশে মেঘ জমিতে সুরু হইয়াছে আর অন্য অংশ নির্মেঘ। আমাদের বারখানা বিমান বোমা বর্ষণের পর নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—পক্ষীরা যেমন সন্ধ্যায় নিজ নিজ কুলায় উড়িয়া আসে। বিমানগুলি উড়িয়া আসিতেছে প্রায় পশ্চিমমুখী হইয়া, পড়ন্ত সূর্য কখনও কখনও মেঘের আড়াল হইতে বাহির হইয়া বৈমানিকদের চক্ষু ধাঁধাইয়া দিতেছে। ব্যূহ এখন খুব জমাট নয়, কেননা পথের কিছুটা মেঘের আড়ম্বরে ঢাকা ছিল—এখন শিথিল ব্যূহই শ্রেয়। কেননা, জমাট মেঘের মধ্যে পড়িলে, বিমান হাওয়ার চাপে লাফাইয়া উপরে উঠে, আবার জমাট মেঘের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসামাত্র হঠাৎ কিছুটা পড়িয়া যায়। সে-জন্য এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে বিমানে আকাশ-ভ্রমণ মোটেই আনন্দদায়ক নয়। ইহাতে বিমানকে হঠাৎ ঠেলিয়া শতফিট উর্ধ্বে তুলিয়া দেয়—আবার পরমুহূর্তেই উপর হইতে চাপ দিয়া শত ফিট্ নীচে অবতরণ করাইয়া দেয়। হাওয়ার চাপের ব্যতিক্রম (Air pocket) হওয়ার জন্যই এই প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সময় বৈমানিকদের অবস্থা, কোন পাত্রের মধ্যস্থিত তরল পদার্থের ন্যায় হইয়া থাকে। পাত্রটি নাড়াইলে পাত্রের মধ্যস্থিত বস্তুর যে অবস্থা হয়, এখানে বিমানের ভিতর বৈমানিকদেরও সেই অবস্থা। সেইজন্য ব্যূহ শিথিল করিতে হয়। তখন প্রত্যেক বৈমানিক এই এয়ার পকেট হইতে নিজেদের যন্ত্রপ্রত্যঙ্গ বাঁচাইবার জন্যও পাশের বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষ যাহাতে না হয় সেইজন্য সর্বদাই সজাগ অবস্থায় থাকেন।

আজ নিশানার দিকে যাইবার সময় বা বোমা বর্ষণের পর ফিরিবার পথে জাপানীদের কোন জঙ্গী বিমানের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। এমনকি জাপানীদের কোন জঙ্গী বিমান নজরেও আসে নাই। হয়ত বা শিলচরের অন্যদিকে সিঙ্গার-বিলে, ভারতীয় বিমান-বাহিনীর যে হকার হারিকেন জঙ্গীবিমান স্কোয়াড্রন ছিল, তাহাদের ভয়ে। মনে থাকিতে পারে, ভারতীয় এই জঙ্গবিমানের স্কোয়াড্রন আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রিসালপুর বিমান-বন্দরে জঙ্গীবিমানের শিক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছিল। পথে নিশানা অভিমুখে যাবার সময় বা কার্যসমাধার পর নিজ-বন্দরে ফিরিবার সময় বা বোমা-বর্ষণের সময় অতর্কিতভাবে দুশমনদের জঙ্গীবিমানের হামলা হইতে আমাদের রক্ষা করাই সিঙ্গার-বিলে অবস্থিত ভারতীয় জঙ্গীবিমান স্কোয়াড্রনের কাজ ছিল এবং শুধু সেই কাজের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়াছিল।

একবার মেঘের ভিতর দিয়া আর তারপরেই বাহির হইয়া পরিষ্কার উজ্জ্বল আকাশে উড়িয়া চলা বেশ ভাল লাগিতেছিল। শুধু হাওয়ার চাপের তারতম্যের জন্য মেঘের মধ্যে প্রবেশমাত্র হঠাৎ উত্থান আর বাহির হওয়া মাত্র পতন খুব আরামদায়ক বোধ হইতেছিল না।

বোমা-বর্ষণ শেষ হইয়াছে। পেট্রলও অনেক পুড়িয়া শেষ হইয়াছে। বিমানগুলি এখন অনেক হাল্কা, সেইজন্য বেশ দ্রুতই গুহের অর্থাৎ কুন্তিগ্রামের দিকে উড়িয়া চলা

যাইতেছে। আর কিছুক্ষণ চলিলেই জাপানীদের জিরো জঙ্গী-বিমানের পাল্লার বাহিরে আসা যায়। তখন একেবারে নিশ্চিন্ত মনে গৃহে পৌঁছান যাইবে।

একি? হঠাৎ একটা জাপানী জিরোর মত বিমান পশ্চাতের মেঘের আড়াল হইতে বাহির হইয়াই আমাদের শিথিল ব্যূহের উপর গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। আমাদের বিমানগুলি হইতে পাল্টা গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিতেই সে রণে ভঙ্গ দিয়া মেঘের আড়ালে পলাইবার চেষ্টা করিল। তখন ভাল করিয়া তাহাকে দেখা গেল। এতো জাপানী জিরো বিমান নয়। এ যে আমাদের আমেরিকান ভাইদের বি, ২৫ অর্থাৎ মিচেল বম্বার। সম্মুখ বা পশ্চাৎ হইতে দেখিতে অনেকটা জাপানীদের জিরো বিমানের মত, কিন্তু আকারে অনেক বড়। এখন বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা গেল যে এই বিমানটি আমেরিকান বিমানবাহিনীর যে মিচেল বম্বার স্কোয়াড্রন ছায়াতে অবস্থিত, তাহাদেরই অন্যতম।

ততক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। ফ্লাইং অফিসার রহমানের পশ্চাতের ককপিটে বর্ম্মা হইতে আগত সার্জেন্ট কুমার ছিলেন গানার নেভিগেটর, বেতার-বার্তা পরিবেশক। তাঁহার ককপিট হইতে বেতারবার্তা-পরিবেশন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফ্লাইং অফিসার রহমান বহু চেষ্টা করিয়াও কোন জবাব পাইতেছেন না, বরঞ্চ কাঁচা রক্তের গন্ধে তাঁহার ককপিটও ভরিয়া যাইতেছে।

কুন্তিগ্রামে অবতরণ করার পর ফ্লাইং অফিসার রহমান পশ্চাতের ককপিটের দিকে ভয়ে আর সঙ্কোচে না তাকাইয়াই ধীরে ধীরে বিমান হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে বারটি বিমান হইতে তেইশজন বৈমানিক ফ্লাইং অফিসার রহমানের বিমানের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাহারও, বিমানের ডানার উপর উঠিয়া পশ্চাতের ককপিটে অনুসন্ধান করার মত মানসিক অবস্থা নাই। ভূমিতে দণ্ডায়মান তেইশজন বৈমানিকের মধ্যে যে কোন একজনের সার্জেন্ট কুমারের অবস্থা হইতে পারিত। অবশেষে, সার্জেন্ট ভাদুড়ী ধীরে ধীরে ডানার উপর উঠিলেন। প্রথমে উড়িবার উপযোগী সাজসরঞ্জামের কিছু ডানার উপর হইতে নীচে নামাইয়া দিয়া নিকটে গিয়া পশ্চাতের ককপিটের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের পর খোলা ককপিটের মধ্যে দুইহাত বাড়াইয়া ককপিটের কেদারার সাথে বাঁধা সার্জেন্ট কুমারের বাঁধন খুলিলেন ও পরে তাহার অসাড় দেহ ধীরে ধীরে বাহির করিলেন। ততক্ষণে আরও কয়েকজন আগাইয়া আসিয়াছেন। সকলে ধরাধরি করিয়া সার্জেন্ট কুমারের অসাড় দেহ মাটিতে নামাইলেন। বি-২৫ বিমানের নিক্ষিপ্ত একটি যন্ত্র ইঞ্চি মাপের গুলি সার্জেন্ট কুমারের হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে—মৃত্যুও নিশ্চয়ই সেই মুহূর্ত্তে হইয়াছে। মৃত্যুযন্ত্রণা হয়ত তাঁহাকে মোটেই সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু এ-প্রকার মৃত্যু কাহারও বাঞ্ছনীয় নয়। এ যেন মাঠে ফুটবল খেলিতে গিয়া নিজে গোলের মধ্যে বল মারিয়া গোল্ করা—সেল্ফ্ সাইড গোল। এ তো ভীষণ লজ্জার কথা।

আমেরিকান বিমানবাহিনীদের কর্তাদের নিকট হইতে পরে অবশ্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র পাওয়া গেল। তাঁহারা জানাইলেন বিমানচালক ছিলেন নবাগত বৈমানিক। আমাদের ভক্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমানগুলিকে জাপানীদের বদ্ধার বিমান ঠাওরাইয়া ভয়ে গুলি চালাইয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস একথা সত্য নয়। আমেরিকান বৈমানিক এবং গোলন্দাজদের মধ্যে দেখা গেছে অনেকেই সুবিধা পাইলেই গুলি নিক্ষেপ করিতে ভালবাসিতেন। তাহাতে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, অন্যের সুবিধা-অসুবিধার, ক্ষতিবৃদ্ধির কোন প্রশ্নই থাকিত না—ইংরাজিতে যে অবস্থাকে বলে "ট্রিগার হ্যাপি"। এই বৈমানিক ভদ্রলোক হয়ত ট্রিগার হ্যাপিই ছিলেন।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। নানা কারণে স্কোয়াড্রনে বৈমানিকদের সংখ্যা কিছু কমিয়া গিয়াছিল। তাহাদের স্থান পূরণ করার জন্য কয়েকজন নূতন বৈমানিক, তাহাদের সকলেই ভারতীয়, স্কোয়াড্রনে আসিয়াছেন। সবাই প্রায় শিক্ষালয়গুলি হইতে সরাসরি আমাদের স্কোয়াড্রনে পৌঁছিয়াছেন। বিমান উড়াইবার কৌশল সমস্তই তাঁহাদের আয়ত্ত, সবই কাগজে-কলমে, শিক্ষালয়ের শিক্ষায়, এমনকি শিক্ষালয়ের বিমান চালান পর্যন্ত। কিন্তু সত্য সত্যই শত্রুশিবিরে বিমান উড়াইয়া লইয়া গিয়া বোমা বর্ষণে নয়। যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন পাইলট অফিসার সাকলৎওয়ালা। বিমানচালক ও তাঁহার সাথী নেভিগেটর-গানার বেতারবার্তা-পরিবেশনকারী পাইলট অফিসার দবি। পাইলট অফিসার সাকলতওয়ালার চেহারাটি বড়ই সুন্দর। গড়নে বেঁটে, কিন্তু চমৎকার স্বাস্থ্য। গায়ের রং খুব ফর্সা, আর সেই সঙ্গে অপূর্ব সুন্দর একজোড়া গোঁফ। গোঁফ-জোড়াটি তিনি সব সময় পাকাইয়া রাখিতেন। আর স্কোয়াড্রনের অনেকেরই নিকট তাহা হইত ঈর্ষার কারণ। পাইলট অফিসার দবির ভাল মানুষের মত চেহারা আর আচার-ব্যবহার। পাইলট অফিসার সাকুলতওয়ালার একেবারে বিপরীত। সেইজন্যই বোধ হয় দুইজনের মধ্যে এত মিল, সব সময়েই দুইজনে থাকেন এক সঙ্গে। স্কোয়াড্রনে কিছুদিন থাকার পর, এবং কিছুদিন ধরিয়া সাধারণভাবে অন্য বিমানগুলির সাথে আকাশে ব্যূহ-রচনা করিয়া উড়িয়া বেড়াইবার পর, স্কোয়াড্রনের হাল-চাল তাঁহাদের আয়ত্তে আসিল। এইবার আসিল তাঁহাদের আসল পরীক্ষার সময়। তাঁহাদের জুড়ির আসল বোমা শত্রু-শিবিরে বর্ষণ করিতে যাওয়ার প্রথম দিন ধার্য হইল। সাব্যস্ত হইল কয়েকদিন পর একদিন প্রত্যুষে প্রথম যাত্রায় বার-খানা বিমানের একটি তাঁহারা দুইজন উড়াইয়া লইয়া বোমা বর্ষণে যাইবেন। প্রস্তুতির সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একটির পর একটি সাঙ্গ করিয়া তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের প্রস্তুতিতে এত আগ্রহ দেখিয়া সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন। বোমা বর্ষণ করিতে যাওয়ার পূর্বদিন সায়ংকালে যখন সমস্ত বিমানগুলিতে বোমা ও বন্দুকের গুলি সারি সারি সাজাইয়া রাখা হইতেছিল, তখন তাঁহারা দুইজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর যে বিমানটি তাঁহাদের দুইজনের লইয়া যাওয়ার কথা, সেই বিমানে আসিয়া তাঁহারা দুইজন

তাঁহাদের প্রস্তুতির অনুষ্ঠানগুলি প্রথম হইতে পুনরায় এক এক করিয়া শুরু করিলেন। প্রথম দিকে আমি অন্য বিমানগুলিতে বোমা ও গুলি সাজান ব্যবস্থাতে সাহায্য করিতেছিলাম। সাথে সাথে বিমানের খোল ও এঞ্জিনগুলিও পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলাম। সব ঠিক আছে কিনা।

একজন বৈমানিক আসিয়া সংবাদ দেওয়াতে পাইলট অফিসার সাকলতৃওয়ালার বিমানের নিকট আসিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ থাকিয়া তাঁহাদের দুইজনের অবস্থা ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিলাম। দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, যেজন একদিন, প্রস্তুতির একটা অনুষ্ঠানও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে একটা ভুলও করেন নাই, তিনি আজ তাঁহার প্রথম অগ্নি পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে একটা অনুষ্ঠানও নির্ভুলভাবে করিতে পারিতেছেন না। আর ভুল যতবার হইতেছে, ততবারই অনুষ্ঠানগুলির ক্রিয়া তিনি একেবারে প্রথম হইতে শুরু করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর, সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে পাইলট অফিসার সাকলাতৃওয়ালাকে বিমানের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসার জন্য অনুরোধ করা হইল। দেখিলাম, যে-পাইলট অফিসার সাকলতৃওয়ালাকে চিনিতাম, ইনি সে পাইলট অফিসার নন। বুঝিলাম যে আসল বোমা বহন করিয়া শত্রুশিবিরে যাওয়ার ভয়ে, তিনি একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ভিতরকার ভাল মানুষের সাথে বাহিরের বোঝাপড়া শত্রু মানুষের অনেক তফাৎ। অন্য সময় তাঁহার চিত্ত শান্ত, এখন তাঁহার চিত্ত শুধু অশান্ত নয়, ভয়ে একেবারে আচ্ছন্ন, তাঁহার আয়ত্তের একেবারে বাহিরে।

প্রথমবার বোমা-বর্ষণে যাওয়া বা প্রথমবার যে কোন কারণেই হউক দুশমনদের এলাকায় যাওয়াতে ভীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একবার দুইবার যাওয়ার পর সে ভীতি ভাঙ্গিয়া যায়। এ ভীতি না ভাঙ্গিলে প্রথমদিকের যাওয়াই শেষবারের মত যাওয়া হয়। এ ভীতি গল্পের সেই গোদাপায়ের নাধির মত। নাধি না খাওয়া পর্যন্ত ভীতি মাথার উপর জবরদখল করিয়া বসিয়া থাকে, একবার নাধি খাওয়ার পর যদি বাঁচিয়া রহিল তবে ভীতি ভাঙ্গিয়া গিয়া আচ্ছন্নতার হইতে মুক্তি মিলিল। পাইলট অফিসার দলির কিন্তু শান্তভাব। সবই অনেকটা নির্লিপ্তভাবে লইবার চেষ্টা করিতেছেন। পাইলট অফিসার সাকলতৃওয়ালার এতবার ভুল হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার ভাবে কোন রাগ বা বিরক্তির প্রকাশ নাই। যতবার পাইলট অফিসার সাকলতৃওয়ালা প্রথম হইতে অনুষ্ঠানের ক্রিয়াগুলি শুরু করিতেছেন, তিনিও ততবারই সেই সঙ্গে তাঁহার কর্তব্য অনুষ্ঠানগুলিও প্রথম হইতেই পুনরায় শুরু করিতেছেন, একটুও বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন না। এখন বুঝিলাম এই দুইজনে কেন এত মিল। একজন অন্য জনের শারক ও পূরক।

পরদিন প্রত্যুষে পাইলট অফিসার সাকলতৃওয়ালার "এ"-ফ্যাইটের ছয় নম্বর বিমানে উড়িবার কথা।

সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখার পর, "এ"-ফ্যাইট কমাণ্ডার

ফ্লাইট-লেফটেনান্ট পিন্টোকে গিয়া সমস্ত কথা জানাইলাম এবং পরের দিনের প্রথম ফ্লাইট হইতে পাইলট অফিসার সাকলাতওয়ালা ও পাইলট অফিসার দদিকে বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলাম। সাথে সাথে একথাও বলিলাম যে একজন বৈমানিক বা দুইজন বৈমানিক নষ্ট হইলে তাঁহাদের অভাব খুব করিয়াই বোধ করিব, কিন্তু বৈমানিকদ্বয় সহ যদি একটি বিমান নষ্ট হয়, তবে সে-অভাব দ্বিগুণ নহে, বহুগুণভাবেই বোধ হইবে। কেননা, এখন বৈমানিকদের অভাব ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু বিমানের অভাব পূর্বের মতই সঙ্কটজনক।

পরের দিন ভোরে আমাদের কয়েক জোড়া বৈমানিক নানা কারণে উড়িবার অযোগ্য রহিল। ফলে পাইলট অফিসার সাকলাতওয়ালা ও পাইলট অফিসার দদিকে বিমান লইয়া বোমা-বর্ষণে উড়িয়া যাইতেই হইল। সেদিনকার অভিযানে অধিনায়ক ছিলেন "এ"-ফ্লাইটের ফ্লাইং অফিসার ঘোষ। পূর্বে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পঠন কালে আমার তৃতীয় বর্ষের সময় তাঁহার প্রথম বর্ষ। এখন দুইজনেই একই স্কোয়াড্রনে। ফ্লাইং অফিসার মোহিত ঘোষ "এ"-ফ্লাইটে আর আমার নাম সার্ভিসিং সেক্সনে, কিন্তু কাজের সময় সব স্থানেই।

সেদিন কুম্ভিগ্রাম বিমান বন্দর ত্যাগ করার কিছুকালের মধ্যেই আমাদের স্কোয়াড্রন গভীর মেঘের মধ্যে পড়ে। মেঘ ছিল একেবারে জমাট। মাটির উপর হইতে শুরু করিয়া প্রায় পনর হাজার ফুট উর্ধ্ব পর্যন্ত গভীর মেঘ। খণ্ড খণ্ড টুকরা মেঘ, সেই অংশ পার হইলেই পুনরায় পরিষ্কার আকাশ আর নীচে পাহাড় মাটি নদী বৃক্ষরাজি দেখা যায়, সেইরূপ নোটেই নয়। চারিদিকে ঘন কালো মেঘ। এ প্রকার ঘন কালো মেঘ শুধু আসামের পাহাড়ী অঞ্চলে আর পূর্ববঙ্গেই দেখা যায়।

এইরূপ মেঘের আড়ম্বরের মধ্য দিয়া উড়নকালে ব্যূহ জমাট অবস্থায় রাখা মারাত্মক হইতে পারে। পাশের বিমান মেঘে ঢাকা। একটা আবছা কালো রং ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ব্যূহ শিথিল করাই এখন শ্রেয়। ব্যূহ শিথিল করার হুকুম ফ্লাইং অফিসার ঘোষ সেইজন্য জারি করিলেন, ও সেই সাথে সকল বৈমানিককেই বেতারবার্তায় নিজেদের ফ্লাইটের সাথে সংযোগ রাখার হুকুমও দিলেন। মেঘের এই আড়ম্বরের মধ্যে শত্রু জঙ্গী বিমানের কোন ভয় নাই। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ নিশানার দিকে উড়িয়া যাওয়ার পর যখন মেঘাড়ম্বর কমিয়া যাওয়ার কোন সঙ্কেতই পাইলেন না, বরঞ্চ মেঘের আড়ম্বর আর গভীরতা বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিলেন, তখন অভিযানের সফলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অভিযানের অধিনায়ক ফ্লাইং অফিসার ঘোষ বারখানা বিমানকেই কুম্ভিগ্রাম বিমান-বন্দরে ফিরিয়া আসার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে ঘন্টাখানেকের মধ্যে এক এক করিয়া আমাদের এগারটি বিমান ফিরিয়া আসিল এবং কুম্ভিগ্রাম বিমান-বন্দরে অবতরণ করিল। কোন বৈমানিকের নিকট পাইলট অফিসার সাকলাতওয়ালার কোন সংবাদ পাওয়া গেলনা। তারপর দুই তিন দিন ধরিয়া প্রবল বারিপাত চলিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। কখনও মুষলধারে,

কখনও ধীরে, কিন্তু বিরামহীন ভাবে। আকাশ মেঘে মেঘে আবৃত। এই আবহাওয়ার মধ্যে উড়িবার আর কোন উপায়ই রহিলনা। পাইলট অফিসার সাকুলাতুওয়ালা আর পাইলট অফিসার দদির জন্য কোন প্রকার খোঁজ করিবার কথাও আর আমরা মনে করিতে পারিলাম না। অগত্যা এই দুইজন বৈমানিকের কথা ভুলিয়া যাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টিত হইলাম।

সাত-আটদিন পরে আকাশ আবার পরিষ্কার হইল। এখানে-সেখানে খণ্ড খণ্ড মেঘ ছাড়া এখন আকাশ নির্ম্মল, নীল বর্ণের, আর গাছপালা সব ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া সুন্দর সুশ্রী রূপ ধারণ করিল। তখন ইরাবতী নদীর একটি শাখার কর্দ্দমাক্ত পারে পাইলট অফিসার সাকুলাতুওয়ালার বিমানটি উল্টা অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখা গেল। উল্টা কেন? তখন নানা জল্পনা-কল্পনার পর স্থির করা গেল যে বিমান মাটির উপর পড়িয়া যাওয়ার পর কোন অজ্ঞাত কারণে উল্টাইয়া গিয়াছে। সঠিক কারণ এখন জানা আর সম্ভব নয়। তখন পাইলট অফিসার সাকুলাতুওয়ালার ও পাইলট অফিসার দদির আত্মীয়দের জানান হইল যে জাপানীদের উপর হানলা করিতে গিয়া তাঁহারা দুইজন নিখোঁজ হইয়াছেন, হয়ত দুইজনেই নিহতও হইয়াছেন। বিমান-বাহিনীর ভাষায়—Lost, believed killed একেবারে নিখুঁত বিমানবাহিনীর ভাষা। এর পর তাঁহাদের নিকট-আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কাহারও তাঁহাদের কথা মনে করিয়া রাখার প্রয়োজন নাই।

দিন দশেক কাটিয়া গিয়াছে। একদিন অপরাহ্নে এক ব্যক্তি, পোষাক তাহার এখনও যেটুকু রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় বিমানবাহিনীর কোন বৈমানিক হওয়াই সম্ভব, পাহাড়ের অপর পার্শ্ব দিয়া কুন্তিগ্রাম বিমানবন্দরের দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে দেখা গেল। পাইলট অফিসার দদি ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু একলা। পাইলট অফিসার সাকুলাতুওয়ালার কথা তিনি কিছুই জানেন না। এই দশদিন অর্দ্ধাহার অনাহারে এবং প্রথমদিকে শুধু রাত্রিকালেই পায়ে হাঁটিয়া কুন্তিগ্রামের দিকে তিনি আসিয়াছেন। বিমান হইতে জাপানীদের এলাকায় তিনি পতিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য প্রথম দিকে দিনে জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতেন এবং রাত্রিতে দিক নির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে এই দিকে অগ্রসর হইতেন। পরে যখন বুঝিলেন যে আমাদের এলাকায় পৌঁছিয়াছেন, তখন দিনের বেলাতেই জঙ্গল-পাহাড় অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

কিছু সুস্থ হওয়ার পর তাঁহার নিজের গল্প বলার অবসর হইল।

মেঘের মধ্য দিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত একলা উড়িয়া যাওয়ার পর তাঁহার বোধে আসিল যে তিনি যেন বিমানের ককপিট হইতে ঝুলিয়া বাহিরে আসিয়াছেন। উপরের ঢাকনা-খোলা পশ্চাতের ককপিটের মধ্যে পিছনের দিকে মুখ করিয়া, বন্দুক চারটি প্রস্তুত রাখিয়া তিনি কেদারার উপর বসিয়া ছিলেন; এবং কেদারার সাথে নিরাপদ-ফেটি দিয়া নিজেকে

শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। ককপিট হইতে বাহিরে ঝুলিয়া পড়ার কারণ তখনই তাঁহার অনুমানে আসে। এ ঘটনা ঘটে ফ্লাইং অফিসার ঘোষ বাহ শিখিল করার হুকুম দেওয়ার অন্ততঃ আধঘন্টা পরে।

মেঘের মধ্য দিয়া উড়িবার সময় আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গম দেখা যায় না। এবং অনেক উপর দিয়া যদি উড়িয়া যাওয়া যায়, তখন প্রথম দিকে বিমান যদি উল্টা অবস্থায় উড়িতে থাকে তাহাও বৈমানিকের বোধে আসে না। মাটির নিকটে থাকা কালে কাহারও পদদ্বয় ঊর্দ্ধে ও মস্তক নিচের দিকে রাখা থাকিলে, তখনই সে বুঝিতে পারে যে সে উল্টা হইয়া আছে। ইহার কারণ খুব সহজ। মস্তক নীচের দিকে ও পদদ্বয় ঊর্দ্ধে থাকিলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য তাহার শরীরের রক্ত মস্তকে টানিয়া আসে, এবং সেজন্য সে অস্বস্তি বোধ করে। বিমান যদি খুব ঊর্দ্ধে উল্টা অবস্থায় উড়িতে থাকে তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে রক্ত চক্ষু, মুখ, নাসিকাতে খুব শীঘ্র আসিয়া জমা হইতে পারে না, কেননা তখন বিমানের বেগে গতি মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত-ভাবে শরীরের উপর প্রভাব করে। বস্তুতঃ বিমানের গতিবেগ যত বেশী হইবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব তত পরে বোধগম্য হইবে। সেই কারণে বিমান উল্টা অবস্থায় উড়িতে থাকিলে বৈমানিক তাহার শরীর-যন্ত্র দিয়া উল্টা অবস্থা সহজে অনুমান করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় যদি আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গমও না দেখা যায় তখন বৈমানিককে তাহার বিমানে স্থিত যন্ত্রপাতি ও ঘড়িগুলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমানে আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গম ও সেই সঙ্গমের পরিপ্রেক্ষিতে বিমানের কিরূপ অবস্থান তাহা দেখাইবার জন্য তিনটি ঘড়ি ছিল। পশ্চাতের ককপিটে কিন্তু কোন ঘড়ি সাধারণতঃ থাকে না এবং পাইলট অফিসার দদির বিমানেও ছিল না। সেইজন্য বিমান উল্টা না সোজা অবস্থায় উড়িতেছে, তাহা পাইলট অফিসার দদি যতক্ষণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দাপটে ককপিট হইতে ঝুলিয়া না পড়িলেন ততক্ষণ জানিতে পারেন নাই।

গভীর মেঘের মধ্য দিয়া উড়িয়া যাওয়ার সময় তাঁহাদের বিমান নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে উল্টা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল; পাইলট অফিসার দদির পক্ষে এই উল্টা অবস্থার কথা অনুমান করা অসাধ্য ছিল। কিন্তু পাইলট অফিসার সাকুলতওয়ালার পক্ষে নিশ্চয়ই সহজ ছিল। যদিও আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গম গভীর মেঘের জন্য তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে ছিল, কিন্তু সঙ্গম দেখার জন্য যে তিনটি ঘড়ি তাঁহার ককপিটে অবস্থিত ছিল সেগুলির দিকে তাঁহার নজর হয়ত ছিল না। হয়ত বলাই শ্রেয়, কেননা আসল কারণ জ্ঞাত হওয়ার তখন আর কোন উপায় নাই। শুধু অনুমান করা যায় উল্টা অবস্থায় বিমান উড়িবার কথা শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাঁহার বোধে আসে নাই। পাইলট অফিসার দদিরও একথা বোধে আসিত না যদি তিনি তাঁহার ককপিট হইতে ঝুলিয়া বাহির হইয়া না পড়িতেন।

উল্টা হইয়া উড়িবার কথা পাইলট অফিসার মদির বোধে আসা মাত্র তিনি পাইলট অফিসার সাকলতওয়ালাকে বিমানের অবস্থা জানাইবার চেষ্টা করেন, ও সেই সাথে নিজেকেও টানিয়া তাঁহার ককপিটের মধ্যে লওয়ার চেষ্টা করেন। তাড়াতাড়ি এই প্রক্রিয়াগুলি করার সময় বিমানের সহিত তাঁহার কেদারার বাঁধন খুলিয়া যায়, এবং কেদারায় বসা অবস্থায় তিনি অতি শীঘ্র বিমান ত্যাগ করিয়া ভূমির দিকে অবতীর্ণ হইতে থাকেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অবতরণ করার পর তিনি নিজেকে কেদারার বাঁধন হইতে মুক্ত করিয়া প্যারাসুট খুলিয়া ফেলেন। অতঃপর ভূমিতে অবতরণ বা পতন এবং জঙ্গল-অভিযানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কয়দিন পরে ছাউনিতে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীরঙ্গম

এই সেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্র।

রাজা মৃগয়ায় বের হয়েছিলেন। সমস্ত দিন ক্রীড়া পরিশ্রমের পরে বসেছিলেন গাছতলায়। ঝিরঝিরে হাওয়ায় সেই বিজন প্রান্তরে হয়ত তাঁর চোখে নেমে এসেছিল ঘুমের আমেজ। এমন সময় কানে এল ওই কথা। জনমানব তো নেই। রাজা উৎকর্ণ হলেন। যে-গাছের ছায়ায় বসেছিলেন তারই শাখায় বসে পাখি কথা বলছে।

এই সেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্র। মাটির নিচে ঘুমন্ত রয়েছে রঙ্গনাথের মন্দির। দেখতে পাচ্ছ না, রাজন্? জাগাও তাঁকে।

কিলিকাও রাজা (কিলি=পাখি) অনতিবিলম্বে লোক লাগালেন—এমনি ব্যাপার—বৃত্তিকাজঠর থেকে মন্দির উদ্ধার হল, তার মেরামতি মাজাঘষা বাকী থাকল না।

জনশ্রুতির কাহিনীটি বেশ মনোরম। তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের মেরু-মজ্জা যোগ করা ক্রমে আবশ্যক হয়ে পড়বে।

ত্রিচি বা আধুনিক তিরুশিরাপল্লীর দুই-বাড়াই মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গম শহর। উত্তরে কোলেরুণ এবং দক্ষিণে কাবেরী নদী দ্বীপের মতো ঘিরে রয়েছে চার মাইল চওড়া ও আট মাইল লম্বা ভূখণ্ড। সবটা জুড়েই তো প্রায় মন্দির—সীমানা দৈর্ঘে ২৮৮০ ফুট এবং প্রস্থে ২৪৭৫ ফুট—অর্থাৎ কমবেশি তিন বর্গ মাইল ক্ষেত্র। কেন্দ্রে বিগ্রহের স্বর্ণচূড় আলয়। তাকে ঘিরে চতুষ্কোণ সাতটি প্রাকার—সপ্ত ভুবনের পরিকল্পনায় কি?—বাকুলের মধ্যে বাকুল যেন। এ-সব প্রাকার বা অঙ্গনবেষ্টনী প্রাচীরের উপর একশটি গোপুরম্, চোদ্দটি আবার একই সারিতে। একান্ত বাহিরের শেষ তিনটি প্রাকার আজ কালপ্রবাহে ডুবে গিয়েছে বাড়তি শহরের মধ্যে অন্যান্য বিপণিশ্রেণী ও বাসগৃহের অন্তরালে। শহরের এখানে-ওখানে অপ্রত্যাশিতভাবে ভুঁই ফুঁড়ে উঠেছে এদের গোপুরম। এককালে এক বহিঃসীমান্তের প্রাকারে পূজারী সেবায়েতদের বাসস্থান ছিল।

আমরা পর্যটন শুরু করলাম চতুর্থ প্রাকারের দক্ষিণ মুখ থেকে। ক্রমশ যাব উত্তর দিকে। খুবই আশ্চর্যের কথা। কেননা দক্ষিণে যাবতীয় মন্দিরের পরিকল্পনায় দেবতা পূর্বমুখী, প্রবেশদুয়ার খুলেছে পূর্বান্তে (ক্বচিৎ পশ্চিমে)। তীর্থকামীকেও চলতে হয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে। গাইড আলো-উন্মুখতার একটা ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছিল। অশোক তাকে এগুতে দিল না। ব্যাটা কিছু জানে না। না জানবারই কথা। সে কার্ণগন, পার্সি ব্রাউন, হ্যাভেল, কুমারস্বামী, সিলভ্যাঁ লেভী, জ্যাভো দ্যুব্রুই, ওকাকুরা, ও, সি, গাঙ্গুলি আদপেই পড়েনি। তবু তাকে আমি সঙ্গে আসতে বললাম। এইটুকুই

নে তার ভীরিকা। কী গভীর মমত্ব দিয়ে প্রকৃতির রূপলোক সে উজাড় করে দেয়। তার সব কথা বিশ্বাস করতে হবে এমন দাবিও তার নেই। দেখলাম এই চতুর্থ প্রাকারই (১২৩৫′×৮৪৯′) শিল্পোৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বাহুতে তিনটি গোপুরম্। পূর্বদিকের 'ভেল্লাই' গোপুরম্ সর্বোচ্চ, ১৪৬ ফুট। তারই পশ্চিমে 'হয়সভা' (Horse Court)—একটি চতুষ্কোণ পার্শ-খোলা মণ্ডপ, তার বহিঃ প্রান্তের স্তম্ভগুলির সঙ্গে আরোহীসহ লম্ফোদ্যত অশ্বশ্রেণী। এগুলির বিশদ খোদাই এত নিপুণ এত বাস্তবানুসারী যে মনে হয় যেন জীবন্ত যুদ্ধং দেহি প্রাণীটির ঘ্রেষাধ্বনি এবং নাসাবিস্ফার শুনছি। বালিপাথরে কলাকৃতিরএই উৎকর্ষ মূর্তি চালাইয়ের বিস্ময় এনে দেয়। হয়সভার ঠিক বিপরীত দিকে—প্রকারের উত্তর-পূর্ব কোণে 'সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ', ১৬০ফুট×৫০০ ফুট সমন্বিবাহু ক্ষেত্র; প্রসারে ১৮টি এবং গভীরতায় ৬৩টি স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভ গ্রানিট পাথরের অবিতর্ক ধৈর্য—তাদের গায়ে লতাপাতাফুল পশুপাখির বিপুল ও বিচিত্র সমারোহ। তারপর উত্তর-পশ্চিম কোণের রঙ্গনায়কী মন্দিরে এসে পৌঁছালাম। ততক্ষণে সেখানে ভক্তের ভিড় জমে উঠেছে—তারা ফলপুষ্পের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে দেবী সান্নিধ্যে। আমরা দর্শন করে পরিক্রমার প্রায় শেষে পেলাম কৃষ্ণমন্দির। এখানে কৃষ্ণ নেই, বিগ্রহ নেই, এমন কি পূজারী বা ভক্তেরও সমাবেশ নেই। শুধু একটি অনুচ্চ মনুমেন্ট—মহাবল্লীপুরের পঞ্চরথ রথের ধরণে—নিছক শিল্পসুষমার সম্ভার অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য তার শ্রী। মন্দিরের গায়ে গভীর-খোদাই কয়েকটি নারী-মূর্তি ('মালাধার রাণী,' 'তামিল রাণী')। আমরা য়ুরোপীয় সমালোচকের ধুয়া ধরে দিনরাত গ্রীক মূর্তি ও ভাস্কর্যের স্তুতি করি, কিন্তু মহাবল্লীপুরম্, কৈলাসনাথ-চোলপুরম্ এবং শ্রীরঙ্গমের এই মূর্তি-খোদাই দেখলে ভারতীয় শিল্প-প্রতিভাকেও শ্রদ্ধা করতে শিখব।

উত্তর তোরণ পার হয়ে এবার পড়লাম তৃতীয় প্রাকারে (৭৬৭ ফুট×৫০৩ ফুট) অর্থাৎ তার প্রসার প্রায় সাড়ে তিনশ ফুট। ঢুকেই প্রথমে গরুড় মণ্ডপ—মণ্ডপের দক্ষিণে 'সূর্যপুষ্করিণী'। সেখান থেকে সোজা দক্ষিণ মুখে চলে গেলে শেষে প্রায়-গোলকার 'চন্দ্রপুষ্করিণী'। শুধু পশ্চিমের ঘাটটুকু ছাড়া চারদিকে কোমর-সমান পাঁচিলে ঘেরা। সেই ঘাটের সিঁড়িতে কৌতূহলী আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চিলাপিয়া মাছ। দক্ষিণী বামুন তো এর ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। তবু এখানে কী করে এদের আশ্রয় এবং অবাধ বসতি হল তা চিন্তার বিষয়। স্বচ্ছ জলে এদের লীলা অশোক ক্যামেরায় ধরে ফেলল। শুধু ছোলায় ভরে ফেলতে পারল না বলে যা দুঃখ।

দ্বিতীয় প্রাকারটি (৪২২৬ ফুট×২৯৫ ফুট) চাকা অঙ্গন—পশ্চিম দিক বরাবর লম্বা করিডর, স্তম্ভের সারি চলেছে দূর অবধি যেন ট্রায়াম্ফাল আর্চের অনন্ত শ্রেণী মাথার ওপরে। প্রাচীন স্থাপত্যের বিচারে এই স্তম্ভগুলির প্রকৃতি বিশেষ সাহায্য

করে—তাদের ক্রমশ জটিল আকৃতি এবং ভারবহন-পদ্ধতি কালের সূচিপত্র বহন করে। ক্রমে সে প্রসঙ্গের অবতারণাও আবশ্যক হবে।

প্রথম প্রাকারের (২৪০ ফুট × ১৮১ ফুট) মাঝখানে দেবগৃহ বা গর্ভগৃহ, বাহিরে দেখতে চতুষ্কোণ এবং সমচতুর্বাহু হলেও ভিতরে গোলাকার। আমরা ফুলেফলে পূর্ণ ভোগের থালা ক্রয় করিনি, পূজার ফলমাংশে দক্ষিণা বরাদ্দ করিনি। আমরা চেয়েছি অনন্ত শয়নে শায়িত বিষ্ণুর কাছে একটু যেতে, কোন সে ভাব মুদ্রিত কপকনয়নে তারই একটু আভাস ধরতে। ক্রমে ক্রমে এগিয়ে গেলাম কাছে—একান্ত কাছে। মানুষের চোখ সে-মূর্তিতে নেই—সেখানে কালো অক্ষে চোখ দু'টি শুধু রাশি রাশি সোনা, সে-দৃষ্টি অনিবন্ধ—তাতে সব সোনা হয়ে ওঠে। অনন্তশয়ানের সংজ্ঞা আমার কাছে মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠল—এই যদি আত্মসংবরণ হয়, মনে হ'ল, প্রলয়ের বিক্ষোভ তাতে এতটুকু রেখাপাত করবে না। চেতনার মৃত্যু নয়, চেতনার এ এক অটুট পূর্ণতা।

পূজারী নৈমিত্তিক আচারে বদ্ধ। সে এনে দিল দীপচন্দনের স্পর্শ—বিভূতির প্রলেপ। তাকে এরই মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—ডাকতে হয় ভক্তদের। যে জ্ঞানে সন্ধান তার কাছে আচারের বন্ধন থেকেও আলগা, সে এক দুর্জ্ঞেয় বিদ্যা—কেউ কাউকে বলে দিতে পারেনা, নিজেকে আবিষ্কার করে নিতে হয়।

পুরাণের কাহিনীটিও এবার বলে নিই। কারণ একমাত্র বিজ্ঞানের চমৎকারিত্ব দেখাবার জন্যই তো এসব মন্দিরের জন্ম হয়নি। যে-সব রাজা মহারাজার ভাবনায় এরা প্রথমে বীজরূপে ফুটে উঠেছিল তাদের মনে পুরাণের প্রভাব বেশ প্রবলই ছিল।

বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন সেই প্রলয় পয়োধিজলে। সৃষ্টি হল বিশ্বচরাচর। কিন্তু ব্রহ্মা চরাচর সৃষ্টির ভবিষ্যৎটি ভেবে চিন্তাকুল হলেন। অগত্যা বিষ্ণুর আরাধনায় বসলেন তিনি। বিষ্ণু প্রণবাকার শ্রীবিমান-বিমানের আশ্রয়ে আবির্ভূত হয়ে অভয় দিলেন। ব্রহ্মা বিশ্বকর্মার সাহায্যে এই পবিত্র বিমান সত্যলোকে বহন করে নিয়ে বিরাজ নদীর তীরে প্রতিষ্ঠা করলেন। কালক্রমে ব্রহ্মা এই বিগ্রহপূজার ভার ইক্ষাকু রাজবংশের হাতে অর্পণ করলেন। রাজা দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন চোলরাজ ধর্মবর্মা—তিনিও স্বর্ণ বিমানে পূজা দিয়ে তাঁর রাজধানী ওরেইয়ুরে রঙ্গনাথের আগমন প্রতিশ্রুতি পান। রামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধার করে ফিরে এলেন তখন রঙ্গনাথ বিমান ও বিগ্রহ তিনি বিভীষণের হাতে অর্পণ করেন। বিভীষণ লঙ্কায় যাবার পথে চন্দ্র-পুষ্করিণীর পাড়ে থামেন। পরে সে-বিমান আর তিনি নড়াতে পারেন না। রঙ্গনাথ বললেন, কাবেরী-কোলেরুণের অন্তে জায়গাটা তাঁর ভালো লেগে গিয়েছে—সেখানেই তিনি থাকবেন, তবে সর্বদা দৃষ্টি রাখবেন বিভীষণের রাজ্যের ওপর। এখনো সরল

লোকেরা বলাবলি করছে প্রতি বছর একবার বিভীষণ সকলের অজ্ঞাতসারে এসে রঙ্গনাথ দর্শন করে যান।

জানি বিভীষণের গতিবিধি গোপন। আরও জানি ভারতবর্ষের সরল-বিশ্বাসী প্রত্যক্ষ সাধারণের পদক্ষেপে আজ এই অবহেলিত মন্দির আবার সজাগ সরব হয়ে উঠছে। সেখানে ভিক্ষায় বিদেশীও এসে জুটেছে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের এক অলঙ্কারপ্রধান তত্ত্বের রসে সিক্ত নতুন বস্তুরূপ তাকে দিয়েছে এক নূতন স্বাদ, শিল্পোদ্যানের এক নূতন অর্থ।

এই উদ্যানের প্রথম উদ্যোক্তা চোলরাজ—মূল দেবাসনের সাধনা তার প্রমাণ। চোল স্থপতির দৃষ্টি ছিল সরল—বলিষ্ঠ রেখায় অলঙ্কৃত সেখানে অনুচ্চ শিখর। তাঞ্জোরের নানা উদাহরণে এই সত্য পরিস্ফুট। এই সূত্রে সিদ্ধান্ত করা চলে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের সূচনা দশম শতাব্দিতে এবং সম্ভবত প্রথম দিকে। চোলদের পরে এসেছে পাণ্ড্যরাজবংশ। পাণ্ড্যরা দৃষ্টি দিয়েছে পরিবেশ-সজ্জায়—জটিল পরিকল্পনায়, স্তম্ভ মণ্ডপ এবং গোপুরম নির্মাণে। তাদের হাতে পলস্তারাশিল্প পরিণত যৌবনে এসে পৌঁছেছে। চিদম্বরনের গোপুরম তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। শ্রীরঙ্গনের অর্ধসমাপ্ত দক্ষিণ গোপুরমের যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে জানা গেল তার উচ্চতার লক্ষ্য ছিল ৩০০ ফুট—বিশ্বের প্রাচীন ধর্মালয়গুলির সমকক্ষ। শিলালিপিতে প্রকাশ মন্দির-সংস্কারে ও সংযোজনে জটাবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্যর দান (১২৫৪ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য। একখণ্ড শিলাপাতে উৎকীর্ণ যে রাজা কম্পন উদৈয়ার এর সম্ভার্জনা করেছিলেন। মাদুরার নায়ক এবং বিজয়নগরের হাতে এসে পুরাতন রঙ্গনাথ-মন্দির আধুনিক আভরণ-অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়াল। শেষগিরি রাও মণ্ডপের হয়সভাতে প্রচুর কারুকার্য একটা উচ্ছল যৌবনতরঙ্গ অথচ তার রক্তের সুরে যেন সংযত তাল বাঁধা। বিজয়নগরের তাৎপর্যই হল তাই। কৃষ্ণা তরঙ্গিনীর পাড়ে ও তুঙ্গভদ্রার তীরে বিজয়নগরের আবির্ভাব ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে, সংস্কৃতির এক সংকটমুহূর্তে। সেদিনের হরিহর-বুক্ক ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই হিন্দুরাজ্য শুধু রাজনৈতিক শক্তিতে শুধু বাহুবলে ক্ষাত্রবীর্যে মুসলমান-অভিযান প্রতিহত করেনি—অন্তরের শক্তিও সে অর্জন করেছিল। তার শিল্পে এই অন্তশ্চেতনারই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত—দর্শনের ভাষায় রজোগুণের ওপর সত্ত্বগুণের প্রভুত্ব—তাতেই এই নূতন রাজ্য পেয়েছিল আত্মরক্ষার শক্তি, কাল-ভবিষ্যের কাছ থেকে সাফল্যের স্বীকৃতি। য়ুরোপীয় সমালোচকরা প্রায়ই এ-দৃষ্টিতে দেখেননা। য়ুরোপীয় চঙে সাহস ও আধুনিকতা দেখাতে গিয়ে আমরাও অনেকে আজ মন্দিরের মূর্তিতে প্রাণস্ফূর্তি ও যৌনতা আবিষ্কার করতে প্রস্তুত। সমস্যার বিষয়, আমাদেরই সংস্কৃতিবাহকরা বিদেশী দর্শক পর্যটকদের জ্ঞান দেবার জন্য কতকগুলি অঙ্গভঙ্গিমাকে কাম-বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বিজ্ঞাপিত করছেন। এরাই বিজয়-নগরের শিল্পের অলঙ্কার-প্রাচুর্যকে সমসাময়িক পাশ্চাত্যের রেঁনেসাঁসের প্রসূতিঘরে

জাত বারোক (Baroque) শিল্পের সঙ্গে সমান পর্যায়ে ফেলেছেন। বস্তুত এতে সত্যের অবমাননা হয়—বিজয়নগর আর বারোক আকাশ পাতাল তফাৎ, প্রেরণার উৎস তাদের এতই পৃথক।

আয়তনের বিশালতায়, গোপুরমের সংখ্যাধিক্যে ও বিপুলতায়, কারুকার্যে ও শোভন মণ্ডপবিন্যাসে, ঐতিহ্য-নাহাত্ম্যে ও লোকসংগ্রহে পারঙ্গমতায় শ্রীরঙ্গম এই দক্ষিণে সকলের অগ্রগণ্য। তার অঙ্গরচনার নকসা (plan) হয়ত চালুক্যরীতির মতো জমাট ও পদে পদে কৌতুকাবহ নয়—যেমন বলছেন ফার্গুসন—তা বলে তার সরল রেখার প্রাধান্যে অঙ্কিত মন্দিরচিত্রটির নিজস্ব শ্রী নেই এমন কথা বলা চলে না। তার মুখ্য সরলতা ও বিস্তারের সঙ্গে মূলভাবটি মিশে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। আচার্য রামানুজের ভক্তি সেখানে বায়ুতরঙ্গে মিশ্রিত ও শিলাঙ্কে প্রলিপ্ত, কৃষ্ণ-পাগলিনী কুমারী অণ্ডালের গীতি অনিলে নীলিমায় নিত্য উচ্চারিত—

"আমরা চাই শুধু তোমার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা,
আবহমান কাল এবং সকল আবির্ভাবে
তোমারই সেবায় জীবনধারণ।"

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

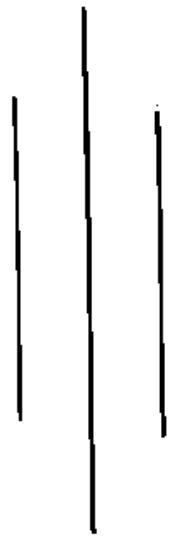

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

Planning a new project ?

IT PAYS TO AVAIL OF INDIAN CONSULTANCY SERVICES

What should be the best process for the plant ? Will the plant be economically viable? Does the market justify the plant capacity ? Is the site selected ideal for the plant ? Is the production cost realistic ? How and where to obtain the best possible plant and equipment ? All this and many other project problems may confront you Why not leave these to competent Indian Consulting Engineers ? Indian Consultants have no interest other than yours It is they who know the Indian conditions best

RANGE OF SERVICES

FEASIBILITY AND PROJECT REPORTS ☐ MARKET STUDY AND ECONOMIC INVESTIGATION ☐ SITE SELECTION AND SURVEY ☐ BASIC AND PROCESS ENGINEERING ☐ TENDER EVALUATION AND APPRAISAL ☐ DETAIL DESIGN ENGINEERING ☐ CONSTRUCTION SUPERVISION AND MANAGEMENT ☐ COMPLETE PLANT ERECTION ☐ START-UP AND COMMISSIONING ☐ INITIAL OPERATION ☐ TRAINING OF PERSONNEL ☐ POST-OPERATION CONSULTATION.

Indian consultancy helps the nation attain self-sufficiency in technical know-how

*

Issued in the interest of consultancy services by

THE KULJIAN CORPORATION (INDIA) PVT LTD.

24-B, Park Street, Calcutta-16

Phone : 34-2665 Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	দাম—২·০০
তৃতীয় খণ্ড	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	দাম ২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	দাম ২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন

(সংক্ষিপ্ত—১ম খণ্ড)

১ থেকে ২৮ অধ্যায়

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য তিন টাকা

"এই সংক্ষিপ্তসার অনুসরণ করে যারা শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনে প্রবেশ করবেন তাঁরা অল্প চেষ্টায় মূল গ্রন্থের সার কথা সবই পাবেন।" (যুগান্তর)

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

Reg. No. 13773/66

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির প্রকাশনা

যোগ সাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
স্মৃতির পাতা (১ম পর্যায়)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪·৫০
ঐ (২য় ,,)	ঐ	৪·০০
কবিমনীষী (১ম খণ্ড)	ঐ	৩·০৫
ঐ (২য়)	ঐ	৪·৫০
রবীন্দ্রনাথ	ঐ	৩.৫০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও কর্ম	পশুপতি ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক)	৫·০০
Talks with Sri Aurobindo	by Nirodbaran	৮·০০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	অনিলবরণ রায়	২·০০
সাধনার জীবন	নলীনকান্ত গুপ্ত	১·০০

আশ্রম প্রকাশনা

বিবিধ রচনা	শ্রীঅরবিন্দ	১·০০	উত্তম রহস্য	শ্রীমা	১·০০
ভারতের নবজন্ম		১·৫০	ছোটদের গল্প		১·৫০
কর্মযোগী		১·৫০	পুরাণো লেখা		১·৫০
জন্মান্তরের রথ		১·০০	শিক্ষা		১·৫০
গীতার ভূমিকা		২.০০	মায়ের আলাপ		২·৫০
শ্রীঅরবিন্দের পত্র		১·০০	সর্ব্বোত্তম আবিষ্কার		০·৩৭

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা--১২

ফোন--৩৪-২৩৭৬

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৯

বর্ষ—২৮ সংখ্যা—৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৯)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...	৫
চান্দ্রায়ণ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১২
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	১৬
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা	পবিত্র	২৬
পথের কথা	...	৪০
গোলকুণ্ডে তোমার নামে	সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত	৫২
মর্ত্য সীমা	ঐ	৫৩
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু	৫৪
নেলী সাক্স্	সমীরকান্ত গুপ্ত	৬৩
মাতৃবাণী		৬৯
সূচীপত্র (১ থেকে বর্ষ ১২)		৭১

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০.০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০.০০		২০০.০০
ভিতরের মলাট	১৫০.০০		৫২০.০০
বাহিরের মলাট	২০০.০০		৬০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Edited By : Nolini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2
PRINTED IN INDIA

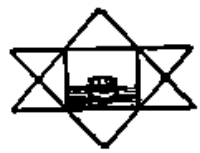

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৯

প্রত্যেক সত্য আপনাআপনি যত সত্যই হোক, তাকে যদি পৃথক করে ধরা হয় অন্য সেই সব সত্য থেকে যারা তাকে যুগপৎ সীমাবদ্ধ করে ও পরিপূর্ণ করে, তবে তা হয়ে ওঠে বুদ্ধিকে বেঁধে রাখবার ফাঁদ আর বিভ্রান্তকারী মতবাদ। কারণ বস্তুতঃ প্রত্যেক সত্য হল জটিল এক বুনানীর মধ্যে একটি সুতো, বুনানী থেকে কোন সুতোই পৃথক করে নেওয়া যায় না।

—শ্রীঅরবিন্দ

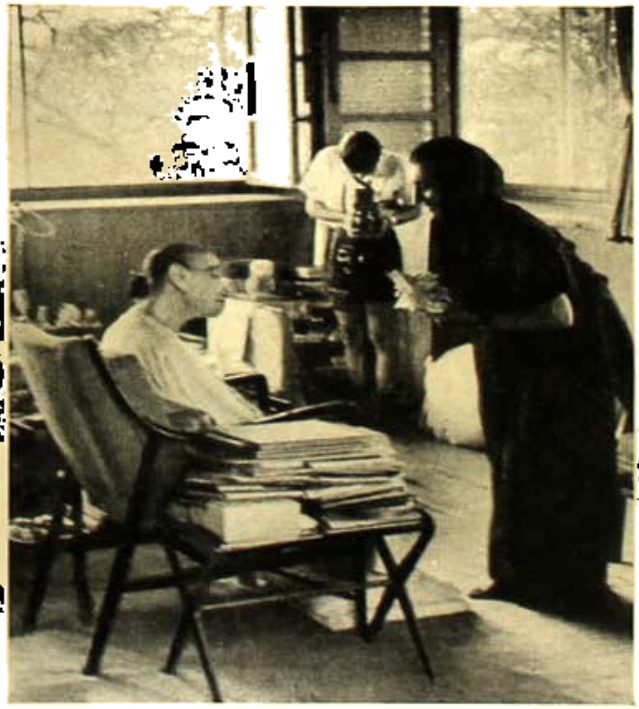

শ্রীমা সমীপে
প্রধানমন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা

শ্রীমা সমীপে রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি

শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে রাষ্ট্রপতির পুষ্পার্ঘ্য

সাবিত্রী

[নবসৃষ্টি, নব মানব কি রকম হবে—তাদের স্বভাব-স্বধর্ম—তাদের ধর্ম-কর্ম আকার-প্রকার—কিং যাগীত ব্রজেত কিং—বসে কি রকমে চলে কি রকমে, সেই আলেখ্যই এঁকে দেওয়া হয়েছে—আরও উজ্জ্বল করে]

একাদশ পর্ব্ব—প্রথম সর্গ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(১৩)

মানস সত্তার ঊর্দ্ধে এক সত্তা আছে,
এক অপরিমের বহুরূপে ঢালা হয়েছে,
বহুল বিচিত্র একের অলৌকিক সে লীলা।
চেতনা আছে মন যাকে স্পর্শ করে না।
মনের ভাষায় তা উচ্চারিত হয় না,
মনের চিন্তায় প্রকাশ পায় না,
পৃথিবীতে তার কোন গৃহ নাই,
মানুষের অন্তরে তার অধিষ্ঠান নাই,
তবুও তা হ'ল যাবতীয় চিন্তার যাবতীয় কর্ম্মের উৎস,
সৃষ্টির ক্রিয়াবলীর আদি প্রস্রবণ,
এখানকার সকল সত্যের জনয়িতা,
মনের বিক্ষিপ্ত কিরণাবলীর সংহত সূর্য্যমণ্ডল,
অনন্তের আকাশ নালে যে ভাগবত বর্ষণ
সেই বৃহৎ যে মানুষকে ডেকে বলে
আত্মাকে প্রসার করে ধর,
উদার সেই লক্ষ্য যেখানে মানুষের সকল সঙ্কীর্ণ
প্রয়াসের সার্থকতা,
সেই ধারা যেখানে সে পায় যতটুকু আনন্দের রসাস্বাদ
রয়েছে তার ভাগে।
রয়েছে তারা যারা গড়ে উঠবে সেই মহিমার আধার হয়ে,
শাশ্বতের জ্যোতির্ম্ময় শক্তির বাহক হয়ে।
এরাই হল পূর্ব্বগামীরা কালের অগ্রভাগে স্থান যাদের,

পৃথ্বীবক্ষ মনের মহান মুক্তিদাতা তারা,
মানুষী মাটির পরম রূপান্তর-কর্তা,
সমুচ্চ এক অভিনব জাতির প্রথম সন্তান তারা।
দেহধারী যুগল-শক্তি দৈবদুয়ার খুলে ধরবে,
শাশ্বত অতিমানস পার্থিব কাল স্পর্শ করবে।
বর্ত্তমানুষের মধ্যে অতিমানব জাগ্রত হবে,
প্রকাশ করবে অপ্রকট দেবপ্রায় জীবকে,
অথবা পরিণত হবে সেই ভাগবত-আলোকরূপে,
সেই ভাগবত-শক্তিরূপে,
ব্যক্ত করবে গুহাভ্যন্তরের গুপ্ত দেবতাকে।
তখনই পৃথিবী পরমের স্পর্শ পাবে,
তাঁরই লোকোত্তর অনাবৃত জ্যোতি
উদ্ভাসিত করে ধরবে
মনকে হৃদয়কে, জীবনকে বাধ্য করবে,
এমন কর্ম্ম করে চলবে
যাতে অনির্ব্বচনীয় তার রহস্যের ব্যাখ্যা দেবে
ভগবানের স্বর্গীয় বর্ণমালার চিহ্নাবলী আশ্রয় করে।
দুঃখের ও মৃত্যুর নিয়তি খণ্ডিত ক'রে,
অজ্ঞানের সূত্রাবলি মুছে ফেলে,
তার জীবন্ত বিশ্বময় চেতনা
ঘিরে রাখবে অমৃতের অধিকারী সত্তাকে
সৌন্দর্য্যের গভীরতর অর্থ দিয়ে,
জীবনের গুপ্ত অভিব্যঞ্জনা দিয়ে ;
দৃষ্টি তার পার হয়ে যাবে অনন্তের রহস্যময় তরঙ্গাবলী,
প্রকৃতি ফিরে পাবে তার জীবন-ধারণের আদি আনন্দ,
ফিরে পাবে বিগত-বিলাসের ছন্দোময় হৃৎস্পন্দন,
বিস্মৃত উল্লাসের তীব্র কণ্ঠ,
বিশ্বস্রষ্টা আদি আনন্দের নৃত্যলীলা।
অন্তর্যামী হবে তখন প্রত্যক্ষদর্শী ভগবান,
সহস্রদল-কমলের সিংহাসনে আসীন,
দৃষ্টি তাঁর চারিদিকে ;
কর্ম্মহীন সত্তা তাঁর, নীরব শক্তি তার,
পার্থিব প্রকৃতি শাসন করবে শাশ্বতের বিধি আশ্রয় করে ;
মনীষী এক জেগে উঠবে নিশ্চেতনার জগতে,

অচঞ্চল কেন্দ্র এক বহুল আনন্দের,
সহস্র স্তম্ভের মন্দির মাঝে মহাকালের সাগরতীরে।
তখন দেহধারী জীবের জীবন হবে
যেন ভগবানের চিন্তা এক, ইচ্ছাশক্তি এক,
তার ভাগবত সত্তার মুখাবরণ বা অঙ্গাভরণ,
তার পরাশক্তির যন্ত্র ও সঙ্গী,
অনন্তের বুকে অঙ্কিত এক বিন্দু বা রেখা,
পরম অবিনাশীর মূর্ত্ত আকার।
অতিমানস হবে তখন তার প্রকৃতির উৎস,
শাশ্বতের সত্য গড়ে তুলবে তার চিন্তাবলী ক্রিয়াবলী,
শাশ্বতেরই সত্য হবে তার আলোক-বর্ত্তিকা, তার দিশারী,
সকলি তখন পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে, আসবে একটা
যাদুকর পৃঙ্খলা,
এই যন্ত্ররূপী বিশ্বের উপরে অধিষ্ঠিত হবে;
মর্ত্ত্যজগতে এসে বাস করবে বলিষ্ঠতর জাতি এক।
প্রকৃতির জ্যোতির্ময় সব শিখরে, আত্মার চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠ
অতিমানুষ বাস্তব করবে জীবনের রাজা হয়ে,
পৃথিবীকে পরিণত করবে প্রায় স্বর্গের সহধর্ম্মী ও সমতুল করে,
মানুষের অজ্ঞান হৃদয়কে নিয়ে চলবে ভগবানের সত্যের দিকে,
তার মর্ত্ত্যসত্তাকে তুলে ধরবে ভাগবত সত্তার দিকে।
চারিদিকে যেন সঙ্কীর্ণ সীমানা হতে শক্তি এক মুক্তি পাবে,
তার শীর্ষ সে তুলে ধরবে মৃত্যুর ভূতুক্ষু প্রসার অতিক্রম করে,
জীবনের শিখর যত প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে পরম-অনরত্বের চিন্তাধারায়,
পরাজ্যোতি এসে প্রবেশ করবে তার মূলাধিষ্ঠানের অন্ধকারে।
তারপর কালের বিবর্ত্তন-ধারা-ক্রমে
সবই সংগ্রথিত হবে একই পরিকল্পনার মধ্যে,
পৃথিবীর নিত্যবিধি হবে দিব্য সমন্বয়,
তার জীবনধারা গড়ে উঠবে সৌন্দর্য্যে আনন্দে
দেহ অবধি স্মরণ করবে ভগবানকে।
প্রকৃতি মৃত্যুপাশ হতে সরে দাঁড়াবে,
চিন্ময় আত্মার বহ্নি পৃথিবীর অন্ধশক্তিকে
পরিচালিত করবে,
আত্মাময় চিন্তাধারার মধ্যে জ্ঞান এনে ধরবে
সত্যের ও ভগবানের নিবিড় সামীপ্য।

অতিমানস জগৎকে অধিকার করবে আলোকের জন্যে,
মুগ্ধ হৃদয়কে স্পন্দিত করবে ভাগবত প্রেমের ধারায়,
প্রকৃতির উর্দ্ধায়িত শীর্ষে স্থাপন করবে জ্যোতির মুকুট,
তার অবিচল ভূমির উপরে গড়ে তুলবে জ্যোতির রাজ্য।
পৃথিবীর অপেক্ষা মহত্তর শক্তি এক হবে পৃথিবীর চন্দ্রাতপ,
তার সূর্য্যদীপ্তি বর্ষণ করবে মানসের পথে পথে,
চিন্তাকে ধরে নিয়ে চলবে অভ্রান্ত শক্তি এক,
জীবনকে কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করবে দৃষ্টিবর তপোবল,
মানুষী হৃদয়ে প্রদীপ্ত করবে অমরের আগুন।

নিশ্চেতনার আবাসে জাগবে আত্মা এক,
মন হবে ভাগবত নয়নের গর্ভগৃহ,
দেহ হবে অন্তঃজ্ঞানের যন্ত্র,
প্রাণ হবে সাক্ষাৎ ভাগবত-শক্তির বাহন।
সমস্ত পৃথিবী হবে চিন্ময়ের মূর্ত্ত নিলয়,
শরীর কি প্রাণ তাকে আর ঢেকে রাখবে না,
ঢেকে রাখবে না মনের অজ্ঞান।
অভ্রান্ত হস্ত এক গড়ে তুলবে কর্ম্মকে ঘটনাকে,
চিন্ময়ের দৃষ্টি দেখবে প্রকৃতির চক্ষুর ভিতর দিয়ে,
চিন্ময়ের শক্তি অধিকার করবে প্রকৃতির শক্তিকে।
এই বিশ্ব হয়ে উঠবে ভগবানের সাক্ষাৎ উদ্যান-বাটিকা,
পৃথিবী হবে ভগবানের ক্ষেত্র ও রণাঙ্গন।
মানুষ মৃত্যুকে স্বীকার করতে ভুলে যাবে,
ভুলে যাবে তার এই ভঙ্গুর শারীর ক্ষণস্থায়িত্ব।
সৃষ্টির ধারা পরিবর্ত্তন করে ধরবে তার প্রাচীন বাহ্য আকার,
তার অজ্ঞান বিবর্ত্তনের সোপানক্রম
আপন প্রতিষ্ঠাতলে শৃঙ্খলবদ্ধ জ্ঞানকে মুক্ত করবে।
চিন্ময় পুরুষ হয়ে উঠবে জগতের অধিপতি,
আপনাকে আর লুকিয়ে রাখবে না রূপের অন্ধকারে,
আর প্রকৃতিও তার কর্ম্মের নিয়ম উল্টে দেবে,
বাহ্য জগৎ প্রকট করবে অন্তরে অবগুণ্ঠিত তার যে সত্য।
সব জিনিস প্রকাশ করবে অপ্রকাশ ভগবানকে,
সবই ব্যক্ত করবে চিন্ময়ের জ্যোতি ও শক্তি,
সবই চলবে আপন আপন আনন্দময় নিয়তির অভিমুখে;

কোথাও যদি এ রাজ্যে পৃষ্ঠাসীন থাকে কোন বিরুদ্ধশক্তি
আপনার শাশ্বত আধিপত্যের অধিকার দাবী করে,
মানুষও যদি তার সমুচ্চ আধ্যাত্মিক পরিণাম অস্বীকার করে,
তবুও সকল বস্তুর মধ্যে নিহিত মহাসত্য
জয় লাভ করবেই।
কারণ সর্ব্ব ফলদাত্রী কালের গতিধারায়
পরাৎপরের সঙ্কল্প পাবেই তার শুভদিন ;
সব ছিনিস চলে ঘুরে ফিরে তাঁরই পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে.
প্রকৃতির অটল অনিবার্য্য ধারায় চলে,
যে বিধিলিপি জগৎসমূহের আদি থেকে রয়েছে.
যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর গভীর সারসত্তার মধ্যে ;
এমন কি শেষ বিজয়-মুকুটরূপে যেন আসবে
মৃত্যুরও শেষ, অজ্ঞানেরও মৃত্যু।
কিন্তু তার পূর্ব্বে সমুচ্চ সত্তাকে পৃথিবীর উপর
পদার্পণ করতে হবে,
মানুষকে আকাঙ্ক্ষা করতে হবে শাশ্বতের জ্যোতি,
আর তার প্রতি অঙ্গ অনুভব করবে চিন্ময়ের স্পর্শ
তার সমস্ত জীবন এক আসুর শক্তির অনুগত হবে।
এ পরিণতিও ঘটবে, কারণ নূতন জীবন আসবে,
পরাচেতনার সত্য দেহ ধরবে,
পরাপ্রকৃতির শক্তি পাবে তার আপন লীলাক্ষেত্র.
তার কল্যাণে পৃথিবীর নিশ্চেতন মৃত্তিকা হয়ে উঠবে সত্যের উপনিবেশ,
অজ্ঞান অবধি হয়ে উঠবে স্বচ্ছ পরিচ্ছদ এক.
তার ভিতর দিয়ে সত্যের জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গসব উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে,
সত্যই সূর্য্য হয়ে জ্বলবে প্রকৃতির শিরোভাগে,
সত্যই প্রকৃতিকে প্রতিপদ দেখিয়ে নিয়ে চলবে,
তার অধস্তন গভীরতা থেকে সত্যই চোখ মেলে চেয়ে দেখবে।
অতিমানুষ যখন প্রকৃতির রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে,
তার সান্নিধ্যই জড়ের জগৎকে রূপান্তরিত করে ধরবে,
সত্যের আগুন সে প্রজ্বলিত করবে প্রকৃতির রাত্রির মাঝে,
পৃথিবীর উপরে প্রতিষ্ঠিত করবে সত্যের মহত্তর বিধি ;
মানুষও ফিরে সাড়া দেবে চিন্ময়ের আহ্বানে।
সে জেগে উঠে জানবে তার হৃদয়ের মধ্যে সুপ্ত ছিল যা কিছু,
যা কিছু ছিল প্রকৃতির কাম্য পৃথিবী যখন প্রথম রূপ নিয়েছিল,

চিন্ময় যখন এই অজ্ঞান জগৎকে তাঁর গৃহরূপে গ্রহণ করেছিলেন ;
মানুষ আকাঙ্ক্ষা করবে এখন সত্য আর ভগবান আর আনন্দ।
দিব্যতর এক বিধানের ব্যাখ্যাতা,
পরম পরিকল্পনার যন্ত্র,
এক মহত্তর জাতি আনত হয়ে মানুষকে তুলে ধরবে।
মানুষের আশ্পৃহা হবে তার আপন সব শিখরে আরোহণ,
ঊর্দ্ধের সত্য নিম্নের এক সত্যকে জাগ্রত করবে
মূক পৃথিবী অবধি হয়ে উঠবে সজ্ঞান শক্তি ;
চিন্ময়ের শিখর আর প্রকৃতির পাদপীঠ
পরস্পরের নিকটতর হয়ে আসবে সেখানে,
যেখানে রয়েছে তাদের আপন আপন পৃথক সত্যের গোপন রহস্য,
চিনতে পারবে উভয়ে তারা এক অভিন্ন দেবসত্তা।
আত্মা জড়ের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে দৃষ্টিপাত করবে,
জড় ব্যক্ত করবে আত্মার স্বরূপ।
তখন মানুষ আর অতিমানুষ এক হয়ে যাবে,
সকল পৃথিবী হয়ে উঠবে এক অভিন্ন জীবন,
সাধারণ জনতা অবধি শুনবে সে মহাকণ্ঠ,
ফিরে দাঁড়াবে সংযোগ স্থাপন করবে অন্তরের আত্মার সঙ্গে
তার প্রয়াস হবে সমুচ্চ অধ্যাত্ম-বিধির অনুসরণ।
এই পৃথিবী ঊর্দ্ধতন প্রবেগে স্পন্দিত হবে,
মানবজাতি তার গভীরতম আত্মসত্তায় জেগে উঠবে,
প্রকৃতি চিনে নেবে তার নিভৃত ভাগবত সত্তা,
এমন কি সর্বসাধারণেও দেবে সাড়া এক,
সহ্য করবে ভাগবত অবতরণের ধর দীপ্তি,
আর অদৃশ্য যত দুয়ারের উপর তার সবেগ আঘাত ;
মহত্তর স্বর্গীয় আবেগে মানুষের জীবনকে ঊর্দ্ধায়িত করবে,
তাদের মন সেই অবর্ণনীয় প্রভার ভাগ গ্রহণ করবে,
হৃদয় তাদের অনুভব করবে আনন্দ আর আগুন,
পার্থিব শরীর সব আন্তর আত্মার চেতনায় সচেতন হবে;
মর্ত্যধর্মের ক্রীতদাস তাদের পাশ খুলে ফেলবে,
সামান্য মানুষ আধ্যাত্মিক জীবে পরিণত হবে,
দেখবে তারা মূক ভগবান জেগে উঠেছে।
অন্তর্জ্ঞানময় কিরণরাজি প্রকৃতির শিখরসব স্পর্শ করবে,
দিব্যদৃষ্ট প্রকৃতির অতলসব অনুপ্রাণিত করবে,

সত্যই হবে তাদের জীবনের দিশারী,
সত্যেরই আদেশ তাদের চিন্তা তাদের বাক্য তাদের কর্ম্ম মেনে চলবে,
তারা অনুভব করবে উর্দ্ধে উঠে গিয়েছে তারা আকাশের পাশে,
দেবতাদের থেকে সামান্য নিম্ন আসনে হয় ত'।
জ্ঞান ঢেলে দেবে তার জ্যোতির্ম্ময় ধারা সব ;
তমসাবৃত মন অবধি নূতন জীবনে হবে চঞ্চল,
প্রজ্বলিত সমিদ্ধ হবে নবচেতনার আগুনে ;
মুখ ফিরিয়ে পরিহার করবে মর্ত্যের অজ্ঞান।
অজ্ঞানের সীমানা দূরে সরে যাবে,
জীবেরা আলোর মধ্যে প্রবেশ করবে ক্রমবর্দ্ধিত সংখ্যায়,
মন সব হবে দীপ্ত অনুপ্রাণিত, শুনবে গুপ্ত অন্তর্যামীর বাণী ;
জীবন সব জ্বলে উঠবে আকস্মিক এক আন্তর অগ্নিশিখায়,
হৃদয় সব প্রেমাপ্লুত হবে ভাগবত আনন্দের জন্য।
মানুষী ইচ্ছা বাঁধা হবে ভাগবত ইচ্ছার সুরে
এই যত পৃথক ব্যষ্টিসত্তা তারা পরমাত্মার একত্ব অনুভব করবে,
এই যত ইন্দ্রিয়বৃত্তি তারা পাবে স্বর্গীয় ইন্দ্রিয়ানুভব,
এই রক্তমাংস, এই পেশীস্নায়ু লাভ করবে অপরূপ দিব্যপুলক ;
এই মর্ত্যদেহ যত লাভ করবে অমৃতত্ব।
দিব্যশক্তি এক প্রবাহিত হবে প্রতি অঙ্গে প্রতি কোষে,
নিয়ন্ত্রিত করবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে, বাক্যকে, কর্ম্মকে,
সকল চিন্তা হবে যেন বহুল সূর্য্যের দীপ্তি।
প্রতি অনুভব হবে স্বর্গীয় শিহরণ ;
একটা জ্যোতির্ম্ময় আন্তর ঊষা বারম্বার দেখা দেবে এসে,
প্রসুপ্ত মনের কক্ষ সব আলোকিত করে দেবে,
প্রতি অঙ্গ ভরে দিয়ে ছুটে যাবে অভূতপূর্ব্ব উল্লাস,
প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ করে দেবে এক মহত্তর অধিষ্ঠানে
পৃথিবী তখন উন্মুক্ত হবে ভগবানের দিকে,
সাধারণ মানব-প্রকৃতিও অনুভব করবে উদার উর্দ্ধায়ণ,
সাধারণ কর্ম্মাবলিকে উদ্ভাসিত করে তুলবে চিন্ময়ের কিরণে,
ভাগবত সত্তার সাক্ষাৎ সে পাবে স্থূলবস্তুর মধ্যে ;
প্রকৃতি তার জীবন যাপন করবে গুপ্ত ভগবানকে ব্যক্ত করবার জন্যে,
চিন্ময় পুরুষই মানুষী লীলার ভার গ্রহণ করবে,
এই পার্থিব জীবনই হয়ে উঠবে দিব্য জীবন।

চান্দ্রায়ণ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আকাশচারীরা—আকাশিকেরা (Astronauts)—চাঁদে গিয়ে চাঁদের মাটি এনেছে। কিন্তু আসলে চাঁদে মাটি নেই, চাঁদে আছে বালি, ধূলিকণা। পৃথিবীর মাটি হ'ল জল দিয়ে তৈরী, চাঁদে জল নেই। মাটি, কাদা-মাটি একান্ত পৃথিবীর বস্তু—এঠেল মাটি হাতে পায়ে লাগলে টানে-জোঁকের মতো আটকে থাকে; চাঁদের মাটির বৈশিষ্ট্য ধুলো হ'লো শুক্ন গুঁড়ো, গায়ে লাগে, গায়ের উপর বসে, ঝাঁকি দিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে ফেলে দেওয়া যায় কাদা-মাটিকে ওভাবে তাড়ান যায় না। আকাশিকেরা আরও বলেছেন, চাঁদের মাটির একটা বিশেষ গন্ধ আছে, ঝাঁঝাঁল, যেন পোড়া গন্ধ একটা। পৃথিবীর মাটিরও গন্ধ আছে, তাকে বলা হয় সোঁদা গন্ধ, তাতে জলের স্বাদ যেন লেগে রয়েছে।

পৃথিবীর ঢেলো মাটি লেগে থাকে, সহজে তাকে ছাড়ান যায় না—এ হলো পৃথিবীর আর একটা গুণের চিহ্ন বা লক্ষণ—আমরা জানি পৃথিবীর আছে একটা টান তাকে বলে মাধ্যাকর্ষণ, যাতে এনে দেয় জিনিষের ভার। চাঁদের টান আছে বটে কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম, এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। এখানে—পৃথিবীতে—আমাদের অঙ্গ-সঞ্চালন করতে হয় একটা বাধার বিরুদ্ধে চাপ দিয়ে—হাওয়ার বিরুদ্ধে, মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে—এখানে কাজ করতে হয় শরীরে একটা জোর দিয়ে—চাঁদে সে বালাই নেই, সেখানে হাওয়া নেই, মাধ্যাকর্ষণ নেই, সেখানে জোর খাটান চলেনা। একবার চললে চলতেই হয়, পা আপনা থেকেই আপনাকে এগিয়ে দেয় সেখানে সমান্তরাল বা তির্যক গতি বেশি স্বাভাবিক আলম্বগতির চেয়ে—ভাসা, ভেসে চলা, উড়ে চলার মত গতিবিধি সেখানে।

জলকেই বলা হয় জীবন। সুতরাং জল যেখানে নাই, জীবনও সেখানে নাই—জীবন্ত সজীব সবুজ কিছুই নাই, তাই বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, চাঁদ হ'ল একটা অতীতের দৃষ্টান্ত, যে অতীত পৃথিবী বহুদূরে, বহু যুগ-যুগান্তর পূর্বে ফেলে এসেছে পিছনে—হয় ত কোটি কোটি বৎসর পূর্বেকার এক জগতের ভূতাবশেষ। আরও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত—এদের উপাদান আবেষ্টন পরীক্ষা করে আমরা বুঝতে পারব আদিতে কোথায় ছিলাম, কি ছিলাম আমরা, এখনই বা কোথায় এসেছি বা কি হয়েছি।

চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর জড় গঠনে পর্য্যন্ত একটা বিশেষ পার্থক্যের কথা বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন আজকাল পৃথিবীর জড় মণ্ডলটি নানা রকম স্তরে গঠিত, বাহিরের ভাগ কঠিন, নাতি-উষ্ণ, ক্রমে নীচে বা ভিতরে চলে গেলে দেখা যায় রয়েছে স্তরের পর স্তর বিভিন্ন প্রকৃতির—কঠিন, তরল, বাষ্পীয় বা অগ্নিময়। এমন কি বলা হয় পৃথিবীর কেন্দ্র বা অন্তঃস্থ অন্তস্তল তল প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। চাঁদে

স্তরবিন্যাস নাই, তার সমস্তটাই কঠিন নিরেট, পাথরের বর্তুল যেন। সেখানে কোন রকম ক্রম-পরিবর্তনের ক্রম-পরিণতির চিহ্ন নাই। গোড়ায় একটা অবস্থায় যেমন ছিল তেমনই রয়ে গিয়েছে কোটি, কোটি বৎসর ধরে, যেন অচঞ্চল স্থাণুবৎ, বিবর্তনের স্রোত সেখানে বয়নি। সেই জন্য একটা যে বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল যে, চাঁদ হল পৃথিবী হতে বিচ্যুত একটা অংশ (বলা হত প্রশান্ত মহাসাগরের প্রসার), এখন তা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা হয় না। এখন বলা হয় অন্যান্য গ্রহের মত এও একটি বহিরাগত জড়মণ্ডল।

তবে চাঁদে বা অনুরূপ অন্যান্য জড়-মণ্ডলে জীব বা জীবন্ত সত্তা নেই বলে যে কোন সত্তাই নেই, এমন সিদ্ধান্ত করা হয় তা চলে না। ভিন্ন আবেষ্টনে ভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে অন্যরকম সত্তা থাকা খুবই সম্ভব—পাশ্চাত্যের পুরাণ কাহিনীতে বলে সালামাণ্ডার নামে এক জাতীয় জীবের কথা, তারা হ'ল আগুনের জীব, তাদের বসবাস জীবনধারণ প্রজ্বলন্ত আগুনেরই মধ্যে। তবে সে সব সত্তার গড়ন, তাদের উপাদান ভিন্ন রকম নিশ্চয়, স্থূল মাটির সত্তার আছে যেমন জড় দেহ, তার গড়ন যেমন কঠিন জমাট, অন্য লোকের সত্তাদের দেহ সে রকম নয়। বড় জোর তারা সূক্ষ্ম জড় উপাদানে তৈরী এই সূক্ষ্মের পরিমাণ ও প্রকার বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন স্তর এবং লোক অনুসারে। চাঁদে বসবাস করতে হলে কি আকার ও গড়ন প্রয়োজন অর্থাৎ মানুষের পক্ষে, তার নমুনা দেখেছি আকাশচারীদের বেশভূষায়। অবশ্য চাঁদের আদিবাসীদের সে রকম কিছু হওয়া দরকার তা নয়, তাদের নিশ্চয়ই থাকবে নিজস্ব গড়ন, নিজস্ব প্রকরণ। তবে জড়-জগতের অন্তর্ভুক্ত বলে তাদের আকারে প্রকারে জড়-ধর্ম্মের লক্ষণ বা চিহ্ন কিছু থাকবেই। যারা পরীদের কথা জানি, তাদের সঙ্গে অনেক সূক্ষ্মদর্শীদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা অনেকাংশে ক্ষুদ্রাকার মানুষেরই প্রতিরূপ। শ্রীঅরবিন্দ "The Other Earths" বলেছেন, তার অর্থ, এই একান্ত জড় পৃথিবী ছাড়া এরই অনুরূপ সূক্ষ্মতর পৃথিবী আরও আছে। বিভিন্ন স্থূললোকের গ্রহ-উপগ্রহের বাসিন্দারা বিভিন্ন রকমের সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত হওয়া সম্ভব। ধ্বনির স্পন্দন যেমন বিভিন্ন এবং নানা সুর তুলে ধরে, আলোর তরঙ্গ যেমন নানারকম, প্রত্যেক তরঙ্গ তুলে ধরে বিভিন্ন রং, তেমনি বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরাও বিভিন্ন গুণ-তরঙ্গের সমষ্টি, আকার-প্রকারেও বিভিন্ন, ধর্ম্মকর্ম্মেও বিভিন্ন।

তবে এই পৃথিবী একটা অদ্ভুত বস্তু, পৃথিবীর মানুষ আরো অদ্ভুত। কারণ পৃথিবী সমস্ত সৃষ্টির প্রতীক, পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির সকল স্তরের সকল অঙ্গের সকল গুণের প্রতিরূপ ও প্রতিচ্ছায়া। মহাভারতের মতই, যা আছে সৃষ্টিতে তা আছে পৃথিবীতে, আর যা নাই পৃথিবীতে তা নেই কোথাও। মানুষের সম্বন্ধেও সেই একই কথা, মানুষ সর্বগুণ-সম্পন্ন, সর্বসত্তাময়, বিশ্বের প্রতীক পুরুষ। অন্যান্য লোক অন্যান্য সত্তা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, প্রত্যেকের গোটা একটি বাষ্টিত্ব, তার মধ্যে অন্য বাষ্টির স্থান নাই। প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ গুণের আধার, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, নক্ষত্রলোক আপন আপন বিশেষই রূপ বিশেষ গুণ নিয়ে আপনার মত চলেছে, মানুষ ও পৃথিবী এরকম একেক

নয়; তারা হ'ল সর্ব্বময়। তাই ত বলা হয় আত্মস্বরূপ সৃষ্টি রয়েছে মানুষের মধ্যে, মানুষের লীলাক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীর ও স্বরূপ তাই। জড়াধারে পৃথিবীর যেমন স্তর-বিন্যাস, মানুষের মধ্যেও তেমনি স্তর-বিন্যাস রয়েছে। অন্তরের অন্তস্তলে তারও একটা অগ্নিকুণ্ড রয়েছে, তা হল—হৃদ্‌কুণ্ড।

মানুষের আধারে যখন বিশ্বপ্রকৃতি সম্পুটিত সংহত হয়ে রয়েছে তখন মানুষ তার এ অন্তর্নিহিত বিশ্বের প্রতিরূপকে আশ্রয় করেই বাস্তব বিশ্বের সংবাদ বা জ্ঞান লাভ করতে পারে। এমনও হতে পারে মানব-আধারের বিশেষ বিশেষ কণা বা কোষ বা অঙ্গ বিশ্বের লোকবিশেষের বা মণ্ডল বিশেষের প্রতিনিধি। অনেক যোগীদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁরা তাঁদের দেহ থেকে উৎক্রান্ত হয়ে লোক-লোকান্তরে চলে যান এবং এ সকলের সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করেন। রাজযোগে এ রকম এক সিদ্ধির নাম দেওয়া হয়েছে সংযম। এই উৎক্রান্তি সম্ভব, কারণ যেখানে পৌঁছিবে মানুষ উৎক্রান্ত হয়ে, সেই গন্তব্যস্থানই বিন্দুরূপে রয়েছে তার এই পার্থিব-আধারে, এই বিন্দুকে আশ্রয় করে সূত্রকে ধরে ধরে যেন উঠে চলা যায়।

সুতরাং যোগী তার চেতনার আশ্রয়ে বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে একীভূত হতে পারেন এবং সেই একত্বের ফলে তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন; তবে এই চেতনা নানা স্তরের হ'তে পারে, মানস চেতনা বা মানসোত্তর চেতনা আপনাকে বিশ্বভূত করে ধরতে পারে। সে চেতনায় প্রতিফলিত হয় বিশ্বের এবং বস্তুর এক প্রকার চিত্র, সে রকম প্রাণময় চেতনার আশ্রয়ে বিশ্বপ্রাণের মধ্যে আপনাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং বিশ্বপ্রাণের রহস্য অবধারণ করা যায়। নিম্নতর প্রাণে এবং সূক্ষ্মজড়ে সংহত-চেতনার সহায়ে জগতের আর এক বিচিত্র জ্ঞান অর্জন করা যায়। যোগীর চন্দ্রে সশরীরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, তিনি নিজের অন্তরস্থ যে কোন চেতনার স্তরে বিন্দু-বিশেষে আশ্রয় করে চন্দ্রলোকে পৌঁছতে পারেন কিন্তু চন্দ্রের যে মূর্ত্তি দেখবেন তা তাঁর সেই বিশিষ্ট চেতনার বিধি-বিধান অনুসারে। এইভাবে তাঁরা এঁকে দিয়েছেন চন্দ্রের বিবিধ সূক্ষ্ম মূর্ত্তি সব, তবে এই সূক্ষ্মদৃষ্টির সহায়ে বা সূক্ষ্ম জড়দৃষ্টির সহায়েও কতখানি স্থূল জড় বাস্তব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যায় তা বিবেচ্য। হয়ত অনেকখানি জানা যায়।

একদল বৈজ্ঞানিক উঠেছেন আজকাল, তাঁরাও বলছেন, চাঁদে সশরীরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই চাঁদের খবর গ্রহণ করবার জন্য। বর্ত্তমানে যান্ত্রিক কৌশলই এমন পরিণতি লাভ করেছে যে পৃথিবী থেকে পরীক্ষাগারে বসেই বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। ঘরে বসেই দূর-দূরান্তরে যন্ত্র পাঠান যেতে পারে, যান্ত্রিক খবর সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং তাদের সত্যতা পর্য্যন্ত প্রমাণ করা যেতে পারে। গ্রহে গ্রহান্তরে মানুষ পাঠানোর প্রয়োজন নেই, এতে কেবল অর্থ নষ্ট, নিরর্থক প্রাণহানি এবং অযথা পরিশ্রম।

সে যা-হোক, এই যে সশরীরে গ্রহান্তর পর্য্যটন এর সার্থকতা কি, উদ্দেশ্য কি, আসল অর্থ কি, এ বিষয়ে আকাশিকেরা নিজেরাই জিজ্ঞাসা করেছেন—তাঁরাও বলছেন

এক গভীর আস্তিকা-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে, অন্তরাত্মারই একটা প্রেরণায় যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে যে এ হ'ল মানবশক্তির জয়যাত্রা। মানুষ পার্থিব পরিধির মধ্যে আর আবদ্ধ থাকতে চায় নাই, পৃথিবী ছোট হয়ে গিয়েছে মানুষের প্রসারিত সামর্থ্যের কাছে, সে চেয়েছে এখন তার পরিক্রমার জন্য বৃহত্তর অবকাশ, অসীমের প্রসার।

অন্তশ্চেতনার আকাশে স্থিতি ও বিচরণ প্রয়োজন। অন্তশ্চেতনার সাহায্যে বিশ্ববস্তুর সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় এবং তার প্রয়োগে বিশ্বশক্তির সহকর্মী হওয়া যায়, মানব প্রতিভার বিকাশে এ হ'ল এক দিক, প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু একান্ত যাহা স্থূল জড়-ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটা ঐশ্বর্য্য মানুষের নব অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, শরীরে আসবে নব সামর্থ্য, নব ধর্ম্ম নব গঠন, নব চেতনার প্রকাশ ও অনুসঙ্গী হবে। আমাদের মহাকাশিকদের কল্যাণে সেদিক দিয়ে কিছু অন্বেষণ ও আহরণ হয়েছে বইকি। ভারতের যোগজ উপলব্ধিতে শরীরের যে সব সিদ্ধির উল্লেখ আছে—অষ্টসিদ্ধি তাদের ছায়া ও নিদর্শন। ভবিষ্যতের মানবদেহ আরো অনেক কিছু অলৌকিক ধর্ম্ম ফুটিয়ে তুলবে এখন যা কল্পনাতেও আসে না। এ পথে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই অনেকখানি অদ্ভুতই মনে মনে হয়, কিন্তু এ সব ভবিষ্যতে যা হবে তার তুলনায় শিশুর প্রথম অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রচেষ্টা মাত্র, তবুও পুরাতনের গণ্ডী পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের মোহ-ঘোর, আকাশচারীদের প্রয়াসে অনেকখানি কেটে গিয়েছে মানুষের অন্ত-চেতনায় এসে গিয়েছে একটা বিশালতর ছন্দ অনন্তেরই ছাপ। আকাশিকেরা নিজেদের মুখে এই ধরনের কথা বলতে সুরু করেছেন।

সে যা হোক, আকাশে আমরা যতই উড়ে চলি না কেন, যাহাতঃ আমরা যত দূরেরই সঙ্গে শরীর সংযোগ স্থাপন করি না কেন, তবুও পৃথিবীই হলো আমাদের কেন্দ্র, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র, সিদ্ধির আসন। ভাগবত ঐশ্বর্য্যকে মাটিরই রূপ দিয়ে গড়তে হবে। আমি আগেই বলেছি পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য হলো কাদামাটি, পাঁক, আর পঙ্ক হতেই জন্মিতে পারে পঙ্কজ, অন্য কোথাও নয়—পৃথিবীতেই ফুটে ওঠে পঙ্কজিনী।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(১৭)

সদাচারের আদর্শ ও সত্যসঙ্কল্প নিয়ে কর্মযোগে কর্ম করার প্রসঙ্গে অহন্তার বিলয় ও সমতা রক্ষা করার আলোচনায়, বহু রকমের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকৌশলের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। তবুও কর্মের গতি গহন বলেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন থেকে যায় যে আমাদের কর্ম কি। আমরা কি করব যাতে কর্ম যোগকর্ম হয়ে উঠবে? দেহ প্রাণ মন এই তিন নিয়েই আমাদের জীবন এবং এদের আশ্রয় করে শক্তির প্রকাশ, তাকেই আমরা নাম দিয়েছি প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি, যে পুরুষ তার ভর্তা ভোক্তা প্রশাস্তা ও দ্রষ্টা। তবুও যে দুঃখ পাই, তার কারণ প্রকৃতির ওপর আমাদের প্রশাসন নেই আমাদের কর্তৃত্ব ও আমাদের জীবনে ভোক্তৃত্ব বারবার ব্যাহত হয়। আমাদের মধ্যে যে পুরুষের বিবিক্ত দৃষ্টি অপাবৃত হয়নি, দুঃখের বীজ সেইখানেই। কি করে প্রকৃতি পুরুষের এই স্বাতন্ত্র্য হরণ করে তাকে বাঁধে, আবার কি করেই বা সে বাঁধন কাটিয়ে পুরুষ বিবিক্ত হয়, দুঃখের হাত থেকে বাঁচে, তা বুঝে দেখতে গেলে গুণময়ী প্রকৃতির তিনটি গুণের আলোচনা করে দেখতে হবে। সে তিনটি গুণের কথা আমরা শুনেছি যে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে, তমঃ রজঃ আর সত্ত্ব। প্রকৃতিতে এ তিনটি গুণ থাকবেই, না হলে শক্তির বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় গুণলীলা না হলে সৃষ্টিতে ক্রম-অভিব্যক্তি হয় না। কিন্তু গুণসাম্য ও গুণবৈষম্য কি ভাবে চিৎ-প্রকাশের অনুকূল ও প্রতিকূল হবে—সেটাই আমাদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা যখন আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে কর্মযোগ শুরু করতে চাই, তখন পুণ্যকর্মের বোধই আমাদের ওপরে ভর করে থাকে। তাই এক কল্যাণবুদ্ধিতে "বহুজনহিতায়" "বহুজনসুখায়" যে সব বৃহৎ কর্ম ও ক্ষুদ্র কর্ম সম্পাদিত করতে লেগে যাই, সে তো কল্যাণকৃৎ-এরই ধর্ম। কিন্তু সেই সব কর্মের পথেই বিপরীত ভাবের অশুভ মন্দ পাপ এই সব বোধও তখন প্রতিযোগীরূপে দেখা দিতে থাকে। এই দ্বৈতবোধ মানুষেরই বুদ্ধিতে বিবেক-বিচারের ফল, পশুর মধ্যে এ দ্বৈতবোধ নেই। যদিও সাধারণ মানুষ জৈব কর্মে পশুরই উন্নততর এক জীবন যাপন করে এবং বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষের জীবনের কর্ম শুরু হয়, তা আমরা জানি। কিন্তু তাতেও ভালমন্দের বোধই তার কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে। বেঁচে থাকার তাগিদটা মিটে গেলেই কোন এক আদর্শবোধ মানুষকে জৈব প্রয়োজনের গণ্ডী কাটিয়ে সৎ কর্ম করাতে চায়। সেই আদর্শবোধ যে একটা অনড় বস্তু নয়, তা নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, জীবনের পথে চলতে গিয়ে ঠেকে

শিখতে হয় আদর্শবোধ কি আর কিভাবে সে সম্বন্ধেও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হতে থাকে। ভগবানকে প্রেমময় মঙ্গলময় করুণাময় বলে আমরা যেন তাঁকে ওপরে তুলে রেখেছি। তাঁর জগতে তাঁর সৃষ্টিতে এত অশুভ পাপ দুঃখ এল কি করে—এই জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না বলে তাঁরই কাছে আমাদের এই সমস্যার যেন জবাবদিহি চাই। কেননা দ্বৈতের জগতে এর সোজা কোন উত্তর মেলে না, বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যাও চলে না। এই দ্বৈতবোধের ওপারে চেতনাকে তুলে নিতে পারলে দেখা যায় যে অশুভকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। আবার ঐ অশুভ শক্তিকে অসুর শয়তান (evil) যে নামই দিই না কেন, তার সঙ্গে ভগবানের এক দ্বন্দ্বও দেখা যায়। তাহলে ভগবানের ভগবত্তা কি রকম হল? বেদান্ত তাঁকে বলেছেন শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্। কথাটা তাহলে দাঁড়ায় যে, পাপ আছে, কিন্তু পাপ তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে না। তাহলে পাপেরও একটা স্থান রয়েছে, জগতের সৃষ্টির ব্যাপারে তাকেও একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। তখন এই দ্বন্দ্ব নিয়ে তাঁর ইচ্ছা-শক্তি বা সত্যসঙ্কল্প কি ভাবে জগৎ পরিচালনায় কর্ম করছে, সেটা বুঝে নেবার কথা আসে। আমার ইচ্ছা দিয়ে যদি তাঁর ইচ্ছা বুঝতে যাই, তাহলেই গোলযোগে পড়তে হয়। কিন্তু তাঁর ঐ বৃহৎ ইচ্ছাশক্তির ধারা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখলে বোঝা যায়, দ্বৈত না থাকলে, আলোছায়ার সৃষ্টি না হলে জগদ্‌ব্যাপারই সম্ভবপর হয় না। জীবন তো শুধু যান্ত্রিক আবর্তন মাত্র নয়, তার পিছনে একটা বাস্তব ছন্দের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, তার একটা লক্ষ্যও আছে। শিল্পী যখন তার শিল্পকলায় আলো-ছায়ার খেলা বহু বিচিত্র ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তখনই সেটা সার্থক সুন্দর শিল্পসৃষ্টি হয়। শুধু আলো বা শুধু ছায়া কোন কারুশিল্প সার্থক করতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃতির পরিণামী ধারা দেখিয়ে ওই দ্বৈতবোধকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অসৎ থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয় ও মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যে চলা, তারই এক মধ্যবর্তী অবস্থায় চেতনার এই বিশ্লিষ্ট ভাব, যেখানে আলো-ছায়া হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ এই রকম সব বিপরীতধর্মী দ্বন্দ্ববোধ দুদিকে চেতনাকে আকর্ষণ করতে চায়। প্রকৃতি-পরিণামের এই মধ্যবর্তী অবস্থায় যে দোলা, তার দুদিকেই অব্যক্ত, যেন দুই মেরু। যেদিকে অভিব্যক্তির লক্ষ্য, সেদিকে শুধুই আলো অমৃত সত্য। সেখানে কোন সংঘর্ষ নেই, তাকে আমরা বলে থাকি সুমেরু। সেখানে পুরুষ বা শুদ্ধ আত্মা, তিনি দ্বন্দ্বাতীত চিৎ-স্বরূপ। অপর দিকে প্রকৃতির অব্যক্ত দশার হল কুমেরু; সেখানে একেবারে নিরেট জড়, যেখানে এক অনড় অবস্থায় চৈতন্য মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। সেখানেও দ্বন্দ্ববোধ নেই, সবটা যেন এলিয়ে ঝিমিয়ে রয়েছে। সেই জড়ের কুমেরু থেকেই প্রাণের ক্রিয়া শুরু হতে দেখা যায়, আর তারই মধ্যবর্তী ব্যক্ত অবস্থায় আমরা এক বিষমের দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। কিন্তু প্রাণ একা ঐ বিষমকে সুষম (Cosmos) করে গড়ে তুলতে পারে না, যদি না তাতে মনের আলো পড়ে ছন্দ ও সুষমা গড়ে ওঠে। কিন্তু মনোজ্যোতিতে পৌঁছালে দেখা যাবে,

সেখানেও এক শুদ্ধ উদাসীন ভাব। এইরকম করে গুণাত্মিকা প্রকৃতির তিনটি স্তরে প্রধানত তিন গুণের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, যথাক্রমে তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, গুণাতীত অবস্থায় সৎ ভাবে যে পুরুষের স্থিতি, তা গুণাত্মিকা প্রকৃতির উর্ধ্বে। কিন্তু সেই উর্ধ্বে অবস্থিত থেকেও পুরুষ যখন দ্রষ্টা থেকে প্রকৃতির গুণসকলকে কর্ম করতে দেখেন তখন সাধক ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন।

সাংখ্য বলেছেন প্রকৃতি গুণাত্মিকা তাই পরিণাম হয় প্রকৃতিরই। দুই রকমের দুই অব্যক্তের শুদ্ধতা, আর তারই মধ্যে প্রকৃতির পরিণামী ধারা বয়ে চলেছে; সেই চলার এক ছন্দ ও এক নিয়মও আছে। যেমন আমরা দেখি প্রতিদিনই জীবকে ঘুমের মধ্যে ঢেলে পড়তে হয়, আবার জেগে উঠে কোলাহল করতে হয়, সেই তার প্রবৃত্তি। এটা প্রকৃতিরই নিয়ম আর সেভাবে তার তিন গুণের খেলায় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃকে চিনে নিতে হবে। ব্যক্তি তার কর্মস্রোতে যখন থেমে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে, সে অবস্থা হল তমোগুণের অধিকারে। এতে তার শক্তি নতুন করে সঞ্চিত হয় ও আবার সে কর্ম শুরু করে। প্রাণের আলোয় জেগে উঠে মনোজ্যোতির নির্দেশে সে চলে যথাক্রমে রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের ক্রিয়ায়। সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে সাংখ্য দর্শনে তিনগুণের লীলা সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত। সূর্যোদয়ের পূর্বে যে অন্ধকার আকাশ ও পৃথিবীকে মৃতের মত নিরেট করে রাখে, সেটা তমোগুণের প্রতীক। তারই মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ক্রমে অন্ধকার তরল হয়ে তার আলো এসে পড়বে, তারই সূচনাস্বরূপ আলো-আঁধারের এক মিশ্র ছায়া এসে পড়ে। তারপর লাল রঙে দিগন্ত প্লাবিত হয়—সেটাই রজোগুণ। তা থেকে সূর্যোদয়, আর তারপর থেকে আলো ক্রমেই বেড়ে চলে। তখন শুধুই আলোর প্রকাশ, সেটাই সত্ত্বগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণ চিৎ বা প্রকাশ সূচিত করে।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়, অব্যক্ত থেকে কর্মের চাঞ্চল্য আসে—কেনোপনিষৎ বলছেন "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ। কে যেন মনকে ঠেলে দিচ্ছে"। আর তখনই দেখা যায় যে আপনা থেকেই কর্ম হয়ে চলে। গীতা যেমন বলেছেন "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি"। সব প্রাণী প্রকৃতি অনুযায়ী চলেছে, সেখানে নিগ্রহ করে কোন ফল হবে না। এইভাবে চলতে চলতে আবার থেমে যাচ্ছে অব্যক্তে, সেটাই তার বিশ্রামের স্থান। যোগদৃষ্টি ফেলে এই চাঞ্চল্য ও যুক্ততার মধ্যে দেখতে শিখলে অব্যক্তের অন্ধকারকেও দেখা যায়। যিনি তা দেখতে পারেন, তিনিই গীতার ভাষায় সংযমী—"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী"। যে অবস্থায় সাধারণ মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে, যোগী সেখানেও তাঁর দৃষ্টি মেলে দিয়ে জেগে থাকেন। এই রকম করে ঘুমের মধ্যেও সচেতন থেকে সেই জাগ্রতকে উজ্জ্বল করা, এটা যোগের সাধন। সাধারণত প্রকৃতিতে প্রেরণা বা একটা ঠেলা আসে, কর্ম করা হয় আবার সে শক্তি চলে পড়ে, এই আবর্তন চলতে দেখা যায়। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে দেখানো

রয়েছে, ঐ আবর্তনের মধ্যেই ক্রমশ জেগে উঠে সবকে খুঁজে পাওয়া যায়, কেননা মূল শক্তি তো তারই। অন্ধতমিস্রায় সেই সবই ঠেলে দিচ্ছে; রজোগুণ দিয়ে সে শক্তিলাভ হয়, কিন্তু তা দিয়ে শক্তিকে ধরতে পারা যায় না। অব্যক্তের অন্ধকার হল সুষুপ্তির ভূমি সেখান থেকেই আবর্তন শুরু হতে দেখা যায়। সে আবর্তনের শুরুতে তামসিক মূঢ়তা ও রাজসিক চাঞ্চল্য যেন হুড়াহুড়ি করে আছে, এ রকম বোধে আসে। তার মধ্যেই সব জেগে ওঠে, কিন্তু সেও ঐ ঘোর (রজঃ) ও মূঢ় (তমঃ) শক্তির কবলে পড়ে যায়। জগতে এই ভাবেই শক্তির বিক্ষোভ ঘটতে দেখা যায়, যেন এক হুল্লোড়। কিন্তু তারই মধ্যে একটা অবিরুদ্ধ দৃষ্টি আছে বলে তা নিজকে পেতে চায়, ছন্দ চায় সুর চায়। অনুতি (disorder, chaos) থেকে যে একটা তন্ত্র (system) সৃষ্ট হয়ে চলেছে, তা প্রাণেরই (Life) শক্তিতে। কিন্তু প্রজ্ঞার দৃষ্টি বা চৈতন্যের আলো না পেলে প্রাণ তার শক্তি সামলাতে পারে না। জড়ের রাজ্যে জীবজগতে ও মনোভূমিতে প্রাণশক্তিই চেষ্টা করে চলেছে সমগ্র প্রকৃতিকে ছন্দ দিয়ে সুর দিয়ে তন্ত্রিত করতে। কিন্তু সে সার্থক হয় তখনই, যখন সে প্রজ্ঞা-শাসিত হয়ে প্রজ্ঞাসহযোগে চলতে পারে। প্রাণের ঐ ঋতায়নী শক্তি একটা পরমাণুর গাঁচের (structure) মধ্যেও আমরা দেখেছি। কিন্তু ঐ গাঁচেও চৈতন্যের আলো এসে না পড়লে সেটি প্রাণবন্ত হয় না। রজোগুণের ক্রিয়া আধারের রাজ্যে সেই আলোর পিপাসাই ফুটিয়ে তোলে।

সূর্যোদয়ের লাল বিম্ব শুদ্ধ রজোগুণের প্রতীক। মধ্যরাত্রি (0·hour) থেকেই আলোর অভিযান শুরু হয়, যেখানে অন্ধকার সব চেয়ে গাঢ় হয়ে আসে। বেদে অশ্বিদ্বয়ের অভিযান ঐ মধ্যরাত্রি পেরিয়েই যে শুরু হয়, তার প্রথম দিকের অংশকে বলা হয় তমোভাগ অশ্বী আর শেষ রাতের অংশকে বলা হয় জ্যোতির্ভাগ অশ্বী, তখন রজোগুণের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়েছে। তারপর উষার আবির্ভাবে সত্ত্বগুণের ক্রিয়ায় যে আলো জেগে উঠল, সেই আলোই হল বোধের শক্তি—তা মৃতকে প্রাণ দান করে। সেই শক্তি বরণীয় সবিতার ভর্গদ্যুতি, সেই শক্তিই সাবিত্রী শক্তি। তমোগুণে আধার গড়ে ওঠে, রজোগুণে সেই আধার হয় প্রাণচঞ্চল আর সত্ত্বগুণে তাতে চৈতন্যের আলো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। মানুষকে যে বলা হয় thinking living body, তার গাঁচ এইভাবে তৈরী হয়। উপনিষৎ পুরুষকে বলেছেন মনোময় প্রাণশরীর নেতা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন প্রকৃতিতে মানুষের গাঁচ সৃষ্টিতে তিনগুণের সমাহারে এক বিশেষ ক্রম-অভিব্যক্তি দেখা যায়। তার দেহে তমোগুণের ক্রিয়া প্রাণশক্তিতে রজোগুণের ও মনোজ্যোতিতে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। মানুষের মধ্যেই আবার যাদের দেহের টান প্রবল, সেখানে সব কিছুই অত্যন্ত নিম্নেট—স্থূল। সংসারে পনের আনা লোকই সেই রকম টানে অভ্যস্ত, খাওয়া-পরা ও গতানুগতিক ঐ স্থূল জীবন ছাড়া আর যেন কিছুই তারা জানে না। মনের দিক থেকে সেখানে এমন এক তামসিক শক্তি (inertia) জোট পাকিয়ে আছে, ঠিক যেন জগদ্দল পাথর। তা দেখলে শিউরে

উঠতে হয়। সেখানে নতুন ভাব তো নেই-ই, কোন নতুন আলো পড়লে এক বিরাট বাধার প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের এই জগদ্দল পাথর চাপার মত মনের অবস্থা দেখে বিবেকানন্দ ভাল করেই বুঝেছিলেন যে সর্বপ্রথম এই তামসিকতা থেকে প্রাণের জাগৃতি চাই। তাই তিনি তাঁর বীর্যের দ্বারা দেশের লোকের রজোগুণ উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছিলেন—কিছু কর, প্রাণ জাগুক। শুধু প্রাণ জাগল আর তাতে প্রজ্ঞার আবির্ভাব ঘটল না ; এমন হলে তাতেও আবার বিপদ। নিত্য নতুন কিছু চাই, কর্মে ও ধর্মে ধৃতি-শক্তির অভাব। আহার-বিলাসীদের যেমন আহার নিয়ে নিত্যনতুনের চাহিদা আছে ; তাতেও অবশ্য নিয়মের নিগড়ে যে তামসিক আবরণ, তা নাড়া পায় এবং তা থেকে প্রাণ মুক্তি চায়, তাই বৈচিত্র্য খোঁজে।

কিন্তু প্রাণ যে আবার নিজের রাজ্যে হানাহানি শুরু করে দেয়, সেটাই তার স্বভাব। উনিশ শতকে ডারউইনের যে ক্রম-অভিব্যক্তিবাদ, তাতে হানাহানির ফলে প্রাণশক্তির যে বিজয় (survival of the fittest), তাকে ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাণের বুভুক্ষা রজোগুণের পরিণাম মাত্র। মহাপ্রকৃতি বুভুক্ষা জাগিয়ে তুললেও হানাহানি তাঁর লক্ষ্য নয়। তাই জড়প্রকৃতির তামসিক বাধাকে বিদীর্ণ করে প্রাণের যে ক্ষুধার অভিব্যক্তি, তা আলোর পিপাসাই সূচিত করে। আয়তন বা পরিমাণের দিক যেমন আছে (Law of quantity), তার মূল্যবোধের বা উৎকর্ষের (Law of quality) দিকও তেমনি আছে। সংসারে যেমন দেখা যায় বার আনা লোক তামসিক, তার তিন আনা লোক রাজসিক ও এক আনা লোক মাত্র সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। ভক্তিশাস্ত্র বলেন "কোটিকে গোটিক হয়"। গীতা বলেছেন "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥" সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে দুই একজন হয়তো সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে। আবার সেই সিদ্ধদের মধ্যে বড় জোর দু' একজন ভগবানের সকল তত্ত্ব জানতে পারে। তাই পরিমাণগত মূল্যবোধ থেকে গুণগত মূল্যবোধ বুঝতে না পারলেই বিপদ। পুরুষের যেন শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ও প্রকৃতির তমোগুণ, এইভাবে দেখলে চৈতন্য ও জড়ের মাঝে রজোগুণ দুদিকেই ওঠা নামা করে। কিন্তু সত্ত্বগুণের অধীনে রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে না পারলে রজোগুণের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় ও তার নিত্যনবীনতাও শ্রান্ত করে দেয়। প্রশান্তি সত্ত্বগুণেরই ফল, তাকে আশ্রয় করে রজোগুণকে সংযমিত করতে হয়। আবার রজোগুণকে সংযত করতে না পেরে, শক্তিকেই যদি বাদ দিয়ে বসি, তা হলে নির্বীর্যভাব বা ক্লৈব্য এসে গ্রাস করে। আমাদের দেশে তাই হয়েছে। সাত্ত্বিক ভাবের যথেষ্ট স্ফুরণ থাকা সত্ত্বেও তামসিকতা যেন জাতির মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদার মতবাদের আবরণে অনেক সময় তামসিক ভাবকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যেমন অভ্যাসের দাসত্ব করা বা গুণের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গতানুগতিক আবর্তনের পথে চলা। গীতার দার্শনিক ব্যাখ্যায় আমরা শুনেছি যে সত্ত্বগুণও বন্ধনের

কারণ হয়। অন্যান্য গুণের মত মানুষকে তা বাঁধে সুখের সঙ্গে, সেজন্যে সে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মাশ্রমের নিশ্চিন্ত জীবনে সাধকদের মধ্যে ঐ নিশ্চিন্ত আরাম এসে তাদের বাঁধে। সেই কারণে জ্ঞানও যদি বন্ধনের কারণ হয়, তাহলে আর আলোর পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অতি সাত্ত্বিকতার এই অভিশাপ যে তা রজোগুণকে দাবিয়ে রাখতে যায়, আর তখন তমোগুণ এসে অজগরের মত সত্ত্বগুণকে গ্রাস করে।

তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিসে? যদিও সাত্ত্বিক বাসনা ও সত্ত্বের অহং শুদ্ধতর ও বৃহত্তর, কিন্তু যতক্ষণ ঐ বাসনা বা আসক্তি ও অহন্তার বিলয় না ঘটছে ততক্ষণ মুক্তি নেই, সমতাও রক্ষা করা যায় না। এজন্য সমস্ত আচার ব্যবহারের উর্ধ্বে উঠে সমগ্র দৃষ্টি অধিগত করা চাই। সেখানে ক্ষুদ্র অহং-এর স্থান নেই। প্রকৃতির উর্ধ্বে যে আত্মা, সেই শুদ্ধ আত্মার স্বানুভবে বৃহৎ হতে হবে। সেই চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা হয় "যদাত্মা সর্বভূতাত্মা" এই বোধের পরিপাকে। তখনই প্রকৃত মুক্তি লাভ হয় ও সেইসঙ্গে ত্রিগুণের ক্রিয়াকে সংযমিত করা যায়।

আমাদের মূল সমস্যা হল এই যে, মানবপ্রকৃতিতে তিনটি গুণই মিশে রয়েছে জড়াজড়ি করে। তাই আমরা প্রায়ই সমতা রক্ষা করে জীবনে চলতে পারি না। সদাচারের আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে পুণ্যকর্ম নিয়ে অযথা হৈ চৈ করে ফেলি। তাতে সত্ত্বগুণ রজোগুণের অধীন হয়ে পড়ে ও রাজসিক ভাব বেড়ে যায়। তখন শক্তির অপচয় ঘটতে শুরু করে, ভাব বিহ্বলতার এই এক মারাত্মক ত্রুটি। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা মনে পড়ে

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।
দাও ভক্তি শান্তরস ইত্যাদি।

সমিধ যদি আগুন হয়ে সবটাই না জ্বলতে পারে, তবে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় ও আত্মহোমের ঊর্ধ্বমুখী শিখাও স্তিমিত ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই রকম সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে চললেও সাধকের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে রজোগুণ ও তমোগুণ সেই সত্ত্বগুণের অধীনে ক্রিয়া করতে পারে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব উদ্ভিত হওয়া চাই; তখন রজোগুণ ও তমোগুণ তার বশে থাকবে ও আপন আপন শুদ্ধাবস্থা ফিরে পাবে। এ বিষয়ে সাধনায় করণীয় আচরণগুলি (চর্যা) সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান যেমন আছে, সিদ্ধ আচার্যগণ তাঁদের আচরণ ও উপদেশ দ্বারা জিজ্ঞাসু সাধকদের চিরকাল পথ দেখিয়েও যাচ্ছেন। প্রাচীন উপনিষদে আহার-শুদ্ধি থেকে সত্ত্ব-শুদ্ধি ও তা থেকে ধ্রুবাস্মৃতি বজায় থাকে, এ নির্দেশ আমরা পেয়েছি। কিন্তু এ সত্ত্বশুদ্ধির ফলে যে প্রশান্তি আসে, তা কিন্তু তামসিক প্রকৃতির ধৈর্য মাত্র নয়। যেন কোন বোধ নেই,

এমন এক নিরেট অসাড়তাকে আমরা শান্তি বলে ভুল করে থাকি। আলো চাই, এবং তা অলক্ষে অধুনক জ্যোতি হয়ে। সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়েও আমরা বুঝে দেখতে পারি যে, যখন আলো জ্বালানো হয়, তা থেকে কালি (carbon) উৎপন্ন হয়; কিন্তু আলোকে উজ্জ্বল রাখতে হলে তাতে কাঁচের আবরণ দিয়ে ঐ কালিকেও পুড়িয়ে আলো করে দিতে হয়, এই নিয়ম। তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব রজস্তমোলেশশূন্য হলেও তা নিম্ন অপরা প্রকৃতির কবলে থাকলে বিশুদ্ধ থাকতে পারে না। তাকে বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, তা হবে বিশুদ্ধ সত্ত্ব। তার আলোতে রজঃ ও তমোগুণের বিক্ষেপ ও মূঢ়তা পরাবর্তিত হয়ে বীর্য শক্তি শান্তি ও স্থৈর্য আধারে স্থায়ী আসন লাভ করবে।

প্রাচীন যোগশাস্ত্রে ঐ সব শুদ্ধির প্রক্রিয়া ও করণ নিয়ে অনেক সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। কারণ তাতে প্রবর্ত দশায় অনেক ভুল করা ও ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। রজোগুণ ও তমোগুণের ঊর্ধ্বে ওঠার অর্থ এ নয়, যে এক নিরেট নির্বোধ অবস্থায় চেতনা চাপা পড়ে যাবে; তা হলে তাকে কোন মতেই যোগ-চেতনা বলা যায় না। চিত্তের মধ্যে এক অনুসৃতির দহন অনুক্ষণ চিত্তকে সজাগ ও সমনস্ক করে রাখে, আর তারই মধ্যে জ্বলছে চিত্তদীপের অধুনক জ্যোতি—এই ঊর্ধ্বমুখী স্মৃতির অনুসরন করে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত সেই জ্যোতি স্পর্শ করতে হবে। তার বদলে শূন্য বা ফাঁকা চিত্তাধারে নিরেট নির্বোধ ভাব চেপে বসে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে না পারে এজন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সেই ভয়ঙ্কর প্রমাদ আসে তমোগুণ থেকে। গীতায় তিন গুণের প্রসঙ্গে তিন গুণের ক্রিয়াকে সাজিয়ে দেখানো হয়েছে। প্রমাদ আলস্য নিদ্রা দেহীদের বিভ্রান্ত করে দেয়, এগুলি সবই জ্ঞানকে আবৃত করে তমোগুণের ক্রিয়ায়। ভ্রান্তি ও নিষ্ক্রিয়তা তখন সাধককে পেয়ে বসে। রজোগুণের ক্রিয়া তাতে যোগ হলে এক ছটফটানি দেখা দেয়। তাতে অনেক শারীরিক অস্থিরতা মুদ্রাদোষের মত শরীরে দেখা দেয়। সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কেননা অজ্ঞানের আবেগে রজোগুণের ক্রিয়ায় লোভ থেকে কর্মের আরম্ভ হলে কর্মের নেশায় নানা রকম দুঃখ ও অশান্তিতে জড়িয়ে পড়তে হয়। তীব্র বাসনার আকর্ষণে অন্ধ হয়ে চললে প্রকৃতভাবে চাওয়া পাওয়া ও ভোগ করার রহস্য জানা যায় না। কারণ রজোগুণে জ্ঞানের অভাব থাকে। রাজসিক ও তামসিক কর্মের ফল হল দুঃখ ও অজ্ঞান। সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, তাই সাত্ত্বিক কর্মের নির্মল ফল হল সুখ। কিন্তু সেই সুখময় ফলে বাঁধা পড়লেও চলবে না। সুখের আসক্তি পুণ্যকর্মের লোভে সাধককে বাঁধে। শ্রীঅরবিন্দ গীতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাই বলেছেন যে নিস্ত্রৈগুণ্য হও, গুণের ওপরে উঠে গুণাতীত থেকে অন্তরে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবে এক সমত্বের ভূমি আছে। সেই সমতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গিয়ে যদি গুণের থেকে একেবারে অব্যাহতি চাই, হঠযোগ ও রাজযোগের ক্রিয়া নিরুদ্ধ ভূমিতে একেবারে গুণাতীত করে দিল, তাও আসতে পারে। কিন্তু জীবন থাকলে দেহ প্রাণ মন সব স্তব্ধ হয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। নেমে এসে নিম্ন প্রকৃতিতেই

ব্যাখান হলে এক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নাড়ীতন্ত্র সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্মভাবে সর্বান্তিক প্রতিক্রিয়াশীল (hypersensitive) হয়ে ওঠে। বাহিরের কোন শব্দ বা বিকৃতি সহ্য করতে না পেরে সাধকের ঐকান্তিক চেষ্টা তখন হয় ঐ গুণাতীতে ডুব দেওয়া ও সেইভাবেই থেকে যাওয়া। বলা বাহুল্য পূর্ণযোগের আদর্শ তা নয়, কিম্বা এও বলা যায় যে যোগ তাতে সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য লাভ করে না।

এরকম অবস্থায় ব্যক্তিগত লাভক্ষতি বিবেচনা না করে প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করা দরকার। সমাধির স্মৃতি ব্যুত্থানে ধরে রেখে চলতে হবে। তা থেকে ছিটকে পড়ে বা লাফ দিয়ে এসে বাহিরকে আঁকড়ে ধরার দরকার নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন "ন্যাংটা লাগার মত ভাব," সেই আবেশ নিয়েই চলতে হবে। কেননা সে সংস্কার তো নষ্ট হবার নয়। বাহিরের অভিঘাতগুলি তাকে "যুদ্ধং দেহি" বলে যেন প্রতিযোগিতায় আহ্বান করতে চায়। তখন আকাশবৎ ভাবনাকে প্রসারিত করে দিয়ে ওই দুই সংস্কারকে মুখোমুখি রেখে নিজকে দেখতে হবে। একদিকে অনন্তে প্রসারিত আকাশ-শরীর, আর একদিকে তীব্র সংবেদনশীল বাহিরের অভিঘাতে চঞ্চল বৃত্তিসমূহ। এই ভাবে মুখোমুখি হওয়ার ফলে গুণগুলি ক্রমশ রূপান্তরিত হয় গুণ নষ্ট হয় না। উর্ধ্বে পুরুষের অব্যক্ত ও নিম্নে প্রকৃতির অব্যক্ত, এ ভাবে আমরা দুটি অব্যক্তের কল্পনা করেছি। সেখানে উর্ধ্বে অতিচেতনার (Superconscient) সুমেরুতে যেমন কোন গুণের ক্রিয়া নেই, তেমনি নিম্নে এক নিরেট নিশ্ছিদ্র জড় (Inconscient) কুমেরুতেও কোন গুণের ক্রিয়া নেই। নীচের অব্যক্তেও থাকে এক গভীর প্রশান্তি, সুষুপ্তির স্থানুভাবে তার আবেশের ক্রিয়া হয়ে থাকে। তখন রজোগুণের ক্রিয়া থাকে না। কিন্তু সেখান থেকে কে ঠেলে দেয় যাতে স্বপ্ন দেখা দেয় ও আবার জেগে উঠতে হয়?

স্বপ্নভূমি দুদিকেই আছে, ওপরের দিকে ও নীচের দিকে যেমন বিজ্ঞানভূমির স্বপ্ন বা দেবস্বপ্ন ও মনোভূমির সাধারণ স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়, যাতে তা সাধনার কাজে লাগে ও ঘুমের মধ্যে অযথা সময় নষ্ট না হয়। এ বিষয়ে শ্রীমা তাঁর অনেক বাণীতে নির্দেশ দিয়ে আলোকপাত করেছেন। ঘুমের মধ্যে যদি সচেতন থাকা যায়, তা হয় যোগ-নিদ্রা তখন সমগ্র চিত্তভূমিই জ্যোৎস্নার আলোয় ভরে যায়। তারও গভীরে যে সুষুপ্তির ভূমি, তা হল শুদ্ধ তমোগুণের প্রশান্তি; তার ওপরেই জগৎ ভাসছে। তাকেও ছাপিয়ে রয়েছে তুরীয় ভূমি। শুদ্ধ গুণগুলি সেখানে জেগে ওঠে। সে অবস্থায় এই তিনগুণ রূপান্তরিত শুদ্ধ ভাবে থাকে। গভীর নিদ্রায় তো শব হয়ে যেতেই হয়, সেই নিদ্রা যদি যোগনিদ্রা হয় তো শব হয়ে যায় শবশিব। বাহিরটা নিরেট জড় তমোগুণের অভিব্যক্তি হলেও শুদ্ধ তমোগুণের প্রশান্তি তাকে রূপান্তরিত করে। আবার রজোগুণের চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপকে সংহত করে গুটিয়ে এনে যদি জ্যোতির অধূমক দীপশিখার মত জ্বালিয়ে রেখে ধারণ করে রাখা যায়, তবে তা হতে এক দৃঢ় ধৃতিশক্তি বা যোগবীর্য সঞ্চারিত হয়।

তাই যোগীর চেতনা হয় প্রশান্ত কিন্তু বীর্যে উদ্বুদ্ধ। তিনি সবটাই দেখেন প্রজ্ঞায় উদ্দীপ্ত, তাই তিনি সমভায় প্রতিষ্ঠিত থেকে গুণের খেলা দেখে যান। এই ভাবে চেতনার গভীরের দিকের ভাব রূপান্তরিত হয়, কিন্তু তখনও বাহিরের দিকের কাজ বাকী থাকে। সে ক্ষেত্রে চৈতন্যের প্রতিক্রিয়া দুরকম ভাবে লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরা হীনযানী, তাঁরা বলেন যে অন্তরে রূপান্তর ঘটলে জগৎ শূন্য বলে বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা মহাযানী, তাঁরা আরও উজানে গিয়ে বলেন তা তো হবে না, তা হলে যে এক দিকে ঝোঁক পড়ে যায়। ঐ শূন্যবৎ জগতেও অন্তরের রূপান্তরের বোধ আনতে হবে। পূর্ণযোগীর দায় হল ঐ সামগ্রিক রূপান্তরিত চেতনাকে অন্তরে ও বাহিরে সব দিক দিয়ে লাভ করা। তাই তাঁর আদর্শ হল নিস্ত্রৈগুণ্য থেকে তারই মধ্যে তিনটি গুণের শুদ্ধীকরণ। তখন রূপান্তরিত তিনটি শুদ্ধ গুণের ক্রিয়াই শুদ্ধিসাম্যের অবস্থা। গীতা থেকেও আমরা সেই শিক্ষাই লাভ করেছি, জোর করেও যদি তাঁর দৈবী প্রকৃতি, সেই শুদ্ধা চিন্ময়ী শক্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি, তাহলেও জগতে রূপান্তর আসবে। তখন সব রকম ঝুঁকি দিয়েও কর্ম করা সম্ভব হয়, এক যৌগিক প্রশান্তি মনের সঙ্কল্পকে ধরে থাকে।

তাহলে নিস্ত্রৈগুণ্য থেকে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ থেকেও যোগীর কর্ম উৎসারিত হয়ে থাকে। বৌদ্ধদের সাধনশাস্ত্র থেকে পাওয়া গেছে যে তাঁরা এক দৃঢ় সঙ্কল্প ধরে রেখে নিস্ত্রৈগুণ্যের মধ্যে যেন ঝাঁপ দিতেন যে এত সময় পরে ব্যুত্থিত হবেন। ঘড়িতে সময় সঙ্কেত স্থির রেখে যেমন এলার্ম দিয়ে রাখা হয়, ঠিক তেমনিভাবে নিজের ধ্যানচেতনার গভীরে সঙ্কল্পশক্তিকে গুটিয়ে রাখতে হবে। রামকৃষ্ণদেবকে দেখা গেছে যে তিনি বারবার মহাশূন্যে ঝাঁপ দিতেন, আবার তাঁকে কে যেন ঠেলা দিত, বলতেন "নেনে যা নেমে যা"। তখন একটা প্রাচীন সংস্কার ধরে তাঁকে নেবে আসতে হত, একথা তিনি বলতেন। কিন্তু বারবার নিরোধ সমাধিতে গিয়েও সর্বদা শক্তি-সঞ্চার হয় না বা জগৎকেও বদলানো যায় না ও বোধসত্ত্বের চর্যাও হয় না। কাজেই শুধু তটস্থ থাকলে হবে না, চাই রূপান্তরিত চেতনার বিকাশ। শ্রীঅরবিন্দ বারবার বুঝিয়েছেন শূন্যের অর্থ একেবারে ফাঁকা বা অন্ধকার নয়। সেই মহাশূন্যেই আলো ছড়িয়ে পড়ে, যে আলো জগতের প্রথম প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলে মৃতপরীরে বোধসঞ্চারের মত। সেই প্রাণই জীবজগতে আমাদের মধ্যে স্পন্দিত। তাই গুণাতীত শূন্য হয়ে তবেই তাকে অধিগত করতে হবে কিনা গুণের অধীনে অবশ হয়ে না থেকে গুণের অধীশ্বর হয়ে বসতে হবে। গুণময়ীর গুণগুলিকে বশীভূত করে রেখে তাদের লীলা চলতে দিতে হবে। নিত্যজাগ্রত ও তটস্থ থেকেও তখন গুণগুলি নিয়ে কর্ম করা অনায়াস ও সহজ হবে। গুণের এই রূপান্তরের জন্যই নিস্ত্রৈগুণ্যের সাধনা। প্রাকৃত চেতনায় যে গুণবিক্ষোভ তা হল অপরা প্রকৃতির মধ্যে, সেই প্রাকৃত গুণের ঊর্ধ্বে যেতেই হবে। পরা প্রকৃতিতে শুদ্ধ গুণের দর্শন পাওয়া যায়। আর পরমা প্রকৃতি সেই শুদ্ধ গুণগুলি স্ফুরিত করেন আধারে তাঁর গুণসাম্যের ভিত্তিতে। চেতনায় সেই গুণসাম্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সম্পূর্ণ

রূপান্তর সম্ভব হয়। তম: তখন রূপান্তরিত হয় সত্তার স্থৈর্য ও প্রশান্তিতে, রজ: রূপান্তরিত ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত বীর্যে আর সব রূপান্তরিত হয় চিৎপ্রকাশের অনিবার্য সৌষম্যে। গুণের সঙ্গে গুণের কোন বিরোধ নেই অথচ দিব্য ভাবে গুণগুলি স্ফুরিত হতে থাকে, এই হল পুরুষের গুণসাম্য বা সত্তার কুনেক্ত। অপরা প্রকৃতির গুণলীলায় এতদিন যে যন্ত্রিচ্ছন্দ ছিল সত্তার কুনেক্তে যার জন্য বিবেক সাধনায় তাকে ছাপিয়ে উর্ধ্বে যেতে হয়েছিল, তা এখন মিত্রচ্ছন্দে রূপায়িত করে তোলে দেহ-প্রাণ-মনকে। সাধকের আধারে তখন আর স্বচ্ছন্দ চিৎপ্রকাশের কোন বাধা সৃষ্টি হতে পারে না। উর্ধ্বের বিশুদ্ধ প্রকাশ এই প্রাকৃত ভূমিতেই নেমে আসে তুরীয় চিৎ-শক্তির আবেশে।

ওই মহাশক্তির আবেশই পারে বিজ্ঞানকে আধারে সক্রিয় করতে, ব্যক্তির নিজের চেষ্টায় বা দেহ-প্রাণ-মনের শক্তিতে তা কিছুতেই হবার নয়। তাই ব্যক্তির অহং থেকে মুক্তি পেতে হবে শুদ্ধ আত্মায়। যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে ওই তিন গুণের বিক্ষোভে জড়িয়ে আছি, ততক্ষণ আমরা নিজেদের বলতে গেলে কিছুই চিনি না। শক্তির প্রবাহে ভেসে চলি কিন্তু তাকে বুঝতে পারি না, নিজেকেও সামলাতে পারি না। এই 'আমি'কে নয়তে হবে, আমি গেলে তবেই তিনি আসেন। তখন দেখি আমি যেন কোথাও নেই, শূন্যবৎ —শুধু সত্তা মাত্র। কিন্তু সত্তার গভীরে এক পরম প্রশান্তি, আকাশের মতই আধারকে ব্যাপ্ত ও লঘু করে গ্রন্থিগুলি শিথিল করে দিয়েছে। দুঃখে অবসাদে হর্ষে উদ্বেগে কোন তরঙ্গই সেই উদাসীন শুদ্ধ চেতনার হিল্লোলিত হয় না। এই শূন্যের বুকেই নামে লোকোত্তর জ্যোতির প্লাবন। বারবার নামে আর আলোয় আলোয় শূন্যতাকে ভরে তোলে। সে আলোর তেজ আছে, আর সেই তেজক্রিয়া সৃষ্টিধর্মী। সৌরালোকের মতই তা নেমে আসে আর তার তেজে আধারকে নতুন করে গড়ে তোলে। এই ভাবে তিনি নেমে আসেন রূপান্তরিত 'আমি' হয়ে। দেহের অণুপরমাণুতে চিৎশক্তির বিচ্ছুরণে আধারে আগুন ধরে যায় কয়লাতে আগুন ধরার মত। শক্তির প্রচণ্ড চাপে সে কয়লা হয়তো হীরা হয়ে যায়। এই রূপান্তরের ফল। তাই পরমা শক্তির গুণসাম্যের ভিত্তিতেই অতিমানস যোগের আশ্রিত সম্পূর্ণ রূপান্তর সম্ভব হবে।*

(ক্রমশ)

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা

পবিত্র

[এই সকল কথোপকথনের তারিখ ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৫ থেকে ২০ ডিসেম্বর ১৯২৬-র মধ্যে। "পবিত্র" ছিলেন পলিটেকনিকের এঞ্জিনীয়ার, আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে প্রায় চার বছরকাল জাপানে এবং মঙ্গোলিয়াতে নানাদের কাছে কাটিয়ে অবশেষে পণ্ডিচেরিতে এসে উপস্থিত হন ১৯২৫ ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে। সেদিন থেকে তিনি বরাবর এখানেই রয়ে গেলেন, অতঃপর তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত চুয়াল্লিস বছর তিনি আর কোথাও যাননি, শেষ পর্যন্তই ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রীমায়ের সেবক হয়ে। ইনি দেহত্যাগ করেন ১৬ই মে ১৯৬৯ তারিখে। এই সকল কথা তিনি আপন স্মৃতি থেকে লিখে রাখতেন, বেশির ভাগ ফরাসী ভাষাতে ও পরে ইংরেজীতে। এগুলি হুবহু শ্রীঅরবিন্দের মুখনিঃসৃত উক্তি না হলেও যথাসম্ভব অবিকৃত-ভাবে লেখা। পবিত্র যখন পণ্ডিচেরিতে প্রথম আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৩১ মাত্র।]

শুক্রবার, ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৫

শ্রীঅরবিন্দ এখন আবার ফ্রান্সে ফিরে গেলে তা তোমার পক্ষে হবে মানা হবে। চেতনার যে অবস্থার আভাস তুমি পেয়েছ তার থেকে তোমার পতন হবে। এবং আরো খারাপ কিছু হতে পারে। কিছু বছর পরে হয়তো তা কেটে যাবে, তবু এখন যে সুযোগ পেয়েছিলে তা নষ্ট হবে, তোমার যা করবার ছিল তা করা হবেনা।

তোমার চেষ্টার মধ্যে হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও মনের শিক্ষাগ্রহিষ্ণুতা (আর বিচারণ) রয়েছে। কিন্তু মনের ভিতরকার ক্রিয়াগুলি অনিষ্টকারী। ঐ মনকে নীরব করতে হবে।

এক নূতন চেতনা তোমার মধ্যে প্রকাশ পেতে চাইছে। এই ভারতে এমন অনেক যোগী আছে যারা এ বিষয়ে সাহায্য ক'রে তোমাকে একটা নবজন্ম দিতে পারে। কিন্তু তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন, আর তা ছাড়া তাদের ভাষা তুমি জানোনা। তথাপি তোমার পক্ষে তাই সুবীনাসো।

সেই আধ্যাত্মিক চেতনা এলে তুমি মুক্তি পাবে।

আমার নিজের তরফের কথা এই যে মুক্তিই যদি আমার লক্ষ্য হতো তাহলে আমার যোগ এখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু মুক্তি আমার লক্ষ্যের প্রথম অংশ মাত্র। দ্বিতীয় অংশ হলো সেই মুক্তির আলোকে সকল যন্ত্রগুলির মধ্যে নামিয়ে আনা, যাতে সকল যন্ত্র সম্পূর্ণ নিখুঁত হয়ে পরম সত্যের বাহক হতে পারে। তাতে বিশ্বসত্তা ও

বিশ্বশক্তির ফলে তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করে তোমার ভিতর দিয়ে তার কাজ করবে। অবশ্য অজ্ঞাতভাবে সকলেই অল্প-বিস্তর সেই শক্তির বাহক; কিন্তু আমি চাই চেতন ভাবে তার সম্পূর্ণরূপ বাহক হওয়া।

অতটা পূর্ণতা লাভ করা মানুষের পক্ষে কঠিন, তার জন্য সারা জীবন লেগে থাকতে হয়। আর সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে জীবনটা লণ্ডভণ্ড হয়েও যেতে পারে। এ কাজ এমন কঠিন বলে আমি অন্য কাউকে এ পথে আসতে বলতে চাইনা। কিন্তু তোমার মধ্যে দেখছি প্রবল আস্পৃহা, এগিয়ে আসার আগ্রহ। সেইজন্যই তোমাকে এই আদর্শের কথা বললাম। এখানে তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও, তাহলে তখন দেখা যাবে যে কতটা কি তোমাকে দেওয়া যেতে পারে, আর কতইবা তুমি নিতে পারো, অতঃপর তার থেকে আরো বেশি এগিয়ে যাবার আগে।

রবিবার, ২০ ডিসেম্বর ১৯২৫

আমাদের ভিতরের দিকে এমন একটি জায়গা আছে যা সকল স্থান কালের বাইরে, যা স্থির, অনড়, অপরিবর্তনীয়; মনের চিন্তা ও ভাবপ্রবাহের মধ্যে তা কোনোরূপ অংশ গ্রহণ করেনা। সাধনার প্রথম ধাপ হলো ঐখানে আপন চেতনাকে স্থায়ীভাবে কেন্দ্রীভূত রাখা; তাই হলো মুক্তি। আমাদের ব্যক্তিসত্তার অন্তরালে যে পুরুষ আছেন তাকে তখন দেখতে পাওয়া যায়, তাঁর বহুপ্রকার গুণাবলী পর্যায়ক্রমে উদ্ঘাটিত হয়।

প্রথমে তিনি দেখা দেন সকল ক্রিয়ার ও অনুভবের সাক্ষীরূপে, নিজে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও অপরিবর্তনীয় হয়ে থেকে।

তারপরে তিনি নিজেকে প্রকট করেন অনুমন্তারূপে প্রকৃতির যত কাজগুলিকে তিনি অনুমোদন দেন অথবা দেন না কাজনা চিন্তা ও কর্মাদির বেলাতেও তাই। তিনি এইভাবে যখন তাঁর আদেশ জানান, যেমন কোনো ভাব প্রকাশের বেলাতে, তখন তার কোনো উপযুক্তরূপ কারণ অতীতে থাকলেও সত্তা তখন আদেশানুযায়ী নিজে তার থেকে নিরস্ত হয়।

তদ্ভিন্ন এই পুরুষ হলেন জ্ঞাতা, যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। সে জ্ঞানের বিভিন্ন স্বরূপ; তার সব চেয়ে নিম্নস্থ জিনিস হলো বোধি, তার উপরে ঐকাবোধ। কিন্তু সেখানে কোনো ইন্দ্রিয়াদি সেই জ্ঞানের মাধ্যম নয়; তার প্রকাশ হয় সরাসরি।

শেষে তিনি প্রকাশ পান স্বয়ং ঈশ্বররূপে। তখন আপন রাজ্যের সম্পূর্ণ দখল নিজের হাতে নিয়ে আপন যন্ত্রাদির সাহায্যে তিনিই সকল রকম কাজের পরিচালনা করেন।

এ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে দুই স্তরের ভিতর দিয়ে।

প্রথম ক্রিয়াশীল হবে মনে বুদ্ধির অংশে। তুমি চিনতে শুরু করবে যে তোমার ভাবধর্মী মন এবং তোমার স্থূল দেহ, এগুলি তুমি নও। তুমি রয়েছ ওর উপরে—তোমার এই পার্থিব ও স্থানীয় অস্তিত্বের উপরে। এতে আসবে একটা শান্তি ও নিশ্চিন্ততা।

এরূপ অবস্থাতে পৌঁছতে প্রথম কাজ হবে (বিশেষত তোমার পক্ষে) ইচ্ছামত তোমার মনের চিন্তাকে স্তব্ধ করতে পারা। মনের দ্বারাই মন থেকে নিজেকে পৃথক করে নেবে (তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে তা পারবে না), মনের দিকে তখন চেয়ে দেখবে। এরূপ করলে তখন চিন্তার কাজকে বন্ধ করা সম্ভব হবে। এইটি যোগের প্রথম শিক্ষা। যেমন, এই দেখ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, এ সময়ে আমার মধ্যে চিন্তা নেই। চারিপাশে যা কিছু আছে সবই দেখছি কিন্তু চিন্তা বন্ধ (যখন চাইব তখন চিন্তাকে ডেকে আনব)। প্রথম যখন যোগ শুরু করি তখন কিছু সাহায্য পেতে লেলের খোঁজ করেছিলাম। সে আমাকে বললে তার পাশে বসে মনকে তফাৎ করা অভ্যাস করতে। তিন দিনের চেষ্টাতে আমি চিন্তা থামিয়ে দিলাম।

অন্যরকম উপায়ও আছে, চুপচাপ বসে থেকে নিজেকে খুলে রাখা যাতে উপরকার কিছু জিনিস ভিতরে এসে ঢুকতে পারে, তাহলে নিজের চেষ্টার বদলে উপরের দ্বারাই তা হয়ে যাবে। তবে তোমাকে আমি প্রথম উপায়টাই নিতে বলি। যতক্ষণ পর্যন্ত এতে সফল না হও ততক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু হয় সব মনেরই কাজ। বোধ এসে পড়লেও তা আসে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে, থেমে থেমে অনিশ্চিত ভাবে। তার উপরে উঠতে হবে। ছোরালো আশ্বাস থাকলে অল্প অল্প (অথবা হঠাৎ) হয়তো এক নতুন চেতনাতে ঢুকে যেতে পারবে কিংবা কখনো বা আসবে একটা প্রশান্তি যা পাহাড়ের মতো নিরেট। কখনো বা আসবে আলো, সুস্পষ্ট চোখে দেখার মতো, ভিতরে বাহিরে দীপ্তি দিয়ে। আর কখনো বা আসবে কিছু নির্দেশ। যাই কেন আসুক, তার মধ্যে পাবে অনির্বচনীয় শান্তি ও জ্ঞানদীপ্তি।

আর এই সব জিনিস নিচে তোমার মধ্যে নেমে আসবে উপর থেকে। আত্মিকদের মতো নিচেকার চক্র থেকে উপরের দিকে ওঠা নয়, এতে তার পরিবর্তে উপর থেকে নামা নিচের দিকে।

তাহলে তোমার পক্ষে প্রথম লক্ষ্য হলো এই: মন থেকে নিজেকে পৃথক ক'রে নেওয়া এবং এইরূপ জানা যে মন হলো তোমার থেকে স্বতন্ত্র এক জিনিস। তুমি তার কাজের সাক্ষী। চিন্তা যদি এসে পড়ে তো আসুক, কিন্তু নিজেকে তার সঙ্গে জড়াবেনা। এইটি তুমি ধ্যানের সময় অভ্যাস করবে। অতঃপর ক্রমশ: এই ধ্যানলব্ধ বিচ্ছিন্নতাকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও এনে ফেলতে পারবে।

মঙ্গলবার, ২২ ডিসেম্বর ১৯২৫

প্রশ্ন আমার বোধ হয় যে মনের দুটি থাক ভাগ করা আছে প্রথমটির কাজ শুধু ছবি আর আকৃতি নিয়ে, দ্বিতীয়টির কাজ ভাব ও ভাষা নিয়ে। এর পিছনে রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তি। নিচু মন থেকে আমি সহজেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারি। যখন ভাব ও ভাষার দিকে ফিরি তখনও নিজেকে তফাতে রাখতে পারি। কিন্তু যেমনি বুঝে দেখতে যাই তখনই মনের সঙ্গে নিজেকে জড়াই (অর্থাৎ বুদ্ধি মেশে মনের সঙ্গে)।

শ্রীঅরবিন্দ : তা হোক—কিন্তু তা ছাড়াও একটা তৃতীয় জিনিস রয়েছে মনেরই মধ্যে, যা ছবি ও ভাব থেকে স্বতন্ত্র। তা এমন কিছু যা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত—শান্ত এবং স্বচ্ছ। অধিকাংশ লোক—এবং তুমিও—মন ও তার ক্রিয়াচাঞ্চল্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ক'রে ভাবো মন ও তার ক্রিয়াকে একত্রে মিশিয়ে মনে করো এই আমি। তোমার পক্ষে দরকার এই প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে নিজেকে পুরুষ বলে ভাবা। আমার শিক্ষা এই যে চিন্তা এসে উপস্থিত হলে তাকে হটিয়ে দিতে হবে, কেবল স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে।

তুমি বলবে যে তাতে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে, কারণ লোকে সাধারণত তাই মনে করে যে মনকে নীরব করা মানেই ঘুম। কিন্তু তা নয়, ওটা ছাড়া যায়—ঐ বাধাকে কাটানো দরকার। যেমন নিম্ন প্রকৃতির বিকৃতিকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারো, তেমনি ঐরূপ ঘুমের ভাবকেও প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে ক্ষমতা তোমার আছে; যেহেতু তুমি পুরুষ।

তখন দুই অবস্থার মধ্যে একটি তোমার হবে হয় তুমি চেতন থাকবে মনকে শূন্য রেখে, নতুবা এই চেতনা থাকবে কিন্তু জাগ্রতভাবে নয়, সমাধিতে।

অতএব এই প্রচেষ্টাই হলো তোমার কাজের প্রথম ধাপ।

শুক্রবার, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৫

প্রশ্ন চিন্তাগুলির ব্যাপার পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখলাম যে তার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেই তা মিলিয়ে যায়। সুতরাং কেবল সেদিকে লক্ষ্য রাখলেই তাকে ঘোচানো সম্ভব, যেমনি তার সম্বন্ধে চেতন হই অমনি তার বিনাশ হয়। এটা ভাব ও কথার ব্যাপারে পুরোপুরি সফল হয় কিন্তু ছবি ও প্রতিবিম্বের বেলাতে কিছু কম। এমনি লক্ষ্য স্থির রেখে আমি চেতন থাকতে পারি। কিন্তু তখন সরে যায় না, সে থাকে দরজায় আড়ালে। কখনো কখনো এমন বোধ করতে থাকি যে আমি কি এবার চেতনা হারাবো (?)

উত্তর ঠিক আছে, কিন্তু এখনও তুমি চিন্তাকে নষ্ট করা নিয়ে চেতন রয়েছ। সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু সময়ান্তরে এটিও থাকবেনা।

চেতনা হারাবে বলে ভয় পেওনা। এমন হতে পারে যে আগের দিনে যে দুই রকম সম্ভাবনার কথা বলেছি, সেই ভাবে এমন অচেতনার মধ্যে গিয়ে পড়বে যার কোনো স্মৃতি তোমার থাকবে না। সে জিনিস এড়াতে চেষ্টা করবে, যাতে মনকে বাদ রেখে জাগ্রতই থাকতে পারো কিংবা সমাধিতে যেতে পারো।

প্রশ্ন বই পড়া কি অনিষ্টকর? বেশি আমার দরকার হয়না, তবে কখনো বা মানসিক ক্রিয়া পীড়াদায়ক হয়।

উত্তর অমন কোনো মানসিক আইন খাড়া করোনা। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন যখন যেমন হবে তা করবে। বই পড়া মাত্রই যে অনিষ্টকর এমন কথা নয়।

বুধবার, ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৩

প্রশ্ন মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আমি নিজেকে চিন্তাশূন্য করে একাগ্র থাকতে পেরেছি—তারপরেই বিশুদ্ধ তেজে সব কিছু অনুভব ফিরে এলো। কোথাও কোনো রকম শব্দ হলেই সেই দিকে আমার মনোযোগ একবার চলে গেলে আর তাকে ফেরাতে পারিনা, একাগ্রতা খুঁজে পাইনা।

উত্তর সকল চিন্তা ও সংবেদনাদি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারা প্রথম কথা নয়, প্রথম কাজ হলো এইটি মনে আনা যে ও সমস্তই তোমার বাইরের জিনিস। মনের দুটো ভাগ আছে, তার মধ্যে একটি ভাগ কাজ করে, আর অন্য ভাগটি প্রকৃতির কাজের সঙ্গে না জড়িয়ে কেবল নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হয়ে থাকে। এই দুটিকে তোমার আলাদা ক'রে নিতে হবে। 'আমি ওটা নই' এই ভাবটিকেও দাবিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি এগোতে চাইছ। কিন্তু এখন ঐ চিন্তাকেই তোমার যন্ত্রস্বরূপ করতে হবে।

তুমি তোমার চিন্তা ও সংবেদনাদির দ্রষ্টা হও আর জানতে অভ্যাস করো যে ওগুলো বাইরের জিনিস, তাতে তোমাকে বিচলিত করছে না। এতে তোমার মধ্যে নেমে আসবে উচ্চতর পুরুষ-চেতনা, তাই তোমার মনকে অধিকার করবে।

জোর করতে যেওনা, জোর করে ঠেলে ফেলতে গেলেই বরং তা আরো বেশি ক'রে মনের মধ্যে ফিরে আসবে। জোর করলেই নানা বিপত্তি এসে হাজির হবে।

সোমবার, ৬ জানুয়ারী ১৯২৬

প্রশ্ন আমার চেতনাকে সুস্থির ক'রে নীরবতার মধ্যে সজাগ ও অটল রাখতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু তা স্থায়ী হয় অল্পক্ষণের জন্য। চেতনা তখন কেন্দ্রস্থ হয় ভ্রূমধ্যে। তাতে তিনটি কেন্দ্রে কাজ হয়, ভ্রূমধ্য, নাভিকেন্দ্র, ও ঘাড়ের দিকে, আর মাথার চোটার মধ্যে ক্লান্তি আসে।

উত্তর এর পরে ঐ মাথার আবেগ চলে যাবে, কারণ তখন কাজটা মস্তিষ্কের দ্বারা হবে না। এটা কেবল মধ্যবর্তী অবস্থা। তোমার চেতনা এক সময় দেহের বাইরের দিকে—মাথার উপর দিকে—কেন্দ্রীভূত হবে, তার পরে তার ব্যাপকতা আসবে, আর তুমি বোধ করবে তা অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গে বিলিত হচ্ছে।

কণ্ঠের কেন্দ্র ওর মধ্যে নেই কারণ তা মনের কেন্দ্র নয়, স্বরের স্থান। যারা ভাবযুক্ত মন নিয়ে সাধনা করে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে নাভিকেন্দ্রের স্তরে।

প্রশ্ন যদি আমি সমগ্রের সঙ্গে ঐক্য বোধ করতে পারি, তাহলে কি নিজের চেতনাতে অন্য চেতনাকেন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারব?

উত্তর তা আদৌ পারবে না। ওর মধ্যে দুই ধাপ আছে, প্রথমে তুমি কেবল 'নীরবতার মধ্যে' অন্যান্য চেতনাকেন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম বোধ করবে। সে বোধ আসবে তখন পরাৎপরের মধ্যে। তার পরের ধাপে আসবে সক্রিয়তার মধ্যে—শক্তিগুলির ক্রিয়ার মধ্যেও—এবং তখন তুমি যা বলছ তা সম্ভব হতে পারবে।

প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে এখনও আমি আমার মূল সত্তাকে স্থূলদেহ থেকে বন্ধনমুক্ত ক'রে নিতে পারিনি—সেটা মনে মনে ধারণা করতে পারি। সেটা করা কি সম্ভব হবে?

উত্তর সে বোধ তোমার আসবেই,—তখন তুমি দেখবে যে দেহটা তোমার যন্ত্র মাত্র, তাকে তুমি পৃথক করতে পারো। এটি মুক্তির প্রথম লক্ষণ এই বোধ যে দেহ থেকে তুমি মুক্ত।

প্রশ্ন এ ছাড়া এখনও আমার মধ্যে কতকগুলি দোষ রয়েছে, যেমন আমার স্বীকৃতি ও সমাদর লাভের ইচ্ছা অতি প্রবল, যদিও মনের মধ্যে আমি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি।

উত্তর হাঁ, তোমার যতটা ধারণা তার চেয়েও অনেক জটিল তোমার সত্তা। এখন সময় আসবে যখন দেখতে পাবে যে তোমার আভ্যন্তর সত্তা ওর থেকে বাইরে

তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। আর তোমার চেতনার মধ্যে এমন এক অংশ আছে যা প্রকৃতির ঐ সকল ক্রিয়াকে অনুমোদন করছে। সেই অংশটাই চাইছে স্বীকৃতি প্রভৃতি, যদিও মনের তাতে আপত্তি। কিন্তু মন কেবল বাধা দিতেই পারে—কিছু বদলাতে পারেনা।

প্রশ্ন তেমন পরিবর্তন আনতে আমার মনে হয় একটা বিশ্বচেতনা লাভ করা চাই, তাহলে যাকে কিমিয়া শাস্ত্রে বলে 'সর্বদ্রাবক' সেই জিনিস এসে যাবে। তাতে কি আমি বদলাবো না?

উত্তর না, ওতেই যথেষ্ট নয়। সেই বিশ্বচেতনা থেকে যেমনি নেমে আসবে অমনি আবার তোমার স্বভাবের ধারাগুলি জীবনের মধ্যে চলে আসবে। কিন্তু বিশ্বগত চেতনার উপলব্ধি ছাড়াও আর এক পরাৎপরের দিক আছে যার সৃষ্টিক্ষমতা অনন্ত। সেই জিনিসই সর্বদ্রাবক ও স্রষ্টা। যে প্রাণপুরুষ প্রকৃতির কাজে সময় দেয় তাকে সমর্পিত হতে হবে উচ্চতর জীবনে, তবেই তোমার পরিবর্তন আশা সম্ভব হবে।

আধারস্থ চেতনার অনেকগুলি স্তর আছে। উপনিষদে বলেছে পাঁচটি বিভিন্ন পুরুষের পাঁচ রকম কোষাচ্ছাদনের কথা।

প্রশ্ন আত্মা যখন প্রপঞ্চময় জগতের বন্ধনমুক্ত হয়ে নির্বাণের নীরবতায় প্রবেশ করতে পারে, তখন এই ব্যক্তিবোধের বিলোপেই কি চূড়ান্ত অবস্থা?

উত্তর অবশ্য তাই অনেকের কামনা। পুরুষ রূপে পরম ব্রহ্মের দুই অবস্থা এক পরাৎপর অপরিবর্তনীয় পুরুষ, অন্যটি পরিবর্তনীয় পুরুষ, যেমন গীতায় বলেছে। আত্মা প্রথমটির সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করতে পারে প্রকৃতির বিনাশ হওয়াতে আত্মা এই অভিব্যক্ত জগৎকে মিথ্যা মায়া বলে বোধ করতে থাকে, মায়াময় ফাঁদস্বরূপ জ্ঞান করে। কিন্তু তাতে পূর্ণ সন্তোষ মেলে না। কারণ ও পরিবর্তনীয় পুরুষের দিকটা বাকী থেকে যায়; কিন্তু আত্মা যদি পূর্ণ মিলন চায় তাহলে ভগবানের পরাৎপর অবস্থা ও অভিব্যক্ত অবস্থা দুই দিকেরই সঙ্গে মিলন উপলব্ধি করা চাই।

আর আত্মার পরমাত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ মিলে যাওয়া, এ একটা কথার কথা। তাই হলেই কি চরম মুক্তি? আমি তো মনে করিনা।

পরম ব্রহ্মের একটা দিক রয়েছে যা সব কিছু অভিব্যক্তির বাবানে নিজেকে বিশেষ ভাবে জানে, চেনে, ভালোবাসে ইত্যাদি; সেই কারণেই তো এত সব অভিব্যক্তি।

শুক্রবার, ৮ জানুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন যা বেশ সহজ বলে মনে হয়েছিল তা দেখছি খুবই কঠিন। গত কয়েক দিন যাবৎ নিজেকে নিম্ন মন থেকে পৃথক ক'রে নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। মনের মধ্যে নানা প্রতিচ্ছায়ার যার কোনো মাথামুণ্ড নেই, জাগ্রত স্বপ্নের মতো, তার সঙ্গে ভেসে না গিয়ে নিজেকে স্থির রাখতে যথেষ্ট জোর করতে হয়েছে। এ বোধ হয় সাময়িক প্রতিক্রিয়া ?

উত্তর মনকে যখন নীরব করতে যাও তখন তুমি কি করো ?

প্রশ্ন চেতনাকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করি আর নিম্ন মনের ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখি। এতে সফল হলে তখন আমি নীরব হই। দুই রকম জিনিস আসে একটি প্রতিচ্ছায়াগণ আর একটি বাক্যময়। বাক্যময় অবস্থা বেশি কঠিন, আপনা হতে এসে পড়ে। নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে নয়, এমন সব কথা যা আমি কখনো ভাবিনি, আর তাতেই আমাকে ভড়ায়—ইন্দ্রিয়গুলি তার থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে।

উত্তর চেতনাকে বিশেষ কোন বিন্দুতে স্থির করতে চেষ্টা করো ?

প্রশ্ন সাধারণত গোটা আজ্ঞাচক্রের স্থান।

উত্তর আজ্ঞাচক্র হলো সাধারণত স্বয়ংক্রিয় মনের কেন্দ্র, আর ওই শক্তিগুলি তোমার মধ্যে কাজ করে। অধিকাংশের বেলা ওটাই মনের কর্মকেন্দ্র, সাধারণ কাজকর্মের মধ্যে লক্ষ্য করলে ওর ক্রিয়া জানতে পারবে—সকলে তা জানে না।

প্রকৃত মনের কেন্দ্র আরো উপরে। আর ওটি হলো স্বয়ংক্রিয় মন, যাকে নিয়ে তোমার এখন কোনো কাজ নেই। ওর দ্বারা প্রকৃতির অনর্থক অপচয় ঘটে।

তোমার ইচ্ছাশক্তিকে কখনো কি কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছ ?

প্রশ্ন স্বভাবতই তা ক'রে থাকি, কিন্তু বলতে পারি না প্রকৃতই তা ইচ্ছার কাজ কিনা ?

উত্তর ইচ্ছার তিনটি পর্যায় আছে, যার সম্বন্ধে মনের চেষ্টা প্রয়োগের আগে অবহিত হওয়া দরকার। প্রথমটি হলো কামনা—যার কেন্দ্র হলো নাভির স্নায়ুজালক (solar plexus)। দ্বিতীয়টি হলো ঈপ্সিতা—একরকম অনুজ্ঞা, যার দ্বারা প্রকৃতির ক্রিয়াকে তুমি সমর্থন করবে অথবা করবে না। যখন ভাবো যে অমুকটা করা উচিত

কিংবা অনুচিত, তখন এটি কাজ করে। আমাদের যোগে এই শক্তিটি থাকা নিতান্ত অপরিহার্য। আত্মোৎসর্গের ফলে এটি আসে এবং তখন এর ক্রিয়া অনুভব করা যায়। গোড়ার দিকে এর ক্রিয়া বিলম্বিত বা অপূর্ণ হয়, কিন্তু পরে তা নিখুঁত হয়। মনের তরফের চেষ্টা কিছুকাল কাজ করতে পারে কিন্তু প্রকৃত এই ইচ্ছাশক্তির কাজ তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত।

প্রশ্ন : এর ক্রিয়া আমি অনুভব করেছি যখন সমর্পণ ও নিবেদন করতে করতে আমি সত্তার সর্বোচ্চ স্তরে উঠে গেছি। তখন স্পষ্ট জেনেছি যে মাথার উপর তার ক্রিয়ার চাপ নেমে এলো।

উত্তর সেটাই চাই। ওটিকে মাঝে মাঝে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করবে। নিত্য-রূপে তা হওয়া এখন অসম্ভব—কিন্তু মাঝে মাঝে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে।

আর তৃতীয় জিনিসটি হলো পুরো সংযম—অর্থাৎ প্রকৃতিকে এর দ্বারা পুরুষ তার মুঠোর মধ্যে রাখবে (বশিতা)।

সোমবার, ১১ জানুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন আমার ধারণা এই যে T.S.-এর (Theosophical Society) তত্ত্বের প্রধান কথা হলো পরিচালক গুরুস্বরূপ মহাত্মাদের অস্তিত্ব। একটা দিক দিয়ে এটি কিছু নতুন কথা (কর্ম, জন্মান্তর প্রভৃতি আর যা কিছু তা প্রাচীন দর্শনতত্ত্ব)। যাঁরা T.S.-এর নেতৃস্থানীয় তাঁরা বিশেষ করে বলেন যে তাঁরা ঐ সকল মহাত্মাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। কিন্তু (ক) যুক্তির দিক থেকে সেই সব সিদ্ধ সত্তা যাঁরা পূর্ণতা লাভ ক'রে মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের অস্তিত্বের কথা অযৌক্তিক নয় এবং অবশ্যই তা হতে পারে। এ কথা আমি মানতে পারি, তবে (খ) যারা তা বলছে তারা প্রবঞ্চক হতে পারে এ সম্ভবনা বাদ দিলেও তারা কেমন করে ঐ সকল মহাত্মাদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পারে—কেবল উচ্চ মার্গে নয় কিন্তু এই স্থূল পার্থিব স্তরে? HPB, HOS, CWL, এরা নাকি জীবন্ত মহাত্মাদের দর্শন পেয়েছেন। তাঁদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে তাঁদের T.S.-এর আধ্যাত্মিকতা এত কম কেন, নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শ সম্বন্ধে বক্তব্য ঠিক থাকলেও আধ্যাত্মিক দিকের কিছু নেই কেন? ওর মধ্যে এমন কিছু ভুল আছে যার কারণ জানিনা, আর সেইজন্যই আমি ওর থেকে সরে এসেছি (ওদের প্রচার, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি)।

এই সম্বন্ধীয় প্রশ্নটি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর ওর মধ্যে আলাদা আলাদা দুটি প্রশ্ন আছে। তার প্রকৃত জবাব মনের স্তরে মিলবে না, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকেই জানা যাবে। সে যাই হোক, আমি এইটুকু মাত্র বলতে পারি।

প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আমি বলব যে তুমি যাকে বলতে পারো পূর্ণ পরিণত মহাত্মা সত্তা যার 'কোনো কিছুই অজ্ঞাত নয়', এমন কেউ বাস্তবিক আছে কিনা তা বলা যায়না। কারণ অনন্তের মধ্যে জানবার কিছু বাকী থেকে যাবেই। যে বুদ্ধ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শেষ মানুষটি পর্যন্ত যতক্ষণ নির্বাণ না পায় ততক্ষণ তিনি পৃথিবীতে থাকবেন, তিনি গৌতম নন, তিনি অমিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঐ সব মহাত্মাদের সঙ্গে T.S.-এর নেতৃদের কিরূপ সংস্পর্শ ঘটে থাকবে, অর্থাৎ চৈত্য উপলব্ধি কিরূপ হয়েছে, তার বিচার। তাঁদের লেখাগুলি থেকে যার যতটা আধ্যাত্মিকতা তাঁদের হয়েছে তাই দেখে মনে হয় যে প্রাণময় স্তরকে তাঁরা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি—যাকে ওরা বলেন নাক্ষত্রিক (astral) স্তর। প্রবঞ্চনার কথাটা আমি ধরিনা। এখানে প্রথমত ভাবতে হয় এই যে ওর মধ্যে ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা কিছু আছে কিনা, অর্থাৎ আমরা মনের ইচ্ছাতে যেমন দেখতে চাই এ স্তরে দেখা হচ্ছে কিনা। ও এমন এক জটিলতার রাজ্য যেখানে সত্য আর মিথ্যা একাকার হয়ে যায়। সবই মনে হয় যুক্তিগ্রাহ্য ও স্পৃহণীয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়া।

HPB ছিলেন এক আশ্চর্য মহিলা, প্রবল বোধিবৃত্তিসম্পন্ন, কিন্তু যেখানে নিশ্চিত ব্যাপার সেখানে চৈত্যের সত্য কতখানি তার সঠিক বিচার করতে অক্ষম। আর তিনি তা চাননি। তিনি চেয়েছেন একটা আন্দোলন জাগাতে। সেই দিকেই তাঁর অদম্য উৎসাহ, একটা তত্ত্বকে জোরদার করে তুলে তারই প্রভাবের সমাক বিস্তার করতে থাকা, এটি প্রাণময় স্তরেরই কাজের বৈশিষ্ট্য। অনেক রকমের প্রভাবই এতে প্রযুক্ত হয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য যারা উন্নতিকামী মানুষ তাদের দলে নিয়ে যতীষ্টসিদ্ধি। কেবল দুর্বলমনা মানুষদের নিয়ে নয়, সকলকেই তারা হাত করতে চায় যাতে কাজটা আরো ব্যাপক হয়। HPB-র পরে এলেন A.B.। ইনি এসে প্রথমে HPBকেই অনুসরণ করলেন, তারপরে গিয়ে পড়লেন CWL-এর প্রভাবে। জীবনের একটা সময়ে তিনি একেই মানলেন ('যাকে তিনি এমন জ্ঞানদীপ্তি দিলেন') কিন্তু তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব কিছু না থাকাতে যতঃপর তিনি ওর থেকে ফিরলেন। প্রাণময় স্তরের একটা বিশেষত্ব এই যে ওখানকার উপলব্ধি যে পায় সে অন্যকে তা দিতে পারে। সাধারণ জীবনের আদর্শ ওখানে প্রয়োগ করা ঠিক নয়; অশরীরীবাদী ও মৃত আত্মার অস্তিত্ববাদী প্রভৃতিরা সেই ভুল করে। আমি অভিজ্ঞতার দ্বারা তা জানি। এই ভুলের আকর্ষণ এমনই জোরালো যে আমার কোনো কোনো পুরানো শিষ্য ঐদিকে চলে গেছে, চেষ্টা করেও তাদের ফেরাতে পারিনি। আবার কেউ কেউ চিঠি লিখে জানিয়েছে যে কি কি তারা দেখতে পেয়েছে; তারা

আমাকেও দেখেছে, আমি যেন তাদের ঐরূপ উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু তা আমিও নয় আর সে উপদেশও আমার নয়। এমন কি অনেকে একইকালে ঐ একইরূপ দৃশ্য দেখেছে, বর্ণনাতে কিছু পার্থক্য থাকলেও।

অপরপক্ষে যাঁরা তথাকথিত মহাত্মা ও উপদেষ্টা, তাঁরা যদি তেমন পূর্ণজ্ঞানী হন তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে ঐরূপ প্রভাবের দ্বারা কিরূপ কাজ হয় আর প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার কি মূল্য। তাঁরা তাঁদের ভক্তদের কেন এ বিষয়ে সতর্ক করেন না, আর কেনই-বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা এত কম? আমি এমন থিওসফিষ্টদের জানি যারা আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বন্ধে কিছু দীপ্তি পেয়েছে কিন্তু তবু তারা কেউ-ই সেদিকে সুনিয়ন্ত্রিত নয়। অপরপক্ষে যারা ঐরূপ মহাত্মা কর্তৃক পরিচালিত নয় তারা ওর চেয়ে অনেক আধ্যাত্মিক, যেমন যোগী প্রভৃতিরা।

ওদের যা আদর্শ তা মানসিক ও নৈতিক, তা আধ্যাত্মিক নয়। আর সেই নৈতিক আদর্শও এমন কিছু অসাধারণ নয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের বেলা সমস্ত মতামতকে ও মনগড়া জিনিসকে বর্জন করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। একটা কোনো সূত্র কিছুকালের জন্য কাজের হতে পারে, কিন্তু পরে তাই আবার অনিষ্টকর হতে পারে। আমার আধ্যাত্মিক জীবনে চল্লিশের পর থেকে আমি তিন চার বার আমার পূর্বনির্বাচিত পথকে বদল করেছি।

আমাদের কয়েকজন শিষ্যকে যে X থেকে ফিরিয়ে আনা গেলনা তার কারণ তাদের আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যেটা যোগীদের পক্ষে খুবই মারাত্মক, আর আমার মনে হয় যে থিওসফিষ্টদেরও ঐ কারণেই পতন ঘটেছে।

ওর মধ্যে যেটুকু আধ্যাত্মিকতার বীজ তা খুবই ছোটো, আর সেটুকুকে ঘিরে রয়েছে নানা ভ্রান্তির বোঝা ও চৈত্যের নক্সির। তাতে সময় সময় সেই বীজটুকুও বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়।

তোমার ঐ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি কেবল এই কারণে যাতে তুমি ভুলের আবরণ ভেদ ক'রে চৈত্যের পথে চলে আসতে পারো। মন বিশুদ্ধ থাকলে শতকরা হয়তো মাত্র একজন সে আবরণ ভেদ করতে পারে—নিজেকে খুশি করতে গিয়ে কোনো কিছুতে লিপ্ত হয়না। কিন্তু ওর মধ্যে বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা, ওর আকর্ষণের চাপ খুব জোরালো। ওকে প্রত্যাখ্যান ক'রে সত্যকে আঁকড়ে থাকতে যথেষ্টই ক্ষমতার দরকার। এইজন্যই তোমার প্রশ্নের জবাব দিলাম, নতুবা T. S.-এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, আমি তাদের মঙ্গলই কামনা করি। আমি তাদের বিরোধী নই।

ওদের মধ্যে যে কেউ কেউ মহাত্মাদের দেখা পেয়েছে তার মানে আছে। প্রাণময় স্তরের সত্তারা সুযোগ সুবিধা পেলে কিছু বাস্তব আকার পরিগ্রহ করতে পারে, জড়বস্তুর উপর তেমন ক্ষমতা তাদের আছে। অবশ্য সেরূপ যদি তারা সুবিধার জায়গা পায় তবেই।

প্রশ্ন কিন্তু যদি অন্তরেরা তাই পারে, তাহলে স্তরেরাও কি তা পারেনা ?

উত্তর অবশ্যই পারে, কিন্তু তারা সহজে তা করেনা ; খামখা কারো ঘাড়ে উপদেশের বোঝা চাপাতে তারা ব্যস্ত নয়। আর তা ছাড়া তেমন নির্দেশ পাবার মতো যথেষ্ট যোগ্যতাও থাকা দরকার—সত্যকে গ্রহণ করার মতো দৃষ্টি থাকা দরকার।

প্রশ্ন : প্রাণময় স্তরের প্রভাবে পড়ার মতো অবস্থা যদি হয় তবে নিশ্চয় তার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াও সম্ভব ? ঐ সব শক্তিরাও তো তাদের কিছু আইন মেনে চলে সেটা জেনে নিয়ে তার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে।

উত্তর : তা নিশ্চয়ই পারে। এমন কি মিথ্যা মায়াকেও তার আইন মেনে কাজ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে গুহ্যতত্ত্বের কথা এসে পড়ে, তা পিওলফিইটদের জিনিস নয়। গুহ্যবিদ্যার ব্যাপারে সমস্ত জেনে ও বুঝে কাজ করা হয়, কেবল মনকে খুশি করার কাজ নয়। তা অনেকটা বিজ্ঞানের রাজ্যে গিয়ে পড়ে।

শুক্রবার, ১৫ জানুয়ারি, ১৯২৬

প্রশ্ন আমার উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু খুবই কম। আপনি যেমন বলেছিলেন সেই ভাবে ইচ্ছাকে নিয়োগ করতে পারিনি। তা করতে গেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে যায়। আমি যখন নিজের মধ্যে একটা উঁচু অবলম্বন ধরতে যাই, সত্তার গভীর অংশকে জাগাতে যাই, তখন কেবল শূন্য লেগে, 'আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া' কিছুই হয়না। কিন্তু এদিকে সাধারণ জীবনে হয়তো যাহা উৎসাহ নিয়ে একটা কিছু ভালোভাবে করতে যাই, তার বেলা ঠিকই ফল পেয়ে যাই। কিন্তু ধ্যানের বেলা যদিও হয়তো ভিতরের অবস্থার উপর কিছু কাজ হয়, কিন্তু বাস্তব ফল কিছু দেখিনা।

উত্তর মানুষের উপরে ওঠার ব্যাপারে দুটি প্রধান শক্তির সাহায্য কাজ করে একটি হলো আত্মস্পৃহা, এটি ভাবধর্মী আর এর কেন্দ্র হলো নাভিদেশের স্নায়ুজালক। আর দ্বিতীয়টি অতিমানসিক, তার কেন্দ্র মাথার উপর দিকে। সাধারণ জীবনে যা তুমি করো তা ঐ প্রথমটির সাহায্যে। আর ধ্যানের সময় তোমার চেতনা চলে যায় উচ্চমানসে। তখন যে নীরবতার প্রয়াস করো তা কেবল নীরব হবারই জন্য নয়, কিন্তু যাতে ঐ উপরের শক্তি নেবে এসে আত্মস্পৃহার সঙ্গে যোগ দিতে পারে। উপমা হিসেবে বলা যায় ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা আর নিম্নাভিমুখী সূর্যের রশ্মির কথা। কিন্তু তোমার মন উপর দিকে চেতনভাবে

উঠে যেতে অভ্যস্ত নয়, তাই জানেনা যে কেমন ক'রে কি করতে হবে। ঐ সময়ে কোনো চেষ্টার জোর করতে নেই। তোমার পক্ষে দরকার কেবল অনড় হয়ে থাকা। অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা কেউ কেউ মাথার উপর দিকে ক্রিয়া করে সহজেই সেই শক্তিকে নামিয়ে আনতে পারে এবং পরে ইচ্ছা করলেই তা হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন : আমি যখন নীরব হবার জন্য তৈরি হই তখন দেখি যে আমার চেতনা দেহের সাহায্য নিয়েই তাতে কেন্দ্রস্থ হয়। পরে ক্রমে ক্রমে গভীরতার দিকে ডুবে চলে যায়। একটা সময় আসে যখন দেহের অবলম্বন ছেড়ে দিতে হয়। তখন চেতনাকে কোথায় একাগ্র করে লাগাব ঠিক পাইনা। তাই হয়তো তা বাইরের জিনিসের দিকে ফিরে আসে আর আমিও বাহ্য জগতের দিকে জেগে উঠি, কিংবা আধা-স্বপ্নের অবস্থায় গিয়ে পড়ি, যদিও চেতনা জাগ্রতই থাকে।

উত্তর চেতনাকে নির্দিষ্ট কোথাও লাগিয়ে রাখার দরকার নেই। উচ্চ চেতনার মধ্যে গিয়ে পড়লে দেখবে যে তা অতি বিস্তৃত, সমস্তকে ঘিরে রয়েছে, তার কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই। নিজে নিজে একটা জায়গা করে নিতে হয় (মাথার উপরে)। প্রথমে যা করতে হয় তা স্বাভাবিক তারপর নিজেকে ছেড়ে দাও। বাহ্য জগতের দিকে যখন চেতনা যাবে তখন দেখবে যে বাইরে যা কিছুই হচ্ছে, শব্দ কোলাহল ইত্যাদি, তুমি যেন তার ভিতরকার একটা অংশ। সব কিছুকে তোমার চেতনার অন্তর্ভূত ক'রে নিয়ে বলবে, "এর মধ্যে ঐ সব হচ্ছে।"

আধা-স্বপ্ন অবস্থাতে ভয় পেওনা, কিন্তু চেতনাকে সজাগ রাখবে, তাহলে তা ভিতরের দিকে চলে যাবে। কিন্তু মনকে নীরব করতে পেরেছ কি ?

প্রশ্ন হাঁ, প্রথম অবস্থাতে অবলম্বন নিয়ে তা হয়। কিন্তু অবলম্বন যখন ছেড়ে দিই তখন যে সব প্রতিচ্ছবি ভেসে আসে তাকে থামাতে পারি না।

উত্তর : কিসের প্রতিচ্ছবি ? যা কিছু আগে তুমি দেখেছ এবং তোমার জানা জিনিস তারই প্রতিচ্ছবি, কিংবা একেবারে অজানা জিনিসের ?

প্রশ্ন : ঠিক বলতে পারিনা। কোনো কোনোটি নতুন জিনিস মনে হয় কিন্তু হয়তো আবার তা কখনো কখনো আগে দেখে থাকবো।

উত্তর : তখন তুমি কি করো ?

প্রশ্ন সেগুলোকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করি।

উত্তর : তা করবে না। অপেক্ষা ক'রে কেবল লক্ষ্য করবে। হয়তো তা অলোকদৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। হয়তো অনেক দূরে কোথাও কিছু ঘটছে তাই তুমি দেখছ। বিজ্ঞানীর মন নিয়ে তা দেখবে। একটা বিশেষ দুর্লভ রকমের ক্ষমতা তোমার এসে যেতে পারে।

প্রশ্ন আমি শুনেছি তেমন ক্ষমতার কথা, কিন্তু অমন এলোমেলো ছবির দৃষ্টি থেকে তা এসে যেতে পারে এমন কথা ভাবিনি।

উত্তর হতে পারে যে ওটা তারই সূত্রপাত।

প্রশ্ন আপনি T.S.-এর সম্বন্ধে যে কথাগুলি বললেন তা খুবই যথার্থ। আমি বুঝেছি আর সব কথাই মেনে নিচ্ছি। একটা যে আকর্ষণ ছিল তা এখন কেটে গেছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার পিছনে যে শক্তি আছে যা আমাকে পথ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে বোধ করি, যাকে আমার দিশারী বলতে পারি (তার দেখা না পেলেও), যেমন কিছুকে ওরা মহাত্মা নাম দেয়—সে বস্তু বা সে শক্তি কী?

উত্তর এ সব প্রশ্নের জবাব কেবল মনের সাহায্যে মিলবে না। তোমার চৈত্য যখন উন্মীলিত হবে তখন তা নিজেই জানবে ও বুঝবে।

অমন হতে পারে। এ নিয়ে অনেক কিছু ব্যাপার আছে। উচ্চতর জীবনের জন্য যাদের আকিঞ্চন খুব তীব্র হয় তাদের ঐরূপ অনুভূতি আসে। তাদের মন ঐরূপ শক্তিকে আপন প্রবণতা ও পূর্বাভ্যাস অনুযায়ী একটা আকার দিয়ে নিজেকে তাতে আশ্রয়দান করে, যেমন খ্রীষ্টান হলে সে দেখে খ্রীষ্টকে ইত্যাদি। প্রথমত রয়েছেন পরম পুরুষ, যিনি বিশ্বশক্তি, যিনি সর্বনিয়ন্তা। তার নিচে অন্যান্য সকল স্তরেই আছেন মধ্যবর্তীরা। তারপর তোমার নিয়তি যাদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ ঘটাবে তারাও আছেন, তাঁদের প্রভাবও তোমার মধ্যে কাজ করবে, প্রায়ই তাদের অজ্ঞাতে। তোমার চৈত্য যখন উন্মীলিত হয়ে আধ্যাত্মিক স্তরে কাজ করবে তখন সবই তুমি জানবে। মন সে কাজ পারেনা।*

---

* BULLETIN OF S.A.I.C.E থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পথের কথা

মে ১৭, ১৯৬৯

ভক্ত : মৃত্যুর পরে ব্যক্তিত্ব কি বিলীন হয়ে যাবে ?

শ্রীমা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এই সব ধারণা...আমার কাছে তা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। আজ এই সারা সকালটাই...আর গত এক মাস ধরেই তা অনারকম।

লোকে যাকে ব্যক্তিত্ব বলে তা যেন...অন্ততপক্ষে মনের তলে তলে নিজের একটা বিশেষ পার্থক্য, তার আপন নিয়তি নিয়ে একটা আলাদা অস্তিত্ব ; কিন্তু এখন এই দেহচেতনাতে জানছি যে তা একটা তরঙ্গ-স্পন্দনের মতো যা সাময়িক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিকাশ পায়, কিন্তু আসলে তা মূল একটাই জিনিস ; কখনো বা সাময়িকভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একটা আকার নেয় (মা আঙুলগুলি ফাঁক করলেন)...আবার ইচ্ছানত গুটিয়ে গিয়ে (আঙুলগুলি জোড়া ক'রে) আকারটা লোপ ক'রে দেয়। বুঝিয়ে বলা শক্ত, কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে বরাবরের জন্য বজায় থাকবে সে ধারণা চলে গেছে। সমগ্র বিশ্বটাই পরম চেতনার একটা বাহ্যোৎক্ষেপণ মাত্র (অনুরূপ ভঙ্গী করলেন) ; আমাদের তেমন সামগ্রিক দৃষ্টি নেই বলেই মনে করি এটা বুঝি চিরস্থায়ী তা নয়, এ একটা ঢেউ ওঠার মতো, কি'বা...একটা ক্ষণায়ণ লীলা—বস্তুত সত্তা কেবল একই। সত্তা একমাত্র, চেতনা একমাত্র। আর এই যে স্বাতন্ত্র্য...ঠিক জানিনা কেমন ক'রে হলো, ওতেই আসলে যত কিছু গণ্ডগোল—আসলে এত রকমের অশান্তি ও দুর্গতি...এই দেহটা চলেছে এই কয়েকদিনের অনুভূতি-পরম্পরার ভিতর দিয়ে, ওড়িয়ে বলা যায় না এমন বহুরকম অবস্থার চেতনার ভিতর দিয়ে, এই স্থূল বাস্তব অনুভূতি থেকে শুরু ক'রে (মা হাতের চিমটিতে আপন গাত্রচর্ম তুলে দেখালেন) তার যত কিছু ব্যথা বিড়ম্বনা নিয়ে, যেন এই জড়বস্তুই প্রকৃত বাস্তব (পুনরায় অনুরূপ ভঙ্গী) এর থেকে শুরু করে পূর্ণমুক্তির অনুভূতি পর্যন্ত। ঘন্টার পর ঘন্টা এই যেহনত।

কিন্তু এরও আগে দেহকোষগুলির চেতনা গিয়ে পৌঁচেছিল মূল ঐক্যে, যা আসল কথা, এই সব মিথ্যা মোহ ঘুচে গেলে যা হবে সর্বময় ঐক্য। যে মিথ্যা এত হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে সে তার সমস্ত মারাত্মক বিভীষিকা নিয়ে এমন তীব্রতাবে আমার অনুভবের মধ্যে এলো যে তা নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠল...অনেক কিছু হলো যা ভয়াবহ। আর তার পরেই...মুক্তি।

এখন যা বাকী রইল, অর্থাৎ উপলব্ধিতে আসতে, তা হলো...সৃষ্টিক্রিয়ার অতঃপর যা গতি—মূল চেতনাতে ফিরে যাবার পরবর্তী ধাপ। সেই জিনিস, যা...

বোধকরি এটা নির্দিষ্ট করাই আছে যে কেমনভাবে তার শুরু হবে, নতুন কিছু অনুভূতির পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে (আপন দেহের দিকে ইঙ্গিত ক'রে)।

বিশ্বাসের গভীরতা ও সহ্যশক্তির উপর তা নির্ভর করে। এত রকমের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যাবার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

যাই হোক, আগেকার ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী এখন আর নেই, সব লোপ পেয়েছে।

এখন যা কিছু সবই ফিরে যাবার পথে ; এখনও সব কিছুর ভিতর দিয়ে যেতে হবে—তা একই রকমের নয়, নিত্যই এইভাবে এগোতে হবে...যতক্ষণ না সত্যে অবস্থিতি আসে। বলতে পারিনা তবে মনে হয় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যাওয়া হচ্ছে ; উচ্চ চেতনা এবার তৎপর হয়ে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিচ্ছে। চিমে চালে চলার সময় এখন আর নেই।

(বহুক্ষণ নীরব রহিলেন)

ভক্ত কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে আমি অহংএর কথা বলিনি ; আমি বলছিলাম এমন কিছুর কথা যা নানা জন্মের ভিতর দিয়ে বজায় থেকে ক্রমে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে যেতে থাকে।

মা ও, তা সেই পুরুষ সত্তা।

ভক্ত হাঁ, কিন্তু তারই থেকে বেরিয়ে একটা কিছু...

মা তাও সেই তিনি, নিজের সম্বন্ধে নিজেই চেতন।...

ভক্ত ও...

মা :...আংশিক ভাবে।

ভক্ত সেই কথাই বলছিলাম, এমন কিছু রয়েছে...

মা পুরুষ পুরুষ সেখানে তাঁর নিজের সম্বন্ধে আংশিক চেতন।

ভক্ত তাতেই তা ক্রমোন্নতির পথ নেয়।

মা হাঁ, তাই হলো ক্রমবিবর্তনের রীতি।

ভক্ত : হাঁ, তাকেই বলছিলাম একটা ব্যক্তিত্ব।

মা ঐ ভাবেই জানা হয়। সৃষ্টিক্রিয়ার এই রীতি। আর তাই দেখেই লোকে ভুল করে...

ভক্ত ব্যক্তিপার্থক্য বলে।

না পার্থক্য, আর অহং। কিন্তু একটা কিছু তো থাকেই, তার কখনো বিলুপ্তি হয়না।

(নীরব হলেন)

কী যে হবে তা জানিনা।

দেহটা তার নিজেকে নিয়ে আদৌ ভাবেনা, ঠিক এমনি হয়ে থাকে (হাত দুটি চিৎ ক'রে দেখালেন), আর সব সময়েই বলছে : "প্রভু তোমারই ইচ্ছা, তোমার যা খুশি...", আর আপন খুশিতে হাসতে হাসতে কেবল এদিক আর ওদিক (না হাত ঘুরিয়ে জগতের চারিদিকের ইঙ্গিত করলেন)...আশ্চর্য এই, এ দেহকে এমন চেতনা দেওয়া হয়েছে যার কালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই : বুঝতে পারলে, এখন আর অমন কোনো কথা "যখন এটা ছিল না" বা "যখন এটা থাকবে না" এ সব নয়...ও রকম একেবারেই নয়, এখন এমন কিছু যা শুধুই অগ্রগামী। প্রকৃতই অদ্ভুত জিনিস। আর এর সংবেদন, অনুভব, প্রতিক্রিয়া, সবই আগাগোড়া পাল্টে গেছে। সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

এমন একটা অবস্থা যাতে তুমি সর্বোচ্চ চেতনাতে রয়ে গেলে, তাতে আপনা হতেই পরমতম চেতনার সঙ্গে এক হয়ে গেলে, সকলেরই চেতনাকে নিজের ক'রে নিলে—এমনি অবস্থাই এখন এই দেহের স্বাভাবিক অবস্থা। স্বতঃস্ফূর্ত, চেষ্টাবর্জিত ও ছাড়া অন্য কিছুই হয় না। সুতরাং এর পরে কি হবে, কেমন করে তার ভাষা করা যায়? আমি তো জানিনা।

অভ্যস্ত যা কিছু তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এর চেতনা কি জানে যে বাস্তবে কি করা হবে?...বলতে পারব না। কিন্তু এই দেহটার তাই নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই প্রতি মুহূর্তে তার যা করবার তা ক'রে যাচ্ছে, বিনা প্রশ্নে। কোনো নালিশ নেই, পূর্বপরিকল্পনা নেই, কিছুনা, কিছুই না।

এই এখন অবস্থা। দেখা যাক কি হয়। কৌতূহলের কথা বৈকি।

মে ২৪, ১৯৬৯

খুব কঠিন কথা...ইংরেজীতে যেমন বলে, "তামাশা নয়"...সব কিছু ওলটপালট, সবই যেন বিকল বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। কিন্তু তবু স্পষ্ট দেখা যায় যে ঐ বিশৃঙ্খলা এগিয়ে চলেছে কোনো উচ্চতর শৃঙ্খলা আনার দিকে, যাতে এনে দেবে বিস্তার, এনে দেবে মুক্তি,—এ কথা মিথ্যা নয়।...কিন্তু সাধারণ সোজাসুজিভাবে কিছুই হচ্ছে না।

(নীরব থেকে)

দেহটা এমন চেতনাতে রয়েছে যাতে সে জানছে যে মৃত্যু এসে একটা পরিবর্তন ঘটাতে পারে—কিন্তু সেটা বিলোপ নয় (চেতনার)। তাহলে অধিকাংশ লোকের এই যে ভুল ধারণা, মৃত্যুর বিশ্রাম...(মা, যেন বোকামিতে অবাক হওয়ার মতো ভঙ্গীতে মুখে হাত চাপা দিলেন)। সে সান্ত্বনাও এতে নেই, অধিকাংশের পক্ষেই তা বিশ্রামের আরো বিপরীত। সেইজন্যই চাই আরো তীব্রতর প্রার্থনা "একমাত্র ভরসা, হে প্রভু তুমি!...একমাত্র অস্তিত্ব বলতে তুমি; এই স্বাতন্ত্র্য, এই ভয়ানক পার্থক্য যেন আর না থাকে।...সব পৃথকভাব মুছে গিয়ে তোমার যেমন ইচ্ছা তাই যেন হয়; তুমি পুরো সক্রিয় কিংবা পুরো নিষ্ক্রিয়, তাতে কিছু যায় আসেনা এই হোক বা ওই হোক, তাতে কোনো ইতরবিশেষ নেই; কেবল তুমি, তুমি, তাই হলেই হলো।"

এটি খুবই খাঁটি কথা (মা তাঁর হাত মুষ্টিবদ্ধ করলেন), আছে কেবলমাত্র এই একটি নিষ্কৃতির ভরসা—দুই নেই, অন্য কোনো সম্ভাবনা বা বেছে নেবার রাস্তা নেই, এই একমাত্র রাস্তা ছাড়া...যা আশ্চর্যের চেয়েও আশ্চর্য। বাকী যা...বাকী আর অন্য কিছুই সম্ভব নয়।

আর সমস্ত অনুভূতিই এখানকার (দেহ দেখিয়ে), মনের নয়, এই জড়দেহের।

আমি তাই দেখতে পাই, কারণ সকলের চেতনাই আমার কাছে উদ্ঘাটিত (কোনো তফাৎ নেই), তাই আমি দেখি অধিকাংশের বেলা, যখন খুব অসহ্য হয়ে ওঠে তখন: "ওঃ! একদিন, একদিন এর শেষ হবে" (তাই ধারণা)—কি ভুল! কি নির্বুদ্ধিতা।

(নীরব থেকে)

কিন্তু কেন? কেন?...দেহ থেকে থেকে উৎসুক হয়ে ওঠে কেন? এমন কেন? লোকের সঙ্গে যখন মেশে, তাদের দুঃখ কষ্ট ও ব্যথাবেদনার সংস্পর্শে যখন আসে, তখন বলতে থাকে কেন, কেন?...এ সব কিসের জন্য? এই সৃষ্টি যদি আশ্চর্য কিছুই হতে পারবে, যদি পরম চেতনার সঙ্গে এক হয়ে মিলতে পারবে, তবে এত ঘোরানোর কি দরকার (মা হাত দিয়ে গোল ক'রে ঘুরিয়ে দেখালেন)?

থেকে থেকে এই ভাব আসে। অবশ্য তার কোনো মানে হয়না, তাতে কিছু কাজও হয়না—যা ঘটে তা ঘটেই। কেন কেন বললেই তা বন্ধ হবেনা তুমি কেবল এইটুকুই করতে পারো, এমন কিছু উপায় খুঁজে বের করা যাতে এমন আর না হয়।

(নীরব থেকে)

আমি কেবল বুদ্ধ প্রভৃতিদের কথাই ভাবি: তাঁরা চেয়েছেন ভগবানের মধ্যে এমন বিলীন হয়ে যেতে যেন কোনো কিছুই আর না থাকে (নিজের মাথা দুহাত দিয়ে ধরলেন)।

তাঁদের মতটাই যে সত্য এ কথা বোঝাতে তাঁরা বলেন যে এ সমস্তই "ভ্রম" কিংবা মিথ্যা মায়া (মা হাসলেন). ভেবে দেখলেন না যে কি অসম্ভব কথা বলছেন, যেন স্বয়ং যিনি পরমেশ্বর তিনি কোনো ভুল মিথ্যা জিনিস গড়তে পারেন...আর তাঁর সেই

তুলকে ওপরে নিয়ে নিজেকে তার থেকে গুটিয়ে সরিয়ে নেওয়া : এই কথা বিশ্বাস করাবার জন্য যতই জোরালো যুক্তি তাঁরা আহির করেন ততই মনে হয় তাঁরা চোখের পাতা বুজিয়ে তার মধ্যেই রয়ে গেলেন।

(নীরব থেকে)

ভক্ত : আপনার দেহকে যেন মনে হয় বাস্তবিকই তা সমগ্র পৃথিবীর প্রতীকস্বরূপ।

মা সেই রকমই তো দেখায়।

ভক্ত তাই আপনার মধ্যে সব কিছুই আসে বিশুদ্ধি পেতে।

মা তাতে আমার কোনো সাধনা নেই।

ভক্ত তা ঠিক, তবে আমার এটা মনে হয় যে যা-কিছুই এসে একবার আপনার স্পর্শ পাবে তাকে আর তার পূর্বাবস্থায় ফিরতে হবেনা।

মা তেমনি দেখায় বটে, অসাধারণ কত কিছুই হচ্ছে। প্রকৃত অসাধারণ জিনিস প্রতি মুহূর্তেই শুনতে পাই। কিন্তু তাতেও কোনো সাধনা নেই বা আত্মগরিমাও নেই।

ভক্ত কিন্তু তাতে কাজ তো কিছু হয়।

মা হাঁ।

ভক্ত তাতেই বিশুদ্ধি আসে, জগৎ তাতে বিশুদ্ধ হতে পারে।

মা বিশুদ্ধ হবার জন্যে তার কোনো তাড়া নেই...কথাটা কেমন ক'রে বোঝাই...দিবারাত্র অবিরাম চলেছে এই প্রার্থনা "ওগো প্রভু, তোমার যা ইচ্ছা, যেমন তোমার খুশি" তুমি যা "চাও" সে কথা নয় কারণ তা এও নয় (ভিতরের দিকে ইঙ্গিত) আর ও-নয় (বাইরের দিকে ইঙ্গিত)। শুধু "তোমার যা অভিপ্রায়, যেমন তোমার মর্জি" এইটি কেবল এখনকার নিরন্তরের কথা।

(নীরব থেকে)

যাই হোক, পরম চেতনা একে সহায়তা করছে (স্পষ্টই দেখছি), পরিষ্কার এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে চলে যাওয়াতেই সমস্যার মীমাংসা নয়। এমন কি আগে যে ঔৎসুক্য ছিল জানতে যে কি হবে কি হবে, তাও এখন চলে গেছে : আর থেকে যেতে ইচ্ছা, তাও গেছে অনেক আগে। চলে যাবার ইচ্ছার সম্ভাবনা মাত্রেই...যাতে একটু দমবন্ধ ভাব আসে, সেটাও গেছে এই কথা জেনে যে তাতেও কিছু বদলাবেনা। সুতরাং এমন একটা মাত্র জিনিসই রইল, মেনে নেওয়া, পুরোপুরি মেনে নেওয়া। এই হলো কথা।

মে ২৮, ১৯৬৯

সমস্যার একমাত্র সমাধান, পরমেশ্বরের সাথে দেহের সরাসরি সংস্পর্শ, সাযুজ্য। আসল কথা তাই। কিন্তু এই যে সব দেহকোষ ...(বলতে পারিনা যে তা শুধু এই দেহটার বেলাতেই হচ্ছে কিনা, কারণ একে সকলের থেকে আলাদা কিছু অসাধারণ জিনিস বলে ধরিনা)...কিন্তু দেখছি যে এরা পুরো ধৃবিশ্বাস নিয়ে অনবরতই চেষ্টার পর চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে, সর্বক্ষণ যত কিছু দুঃখ ও ব্যথাবেদনার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে চলেছে...এই একমাত্র সমাধানের দিকে "তুমি, তুমি, একমাত্র তুমি"। এই জিনিসকে বৌদ্ধ প্রভৃতিরা তাদের চেতনাতে মায়া বলে তর্জমা করেছে, কিন্তু তা কেবল আধা-অনুবাদ।

সত্যিকার যা সমাধান তা হলো "আছো, আছো, তুমি আছো, একমাত্র তুমি", আর বাকী সব যত কিছু...কষ্ট, আঘাত, যন্ত্রণা...অন্ধকার।

তাহলে তাই—তাই হবে।...অন্ততপক্ষে শ্রীঅরবিন্দ তাকেই বলেছেন অতিমানস, যা সকল ব্যথাবেদনার বাইরে। একমাত্র তাই আছে। নতুবা সব কিছুই কঠোর।

ঐ আধা-সাস্ত্বায় আর চলবেনা...জানিনা, হয়তো এবার ঠিক পথ ধরার সময় এসেছে।

এই দেহটা তাই এমনি এক নির্দিষ্ট পন্থা নিয়েছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম সবই সইতে হবে, খুব বেশিরকম সইতে হবে—তাই অন্য কাউকে বলিনি এমন হতে, কিন্তু তবু এটাই বলতে চাই যে এবার ঠিক পথের সময় এসেছে। কি জানি।

মে ৩১, ১৯৬৯

পরশু রাত্রে আমি ছিলাম শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তিন ঘন্টারও বেশি, তাঁকে দেখাচ্ছিলাম যে অরোভিলের জন্য কি কি সব আসছে। সবই চমৎকার জিনিস। খেলাধূলার ব্যবস্থা, শিল্পকলার ব্যবস্থা, এমন কি নতুন রকম রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। অবশ্য সব কিছুরই চুম্বক প্রতীক হিসাবে। আমি তাঁকে দেখাচ্ছিলাম যেন বড় এক টেবিলের উপর সেগুলি সুশৃঙ্খলে সাজানো, তার সামনে বিশাল ভূমিখণ্ড। খেলাধূলা ও ব্যায়ামাদির জন্য কেমন আয়োজন হবে তাই বোঝাচ্ছিলাম। একটা ছোটো চুম্বকের মতো ক'রে সুস্পষ্ট ছক কেটে দেখাচ্ছিলাম —এখানে থাকবে এই সব জিনিস, ওখানে থাকবে এই সব মানুষ (মা দাবার ঘুঁটি সাজানোর মতো ইঙ্গিত করলেন)। এই সব দেখে তিনি বেশ খুশি হলেন। তিনিও বলছিলেন কিছু কিছু মোটামুটিভাবে (সেগুলি এখন বোঝাতে পারবনা)। তার মধ্যে ছিল শিল্পকলার চূড়ান্ত কল্পনা, বাড়িগুলি কেমন ক'রে গড়া হলে সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে, কি ভাবে তা গড়তে হবে। এমন কি রান্নাঘরগুলি এমন সুন্দর হবে, প্রত্যেকে সেখানে আপন আপন অধিকার সার্থকভাবে এনে ফেলবে। রাত্রে পুরো তিনটি ঘন্টা এই ভাবে কেটে গেল।...খুবই ভালো লাগছিল।

ভক্ত অথচ এখনকার বাস্তব জগতের যা অবস্থা সে তো একেবারেই উল্টোরকম...

মা (একটু ইতস্তত ক'রে) না...আমি ওখানে যা দেখলাম সে তো পৃথিবী ছাড়া অন্য কিছু নয়, তার মধ্যে বেশ সচেতন সঙ্গতি : সেই সব খেলাধূলার যা ব্যাপার, সেই সব শিল্পসৌন্দর্য ও সাজসজ্জার বাহার, নিপুণ খাদ্যব্যবস্থা, সমস্তই চেতন সঙ্গতিযুক্ত।

ভক্ত : কিন্তু এখানে এই পৃথিবীতে যেমন হচ্ছে তা যে একেবারে অন্যরকম...

মা না...

ভক্ত : আপনি না বলছেন ?

মা আজকে X এসেছিল...তাকে আমি বলছিলাম যে সূক্ষ্মদেহের রাজ্যে এই সব শিল্প ও খেলাধূলা ও খাদ্যাদির সুব্যবস্থা ঠিকঠাক তৈরি হয়ে আছে—কেল তা বাস্তবে নেবে এসে আকার নিতে যা বাকী তাকে বললাম, "এখন চাই কেবল এক মুঠো মাটি (মা তাঁর হাতটি কোষা ক'রে ধরলেন) যাতে চারা বসানো যায়।...ঐ মাটিটুকু পেলেই চারা ক্রমে আপনি গজিয়ে উঠবে।

(নীরব হলেন)

ভক্ত জানিনা এটা আমি ভুল অনুভব করি কিনা কিন্তু গত কয়েক মাস থেকে আমার বোধ হচ্ছে যেন পৃথিবীর উপর এমন ঘোর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে যা আর কখনো হয়নি।

মা হাঁ, হাঁ,—কিন্তু দুটোই তো রয়েছে। সত্যই তাই। এই অন্ধকার বিভীষিকা তো নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ হলো সেই ব্যাপার যার কথা শ্রীঅরবিন্দ বরাবরই বলতেন অন্ধকার সব চেয়ে প্রগাঢ় হবে যখন আলো আসার সময় হবে। এ হলো সেই অবস্থা, যা দারুণ বিপর্যয়ের মতো দেখাচ্ছে। আর চীনারা...

ভক্ত না, এ কথা কি আপনি জানেন যে পাশ্চাত্য জগতে যে সকল বইএর কাটতি এবং প্রভাব সব চেয়ে বেশি (কেবল প্রভাব মাত্র নয়, ওখানকার আধুনিক যুবকরা যা গিলে গিলে খায়) তা হলো মাও সে-তুংএর লেখা সব বই ?

মা তিনি কি বলেছেন তাতে ?

ভক্ত : তিনি বলেছেন যে প্রকৃত শক্তির জন্ম বন্দুকের নলের মধ্যে।

(মা চুপ ক'রে থাকলেন)

ঐ সব বইই এখন সর্বত্র পড়া হয়। শেষের দিকে যে বইটি সব চেয়ে বেশি সমাদর পেয়েছে তার নাম যেন "দুর্ভাগাদের কথা", তাতে প্রধানত বলা হয়েছে

নিছক বলপ্রয়োগের কথা জোর করে কেড়ে নিতে হবে। ওখানে সর্বত্র এই তত্ত্বেরই জয়জয়কার, স্কুল কলেজের ছেলেরা সকলেই তাই গলাবাজি করছে।

মা ও। বলপ্রয়োগের স্বপক্ষে সাফাই...

ভক্ত : ওটাই ওদের মূল প্রচারমন্ত্র।

মা : প্রাণময় সত্তার পুরোপুরি মুক্তবিকাশ।

ভক্ত : ঠিক তাই।

মা ও! তাইতেই আমি আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে অত সব ব্যাপার দেখছিলাম। আমি ভাবলাম...দেহটাকেই আমি দোষ দিচ্ছিলাম, বলছিলাম বেচারা দেহ, কেবলই খুবগত জিনিসের পুনরাবৃত্তি চায় যত সব বীভৎস ধারণা ও কল্পনা—কিন্তু তা তো ঠিক নয়, বাস্তবে যা ঘটছে তারই সম্বন্ধে অমন চেতনা...ও!

তুমি যা বলছ তা বাজে কথা নয়, গতকাল—আর তিন দিন থেকেই দেহটা দারুণ বিভীষিকা দেখে কাঁদতে লাগল (ভাবপ্রবণ এটা কোনো কালেই ছিলনা, বরং তার উল্টোটাই ছিল)...আগে কখনই অমন করে কাঁদেনি, কিন্তু এখন কেঁদে ফেললে,...আর গভীর আবেগের সঙ্গে বললে "হায় হায়, এ জগৎ এখনই আর আছে কেন?"...এমনই সে ব্যথা পেয়েছে, এতই ভয় পেয়েছে। কিন্তু তার পরেই সে তৎক্ষণাৎ তার জবাব পেয়ে গেল—ভাষাতে জবাব নয়, কেবল সামনে চেয়ে দেখলে একটা বিরাট আলোর বিশালতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তখন আর তার উপরে কোনো কথাই বলা গেল না।

কিন্তু কেমন ক'রে অমন উদার জিনিস এমন হয়ে দাঁড়াল?...কে বলতে পারে। এই প্রশ্নটাই আমার মধ্যে জেগেছিল "কেমন ক'রে যা ছিল পরমাশ্চর্য তা এমন ভয়ানক হলো?"

কিন্তু এর ভিতর থেকে আবার ওতে ফিরে যাবার কি রাস্তা তা জানিনা।...তা কি হবে ইস্তফা দিয়ে (কি বলি) কিংবা আত্মদান ক'রে (তাও নয়)? সমস্তই এত মেঘাচ্ছন্ন। এমনি কঠিন অবস্থাতে সারাদিন কেটেছে। আশ্চর্যের কথা, তখন মনে হলো যে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের তখনকার অনুভূতির কি পুনরভিনয় হচ্ছে, যাতে তিনি বলেছিলেন যে এর থেকে বেরিয়ে যাবার একমাত্র উপায় : নির্বাণ। আবার সেই সঙ্গে ঐ সত্য সান্ত্বনাটাও চেতনাতে এলো। বুদ্ধের সমাধান এক ধাপ মাত্র। তার পরের সমাধান (ওকে পার হয়ে) আরো আছে, যার সুনিশ্চিত অনুভূতি আমি পেলাম।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

কিন্তু তাহলে এই সৃষ্টিটা আসলে কী?...শুধু বিভেদ, তারপর কুটিলতা, তার পর নির্মমতা—হানি করব, নষ্ট করব—ব্যথা দেব, তাতেই সুখ, তারপর অসুখ, সটান পঙ্গু

ও মৃত্যু—বিনাশ। সবই এক ধারার অন্তর্গত। হলো কি তবে?...তখন অনুভূতি হলো যে সমস্তই অবাস্তব, মিথ্যা মায়ার ফাঁকি যা ওর কবল থেকে বেরিয়ে এলেই মিলিয়ে যাবে—কোনো কিছুই থাকবে না। এ তো অদ্ভুত কথা! আমাদের চোখে যা এমন দুর্দান্ত বাস্তব, এমন ভয়াবহ লাগছে, তার অস্তিত্বই নেই?...মিথ্যার খেলা! কেন? কিসের জন্য, কেমন ক'রে?

কিন্তু এত দীর্ঘকালের এই দেহ কখনো একটি বারের জন্যও এমন তীব্র ও সামগ্রিক ভাবে এই রকমের ব্যথা পায়নি...যেন এমনি...(মা আপন গলা চেপে ধরলেন)। কিন্তু আবার ঠিক তার পরক্ষণেই এলো...আনন্দ। সব যেন কোথায় ফুঁয়ে উড়ে গেল। আর যেন বলে গেল "এখনও নয়, এখনও নয়, এখনও সময় আসেনি।" কিন্তু ঐ সব ভয়াবহ কিছু যেন আদৌ ছিলই না।

শেষ পর্যন্ত তাহলে হয়তো কেবল এই পৃথিবীর বেলাতেই (ঠিক বলতে পারি না)—কারণ চাঁদে তো কোনো জীবই নেই। আর এই ধারণাটাই এখন প্রবল যে কেবল অসত্যের মধ্যে আছে বলেই এমন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ আর অবাস্তব। আমরা সকলেই নিমগ্ন রয়েছি এই মিথ্যা ও অবাস্তবের মধ্যে, তাতেই এমন। আর নির্বাণই এর সমাধান নয়, কেবল একটা ওষুধ মাত্র, (সাময়িক বলা যায় কি?) আর আংশিক মাত্র। আংশিক আরোগ্যদায়ক। আর তাও কেবল তখনকারই একটা প্রেরণা তার পরে তো আরো দীর্ঘ রাস্তা পড়ে আছে; উত্তরোত্তর আরো এগিয়ে দিতে হবে রূপান্তরের কাজ। এর পরে আসবে যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন অতিমানস। এক অবস্থা ছেড়ে অন্য অবস্থান্তর।

কিন্তু কেমন করে সেই পরিবর্তন আসবে? তা বলা যায়না।

ভক্ত সেদিন কিন্তু আমার স্পষ্টই এ অনুভূতি এসেছিল যে সমগ্র পৃথিবী একটা কালো ঘোমটা দিয়ে ঢাকা—মিথ্যা যার নাম। তাতেই ছেয়ে আছে এই পৃথিবীকে।

মা : হাঁ, হাঁ।

ভক্ত : আমি স্পষ্টই দেখেছি ঐ কালো আচ্ছাদন।

মা হাঁ, তাই বটে।

ভক্ত জগতের উপর থেকে ওকে উঠিয়ে ফেলতে হবে।

মা : (নীরব থেকে) কেবল যে ওর থেকেই এত আতংক, বিশৃঙ্খলা, জ্বালাযন্ত্রণা, সে কথা বলতে পারি না...আর তা ছাড়াও রয়েছে এই করুণা, যা অতি সুগভীর...। এই দেহটা অমন আর কখনই বোধ করেনি। ওতে একে বড় সঙ্কীর্ণ অবস্থায় এনে ফেলে-

ছিল—কয়েক ঘন্টার জন্য। কিন্তু যতঃপর সবই হয়ে গেল হাস্যময়, আলোকোজ্জ্বল, যেন পরম প্রভু এসে শিশুটিকে ভোলাচ্ছেন: "এই দেখ, আমি তো রয়েছি, সব কিছুর মধ্যেই রয়েছি, এই যে আমি নিশ্চয়ই আছি। বিশ্বাস করা শক্ত...কিন্তু দুই অবস্থার মধ্যে কোনো যোগ নেই।

এই সময়টিতে যখন দেহ বললে: "এ কি? বরাবর কি এই চলবে? এমনই ভাবে এ জগৎ, এখানকার সবাই, এখানকার সমগ্র সৃষ্টি এই ধারাতেই চলতে থাকবে?"...তার পরেই ঐরূপ জিনিস এলো। তাতেই হঠাৎ জানলাম, একেই বলা হয়েছে, কেউ তাই কখনো অনুভব করেছিল।

আর ওর থেকে নিষ্কৃতির যত কিছু কৃত্রিম উপায়—এমন কি নির্বাণ পর্যন্ত—পুরো-পুরি কাজের নয়। যে নির্বোধ "জীবনের শেষ" করছি ভেবে আত্মহত্যা করে, সে তো সকলের চেয়ে বেশিরকম নির্বোধ, কারণ তাতে আরো খারাপই হয়। ঐ উপায়টা থেকে শুরু ক'রে নির্বাণ পর্যন্ত (যাতে মুক্তিলাভ হবে বলা হয়), যদিও সবই বিভিন্ন স্তরের পন্থা, তথাপি তার বিশেষ কিছু দাম নেই।...যখন ঐ চিরন্তন নরকের ভাবটা এসেছিল, তার পরেই চেতনার অন্যরূপ অবস্থা এলো (অবস্থান্তর ছাড়া কিছু নয়)—যাতে আছে কেবল আলো, উচ্ছল ও সুন্দর, কেবল হর্ষানুভব ও কল্যাণ...যা অবর্ণনীয়। "এই যে, এই যে" বলতে বলতেই ফস্ ক'রে তা মিলিয়ে গেল। আর পরবর্তন চেতনার চাপ এসে জানালে "এবার হবে পরবর্তী ধাপ"। দেহটা এই সব কিছুই দেখতে পেলে।...এত যন্ত্রণা এর জীবনে হয়নি, এমন কি এখনই...

তা কি পরিমাণ?...জানিনা। কিন্তু মুক্তি যা এলো তা দৈহিকই, মানসিক নয়। তার মানে এখানকে ফাঁকি দিয়ে মুক্তি নয়, এরই মধ্যে এখানেই মুক্তি। তাই যে স্পষ্ট বোধ করলাম।

তবে কয়েক ঘন্টা দেহের খুব কষ্ট গেছে। সে তো সর্বদাই বলে "ঠিক আছে", তিরোধানের জন্য সে প্রস্তুত, কিন্তু...সে প্রশ্নই নয়, প্রশ্ন হলো কেমন ক'রে আরোগ্য আসবে তাই জানা।...আমাদের বুদ্ধি দিয়ে তা বলা অসাধ্য।

কিন্তু লুকোনো বা চাপা দেওয়া কিছু নেই, সবই হয়ে আছে। তবে কেন বিড়ম্বনা? কোন জিনিস তার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করছে? জানিনা। হয়ে আছে নিশ্চয়। তাছাড়া এ সব যা কিছু, মৃত্যু পর্যন্ত, সবই মিছে, অর্থাৎ যার আসলে অস্তিত্ব নেই।

ভক্ত: হাঁ, ঐ মিথ্যার আচ্ছাদন খুলে দিতে হবে।

মা: কেবল তাতেই যদি হতো তাহলে তো কোন কথা ছিল না।

ভক্ত: আমি বলছিলাম যে ঐ ভ্রান্ত মায়া যেন ঢাকনি চাপার মতো চেপে রেখেছে, তাকেই সরিয়ে দিতে হবে।

মা তা ঠিক বটে। কিন্তু কেবল কি পৃথিবীতেই? জানিনা, ওরা তো আরো উপরে উঠে দেখতে যাচ্ছে। আমার যতদূর মনে হয় এখানেই তা কেন্দ্রীভূত। এখানেই তার কেন্দ্র, এখানেই তার ক্রিয়া। হতে পারে সমগ্র সৌরমণ্ডল, ঠিক বলা যায় না।

(নীরব থেকে)

কিন্তু একা একা এর থেকে বেরোনো যায় না।

ভক্ত ও। কিন্তু মা, আপনি সেদিন বললেন "পায়ের উপর দাঁড়াবার সময় হয়েছে"। আরো বললেন "দেহটা তার নিজের দিক থেকে প্রস্তুত," কিন্তু অন্যেদের পক্ষে তা বললেন না, কেবল বললেন, "দাঁড়াবার সময় হয়েছে"।

মা হাঁ, সেই রকমই মনে হয়।

ভক্ত কিন্তু "পায়ের উপর দাঁড়ানো" কথাটার কি মানে?

মা অর্থাৎ দেহ এখনকার যে চেতনাতে রয়েছে তার বাস্তবতা নেই। এখনকার দেহকে প্রশ্ন করলে সে বলবে "জানিনা আমি জীবন্ত কি মৃত"। বস্তুত সেই অবস্থা, কয়েক মিনিট হয়তো ভাবে সে মৃত, আবার কখনো ভাবে জীবন্ত। এমনিই হয়ে থাকে। আর তা নির্ভর করে সত্যকে তার উপরে দেখতে পাওয়া বা না পাওয়ার উপরে।

(নীরব থেকে)

কিসের উপর নির্ভর? (নীরব থেকে) সকলেই যা-কিছু বলছে বা লিখছে বা অনুভব করছে তার মধ্যে এটাই দেখতে পাই যে, আমি মিথ্যা ও যা-কিছু হচ্ছে তারই ফলে— এমন কথা ভাবতে অধিকাংশ লোকই ভয় পায়। অনেকে লিখে জানিয়েছে যে তারা যখন দেখেছে যে হঠাৎ তারা কোনো শক্তির চাপ বা স্পর্শ বোধ করছে তখন ভীষণ ভয় পেয়েছে, জীবনের অবাস্তবতা অনুভব করেছে। এতেই বোঝা যায় যে কতখানি পথ চলতে বাকী আছে। আরো বোঝা যায় যে খুব তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা মিটে যাবার আশা করা নিতান্ত ছেলেমানুষি, যদি...যদি অবশ্য অন্যদিকে মোড় না ফেরে।

এখন যেমন চলছে এমনি ভাবে চলতে থাকলে...শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগে যাবে। তারপর অতিমানব আসবে একটা ধাপ মাত্র, তারও পরে আরো অনেক কিছু...

ভক্ত প্রতিবারেই কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এর একমাত্র সমাধান হবে আপনার নিজের দিব্যদেহ ধারণ করা, তখন সকলেই চর্মচক্ষে আপনাকে দেখবে—চোখে দেখে প্রত্যক্ষ জানবে যে ভগবানের স্বরূপ কেমন হতে পারে।

মা (হাসতে হাসতে) তাহলে তো বেশ সুবিধাই হয়ে যায়।

ভক্ত : এতে ক'রে তাদের সমস্ত ভুলই ভেঙে যেতে পারে।

মা হাঁ, সেটা ঠিক, কিন্তু তা কি হবে? যদিও এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে এক মত। তবে নিজের তাই হোক এমন ইচ্ছা আমার নেই, আমি ছাড়া অন্য কারো যদি তাই হয় তাতে আমার আনন্দই হবে।

ভক্ত অর্থাৎ তোমরা চোখে দেখে যাও যে ভগবান কেমন হতে পারে।

মা হাঁ, কেমন হয়েছে। (মুহূর্তক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে) কি অপূর্ব।

জুন ৪, ১৯৬৯

সেদিন তুমি যাবার পরে কথাটা নানারকম ভাবে সারাদিনই ভেবে দেখলাম... দিব্যদেহ ঘটে গেলে একটা কিছু সমাধান মেলে, এর মধ্যে যুক্তি আছে। কথাটা যখন তুমি বলছিলে তখন হঠাৎ আমি একটা নিরেট কিছু দেখলাম (যখন মা একদৃষ্টে চেয়েছিলেন)। তবে তাতে আমার ব্যক্তিগত কিছু ছিলনা।...এই দেহটার আদৌ তেমন কিছু কামনা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই বা তার জন্য আস্পৃহাও নেই, কিন্তু অমন কিছু হলে তাতে আনন্দ আছে বৈকি। অনেক লক্ষ্য করে দেখেছি, সে ভাব এক মুহূর্তের জন্যও আসেনি—এটার তাই হওয়া, বুঝলে? (আপন গাত্রচর্ম ধরে দেখিয়ে)। কিন্তু হোক ঐরূপ অবতরণ, অভিব্যক্তি—যে কোনো স্থানে, যে কোনো ব্যক্তিতে কিন্তু না, বাস্তবে কোথাও নেই কেবল সমাধান মেলে ওতে। এই পর্যন্ত।

চেতনা তাই লক্ষ্য করছিল, দেহেতে যদি এমন কিছু থাকে যা অমন আস্পৃহা করে তাতে প্রমাণ হতে পারে যে এ কাজ তার করবার ছিল। কিন্তু তখন আমি দেখলাম অদ্ভুত একটা হাসি (যা বর্ণনাতীত), সেই হাসি আমাকে বলে গেল...যার মানে এই হবে (ছেলে-মানুষি ভাষায় তর্জমা) "ও কাজ তোমার নয়!" ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। এতেই শেষ। তাই তখন ও ভাবনা ছেড়ে দিলাম। "ও কাজ তোমার নয়" অর্থাৎ তাই নিয়ে তোমায় ভাবতে হবেনা। এমনই হোক বা যেমনই হোক, তা তোমার ভাববার নয়। এই মোট কথা।

কিন্তু তাহলে এর কাজ কি হলো? তা এতই গভীর যে বলা যায়না—তা কেবলই : "টোই, টোই, টোই, তুমি, তুমি, তুমি।"...আর কিছু ভাষায় ব্যক্ত করা চলেনা। এক কথায় বলতে হলে—পরমেশ্বর তুমি। সকলের পক্ষে কিছুর পক্ষে এই একমাত্র কথা—খেতে ভগবান তিনি, শুতে তিনি, কষ্ট সইতেও তিনি। সব কিছুতেই ঐ (মা দুই হাত তুলে দেখালেন), নিতান্ত স্থিরভাবে, অটলভাবে।* —শ্রীমা

* BULLETIN OF S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

গোলকুণ্ডে—তোমার নামে

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রায় নিঃশব্দে তুমি আমায় ডেকে নিলে
কখন অজান্তে
ধুয়ে দিলে সব মলিনতা ;
সমস্ত আবিলতাও কখন দেখি
মুছে নিয়েছ আমার মন থেকে ।

তোমার নাম নিতে তবু রাত্রি হল ।

তোমার নামে জেগে উঠলাম গোলকুণ্ডে
তোমার দীর্ঘ অলিন্দে
আমার স্থবির চরণে বাজল দ্রুত চলার ছন্দ ;
কোন রহস্যালোক অনাবৃত হচ্ছে মনে হল—
মনে হল অদেখা জগতের দরজা খুলে যাবে।

উত্তর-দক্ষিণের দেয়াল-ভাঙা জানালায়
দেখলাম উদ্ভাসিত বিশ্বচরাচর ।
পুবের মর্মর দেয়ালে
নতুন সূর্যোদয় দেখতে চেয়ে—
দেখি নীমিলিত চোখ
মনোসমুদ্রে চেয়ে আছে ।

মত সীমা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

এই ভুবনের সীমা ছাড়াই
এই মাটিতেই প্রাণ
কে রাখে অম্লান ?
দূর আকাশে হাত তো বাড়াই
অবাক অফুরান
এ কার পরম দান ?

হারিয়ে যাবার আকুল ক্ষণে
কোথায় আপন জন—
দিঠির অন্বেষণ ;
অথৈ অশ্রু দুই নয়নে
স্বপ্ন বিস্মরণ
সবার আপন খুঁজে বেড়ায় মন ।

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

মাঝে দিন কয়েক সৈন্য বিভাগের কর্তারা আমাদের বোমাবর্ষণের জন্য উপযুক্ত কঠিন নিশানা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। সুতরাং বোমাবর্ষণে যাওয়া হইতে কিছুদিন অব্যাহতি পাওয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চিন্তে ছাউনিতে বসিয়া থাকাও চলে না। কিংবদন্তী আছে "কোন ঘোড়াকে একবার শুইতে দিলে পরে তাহাকে দৌড় করান কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।" সেইজন্য নানা রকমের অবস্থার মধ্যে সব সময় প্রস্তুত রাখার চেষ্টায় আমরা নিজেদেরই তালিম দিতাম। এই তালিম দেওয়ার অনুষ্ঠানগুলিকে আমরা খেলা হিসাবে লইতাম.—তাহাতে একাধারে অনুশীলন করা ও আনন্দ লাভ দুই-ই হইত।

একদিন কে কত নীচু দিয়া বিমান উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারি তাহার পরীক্ষা করা হইল। এ স্কোয়াড্রনের ফ্লাইং-অফিসার সত্যনারায়ণ বিমান-বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পূর্বে দক্ষিণ দেশের কোন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ভদ্রলোক খুব ধীর, স্থির ও ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। সবাই মনে করিত সব বিষয়ে এত মন্থরগতি হওয়ার কারণ তাঁহার সাহসের অভাব। কিন্তু মাটির উপর খুব নীচু দিয়া উড়িবার সময় দেখা গেল, তাঁহার ন্যায় এত নীচু দিয়া আর কেহই উড়িতে পারিল না। ভূমি হইতে মাত্র ইঞ্চি ছয়েকের ও কম ব্যবধান রাখিয়া তিনি কয়েকবার বিমান উড়াইয়া লইয়া গেলেন। প্রথমে যে দিক হইতে উড়িয়া গেলেন, ফিরিবার সময় তার বিপরীত দিক হইতে আসিলেন। একবারই যেমন করিয়া হউক উড়িয়া যাওয়া নয়। প্রত্যেকবারই ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, অসাধারণ সাহসের ও নিজের উপর অগাধ বিশ্বাসের পরিচয় তিনি দিলেন। এরপর তাঁহার সাহস সম্বন্ধে কোন দিন কোন প্রশ্ন কেহ তোলেন নাই।

আর একদিন ফ্লাইং-অফিসার কোচার তাঁহার নেভিগেটর-গানার বেতার-বার্তা-পরিবেশনকারী ওয়ারল্যান্ট-অফিসার মেননকে লইয়া আকাশে উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে হাজার আটেক ফিট উপরে উঠিয়া ঠিক বিমান বন্দরের উপরে বেগে উড়িয়া আসিলেন। বিমান বন্দরের ঠিক উপরে আসার সাথে সাথেই বিমানের গতি সোজা উপরের দিক ঘুরাইলেন। জঙ্গী-বিমান খেলা দেখাইবার কালে এই প্রক্রিয়ায় আকাশে চক্র অঙ্কিত করে। ইংরাজিতে এই খেলাকে লুপিং দি লুপ বলে। বোমারু-বিমান, জঙ্গী-বিমানের তুলনায় ওজনে অনেক বেশী ভারী। সেইজন্য বোমারু-বিমানে এই খেলা দেখান নিষিদ্ধ। নিষেধের আরও একটা কারণ আছে। বোমারু-বিমানের চালকদের অচঞ্চল হওয়া প্রয়োজন। বোমারু বিমানে সাধারণতঃ একের অধিক বৈমানিক থাকে। আকাশে চক্রাকারে ঘুরিতে গেলে,

বিমানে যতজন বৈমানিক থাকিবে, সকলকেই সম্পূর্ণ সতর্ক থাকিতে হইবে। নচেৎ চক্রাকারে ঘুরিতে গিয়া উপর-নীচ হওয়ার সময় বিমানস্থিত অন্য বৈমানিকরা বিষম বিপদে পড়িতে পারে। কিন্তু জঙ্গী-বিমানের ওজন অনেক কম এবং এঞ্জিনের শক্তি বিমানের ওজনের তুলনায় অনেক বেশী—এবং চালক ভিন্ন অপর কোন বৈমানিক বিমানে থাকে না। সেইজন্য জঙ্গী-বিমানে এই খেলা অনায়াসে দেখান যায়। বোমারু-বিমানে এই খেলা হইতেই পারে না। তথাপি সর্দারজী ফ্লাইং-অফিসার কোচার এই খেলা দেখাইতে গেলেন। কিছুটা দূর পর্যন্ত সোজা উঠিয়া যাওয়ার পর বিমানের উপর তাঁহার ক্ষমতা হারাইলেন। বিমান তখনও খাড়াই অবস্থায়। বিমানের এঞ্জিন উপরের দিকে আর পেট্রল এবং তৈলের আধার নীচে হওয়ার দরুণ এঞ্জিন এই সন্ধিক্ষণে পেট্রল অভাবে বন্ধ হইয়া গেল। এর পর বিমান সোজা নীচে মাটির দিকে পড়িতে লাগিল। বিমানের লেজ নীচে—এঞ্জিন উপরে এই অবস্থা হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। আমরা সকলে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম, বিমানের এইরূপ লেজ-নীচু অবস্থায় ভূমিতে পড়িতে কতক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হয়। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কথা মনে পড়িল। ক্যাম্পবেলপুরে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল চিথির বাড়ীর উপরে খেলা দেখাইতে গিয়া আর একজন সর্দারজী গোয়ালঘরে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বেলায় এঞ্জিন নীচের দিকে ছিল, এবারে এঞ্জিন উপরের দিকে আর লেজ নীচের দিকে। সেবারের বেলায় নেভিগেটর-গানার-বেতার-বার্তা-পরিবেশনকারী ছিলেন ওয়ারান্ট অফিসার ঘোষ। এবার যেমন। হঠাৎ একটি অসম্ভব কাণ্ড হইয়া গেল। বিমান উল্টাইয়া গেল এবং এঞ্জিন নীচের দিকে আসিল এবং মুহূর্তপরেই চালু হইল। তারপর ফ্লাইং অফিসার কোচার বিমান অবতরণের পর যখন স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন স্কোয়াড্রনের সকলেই তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য প্রস্তুতই ছিল। একটি মহামূল্য বিমান নষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়াছেন এই অজুহাতে, সকলে মিলিয়া স্কোয়াড্রনের নিজস্ব বিশেষ কানুন অনুযায়ী তাঁহাকে শাস্তি দিলেন। সর্দারজী ফ্লাইং অফিসার কোচার সে অপমান বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। দিন কয়েক পরে, একদিন বোমা বর্ষণে গিয়া আর ফিরিলেন না। বোমা বর্ষণের পর নিশানা তাক করিয়া গুলি বর্ষণ শুরু করিলেন। সমস্ত গুলি বর্ষণ শেষ হইলে, তাঁহার কাজ তিনি কত উত্তমরূপে সমাধা করিয়াছেন এই সংবাদ দেওয়ার জন্য সৈন্য বিভাগের কর্তাদের ছাউনিতে গেলেন। কার্য্য উত্তমরূপে সমাধান হইয়াছে এই সংবাদ একটি চিরকুটে কাগজে লিখিয়া বার্ত্তাবহনের থলিতে পুরিলেন এবং সৈন্যবিভাগের ছাউনির সম্মুখে যেখানে বিমান হইতে বার্ত্তাবহনের থলি ফেলার জন্য স্থান অঙ্কিত করা থাকে, সেইদিকে বিমান সোজা অবতরণ করাইয়া, বার্ত্তাবহনের থলি ফেলিলেন; তখন বিমানকে মাটির এত নিকট পর্যন্ত অবতরণ করাইয়াছিলেন যে, বিমান ঘুরাইয়া আকাশে উঠিবার অবকাশ রহিল না। সম্মুখে ঘন

জঙ্গলে, এক বৃহৎ বৃক্ষের সহিত ধাক্কা খাইয়া পড়িল। সেদিন বিমান সহিত দুইজন বৈমানিক আমাদের ছোয়াড্রন হারাইল।

এর পর কিছুদিন পর্য্যন্ত উদয়বন্ধ হইতেই আমাদেকে বোমা বর্ষণে যাইতে হইত। উদয়বন্ধ হইতে কুষ্টিগ্রামে যাইবার প্রয়োজন তখন ছিল। একদিন প্রায় বেলা দুটায় সময় সৈন্য বিভাগের কর্ত্তাদের নিকট হইতে জরুরী তলব আসিল। আমাদের বিমানগুলি সব সময় প্রস্তুত করিয়াই রাখা হইত—বৈমানিকরাও সাজ-পোষাক করিয়া বিমানের নিকটেই সময় অতিবাহিত করিত। হুকুম-আসা মাত্র যাহাতে গন্তব্য-স্থলের দিকে যাত্রা করা যায়। হুকুম আসার দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই বার-খানা বিমান এঞ্জিন চালু করিয়া বিমান-অবতরণ-পথের দিকে আগাইয়া চলিল। উদয়বন্ধ বিমান বন্দরের অবতরণপথ ছিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি। উত্তরদিকে জেলা-পরিষদের দশ-বার ফুট চওড়া-পথ পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি ছিল। এই জেলা পরিষদের পথের পরেও প্রায় দুইশত গজ পর্যন্ত অবতরণপথ বিস্তৃত ছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে উদয়বন্ধের অবতরণ-পথটি কিছুদিন পূর্ব্বেও ধানক্ষেত ছিল। এখন ধানক্ষেতটি কেবল মাত্র একটু সমতল করা হইয়াছে। আর কিছুই করা হয় নাই। অবতরণ-পথ নির্ম্মাণকারীরা কেন যে জেলা পরিষদের পথটিকে বিমান বন্দরের এলাকার মধ্যে, একেবারে অবতরণ-পথের উপর একধারে রাখিয়া দিয়াছিলেন, পথের উচ্চতা কাটিয়া অবতরণ-পথের সাথে সমতল করেন নাই, তাহা বলা মুস্কিল। জেলা-পরিষদের পথের উপর দিয়া গ্রামবাসীরা এবং গোশকট যাতায়াত করিত। আমাদের বিমানগুলি আকাশে আরোহণ বা আকাশ হইতে অবতরণ করার কালেও অনেক সময় এই পথ ব্যবহৃত হইত। বহুবার দেখা গিয়াছে জেলা-পরিষদের পথ দিয়া গোশকট চলিয়াছে, এবং সেই সময় আমাদের কোন বিমান আকাশে আরোহণ করিতেছে গোশকটের উপর দিয়া বিমান পার হওয়ার সময় শকটের গরুগুলি উড়ন্ত বিমানের ভয়ে যে সব কাণ্ড করিত তাহা দেখিয়া বৈমানিকরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিত না।

এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বিমানগুলি, বেগে দৌড়াইয়া আসিয়া জেলা-পরিষদের পথের কিছু পূর্ব্বেই ভূমি ত্যাগ করিয়া আকাশে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত।

ঐ দিনও একটা একটা করিয়া এগারখানা বিমান উড়িয়া গেল। বার নম্বর বিমানের চালক ফ্লাইং অফিসার এঞ্জিনীয়ার, আর তাঁহার নেভিগেটর-পানার বেতার-বার্ত্তা পরিবেশন-কারী হইলেন ওয়ারান্ট-অফিসার ঘোষ। মনে থাকিতে পারে ওয়ারান্ট অফিসার ঘোষ পাইলট অফিসার লতিফ খানের সাথে ছিলেন। মুখে তাঁহার হাসি সর্ব্বদাই, যেন সব ব্যাপারই মজা মজার ব্যাপার। এঞ্জিন সম্পূর্ণ বেগে চালু করিয়া ফ্লাইং অফিসার এঞ্জিনীয়ার বিমান অবতরণ-পথের উপর দিয়া দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে আগাইয়া চলিলেন। যে কারণেই হউক জেলা পরিষদের পথের অতি নিকটে আসিয়া, সেই দিন ফ্লাইং অফিসার এঞ্জিনীয়ার বিমান ভূমি ত্যাগ করিল, এবং ধীরে ধীরে আকাশে আরোহণ করিতে লাগিল।

সম্মুখের চক্র-সমেত পদদ্বয় কিন্তু সময় মত বিমানের মধ্যে গুটাইয়া উঠিল না। মুহূর্তমধ্যে পদদ্বয় জেলা-পরিষদের তিন ফিট উচ্চ পথের সহিত ঠক্‌কর খাইল এবং বিমান জেলা-পরিষদের পথের অপর পার্শ্বে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। বিমানের খোলের মধ্যে দেড় হাজার পর্যন্ত ওজনের বোমা ঝুলান অবস্থায় রহিয়াছে, আর সেই সঙ্গে আছে অজস্র অটোমেটিক ব্যালের বন্দুকের গুলি। যদি বোমা বিমানের খোল হইতে পড়িয়া যায় ও বিস্ফোরণ হয় বা কোনও প্রকারে ব্রাউনিং মেশিন গানের একটা গুলি ফুটিয়া গিয়া বোমার ফিউজে লাগে, তবে বিমানস্থিত দুইজন বৈমানিকই শুধু নয়, সমস্ত উদরস্থ বিমান বন্দর এবং গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইলেও আশ্চর্য্য হওয়ার কোন কারণ থাকিবে না।

দৌড়াইয়া বিমানের দিকে চলিলাম। বেশী দূর পর্য্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হইল না। ভোলা সহজ নয়। দুইজন বৈমানিক কুম্ভের মত পৃষ্ঠের উপর প্যারাস্যুট-ঝোলা-ভারে ন্যুব্জ দেহে পরিত্রাহিভাবে বিমান ত্যাগ করিয়া জেলা-পরিষদের রাস্তার দিকে দৌড়াইতেছেন যেন যে-কোন প্রকারেই হউক তিন ফিট উচ্চ জেলা-পরিষদের পথ তাঁহাদের অতিক্রম করিতেই হইবে। ঐপথ অতিক্রমেই তাঁহাদের বিপদের ত্রাণ। সেই দৌড়ের গতিবেগ যে-কোন শতনিটার দৌড়বাজের গতিবেগকে হারাইয়া দিবে। তিন ফিট উচ্চ পথ পার হওয়া মাত্র, তাঁহারা দুইজন ভূমির উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। বিপদের কাজ সম্পন্ন করিয়া আসিবার পর যেমন সকলেই হাঁপাইয়া পড়ে এবং জীবন 'এযাত্রার মত বাঁচিয়া গেল' বলিয়া শান্ত হওয়ার চেষ্টা করে, এঁদেরও সেই অবস্থা।

ইতিমধ্যে জেলা-পরিষদের পথের এ-পাশে, তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া গিয়াছি। বিমানের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া এবার তাঁহাদেরকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, হৃৎপিণ্ড সামান্য বেশী দ্রুততালে চলা ছাড়া তাঁহাদের দেহ ও মন অক্ষতই আছে। এতক্ষণে স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরী আসিয়া পড়িয়াছেন। ফ্লাইং অফিসার এঞ্জিনীয়ারের পৃষ্ঠে বিরাশী সিক্কার এক চড় বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উড়িতে যাইবে নাকি? এবং কাহারও কোন বক্তব্য ব্যক্ত করিতে না দিয়াই, অন্য একটি বিমানে দুইজনে উঠিলেন। অবিলম্বে আকাশে আরোহণ করিয়া বিমান বন্দরের চারিদিকে কয়েকবার চক্‌কর দিয়া ঘুরিলেন। পরে বিমান অবতরণ করাইয়া ওয়ারাণ্ট-অফিসার যোগসহ ঐ বিমানেই ফ্লাইং-অফিসার এঞ্জিনীয়ারকে নিশানার দিকে পাঠাইয়া দিলেন। স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের এই ব্যবহারের একটি খুব সূক্ষ্ম কারণ আছে। তখনই আবার উড়িয়া যাওয়াতে বৈমানিকের মনে কোন ভীতি গাঁথিয়া বসিতে পারিল না। কারণ ভীতি একবার মনের মধ্যে বাসা বাঁধিলে, সেই ভীতি হইতে সহজে নিস্তার পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীকে সেইজন্য সকলেই ভালবাসিত ও সমীহ করিত। তিনি যেন সব সময়েই সাথে থাকিয়া হাত ধরিয়া সকলকে লইয়া চলিতেন।

উদয়বন্ধে বিরাটকায় সাপ দেখিয়াছি। তার মধ্যে দুটি গল্প উল্লেখযোগ্য। উদয়বন্ধে এক মুসলমান গৃহস্থের গৃহই আমাদের বসতির হইয়াছিল। সেই গৃহের বসুই ঘরের পাশে একটা প্রায় জলহীন ডোবা ছিল। সামান্য একটু জলকাদা ছিল একেবারে দশ-বার ফুট নীচে। ডোবার চালুতে একদিন সকালে একটি বিরাট হলুদ আর কালো রংয়ের ডোরাকাটা সাপ দেখা গেল। রংটি তাহার ডোরাকাটা বাঘের তুলনায় অনেক সুন্দর ও উজ্জ্বল। আমরা যখন দেখিলাম তখন সাপটি তাহার আহারে খুবই ব্যস্ত। ভক্ষ্য জীবটি আর একটি সর্প। ডোরা-কাটার তুলনায় কিছুটা ছোটই হইবে। এই রাজকীয় আহার দেখার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক ও গ্রামের গৃহস্থেরা জমায়েৎ হইল। ডোরাকাটা অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরেসুস্থে তাহার আহার সমাধা করিয়া ধীরগমনে সরিয়া পড়িল। এই সরিয়া পড়াটা আমাদের মনঃপূত হইতেছিল না। কিন্তু গ্রামবাসীদের অনুরোধে সেদিনকার মত আমরা হিংসা বর্জন করিয়া সাধু হইলাম।

আর একদিন জীপ গাড়ীতে উদয়বন্ধ হইতে কুম্বিগ্রাম যাওয়ার পথে পাহাড়ের ঢালু রাস্তার উপরে এক বিরাটকায় গোক্ষুরা সর্প দেখিতে পাওয়া গেল। যতবার জীপ গাড়ীর চাকার নীচে তাহাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম। ততবারই সে বিদ্যুৎবেগে সরিয়া গেল, কিন্তু পথ ছাড়িল না বরঞ্চ গাড়ীর দিকে ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই প্রকার খেলার পর তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলি নিক্ষেপ করা হইল। গুলিতে মস্তক চূর্ণ হইয়া তাহার মৃত্যু হইল। জীপে করিয়া কুম্বিগ্রামে লওয়ার পর মাপিয়া দেখা গেল যে সর্পটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে ছয় ফিটের উপরেই ছিল।

কুম্বিগ্রামে শিকার করার প্রচুর সুবিধা ছিল। চাষাগানের দিকে গেলে ডোরাকাটা ও গোল চন্দ্রবের সাক্ষাৎ পাওয়া মোটেই দুষ্কর ছিল না। নানাজাতীয় পাখীর মধ্যে এত হরিতাল আর কোথাও দেখি নাই। বনাকুক্কুটের কথা বলাই অনাবশ্যক। বনজঙ্গলের মধ্যে সামান্য দূরে অগ্রসর হইলেই তাহাদের সাক্ষাৎ মিলিত। যেমন বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তাহারা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত, তেমনি ছিল তাহাদের বর্ণ-সমাবেশ। বিমান-বাহিনীর কর্তারা তাহাদের ফৌজে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করে, সেইজন্য বনা-কুক্কুট অতি নিকটে পাইয়াও কখনও সেগুলির প্রাণ হরণ করিতে ইচ্ছা হয় নাই। শুধু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ করিয়াছি। কয়েকটি কুক্কুটিনীর সাথে একটি কুক্কুট। কুক্কুট বর্ণচ্ছটার অতুলনীয়—কুক্কুটিনীগুলি হইতে অনেক সুন্দর। সাথে কয়েকটি নানা আকারের শাবক। কুক্কুট সদাই জাগ্রত। চতুর্দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি। যদি কখনও কোন অবাঞ্ছিত বা অজ্ঞাতবস্তু দৃষ্টিতে পড়িল, অমনি সে তাহার সঙ্গিনী ও শাবকগুলিকে সাবধান করিয়া দিল। সাবধান করার জন্য গলার স্বরে নূতন আওয়াজ সৃষ্টি করিল। সেই কুক্কুক্কু আওয়াজ শোনা মাত্র সকলেই সরিয়া আড়ালে গেল। সে নিজেও কিঞ্চিৎ আড়ালে গেল কিন্তু অবাঞ্ছিত বস্তুকে দৃষ্টির একেবারে বহির্ভূত করিল না। সঙ্গিনী ও শাবকদের নিরাপত্তার জন্য সে নিজেই দায়ী।

কিছুদিন পূর্বে পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজেও এইরূপ ব্যবস্থা কায়েম ছিল। গৃহকর্ত্তাই ছিলেন সমস্ত গৃহবাসীদের কর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, অন্নদাতা। মনুষ্য-সমাজ এখন ধীরে ধীরে নূতন গঠন, নূতন আকার, নূতন ব্যবস্থা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। বন্য-কুক্কুটের সমাজে পূর্ব্বেকার ব্যবস্থাই এখনও চালু রহিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে সমাজশৃঙ্খলার পরিবর্ত্তনের দাবি আসিতে এখনও হয়ত কিছুদিন বাকী আছে। ততদিন পর্য্যন্ত বন্য-কুক্কুট-সমাজে গৃহ-কুক্কুটের অধিকার পূর্ণরূপেই বজায় রহিবার সম্ভাবনা।

উদয়বন্ধে কুক্কিগ্রামে থাকাকালে নানাপ্রকার সুখাদ্য প্রচুর পরিমাণে মিলিত। মিলিত না শুধু মিষ্টদ্রব্য এবং গোদুগ্ধ। গোদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ক্যানাস্তারা টিনে বোম্বাই গুঁড়া-দুগ্ধ পাওয়া যাইত। সে দুগ্ধে গোদুগ্ধের সুমিষ্ট স্বাদ বা সুঘ্রাণ পাওয়া যাইত না। চা-কফি ব্যতিরেকে সেই গুঁড়া-দুগ্ধ কেহই পান করিতে উৎসুক ছিল না। সেই দুগ্ধে প্রস্তুত মিষ্টান্ন তত সুস্বাদু হইত না।

ফ্লাইং অফিসার সত্যনারায়ণ ছিলেন নিরামিষ আহারী। প্রত্যহ দ্বি-প্রহরে অন্যান্য নিরামিষ খাদ্যদ্রব্যগুলির সাথে তিনি দধির অভাব খুব বোধ করিতেন। কয়েকবার গুঁড়া-দুগ্ধ দিয়া মেসে দধি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু গুড়াদুগ্ধে প্রস্তুত দধির স্বাদ গোদুগ্ধে প্রস্তুত দধির তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। সেইজন্য গুড়া-দুগ্ধে প্রস্তুত দধিতে গো-দুগ্ধে প্রস্তুত দধির স্বাদ মিলিত না। অগত্যা ফ্লাইং অফিসার সত্যনারায়ণ বিনা দধিতেই তাঁহার মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত করিতেন।

একদিন ধীর শান্ত ফ্লাইং অফিসার সত্যনারায়ণ খুব ব্যস্ত হইয়াই মেসে আসিলেন এবং বেশ আনন্দের সাথে জানাইলেন যে এবার হইতে মেসে প্রত্যহ দধি সরবরাহ করিতে তিনি সক্ষম হইবেন। কারণও তিনি জানাইলেন—বেশ ধীর এবং সংযত ভাবেই। যদিও মেসের সকলেই খুব উদ্‌গ্রীব হইয়াই তাঁহার আশ্বাস-বাণী শুনিতেছিলেন, এবং দধি মিষ্টান্ন পাওয়ার লোভ সংবরণ করার চেষ্টা করিতেছিলেন। সত্যই আমাদের দেশে বোধহয় খুব কম সংখ্যক লোক আছে যাহাদের দধি, মিষ্টান্ন, রসগোল্লার প্রতি লোভ নাই।

তাঁহার কথায় জানা গেল, মাইল দশেক দূরে এক ঘোষ ভদ্রলোক পূজাকালে বাংলা দেশ হইতে এদেশে আসিয়া "বাথান" করিয়াছিলেন। বাথান কথার মানে কোন নদীর বিস্তীর্ণ চড়ায়, যেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সবুজ ঘাস জন্মে, সেখানে গোরু-মহিষের পালন। এক এক বাথানে হাজার সংখ্যক গো-মহিষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। বাথানে দুগ্ধের দাম নাই। প্রত্যহ যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহার সামান্য অংশই দুগ্ধ আকারে বিক্রয় হয়। দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত-মাখন-ক্ষীর ও নানা প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্নই বাথানের প্রকৃত দান।

ঘোষ মহাশয়ের নিকট বহু গো ও মহিষ আছে। দুগ্ধ না-লাগা পর্যন্ত চিনি প্রচুর পরিমাণে তাঁহার মিলিত এবং সেই চিনি সহযোগে তিনি দুগ্ধের নানা প্রকার সুস্বাদু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া ঐ দেশের নানা স্থানে ও বিদেশের নানা সহরে বিক্রয় করিতেন। কিন্তু যুদ্ধ লাগার কিছুদিন পর হইতে চিনির অভাব হইয়াছে। এবং তাঁহার বাথান হইতে লব্ধ দুগ্ধে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করার আর উপায় নাই, এবং প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ তাঁহার বাথানে হওয়া সত্ত্বেও তাহা বিক্রয় করার কোন পন্থাও তিনি খুঁজিয়া বাহির করতে পারেন নাই। এমত অবস্থায় বিমান-বাহিনী যদি তাঁহার বাথান হইতে খাঁটি গো-মহিষের দুগ্ধ ক্রয় করে তাহা হইলে তিনি বাঁচিয়া যান। জানিতে ঘোষ, সেইজন্য অতি উত্তম দধি প্রস্তুত-প্রণালী তাঁহার জ্ঞাত ছিল। আমরা তাঁহাকেই দধি প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলিলাম।

প্রথমে দধি দধির পর পাতক্ষীর; এবং পাতক্ষীরের পরেই রসগোল্লা। তারপর পান্তুয়া। ধীর পদক্ষেপে ক্রমে ক্রমে উচ্চস্তরে আরোহণ। কিন্তু বাধা হইয়া দাঁড়াইল চিনি। চিনির অভাব। চিনি ব্যতিরেকে রসগোল্লা-পান্তুয়া কোনটাই হওয়া সম্ভব নয়। মেস্ সেক্রেটারীকেই শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিতে হইল। মীমাংসা খুবই সহজ হইল। আমাদের মেসে বস্তা বস্তা বড় দানার চিনি আসিত। গৃহস্থের ঘরে চিনির অভাব হইলে কি হইবে, বিমান-বাহিনীর মেসে বস্তা বস্তা চিনি। চিনি না খাইলে যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবার জন্য হৃদয়ে বল পাইবে কেমন করিয়া? সেইজন্যই বোধহয় গৃহস্থের বেলায় চিনির অভাব আর যোদ্ধের বেলায় চিনি বস্তায় বস্তায়। বিমান-বাহিনীর মেসে সেই বস্তা-বোঝাই বড় বড় দানার চিনি দিয়া প্রত্যহ মিষ্টান্ন ও চা প্রস্তুত হইত।

খাদ্য-গুদাম ঘরে একজন ধর্মভীরু পাঠান মুসলমান বাবুর্চিকে রাখা হইয়াছিল। সে নিজে কিছু চুরি করিত না এবং খাদ্যদ্রব্যের যাহাতে অপচয় না হয় সেই দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিত। বড় দানা এক বস্তা চিনি ঘোষ মহাশয়কে দেওয়ার জন্য মেস্ সেক্রেটারী মোল্লা বাবুর্চিকে হুকুম করিলেন। অবসর মত মোল্লা বাবুর্চি এক বস্তা বড় দানা চিনি ঘোষ মহাশয়কে দিলেন। পরদিন দুপ্রহরে আমরা সকলেই বেশ আনন্দেই মেসে আসিলাম।

এ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহই চাউল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে গুঁড়া দুগ্ধ এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া দুপ্রহরের জন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। আজ সকলেই আনন্দিত। মিষ্ট কিন্তু স্বাদহীন চাউল-গুঁড়া-দুগ্ধ-চিনি মিশ্রিত মিষ্টান্নের পরিবর্তে আজ সুমধুর রসগোল্লা মিলিবে। রসগোল্লা যে কি অপূর্ব বস্তু তাহা আমরা প্রায় ভুলিয়া যাইতেই বসিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। ঘোষ মহাশয় বহুদিন পূর্বে এখানে আসিয়া গো-মহিষের বাথান করার জন্য হয়ত নানা কারণ থাকা সম্ভব, কিন্তু প্রধান কারণ এতদিনে বোঝা গেল। রসগোল্লা, পান্তুয়া, দধি, নানা প্রকার সুমিষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আমাদেরকে খাওয়ানই হইল প্রধান কারণ। সেইজন্যই ঘোষ মহাশয় এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ছিলেন: এইবার তাঁহার জীবন সার্থক হইতে চলিল।

অন্যান্য দ্রব্য আহারের শেষে ডিসে করিয়া রসগোল্লা আসিল। চেহারা রসগোল্লার মতই। রসে পরিপুষ্ট। প্রথমে কাহার বিলিয়াছিল মনে নাই। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সকলেই আশ্চর্য্য এবং ক্রুদ্ধ হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। রসগোল্লাগুলি মিষ্ট কিন্তু ছিল। কিন্তু মিষ্ট আমাদের তুলনায় লবণের আস্বাদ ছিল অনেক প্রখর। ঘোষ মহাশয় নিকটেই ছিলেন—তারিফ পাইবার আশায়। কিন্তু তারিফের বদলে পাইলেন প্রচণ্ড ভিরস্কার। তিনিও খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে লবণাক্ত স্বাদের কোন কারণ দর্শাইতে পারিলেন না।

এতক্ষণ মোল্লা-বাবুর্চি কিছু তফাতে অপেক্ষা করিতেছিল। এবার সে নিজেই আগাইয়া আসিয়া লবণাক্ত স্বাদের কৈফিয়ৎ দিল। কৈফিয়তে সে বলিল যে, সেক্রেটারীর হুকুম সে অমান্য করিতে পারে না সত্য—কিন্তু তাহার সন্দেহ হইয়াছিল যে মেস্ সেক্রেটারী এক বস্তা চিনি ঘোষ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। সে গবর্ণমেন্টের লবণ খাইয়াছে, কেমন করিয়া এই অন্যায় সে বরদাস্ত করে? সেইজন্য চিনির বস্তা হইতে অর্দ্ধেক চিনি বাহির করিয়া সেই বস্তায় কিছু পরিমাণ লবণ ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। এই ব্যবস্থা করিয়া সে মেস্ সেক্রেটারীর হুকুম অমান্য করে নাই সত্য, কিন্তু মেসের চিনি বিক্রয় করিয়া যে অন্যায় মেস্ সেক্রেটারী করিয়াছেন, সেই অন্যায় সে হইতে দেয় নাই। চিনির ব্যবহার সে বন্ধ করিয়াছে কিন্তু সে চিনিতে মেসের জন্যই রসগোল্লা প্রস্তুত হইবে জানিতে পারিলে চিনির বস্তাতে লবণ সে মিশ্রিত করিত না। এই কৈফিয়ৎ-এর পর আর কাহারও রাগ থাকা উচিত নয়। কিন্তু ধর্ম্মভীরু মোল্লা বাবুর্চিকে আর ভাঁড়ারে রাখা চলিল না। এই ঘটনার পর হইতে ঘোষ মহাশয় প্রায়ই হয় রসোগোল্লা, না পান্তুয়া না গো-মহিষের দুগ্ধে ও আমাদের মেসের চিনিতে প্রস্তুত নানা প্রকার সুস্বাদু, সুমধুর, রসাল মিষ্ট প্রস্তুত করিয়া আনিয়া আমাদের সবাইকার মনোরঞ্জন করিতেন। এই ব্যবস্থায় তিনি যেরূপ লাভবান হইতেন, আমরাও তেমনি রসনার তৃপ্তিতে লাভবান হইতাম। এই গল্পের প্রারম্ভে, যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, সে কথা পুনরায় বলিয়া উদরবদ্ধ-কুম্ভিপ্রাব পর্ব্বের কথা শেষ হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জার্মান-বিমান-বাহিনীর সোজা-নামিয়া-আসা বোমারু-বিমান টুকা বোমা বর্ষণের জন্য যখন সোজা নামিয়া আসিত, তখন সেই বিমান হইতে প্রচণ্ড তারস্বরে আওয়াজ নির্গত হইত। সেই আওয়াজ এত তীক্ষ্ণ ও ভীতিপ্রদ ছিল যে রক্ষাকারী ফৌজরা আওয়াজ শুনিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিত।

আমাদের ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স সোজা-নামিয়া-আসা বোমারু বিমানগুলিও যাহাতে বোমা বর্ষণের সময় ঐরূপ তীক্ষ্ণস্বরে আওয়াজ করিতে পারে, তাহার জন্য সামান্যরূপ পরীক্ষা চলিতেছিল। এই সময় আমাদের স্কোয়াড্রনে বিলাতী রাজকীয় বিমান-বাহিনীর একজন ওয়ারান্ট অফিসার বদলি হইয়া আসেন। তিনি ছিলেন বোমা-বারুদ-গুলি-বন্দুকবিশারদ। তাঁহার তত্ত্বাবধানে একদিন রাত্রে কাজ হইতেছিল। তিনি নিজেও

কোন কোন বিমানে ভীতি-প্রদায়ক তীব্র আওয়াজ করার জন্য যন্ত্র বসাইতেছিলেন।

পরদিন সকালে স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর কোন একটি বিমানের উড়িবার উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়া দেখার কথা ছিল। কথা ছিল বিমান অন্ততঃ অর্দ্ধঘন্টা ধরিয়া আকাশে উড়াইয়া পরীক্ষা করা হইবে। নূতন ওয়ারাণ্ট-অফিসার যেখানে রাত্রে কাজে ব্যস্ত ছিলেন, অহার নিকটেই এই বিমানটি রক্ষিত ছিল।

পরদিন সকালে স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরী অন্য কোন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় বিমানের উপযোগিতা উড়াইয়া দেখিবার অবসর পান না, তাঁহার পরিবর্ত্তে ফ্লাইং-অফিসার ব্যাধুজ ঐ বিমানের উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য লইয়া যান। আকাশে অর্দ্ধঘন্টা উড়িবার পরিবর্ত্তে, তিনি মোটে মিনিট বিশেক পরেই অবতরণ করেন। অবতরণ করার কয়েক মিনিট পরেই, যখন বিমানের এঞ্জিন অর্দ্ধঘন্টা চালু থাকা হইয়া গিয়াছে, তখন এঞ্জিনের পশ্চাত দিকে বিমানের খোলের মধ্যে ভীষণ শব্দ করিয়া এক বিস্ফোরণ হয়। আকাশে উড্ডীন অবস্থায় বা অবতরণ করার সময় যদি ঐ প্রকার বিস্ফোরণ হয়, তবে বিমানের ভূতলে পতন অনিবার্য্য। স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরী বিমান লইয়া উড়িতে গেলে, কিছুতেই অর্দ্ধ ঘন্টার পূর্ব্বে অবতরণ করিতেন না। এবং স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার কোন বিমানের উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়া দেখার সময় যদি বিমান ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই স্কোয়াড্রনের আর সুনাম ও সুরের কথা, মুখ দেখানও কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

বিমানের খোলের মধ্যে বিস্ফোরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় বৈমানিক কয়েক-জন ছাড়া আর কাহাকেও বিমানের নিকটে আসিতে দেওয়া বন্ধ করা হয়। দুইজন ভারতীয় বৈমানিক—ফ্লাইট-সার্জেণ্ট ভাদুড়ী ও শ্রামকৃষ্ণ বিমান তৎক্ষণাৎ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং বিমানের খোলের মধ্যে সবুজ-সোনার টুকরা পান। চিহ্নের টুকরাগুলি স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীকে তখনই দেখান হয়। স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার চিহ্নগুলি সঙ্গে করিয়া হার্ডার্ড বিমানে গ্রুপ হেড্‌কোয়ার্টারে উড়িয়া যান।

অপরাহ্নে যখন তাঁহার বিমান গ্রুপ হেড্‌কোয়ার্টার হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবতরণ করিতেছিল, তখন তাঁহার বিমানের পশ্চাতে দুইটি ডাকোটা বিমানও দেখা গেল। আমরা কয়েকজন জানিতাম ডাকোটা বিমানে বিমান-বাহিনীর পুলিশ ফৌজ আসিতেছিল। ডাকোটা বিমান অবতরণ করার অব্যবহিত পূর্ব্বে নবাগত বোমা-বারুদ-গুলি-বন্দুক কিপারণ বিলাতি ওয়ারাণ্ট-অফিসার এক বিষম কাণ্ড করিয়া বসিলেন। বোমা সারির মধ্যে ফিউজ তখন বসান হইতেছিল। তিনি হাতুড়ী দিয়া এক ফিউজের উপর ঘা মারিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তগুলি বোমা একসঙ্গে ফাটিয়া গেল।

বিলাতি ওয়ারাণ্ট-অফিসারের সঙ্গে আমাদের স্কোয়াড্রনের আঠারজন বৈমানিক এবং কপোরাল কাম্বোজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

নেলী সাক্স্

সমীরকান্ত গুপ্ত

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে দু'জন য়িহুদি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—একজন স্যামুয়েল জোসেফ আগনন (Samuel Joseph Agnon), অন্যজন নেলী সাক্স (Nelly Sacks)। নোবেল কমিটির মতে আগননের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বর্ণিতচিত্রে য়িহুদি জাতিরই আশা-আকাঙ্ক্ষা কুসুমিত হয়ে উঠেছে, আর শ্রীমতী নেলীর লিরিক ও নাটকীয় বাণীশিল্পে এক করুণ সামর্থ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যাত ইসরায়েলের ভাগ্যচিত্র।

নেলী সাক্স-এর জন্ম জার্মাণীতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পিতা সমৃদ্ধ শিল্পপতি এবং উদ্ভাবক। বিশ্বযুদ্ধের ঘোর ঘনঘটার মধ্যে ১৯৪০ সালে সুইডিশ রাজপরিবার এবং আর-একজন নোবেল পুরস্কারের অধিকারিণী সেলমা লাগেরলভের আনুকূল্যে নাৎসী জার্মানীর অত্যাচার-নরক থেকে তিনি বৃদ্ধা জননীকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যান সুইডেনে। নূতন দেশে নিতান্ত কাঁপাস্তা এই অপরিচিতার জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হল বালক-বালিকাদের ছাত্রাবাসে। সঙ্গে তাঁর আর ছিল কিছু পুরাণো অপ্রকাশিত কবিতার সংগ্রহ—তাতে অসাধারণত্বের ছাপ পড়েনি। কিন্তু অচিরে বিদেশে এসে তাঁর লেখা নবরচনায় নিপীড়ন-মৃত্যু-বহ্নুৎসবের জীবন্ত স্পর্শ এনে দিল একটা বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-শিহরণ—

সাদা সাপ
বেরুবৃত্ত
গ্রানিট পাথরের ডানা
বরফের চাওড়ায় গোলাপী বিষণ্ণতা
হৃদ্‌স্পন্দ-বাইল-নূরুহ ঘিরে
নিষিদ্ধ অঞ্চল
হাওয়া-শিকল শূন্যে দুলতে থরনুখো
ক্রোধের জলন্ত বোমা
এই সাপ
শুভলগ্নের টিকিট-কাটা

Weisse Schlange
Polarkreis
Flügel im Granit

rosa wehmut im Eisblock
Sperzonen um das Geheimnis
Herzklopfenmeilen aus Entfernung
Windketten hängend am Heimweh
Flammende Granate aus Zorn—
Und die Schnecke
mit dem tickendem Gepäck der Gottzeit.

আরো এগিয়ে যাওয়া যাক এই পূর্ণাঙ্গ রহস্যময় কবিতাটির সামনে—

এই রাতে
অন্ধকার গলিতে ঢুকলাম আমি
ওই মোড়ে
সেখানে যাবার ছায়া
আমার বাহুডোরে এলিয়ে পড়ল
এই ক্লান্ত বসন
চায় কেউ বয়ে নিয়ে চলুক তাকে
আর বং রাত্রি বলল আমাকে
তুমি লোকোত্তর।

DIESE NACHT
ging ich eine dunkle Nebenstrafse
um die Ecke
Da legte sich mein Schatten
in meiner Arm
Dieses ermüdete Kleidungsstück
wollte getragen werden
und die Farbe Nichts sprach mich an :
Du bist jenseits!

টিউটন-প্রতিভা ছাড়িয়ে মনে হয় না পৌঁছে গিয়েছি এক বিস্ময়কর রহস্যে? একটা কেলটিক ইন্দ্রজাল বা ভারতীয় ইঙ্গিতাভাসের জগতে? আপাতদৃষ্টিতে বা স্বলার্থে সাদা সাপ হতে পারে বাস্তব জাগতিক কিছু, ক্রতগামী যান (গ্রানিট পাথরের ডানা যাকে দিয়েছে নির্ভরশালতার পরাকাষ্ঠা)—হয়ত বিমান—কবিকে নিয়ে চলেছে বিপদের নিষিদ্ধ সীমানা ছাড়িয়ে উত্তরাঞ্চলে। পরিত্যক্ত প্রিয় জন্মভূমির স্মৃতি তবু সেই ডুমার

প্রান্তরে ছড়িয়ে দেয় গোলাপী বিষণ্ণতা। আবার অন্য এক দৃষ্টিতে এখানে ফুটে উঠতে পারে কবির মনোজগতের বা অন্তশ্চেতনারই অবিকৃত আলেখ্য—সাপ, বলক, বেরুকেন্দ্রের সুঠাম বৃত্ত সবই এখানে প্রতীক—প্রাণের, শুদ্ধির, পূর্ণ পরিপূর্ণতার প্রতীক : ইঙ্গিত কয়টি দিয়ে আঁকা এ-চিত্র নিভৃতযাত্রী সর্বকালের সর্বদেশের কবির পরিচিত। স্মরণ করুন ইয়েটস স্পেণ্ডারের—

The turning Polar North...

কিম্বা শ্রীঅরবিন্দের—

A serpent Power twinned the insensible Force.

আমাদের কবিও এই ধারায় চলেছেন তার প্রমাণ দেখাতে গিয়ে বললেন, নিজের তুরীয় সত্তার পরিচয় তিনি জানলেন নির্জনে এক গলিতে, সেখানে কায়া থেকে ছায়াকে গুটিয়ে সরিয়ে নিয়ে। দেহ আর ছায়া যে আলাদা করে ধরতে পেরেছে সেই পেয়েছে চিন্ময়ের সন্ধান, হৃদয়ে অধুনক সে-ই তো আলো। নেলী সাকস পুরাণী প্রজ্ঞা বর্ণিত এই হৃদয়ের আলোর কবি। তবে সে-আলোর পরিচয় পেতে হলে ভেদ করে আসতে হবে একটা অন্তরাল—সত্তাসা মুখ অপিহিতম্।

এই অন্তরাল, এই প্রচ্ছন্নতার আবরণ এসেছে কয়েকটি উপাদানের সংযোগে ও বিন্যাসে। ভাবকে নিবিড়ভাবে আলোড়িত এবং অনুভবকে দারুণ বিক্ষুব্ধ করে তোলে এমন দেহযন্ত্রণা এমন ব্যাপক নিপীড়ন (mass torture) প্রত্যক্ষ জীবন্ত হয়ে ওঠে এখানে কবির ভাষায়। জীবন আর মৃত্যুর রহস্যখেলার বর্ণনায় কবি চলে যান Old Testament ও Apocalypse-এর প্রাচীন চিত্রমালার আলাপে। আর আছে আধুনিক বাকভাণ্ডারের দিকপরিপ্লাবী শব্দের যোজনা—যা দেশ ছাড়িয়ে যায়, যা মনকে নিমেষে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে নিয়ে উধাও হয় আর এক প্রান্তে। সবশেষে, ভাষায়, তাঁর একটা কার্পণ্য, শব্দ ব্যয়ে একটা অনিচ্ছা প্রায়—তাতে পদে পদে ভাব তলিয়ে যায় পাহাড়ের পথে ঝাদের অতলে। অথচ কুশলী শিল্পী এসব প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়ের শাখাবিন্যাসটিকে অন্তরাত্মার তপঃপ্রভাবে হৃদয়ে আলো জ্বালবার উদ্দেশ্যে অগ্নিসৃষ্টির সেই পুরাকল্পিত সমিধ করে তুলতে পেরেছেন, যা ছিল বাধা তা হয়ে উঠল চিত্তশুদ্ধির 'পাথেয় টারি'—তাকে পার হয়ে ফলশ্রুতি হিসাবে কবি পেয়েছেন নীড়ের আশ্বাস—স্বদেশের আবির্ভাব—

ঘরের ছায়ায়
আমি রেখেছি বিশ্বরূপান্তরের রহস্য...

An Stelle von Heimat
halte ich die Verwandlungen der Welt...

এই মর্ত্যসিন্ধির জন্য যারা প্রাণ দিল তারা নূতন দিনের মানোত্তর শিল্পী—

শেষ যে এখানে শেষনিঃশ্বাস ফেলছে
তার পথচলা হল অধরে নিয়ে
নবারুণের বীজশস্য।

WER ZULETZT
hier stirb
wird das Samenkorn der Sonne
zwischen sienen Lippen tragen

বলনান পর্গেটনি, চিত্রাধারে পঙ্কদাহনের সবিধ—কাব্যাত্মাকে রহস্যাবৃত করে রাখবার এক কৌশল হল এই বস্তুসনারোহ ও কূটভাষ। তারপর—

দরজার পিছনে
অভীপ্সার সুতো ধরে টানো
টানো যতক্ষণ না জল নামে চোখে
সে ঝরণায় দেখ তোমার প্রতিমূর্তি

Hinter der Tür
ziehst du an dem Sehnsuchtsseil
bis Tränen kommen
In dieser Quelle spiegelst du dich

অশ্রুপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় লাভ—তাকেই প্রাচীন গ্রীকরা তাদের ট্র্যাজেডির প্রধান উপজীব্য করে ধরেছিল। সেই হিসাবে নেলী শাক্স গ্রীক ক্লাসিকালের উত্তরসূরী। এই চিরন্তন সত্যের প্রতিধ্বনি করে ইংরেজ রোমান্টিক কবিও বলেছিলেন—

Our sweetest songs are those
that tell of saddest thoughts

গ্রহণের, আত্মর পরিপাকের এক বিশেষ উপায়ে দাহন দীপ্তি হয়ে ওঠে, আতি মধু ও অমৃতে। ম্যাথু আর্নল্ড যদি ভারতীয় মননী হতেন তবে আধুনিক শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতেন—এই মধু ও দীপ্তি—Sweetness and Light সংস্কৃতির সংজ্ঞা মাত্র নয়, অন্তরাত্মারও বিভাস। কবি নেলী সাক্স অন্তশ্চেতনার এই এক আত্মস্থতার পদবীতে এসে উঠেছেন—যার ফলে অতীতের যাবতীয় মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তাঁকে নিরাশ হতাশ করেনি, যেখানে থেকে তিনি একটা সুস্থ জীবন-দর্শন আবিষ্কার করেছেন। ক্ষয়ক্ষতি তাঁর কাছে একটা রূপান্তরের ধারায় বয়ে চলেছে—জন্ম-মৃত্যু-

পুনর্জন্ম তাঁকে নশ্বরতার হাত, চিরবিস্মৃতির পাতাল-প্রবেশের হাত থেকে মুক্ত করেছে, আগামী একটা আশা দেখানে চিরজাগ্রত—

মানুষটা যখন ঘুমের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে
জেগে ওঠে
পাপের ভার নিয়ে
ভোরের কূপপাঁড়া থেকে
সে জানে না
সে নির্মোকের রাত্রিবাসে অবগুণ্ঠিত
সে তো চেনেনি তার পুনর্জন্ম
নিজেকে দিয়েও দেয়নি মৃত্যুর হাতে।

সবই রূপান্তর।

When the man seduced by sleep
rises
guilt-laden
from the well-shaft of morning
he does not know
that he is wrapped in the nightclothes
of the Chrysalis
for still he has not experienced
his rebirth
nor abandoned himself to his death.

All's metamorphosis

এই চিরকল্যাণী ওভশক্তিকে যখন তিনি বরণ করেছেন, সৃষ্টির ধাত্রী বলে জেনেছেন তখন কবির কণ্ঠে প্রত্যয়ের সুর—

গোপিকার মতো
গোধূলিলগ্নে
তোমার আঙুলের ডগা দিয়ে তুলে আনো
গোপন কুয়ো থেকে
আলো।

Wie eine Melkerin
in der Dämmerung
Ziehen deine Fingerspitzen
an den verborgenen Quelten
des Lichtes

আর এই অপরূপ ইন্দ্রজাল—

স্বপ্নের প্রজাপতি-রাজ্য
ছাতার মতো
সত্যের সামনে ধরা।

Einen Schmetterlingozone der Träume
wie einen Sonnenschirm
der Wahrheit vorgehalten

মাতৃবাণী

এক পরাৎপর ভাগবত-চেতনা রয়েছে, এই চেতনাকেই আমরা স্থূল জীবনের মধ্যে প্রকাশ করে ধরতে চাই।

*

অপর মত সহ্য করে চলা হ'ল সত্যজ্ঞানের প্রথম সোপান।

সয়ে চলবার প্রয়োজন প্রমাণ করে, এখনও রয়েছে প্রিয়-অপ্রিয় বোধ।

ভাগবত-চেতনার মধ্যে যার জীবন-ধারণ সে দেখে সকল জিনিষকেই এক পরিপূর্ণ সমন্বয়-দৃষ্টি দিয়ে।

*

জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ সেইসব জিনিষের মধ্যে রয়েছে যা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না।

*

অরোভিল

(১)

এমন একটী স্থান পৃথিবীর প্রয়োজন যেখানে মানুষেরা জীবনযাপন করতে পারবে সকল জাতিগত বোধ মনোজগত সংস্কার রীতিগত বিভেদ ধর্ম্মগত বিরোধ থেকে রক্ষা পেয়ে—এমন স্থান যেখানে অতীতের এই সকল দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মানুষেরা সর্ব্বতোভাবে আপনাকে উৎসর্গ করতে পারবে যে ভাগবত-চেতনা প্রকাশোন্মুখ তা আবিষ্কারের জন্য, তার সাধনার জন্য।

অরোভিল হতে চায় এই স্থানটি, আপনাকে সে ধরে দিয়েছে তাদের জন্যে যারা চায় আগামী কল্যের সত্যকে ধরে জীবনযাপন করতে।

*

(২)

অরোভিল হতে চায় অতিমানবের শৈশবদোলনা।

*

(৩)

অরোভিল—স্বাধীন আন্তর্জাতিক নগর।
সেনাবাহিনী নাই, সান্ত্রী প্রহরী নাই।
তাদের পরিবর্তে রয়েছে রক্ষীব্যূহ
ব্যায়ামবীরদের, শারীর অনুশীলনকারীদের।

*

(৪)

অরোভিল আদর্শস্থান তাদের জন্য যারা চায় জানতে
সেই আনন্দ সেই মুক্তি যা লাভ হয়
আপনার বলতে যখন কিছু থাকে না।

*

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর জন্য মায়ের বাণী

ভারত যেন ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে চলে, অগ্রণী হয়ে দাঁড়ায়। তবেই সে পৃথিবীর মধ্যে তার সত্যকার স্থান পুনরায় অধিকার করবে।

বহুদিন ধরে শাসনের রীতি ছিল বিভেদকে, বিরোধকে আশ্রয় করে, সময় এসেছে এখন শাসন হবে ঐক্যের, পরস্পরের বোঝাপড়া ও সহযোগের আশ্রয়ে।

সহযোগীর জন্য দেখা প্রয়োজন ব্যক্তির নিজস্ব গুণ, সে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত তা দেখা নয়।

দেশের মহত্ত্ব কোন বিশেষ দলের বিজয়ের উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে সকল দলের একত্বের উপর।

*

শ্রীগিরিজীর জন্য মায়ের বাণী

এস, আমরা সকলে কাজ করি যাতে ভারত মহান হয়ে ওঠে।

*

শুধু ভাগবত-চেতনাই ব্যক্তিগত কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে আর সে চেতনা স্বাধীন স্বতন্ত্র, মানুষী চেতনার ঊর্ধ্বে।

সূচীপত্র

(বর্ষ ১ থেকে বর্ষ ১২)

সন	বর্ষ	সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
১৯৪১ (২৪।১১)	১	১	প্রস্তাবনা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		
			ভৌতিক ও অতি-ভৌতিক অভিব্যক্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১
			(১) পৃথিবীর জন্ম ও জীবজগতের অভিব্যক্তি			
			(২) বানরকুলের অভিব্যক্তি ও মানবের উদ্ভব			১১
			(৩) গুহাবাসী মানব			২৮
			জীবনসমস্যা ও পূর্ণযোগ	শ্রীহরিদাস চৌধুরী		৩৬
			আধ্যাত্মিকতা ও স্বার্থপরতা			৪৩
১৯৪২ (২১।২)	২	২	শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ	শ্রীঅনিলবরণ রায়		১
			ভৌতিক ও অতিভৌতিক অভিব্যক্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৩
			(১) গুহাবাসী মানব			
			(২) প্রাচীন সাম্রাজ্যসমূহ			২৮
			শ্রীঅরবিন্দের 'মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		৪৫
			বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিকতা	শ্রীহরিদাস চৌধুরী		৫৫
			জড়ের রূপান্তর	শ্রীসুরেশ দেব		৬৩
২৪।৪	২	৩	চৌঠা এপ্রিল (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
			চব্বিশে এপ্রিল (ঐ)	নিশিকান্ত		৮
			শ্রীঅরবিন্দের 'মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৪
			(১) ব্যক্তিবাদের স্বরূপ			
			(৩) ব্যক্তিবাদের পরিণাম			

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	(৩) জনসমাজ ও রাষ্ট্র			
	মা	শ্রীহরিদাস চৌধুরী		৪২
	মানুষের অন্তরলোকে উত্তরণ	শ্রীসুরেশ দেব		৪৯
২৪।১১ ২ ৪	চেতনার অবতরণ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		১
	শ্রীঅরবিন্দের 'মনন্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৬
	(১) দানবশক্তির জাগরণ			
	(২) বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ			
	(৩) মানব সমাজের যথার্থ লক্ষ্য			
	(৪) আধুনিক সভ্যতার স্বরূপ			
	মা	শ্রীহরিদাস চৌধুরী		৫৩
	অমৃতময় জীবন	শ্রীহরিদাস চৌধুরী		৬৭
	(১) অমৃতের সন্ধানে	শ্রীহরিদাস চৌধুরী		৬৭
	(২) ভক্তবাদ			
১৯৪৩ ৩ ৫	গীতায় অনাসক্তি যোগ	শ্রীঅনিলবরণ রায়		১
২১।২	শ্রীঅরবিন্দের 'মনন্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৭
	(১) মনোময় মানবের পরিণতি			
	(২) নীতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ			
	প্রণাম—মাতৃচরণে (কবিতা)	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার		৩২
	প্রণাম—শ্রীগুরুচরণে (ঐ)	,,		৩৩
	তন্ত্র ও শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী		৩৪
	শ্রীঅরবিন্দের 'গীতা-নিবন্ধ'	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র		৪২
	শ্রীঅরবিন্দের "বুদ্ধ ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ"	শ্রীপ্রমোদকুমার সেন		৪৯
২৪।৪ ৩ ৬	মা (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
	যোগে অধিকার ও দীক্ষা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		২১
	অমঙ্গল ও তাহার প্রতিকার	শ্রীঅনিলবরণ রায়		২৭

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	শ্রীঅরবিন্দের "মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি"— বুদ্ধিবৃত্তি (১) ও (২)	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		৪৪
	শ্রীঅরবিন্দের 'গীতা-নিবন্ধ'	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র		৫৫
	শ্রীঅরবিন্দের "যুদ্ধ ও জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ" (প্রথম পরিচ্ছেদ)	শ্রীপ্রমোদকুমার সেন		৫৯
	তন্ত্র ও শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী		৬৩
	অদিতি (গ্রন্থ-পরিচয়)	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		৮৩
২৪।১১ ৩ ৭	দর্শন (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
	পবন প্রকাশ (কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৯
	কাণ্ডারী (কবিতা)	নীরদবরণ		১০
	পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		১১
	শ্রীঅরবিন্দের "মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি"— মুক্তিবুদ্ধি ও সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৮
	শ্রীঅরবিন্দ ও তন্ত্র	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী		৩০
	শ্রীঅরবিন্দের "যুদ্ধ ও জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ" (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)	শ্রীপ্রমোদকুমার সেন		৪৮
	শ্রীঅরবিন্দের 'গীতা-নিবন্ধ'	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র		৫৩
	প্রাণ ও প্রাণায়াম	শ্রীঅনিলবরণ রায়		৬০
১৯৪৪ ৪ ৮	নৌন প্রার্থনা (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
২১।২	নব বর্ষ (কবিতা)	নীরদবরণ		৩
	নব বর্ষের দীক্ষা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৫
	শ্রীঅরবিন্দের 'মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'— ১৬শ ও ১৭শ পরিচ্ছেদ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		৯

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	শ্রীঅরবিন্দের 'গীতা-নিবন্ধ'	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র		২১
	জাতীয় জীবনে যাচের মূল্য	শ্রীসোমনাথ মৈত্র		৩০
	ভক্তি ও প্রেম	শ্রীঅনিলবরণ রায়		৩৩
	শ্রীঅরবিন্দের ভাগবত জীবন	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত		৪৫
২৪।৪ ৪ ৯	শরণ (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
	মানুষী তনু	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৬
	পুনর্জন্ম তত্ত্ব	শ্রীঅনিলবরণ রায়		১১
	মন ও মর্ম (কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		২২
	শ্রীঅরবিন্দের 'মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'— অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		২৭
	"ভারত কি সভ্য ?"	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী		৩১
	শ্রীঅরবিন্দের ভাগবত জীবন	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত		৪১
	বিবর্তন	শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়		৫২
	আলো-অবতরণ (কবিতা)	নীরদবরণ		৬১
	শ্রীঅরবিন্দের গীতা-নিবন্ধ	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র		৬৩
১৯৪৪ ৪ ১০	কবিতাগুচ্ছ—শঙ্খ, আহ্বান, বাদ, বাণী, সারথি	নিশিকান্ত		১
	শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী :	শ্রীঅরবিন্দ	অনিলবরণ রায়	
	(১) চৈত্য-পুরুষ			৫
	(২) ভৌতিক চৈতন্য			৬
	সনাতনী ও আকূতি :	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		১১
	জীবন ও যোগ	শ্রীঅনিলবরণ রায়		১৪
	শ্রীঅরবিন্দের 'মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'— ১৯-২০-২১ পরিচ্ছেদ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৮
	ভবিষ্যৎ কবিতার রূপ	শ্রীমতী নতিকা ঘোষ		২২

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	শ্রীঅরবিন্দের 'গীতা-নিবন্ধ'	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র		২৭
	ব্রহ্ম ও বিশ্ব	শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়		৩১
১৯৪৫ ৫ ১১	কবিতাগুচ্ছ—পক্ষিরাজ, সাধনা, বন্দিনী, খণ্ডিতা, আশা,	নিশিকান্ত		১
	অসত্য নয়, সত্যের পথে	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৪
	ভারত কি সত্য ?	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী		৯
	শ্রীঅরবিন্দের 'মনন্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'— ১৯, ২০ ও ২১ পরিচ্ছেদ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১
	ব্রহ্ম ও বিশ্ব	শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়		২৩
	বিবর্তনের তিনটি স্তর	শ্রীঅনিলবরণ রায়		২৮
	আনন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		৩৮
২৪।৪ ৫ ১২	চব্বিশে এপ্রিল (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
	জীবন-শ্রী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৫
	শ্রীঅরবিন্দের বাণী	শ্রীঅনিলবরণ রায়		৬
	ভবিষ্যৎ কবিতার রূপ	শ্রীমতী নলিনী ঘোষ		১০
	শ্রীঅরবিন্দের 'মনন্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'— ২২শ ও ২৩শ পরিচ্ছেদ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৭
২৪।১১ ৫ ১৩	গুরু (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
	উল্লাস (কবিতা)	নিশিকান্ত		২
	বিজয়ের দিনে	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৩
	এই দুর্দিনে	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৩
	পৃথিবীতে নবতন্ত্র	শ্রীঅনিলবরণ রায়		১০
	শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড মানবের আদর্শ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৮
	শ্রীঅরবিন্দের 'মনন্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি'	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		২১

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	অতিমানস তত্ত্ব—The Life Divine-র ১৩শ, ১৪শ, পঞ্চদশ অধ্যায়ের সারাংশ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		২৫
	জ্ঞানা ও অজ্ঞানা	শ্রীসচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়		৩৯
১৯৪৬ ৬ ১৪	ধৈর্য (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
	পন্থা (কবিতা)	নিশিকান্ত		২
	নীল-যমুনার তীরে (গান)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৩
	গান	অরুণা দেবী		৫
	বর্ত্তমান অবস্থায়	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৬
	জীবন ও আনন্দ	শ্রীঅনিলবরণ রায়		৯
	শ্রীঅরবিন্দের গীতা-নিবন্ধ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		২৯
	শুদ্ধ সৎ বস্তু	শ্রীহরিদাস চৌধুরী		৩৯
	ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু	৪৫
	ভাগবত জীবন	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত		৫৪
২৪।৪ ৬ ১৫	শক্তি (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
	বিনতু (কবিতা)	নিশিকান্ত		২
	গান	সাহানা দেবী		৩
	গান	অরুণা দেবী		৪
	স্বপ্নলিখনে (কবিতা)	সাহানা দেবী		৫
	মন ও অতিমানস	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		৬
	ভবিষ্যৎ কবিতার রূপ	লতিকা ঘোষ		১২
	ভারতের বাণী ও শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীঅনিলবরণ রায়		২৫
	ভাগবত জীবন	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত		৩৩
	তন্ত্র ও শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী		৪৫
	পরিশিষ্ট			
	শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৪৮
১৯৪৬ ৬ ১৬	দৃষ্টি নির্ঝর (কবিতা)	নিশিকান্ত		১
২৪।১১	সর্ব্বব্যাপী (কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৩
	অধর-পিয়াসী (কবিতা)	নীরদবরণ		৫

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	হে পথিক (কবিতা)	সাধনা দেবী		৭
	সদ্‌গুণের উৎসবে	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
	মাতৃঃ	শ্রীঅনিলবরণ রায়		১০
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)			
	ছোট-বড় জনসমবায়	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		২২
	প্রাণ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		২৯
	ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু	৩৮
১৯৪৭ ৭ ১৭	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	সোনার ফসল (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪
	দু'টি (কবিতা)	নীরদবরণ		৬৭
	সুখের সন্ধানে	শ্রীঅনিলবরণ রায়		৮
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)			
	রাষ্ট্রের স্বরূপ ও তাহার ভবিষ্যৎ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৯
	প্রাণ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		২৫
	ভাগবত জীবন	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত		৩৩
১৯৪৪ ৭ ১৮	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা		১
	বৈদিক কথোপকথন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৫
	অলৌকিক অট্টালিকা (কবিতা)	নিশিকান্ত		৭
	দক্ষিণং নুখম্ (কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৯
	শ্রীঅরবিন্দ (কবিতা)	বিহারীলাল		১০
	পণ (ঐ)	নীরদবরণ		১১
	জাতিভেদ ও বর্ণবিভাগ	শ্রীঅরবিন্দ		১২
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)			
	জাতীয় রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		২৬
	বাহ্য ও চৈত্য পুরুষ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		৩২

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু	৩৮
১৯৪৭ ৭ ১৯	আবাহন	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২৪।১১	১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২
	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা		৬
	শ্রীমার কথা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত		৯
	(১) মানুষের আদিরূপ			
	(২) শরীরের সার্থকতা			
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৪
	ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু	২৩
	আমাদের যুদ্ধ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৩০
	ঋগ্বেদের মর্মার্থ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩৮
	শ্রীঅরবিন্দের যোগ	শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী		৪৫
	সত্য (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪৯
	মুক্তি-সঙ্গীত (কবিতা)	রবি গুপ্ত		৫০
	অবতীর্ণা (কবিতা)	বিহারীলাল		৫২
১৯৪৮ ৮ ২০	মায়ের প্রার্থনা		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	ঋগ্বেদের মর্মার্থ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৬
	ঋষি গৃৎসমদের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৯
	স্বাধীনতা দিবসে	স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ		২২
	সত্তা ও বিদ্যা	শ্রীঅনিলবরণ রায়		২৫
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ (বিশ্বজাতি গঠন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য)	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		২৯
	জাতির আত্মা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৩৫
	ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু	৩৮
	নবজন্মধ্বনি (গান)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৪৪
	বন্দিনী (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪৫
	গান	অরুণা দেবী		৫২

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
২৪।৪ ৮ ২১	মায়ের প্রার্থনা		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	ঋষি গৃৎসমদের অগ্নিস্তব	শ্রীঅরবিন্দ		৩
	বিশুদ্ধ বুদ্ধি	শ্রীঅনিলবরণ রায়		৭
	শ্রীঅরবিন্দের দিব্যমানব ও নীটশের অতিমানব	শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী		১৫
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ (অষ্টম পরিচ্ছেদ বৃটিশ যুক্তমণ্ডল)	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৯
	ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু		২৫
	কুণ্ডলী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৩৮
	জড়বস্তু	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		৪১
	সাবিত্রী (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৪৬
	(Book I Canto IV থেকে অংশ বিশেষের অনুবাদ)			
	শরণ (কবিতা)	রবি গুপ্ত		৪৮
২৪।১১ ৮ ২২	মায়ের প্রার্থনা		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	দিব্য জীবন	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪
	(Life Divine Ch. XXVIII)			
	ভারতের মস্তিষ্ক	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসরীসকান্ত গুপ্ত	১১
	(Brain of India)			
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ (নবম পরিচ্ছেদ— সাম্রাজ্যবাদের পরিণতি)	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		২৩
	গীতার মর্ম	শ্রীঅনিলবারণ রায়		২৯
	পদার্থের উৎক্রমণ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		৩৫
	ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু		৪৩
	এবার পূজায় (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪৭
	অরবিন্দ (কবিতা)	রবি গুপ্ত		৪৮
১৯৪৯ ৯ ২৩	মায়ের প্রার্থনা		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	শ্রীঅরবিন্দের বাণী		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪
	শ্রীযুত রেভূতীর ভাষণ		শ্রীসরীসকান্ত গুপ্ত	১০

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	দিব্য জীবন	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৫
	মুক্তি ও সিদ্ধি	শ্রীঅনিলবরণ রায়		২১
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ (দর্শন পরিচ্ছেদ— নানা রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংঘর্ষ)	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		২৪
	সন্তার সপ্তবৎ ত্রয়ী	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		৩২
	ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু		৩৯
	একটি তারা (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪৪
২৪।৪ ৯ ২৪	মায়ের প্রার্থনা		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	দিব্যজীবন	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪
	শরীর চর্চা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বাণী		শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৮
	মায়ের আলাপ	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	১১
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ (দর্শন পরিচ্ছেদ— শেষাংশ)	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		১৭
	ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু		২০
	নারী-জীবনের লক্ষ্য মাতৃত্ব ?	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		২৫
	মুণ্ডকোপনিষদ		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২৮
	গান	রবিগুপ্ত		৩২
	সাবিত্রী (প্রথম ভাগ প্রথম সর্গ)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৩৩
	ঝড়ের পরে (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪০
১৩৪৯ ৯ ২৫	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	প্রেম-ভক্তি-যোগ (More Lights on Yoga)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৬
	মায়ের আলাপ	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৯
	মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে (Letters—2nd series)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	১২

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	প্রার্থনা ও মায়ের উত্তর			১৭
	কায়াসিদ্ধি	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২০
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		৩৪
	শ্রীঅরবিন্দ সমীপে	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৪১
	মুণ্ডকোপনিষদ		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৭৯
২৪।১১ ৯ ২৬	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	দিব্যদেহ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৬
	আবেদনিকার উদ্দেশ্যে বাণী	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	২৬
	অফুরন্ত শক্তি	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২৯
	আদর্শ ও লক্ষ্য (More Lights on Yoga)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩১
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৪০
	মুণ্ডকোপনিষদ		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪৮
১৯৫০ ১০ ২৭	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	শ্রদ্ধা	শ্রীঅরবিন্দ		
	মায়ের বাণী			৮
	ভাবীকালে	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৯
	মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩১
	'পরে ক্রমবর্ধমান-পথ	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩৭
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৪১
	ব্যক্তি, বিশ্ব ও ভগবান	শ্রীপ্রমোদকুমার সেন		৪৮
	"প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ"	যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়		৫১
১৯৫০ ১০ ২	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২৪।৪	ঈশ উপনিষদ		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৬
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৯
	অতিমানস ও দিব্যজীবন	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু	২৬
	ভবিষ্যদ্দৃষ্টি	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩৬
	আনাতোল ফ্রাঁস	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩৮
	বিশ্বলীলা	শ্রীযুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়		৪০

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
১৯৫০ ১০ ৩	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	অন্তরাল (কবিতা)	নিশিকান্ত		৬
	শ্রীচৈতন্য (নাটক)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		১৭
	করুণা-আঁখি (কবিতা)	রবি গুপ্ত		৩৯
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৪০
	আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৫৫
	অতিমানস ও মানবতা	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু	৬৯
	শ্রীঅরবিন্দের পত্রধারা	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য	৭৪
	বেদান্তের বাণী	শ্রীহরিদাস চৌধুরী		৮৪
	একজন নেতা	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৯৩
১৯৫০ ১০ ৪	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৪
	মানসোত্তর	অনির্বাণ		১৬
	রূপান্তর	শ্রীমা		২৩
	মানবের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত		২৫
	মন	শ্রীযুগলকিশোর		৩৩
	শ্রীচৈতন্য (নাটক)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৩৭
	শ্রীঅরবিন্দের বাংলা পত্রাবলী (অপ্রকাশিত)			৬৩
১৯৫১ ১১ ১	মায়ের বাণী	শ্রীমা		১
	সমাজের কথা	শ্রীঅরবিন্দ		৩
	শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী (অপ্রকাশিত)			৪
	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫
	শ্রীচৈতন্য (নাটক)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৯
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৩৮
	দুঃখের দান	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৫২
	শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগ	অমলকিরণ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৫৪

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
১৯৫১ ১১ ২	মানব সমাজের তিন ক্রম	শ্রীঅরবিন্দ		১
২৪।৪	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩
	শ্রীঅরবিন্দের পত্রধারা		শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য	৬
	অতিমানস ও মানবতা	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু	২৪
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৩০
	শ্রীচৈতন্য (নাটক)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৩৫
	শিক্ষা	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৬০
১৯৫১ ১১ ৩	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪
১৫।৮	সাধক সর্বদা			
	মনে রাখবে	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
	শিক্ষা	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	১১
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	১৬
	স্বপ্ন	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	২১
	দিব্য জীবন (অবতরণিকা)	অনির্বাণ		২৮
	শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়	ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩৬
	শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ		৪০
	শ্রীচৈতন্য (নাটক)	শ্রীদিলীপকুমার রায়		৪৫
	আশ্রমের বালক-বালিকাদের প্রতি	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৭৪
	দাসত্ব	শ্রীমা		৭৫
১৯৫১ ১১ ৪	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৫
	শিক্ষা	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	১৭
	দিব্য জীবন	অনির্বাণ		২২
	মা কে ? (প্রশ্নোত্তর)	শ্রীঅরবিন্দ	পশুপতি ভট্টাচার্য্য	৩১
	সাবিত্রী	শ্রীঅরবিন্দ		৩২
	একখানি পুরাতন চিঠি	শ্রীঅরবিন্দ		৪৪

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
১৯৫২ ১২ ১	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২১।২	বেদ-রহস্য	শ্রীঅরবিন্দ		৬
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	১১
	শিক্ষা	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	২৮
	দিব্য জীবন			৩৩
	জীবন বিজ্ঞান	শ্রীমা		৪২
	কেনোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৪৯
	গায়িত্রী	শ্রীঅরবিন্দ		৫৫
১৯৫২ ১২ ২	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২৪।৪	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৬
	দিব্য জীবন	অনির্বাণ		১৬
	চিন্তা	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩২
	শিক্ষা	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩৯
	কেনোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৪৭
	তথাগতের রথ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু		৫৪
১৯৫২ ১২ ৩	মায়ের প্রার্থনা		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
১৩।৮	ঋগ্বেদ	শ্রীঅরবিন্দ		৬
	আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	১১
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	১৪
	দিব্য জীবন	অনির্বাণ		২১
	শ্রীমায়ের কথাবার্তা			৩৮
	তৃণ (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪২
	কেনোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৪৩
	দু'টি আঁখি (কবিতা)	রবি গুপ্ত		৪৮
১৯৫২ ১২ ৪	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫
২৪ ১১	পুরাতন ও নতন	শ্রীঅরবিন্দ		১০
	ঋগ্বেদ	শ্রীঅরবিন্দ		১১
	ঈশা উপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ		১৪

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
১৯৫২ ২২ ৪	সমর্পণ	শ্রীঅরবিন্দ		১৬
২৪।৪	যোগেশ্বরম্	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	১৭
	আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র	শ্রীমা	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	২৯
	দিব্য জীবন	অনির্বাণ		৩১
	শিশু সঙ্গে শ্রীমা			৪৩
	মহাশক্তির বাণী (সাবিত্রী)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪৫
	কেনোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৪৭

সেই কবে

অমৃত

এই গ্রন্থে অমৃত তাঁর হৃদয়ের ভাষায় আমাদের বলেছেন তাঁর শৈশব জীবনের কত বিচিত্র মধুর কথা—শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার সঙ্গে তাঁর প্রথম সান্নিধ্যের বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

ভাগবৎ সন্নিধানের প্রতি ওই নিভৃত যোগীর এ হল এক আশ্চর্য অভিসার—ভবিতব্যের সেই যাত্রাপথ...প্রসারিত চিরন্তন দিন আবৃত যেন অমা অন্ধকার দিয়ে—একাকী চলেছেন যোগী, চলেছেন তিনি অভিনন্দিত উষার অভিমুখে।

গ্রন্থখানির প্রস্তাবনায় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বর্ণনা করেছেন অমৃতের আধ্যাত্মিক জীবনের কত অজানা অভিজ্ঞতার কথা। এই সঙ্গে অমৃতের সর্বশেষ রচনা "Pilgrim Way" ও শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক তার অনুবাদ "তীর্থ অভিসার" সংযোজিত হয়েছে। হৃদয়বান পাঠকের কাছে এই গ্রন্থখানি এক দুর্লভ সংগ্রহ। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

পৃথ্বী কার্যালয়	**শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির**
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট	১৫, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২	কলিকাতা-১২

Planning a new project ?

IT PAYS TO AVAIL OF INDIAN CONSULTANCY SERVICES

What should be the best process for the plant ? Will the plant be economically viable? Does the market justify the plant capacity ? Is the site selected ideal for the plant ? Is the production cost realistic ? How and where to obtain the best possible plant and equipment ? All this and many other project problems may confront you Why not leave these to competent Indian Consulting Engineers ? Indian Consultants have no interest other than yours. It is they who know the Indian conditions best.

RANGE OF SERVICES

FEASIBILITY AND PROJECT REPORTS □ MARKET STUDY AND ECONOMIC INVESTIGATION □ SITE SELECTION AND SURVEY □ BASIC AND PROCESS ENGINEERING □ TENDER EVALUATION AND APPRAISAL □ DETAIL DESIGN ENGINEERING □ CONSTRUCTION SUPERVISION AND MANAGEMENT □ COMPLETE PLANT ERECTION □ START-UP AND COMMISSIONING □ INITIAL OPERATION □ TRAINING OF PERSONNEL □ POST-OPERATION CONSULTATION.

Indian consultancy helps the nation attain self-sufficiency in technical know-how

*

Issued in the interest of consultancy services by

THE KULJIAN CORPORATION (INDIA) PVT. LTD.

24-B, Park Street, Calcutta-16.

Phone : 34-2665 **Gram : Boxboard**

For Quality

Printing and Card Board Box Making

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে
শ্রীঅরবিন্দের দি নাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম —২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	দাম—২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	দাম ২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	দাম —২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন

(সংক্ষিপ্ত—১ম খণ্ড)

১ থেকে ২৮ অধ্যায়

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য তিন টাকা

"এই সংক্ষিপ্তসার অনুসরণ করে যারা শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনে প্রবেশ করবেন তাঁরা অল্প চেষ্টায় মূল গ্রন্থের সার কথা সবই পাবেন।" (যুগান্তর)

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

কে এই মা ?

পশুপতি ভট্টাচার্য

(চতুর্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)

মূল্য—৩.৫০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

Reg. No. 13773'66

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির প্রকাশনা

যোগ সাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
স্মৃতির পাতা (১ম পর্যায়)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪·৫০
ঐ (২য় ,,)	ঐ	৪·০০
কবিমনীষী (১ম খণ্ড)	ঐ	৩·০৫
ঐ (২য়)	ঐ	৪·৫০
রবীন্দ্রনাথ	ঐ	৩.৫০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও কর্ম	পশুপতি ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক)	৫·০০
Talks with Sri Aurobindo	by Nirodbaran	৮·০০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্তমান জগৎ	অনিলবরণ রায়	২·০০
সাধনার জীবন	সমীরকান্ত গুপ্ত	১·০০

696| 330 51

আশ্রম প্রকাশনা

বিবিধ রচনা	শ্রীঅরবিন্দ	১·০০	উত্তম রহস্য	শ্রীমা	১·০০
ভারতের নবজন্ম		১·৫০	ছোটদের গল্প		১·৫০
কর্মযোগী		১·৫০	পুরাণো লেখা		১·৫০
জগন্নাথের রথ		১·০০	শিক্ষা		১·৫০
গীতার ভূমিকা		২.০০	মায়ের আলাপ		২·৫০
শ্রীঅরবিন্দের পত্র		১·০০	সর্বোত্তম আবিষ্কার		০·৩৭

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

ক লি কা তা—১২

ফোন—৩৪-২৩৭৬